ষাণ্মাসিক সূচী

বৈশাখ-আশ্বিন—১৩৫১

বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের এই নবধর্ম্মে স্বদেশপ্রীতি বা জাতীয়তা-মন্ত্রের স্থান কি, তাহার একটু সবিশেষ আলোচনা করিলেই বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের কথা একরূপ শেষ হইবে। যে স্বাজাত্যবোধ একদা বাংলা দেশেই জন্মলাভ করিয়া সমগ্র ভারতে একটা নূতন ধর্ম্মচেতনার মত বিস্তারলাভ করিয়াছিল তাহার আদি প্রবক্তা যে বঙ্কিম, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্বের আর সকল তত্ত্ব ওই এক তত্ত্বে আসিয়া ঠেকিয়াছে—জাতি ও সমাজ, এই দুইয়ের এক অর্থ দাঁড়াইয়াছে স্বদেশ। ইংরেজী শিক্ষার ফলে ও রাজনৈতিক চেষ্টার উন্মেষে ক্রমে ভারতবাসী সকল শিক্ষিত সমাজের মনে স্বদেশ-প্রেম নামক যে একটা বিলাতী সেন্টিমেন্টে স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা অবশেষে একটা ধর্ম্মবিশ্বাসের মত গভীরতা লাভ করিল বাঙালীর এই মন্ত্রদ্রষ্টার প্রভাবে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বাংলা দেশে ওই ভাবের যে বাড়বানল জলিয়াছিল—তাহার মন্ত্রোচ্চারণে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অক্ষরগুলা ছিল বটে, কিন্তু ধর্ম্মের বিশুদ্ধি ছিল না; বঙ্কিম যে বিলাতী patriotism-এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, সেই বস্তুই ভাবোদ্দীপনার সহায় হইয়াছিল। বঙ্কিমের দেশপ্রীতি মনুষ্যত্বসাধনারই একটা অঙ্গ—সেই বৃহত্তর ধর্ম্মেরই একটা বড় সাধন। ইহার মূল প্রয়োজন ব্যক্তিক নয়—সামাজিক; মূলে পরজাতি-বিদ্বেষ নয়—স্বজাতি-প্রীতি ইহার একমাত্র প্রেরণা; এমন কি, জগৎ-প্রীতি ও ভগবৎ-প্রীতিতেই তাহার শেষ পরিণতি। এই স্বদেশপ্রীতিকেই বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বলাভের অতিশয় সহজ ও নিশ্চিত উপায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালের মত গোড়া হইতেই ভগবানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জগৎ-সংসারের প্রতি উদাসীন থাকিতে একালে আর

চলিবে না; ভগবানের জন্য সংসার-ত্যাগ নয়—মানুষের জন্যই আত্মত্যাগ করিতে না পারিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না; ভগবান-লাভ তো পরের কথা, আপনাকে হারাইতে হইবে—এই সত্য বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এবং য়ুরোপীয় জাতিসকলের স্বাজাত্যনিষ্ঠা হইতে ইঙ্গিত পাইয়া, তিনি সেই patriotism-কে শোধন করিয়া—তাহাকেই মানুষের একটি মহৎ ধর্ম্মরূপে গড়িয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সেই অনুশীলন-ধর্ম্মের সকল অঙ্গ সংযোজন ও সুসম্পূর্ণ করিয়া লওয়ার পরে, তিনি যেন শেষে এই মন্ত্রটিকে বিদ্যুৎবিকাশের মত আপন অন্তরে দর্শন করিলেন এবং ঋষির মতই উচ্চারণ করিলেন—"ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম"। তারপর—

* ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।

আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র ইহার সবিশেষ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, তাহার কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) যদি সমাজ-ধ্বংসে ধর্ম্ম-ধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হইবে। এই জন্য Herbert Spencer বলিয়াছেন "The of the social organism must as an end, rank above the lives of its units", অর্থাৎ, আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

(২) আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, দেশরক্ষা—জগৎরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাস্তবিক জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য হইব কেন? [মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা স্মরণীয়।]...জাগতিক প্রীতি ও সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কাহারও অনিষ্ট করিব না। পর-সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহাকেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন, এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য।

(৩) আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয়

Patriotism-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।...জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্যধর্ম্ম না লিখেন।

এইখানে বোধ হয় একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে যেমন ঐরূপ দেশবাৎসল্যের একটা উৎকট উন্মাদনা বাঙালীকে প্রায় বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল—তেমনই, তাহার কিছু পরেই অতি-উর্দ্ধ ভাব-স্বর্গ হইতে ঠিক বিপরীত ধর্ম্মের একটা স্নিগ্ধ বায়ুস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে—তাহাতে সেই বিধ্বস্ত সমাজের অবশিষ্টগণের ক্লীবত্ব ঢাকিবার বড় সুযোগ হইয়াছে। এই ধর্ম্মের নাম বিশ্বমানব-প্রেম; ইহার প্রধান লক্ষণ হইল—দেশ ও জাতির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করা; খুব-বড়কে মৌখিক পূজা নিবেদন করিয়া, মাঝারি-বড়কে ধিক্কৃত করা, এবং তদ্দ্বারা খুব-ছোটর উপাসনাকে নির্ব্বিঘ্ন করিয়া আত্মসুখসাধন। সেই উন্মাদনার প্রতিক্রিয়া-মুখে এই ধর্ম্ম বড়ই আরামদায়ক হইয়াছিল, Nationalism যে কত বড় অধর্ম্ম—ভাবস্বর্গবাসী কবির মুখে তাহা শুনিয়া কুলচুরবিলাসী আত্মসুখ-লম্পটের আনন্দ আর ধরে না। অথচ, এইরূপ nationalism-কে গালি দেওয়া যে নূতন নয়, এবং তাহাকে গালি দিয়াও স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশপ্রীতি যে একটা বড় ধর্ম্ম হইতে পারে—এ কথা এক পুরুষ পূর্ব্বেও একজন মহামনীষী প্রচার করিয়াছিলেন—সে সন্ধান কেহ লইল না; এ জাতির ঐতিহাসিক আত্মজ্ঞান এমনই। এক এক প্রহরে এক-একটা ডাক ডাকিলেই হইল—একজন যে ডাক ধরাইয়া দিবে, আর সকলে তাহাই ডাকিবে; কণ্ঠের কণ্ডূয়ননিবৃত্তি হইলেই হইল। যে দয়া ও বিশ্বমানব-প্রীতির আজ এত প্রসার হইয়াছে—বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে এক মুহূর্ত্তও অস্বীকার করেন নাই; বরং ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, জাগতিক প্রীতির সহিত দেশপ্রীতির সামঞ্জস্যসাধন করিতে না পারায়, ভারতবর্ষে সার্ব্বজনীন মনুষ্য-ধর্ম্ম অবনতিগ্রস্ত হইয়াছে—আমাদের সামাজিক অবনতির একটা বড় কারণ ইহাই।

ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বর-ভক্তি ও সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলোকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন

নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়েরই অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে থাকিবে।

এই কথাই, বোধ হয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা খুব বড় কথা। পারমার্থিক আদর্শ, ও সেই আদর্শের সাধনায় ভারতবর্ষে জন-জীবন যে দিক দিয়া যতখানি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকুক, এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী তাহার সমাজ যতই সুবিহিত হউক—তাহার ঐতিহাসিক কর্ম্মজীবনের ধারা যে বার বার রুদ্ধ হইয়াছে, এবং মনুষ্যত্ববিকাশে বাধা ঘটিয়াছে, ইহার মত সত্যও আর কিছু নাই। এই সত্যকে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করেন নাই বটে, কিন্তু তজ্জন্য যে সমস্যা, তাহাকে এমনভাবে জাতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কারের অনুকূলে একটা নূতন ও উৎকৃষ্ট মন্ত্রের দ্বারা সমাধান করা, ইহাই তাঁহার মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। জাগতিক প্রীতিই মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম—তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের মূলতত্ত্ব ইহাই বটে, কিন্তু তত্ত্বকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে—মানুষকে নিঃস্বার্থ করিবার সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়—এ যুগে এমন আর কিছু নাই। মনুষ্য-ধর্ম্মের সকল দিক চিন্তা করার পর সর্ব্বশেষে এই যে তত্ত্ব তাঁহার চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টির গভীরতাও যেমন—তেমনই তাঁহার বাস্তব-নিষ্ঠাও প্রকাশ পাইয়াছে। মনে হয়, ভারতের সেই প্রাচীন ধর্ম্মতত্ত্বকেই ভিত্তি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে নবধর্ম্ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন—তাহার দৃঢ়তম খিলান হইল এই দেশপ্রীতি। আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও চিন্তাপ্রণালী যিনি আমূল পর্য্যালোচনা করিবেন, তিনি ইহাতে বিস্মিত হইবেন না; বরং জাতির চিন্তার-ইতিহাসে তাঁহার এই দান যেমন অমূল্য, তেমনই যুগান্তকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন। ভারতীয় ধর্ম্মের অঙ্গীকৃত করিয়া এই স্বদেশপ্রীতিকে এত বড় স্থান দিবার কল্পনাও পূর্ব্বে কেহ করে নাই।

উপরে উদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে সমাজ ও স্বদেশ একই, অর্থাৎ দেশই সকল সমাজের অধিষ্ঠান-ভূমি। প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে, দেশ-কালের গূঢ়তর প্রভাবে, মনুষ্যজাতির গোষ্ঠী-বিভাগ অনিবার্য্য, এবং সেই কারণে স্বাজাত্যবোধও

স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার চেতনা নানা কারণে কোথাও অপরিস্ফুট, কোথাও বা অসুস্থ আকারে পরিস্ফুট। ভারতবর্ষে একরূপ সমাজ-চেতনাই ছিল—এইরূপ জাতীয়তার চেতনা কখনও পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। পরে সেই প্রাচীন সমাজধর্মও অটুট থাকে নাই, যুগান্তরের প্রয়োজন সত্ত্বেও, মানুষের ধর্মকে সমাজধর্মের সহিত যুক্ত করা হয় নাই—সমাজ একটা বাহিরের বন্ধনমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; মানুষ তাহার মধ্যে স্ব ও পরের কল্যাণকে এক করিতে না পারিয়া শেষে মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিল—তাহার আধ্যাত্মিক সাধনাও স্বার্থসাধনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, জীবনে আত্মোৎসর্গের অবকাশ অতিশয় সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, জাগতিক প্রীতি বা সর্ব্বভূতের হিতসাধন—কর্মে নয়, ধ্যানে ও ভাববিলাসে স্থান লাভ করিয়াছিল—শাস্ত্র-বচনের মত তাহা কেবল উচ্চারণ করিয়াই মনকে পবিত্র করা যাইত। তাই নব-যুগের নবধর্মের প্রেরণা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে-সমাজকেই সেই ধর্মের প্রধান সাধনক্ষেত্র বলিয়া নির্ণয় করিলেন, তাহাতে এই দেশপ্রীতি হইল প্রত্যক্ষ সাধন; এমন কি ভগবৎ-প্রীতির এক ধাপ নীচেই তাহার স্থান! বহুর কল্যাণ-কামনায় একের আত্মোৎসর্গই যে বিশেষ করিয়া এ যুগের মানব-ধর্ম, ইহা তিনিই প্রথম স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন; এই অনুভূতিই পরে অপর এক মহাপুরুষের প্রাণে ও কর্মে আধ্যাত্মিক সত্যের মহিমা লাভ করিয়াছিল—সে কথা পরে বলিব। আজিও জগৎ ব্যাপিয়া যে সাগর-মন্থন চলিতেছে, তাহার বিষবাষ্পে মূর্চ্ছিত ও উৎসন্নপ্রায় মানবসমাজ আর কিছুতেই রক্ষা পাইবে না—ওই অমৃতই একমাত্র ভরসা। উহারই 'সম্বন্ধে বলা যাইতে' পারে—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। উহার দ্বারাই মানুষ যেমন 'বলবান্' হইয়া 'আত্মা'কে লাভ করিবে, তেমনই দেশকে সমাজকে রক্ষা করিয়া, শুধু স্বজাতির নয়—সমগ্র মানবজাতির অকল্যাণ দূর করিবে।

আমরা দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শে তাঁহার ওই সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তাহা মূলে সেই প্রাচীন আদর্শ; রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতির পরিবর্তে তিনি সমাজনীতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তথাপি সেই

বুঝাইলাম; তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশি ভরসা আমি রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে, কৃতবিদ্যগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হইলে ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে। জাতীয় ধর্মের মুখ্য ফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণ ফল সকলেই পাইতে পারে।

আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। শেষের উক্তিটিতে তাঁহার নিজের সেই ধর্মজিজ্ঞাসার ফলাফল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাঁহাতে তিনি যে সে বিষয়ে কত সজ্ঞান ছিলেন তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। যাহা তত্ত্বের সত্য মাত্র, তাহা মানুষের ধর্ম নয়—জীবনে তাহা অনুভব-গোচর হইতে না পারিলে, সেরূপ তত্ত্ববিচার নিষ্ফল। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন, এইরূপ তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট নহে—সেই সত্যকে প্রাণেও প্রত্যক্ষ করা চাই। যাহা জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিবার বস্তু তাহার ফল সমাজের উচ্চস্তরেই কিছু ফলিতে পারে; যদি উচ্চ হইতে নিম্নে সর্বস্তরে একটা সামাজিক সমানুভূতির ধারা অব্যাহত থাকে,-এবং যদি সেই তত্ত্ব জীবন-রস-বর্জিত না হয়, তবেই তাহা উচ্চ হইতে নিম্নস্তরে আপনা-আপনি সংক্রামিত (filter down) হইতে পারে; তাহার যেটুকু জীবনীয় অংশ তাহা সর্বস্তরের একটা সাধারণ কালচার বা চিত্তোৎকর্ষ রূপে ফলদায়ক হইয়া থাকে। তথাপি আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে রামায়ণ-মহাভারতের মত কাব্য-পুরাণের শক্তি এবং সাফল্যের কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই—জীবনেরই একটা রূপকে আশ্রয় করিয়া সেই যে মানবধর্মের ব্যাখ্যা ভারতবর্ষীয় জনগণের চিত্তে এতকাল ধরিয়া একটা সংস্কৃতির স্থায়িত্ব রক্ষা করিয়াছিল, তাহার কারণ তিনি জানিতেন। এই জন্যই বোধ হয়, নূতন যুগের সাহিত্যসৃষ্টিতে শেষের দিকে তিনিও এই অভিপ্রায় করিয়াছিলেন;—পৌরাণিক ধর্মের আধুনিক সংস্করণও যেমন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল; তেমনই সেকালের কাব্যপুরাণকে আধুনিক ছাঁচে ঢালিয়া—জীবনের নূতন রূপ-সৃষ্টির কথাও ভাবিয়াছিলেন, তাই নব ধর্মতত্ত্ব বা জীবন-তত্ত্বের তাত্ত্বরূপে কাহিনী রচনায় চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক উপন্যাসের রচনা-কৌশল ও ধর্মব্যাখ্যার সেই প্রাচীন প্রণালী এই দুইয়ের সামঞ্জস্য, একরূপ অসাধ্য-সাধন বলিলেই হয়;—তাহাতে তিনি কি পরিমাণ সাফল্যলাভ

করিয়াছিলেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর ; এ প্রসঙ্গে আমি কেবল তাঁহার সেই অভিপ্রায় ও তাহার যে কারণ অনুমান করিয়াছি, তাহাই বলিয়া রাখিলাম।

নবযুগের সমস্যা ও তাহার সমাধানে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা-চিন্তার যে পরিচয় আধুনিক বাঙালী-পাঠকসমাজে দিলাম, তাহাতে, আশা করি—আর কিছু না হউক, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার যুগ এই বিস্মৃতিপরায়ণ জাতির স্মৃতিপটে ক্ষণিকের জন্যও প্রতিফলিত হইবে। বাঙালী নাকি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি—কি অর্থে জানি না। সে আপনাকে বিস্মৃত হয় বটে, কিন্তু সে ব্যক্তিগত ভাবে নয়—জাতিগত ভাবে। কালকে সে বাঁধিয়া রাখে 'সাতপুরুষের ভিটা'য়—অন্তত এককালে রাখিত ; এবং ইতিহাস বলিতে সে নিজের ঊর্দ্ধতন পঞ্চাশ পুরুষের বংশতালিকাই বুঝিত ; নতুবা কাল তাহার নিকটে নিরন্তরই বর্ত্তমান—অতীত মৃত ; ভবিষ্যৎ অলসের সুখস্বপ্ন মাত্র, এমন কি, তাহা নাস্তি বলিলেও হয়। সেই মৃত মহাকালের বক্ষে বর্ত্তমান-রূপিণী মহাকাল-জায়ার নৃত্য তাহার চেতনাকে কিঞ্চিৎ আঘাত করে—জীবনে ক্ষণপন্থবৃত্তিই তাহার স্বধর্ম ; এতকাল এমনই করিয়া সে মহাকালকে ফাঁকি দিয়াছে। জাতীয় জীবনধারার অতিশয় অপ্রশস্ত পথে সে যেমন কোথাও কোন চিহ্ন অঙ্কন করে নাই, তেমনই, বৃক্ষ জলাশয় প্রতিষ্ঠাও করে নাই—ভবিষ্যতের পাথেয়-সঞ্চয় তো পরের কথা। কিন্তু আজ এতকাল পরে, তাহার সেই আত্মবিস্মৃতি নয়—ব্যক্তিসুখস্বপ্নের ঘোর আর টিকিতেছে না। মধ্যে সে ঘর ছাড়িয়া সমাজ ছাড়িয়া শ্মশানে পঞ্চমকার-সাধনায় মাতিয়াছিল, এখন তাহাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে—কারণ সবই যে শব, কে কাহার উপরে বসিবে? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই আসন্ন মৃত্যুর অন্ধকারেই হঠাৎ একটু আলো জ্বলিয়াছিল—জাতীয় চেতনার একটা স্তরে জাগরণের লক্ষণ সত্যই দেখা দিয়াছিল,—আরও পূর্ব্বকালে যেমনই হউক, গত শতাব্দীর প্রায় প্রথম হইতেই তাহার প্রাণে-মনে জীবনের সাড়া জাগিয়াছিল, এবং সে স্পন্দন ভারতের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সমুদ্র-কূল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও আশ্চর্য্য—তার পরেই মহামৃত্যুর কত আক্রমণ

দেশ গিয়াছে, বাস্তু গিয়াছে, সমাজ গিয়াছে, স্বধর্ম্ম গিয়াছে—জাতি-হিসাবে বাঁচিবার যাহা-কিছু সবই গিয়াছে; দেহে পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বে, মনেও মহামানবত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে; ভাব যেমন ক্লীব, ভাষাও তেমনই কুলটা হইয়াছে। শিরে সর্পাঘাত হইলে তাগা বাঁধিবে কোথায়? তথাপি মৃত্যুকালে তারকব্রহ্মনাম শুনাইতে হয়—আমার এ প্রয়াস তদপেক্ষা অধিক যুক্তিযুক্ত বা আশাপ্রদ নয়।

সে যুগের যুগনায়করূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সাধনা—সে যুগের সকল উৎকণ্ঠাকে, জাতির হইয়াই একটি চিন্তায় কেন্দ্রীকৃত করা, এবং মুক্তির একটা প্রশস্ত পন্থা নির্দ্ধারণ—তিনি যেমন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ তেমন করেন নাই। তাঁহার সেই চিন্তার কতখানি এখনও এই বহু-মতের তুমুল সংঘর্ষে টিকিয়া থাকিবার যোগ্য, এবং ভবিষ্যতেও তাহার কতটুকু সাধনযোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনীষী বাংলা দেশে অল্পই জন্মিয়াছেন। সে যুগের সমস্যা তাঁহাকে যে দিক দিয়া যে ভাবে বিচলিত করিয়াছিল—তাহা ক্রমেই গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি উভয়ের যে সামঞ্জস্য সন্ধান করিয়াছিলেন, আজিও সেই সামঞ্জস্যের প্রয়োজন আছে; শুধুই যুগ বা জাতি নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাস গতি ও স্থিতির একটা সংশয়-সঙ্কটে আসিয়া অনিশ্চিতভাবে দোল খাইতেছে—মানুষের মনুষ্যত্বের এক মহা পরীক্ষা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য Humanism-এর যে প্রেরণা আমাদের চিত্তে জন্মিয়াছিল—রামমোহন হইতে বঙ্কিম পর্য্যন্ত তাহা প্রায় একমুখে বৃদ্ধিও পাইয়া শেষে একটা বাস্তব কিছুকে আশ্রয় করিয়া স্থির হইতে চাহিয়াছিল—চিত্তের সেই অস্থিরতার মধ্যে স্থিরত্বলাভের প্রয়াস বঙ্কিমের চিন্তাতেই প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়—সমগ্র-দৃষ্টি ও স্থির-দৃষ্টির লক্ষণ তাহাতেই আছে। দৃষ্টির ওই ভঙ্গীটাই বড়, তাহাই অধিকতর মূল্যবান। আমি যুগনায়করূপেই বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি—তিনি যুগকেও কোথায় কতটুকু অতিক্রম করিয়াছেন, প্রসঙ্গত তাহার কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিলেও, আমি মুখ্যত সেই যুগের কথাই বলিয়াছি; এবং তাঁহার

নিজস্ব ভাবচিন্তা যেমনই হউক, তিনি যে তাঁহার কাল ও তাঁহার সমাজকে সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন, তাহাও বার বার স্মরণ করাইয়াছি। তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয়-স্বরূপ একটা কথা আজিও নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, তাহা এই যে—বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি সেই যুগ-প্রয়োজনের যতই বশীভূত হউক, তথাপি তাহা আরও গভীর অর্থে আধুনিক। যাহা তখনও কেহ বুঝিতে পারে নাই, এবং যত দিন যাইতেছে ততই যাহা মানুষের ভাবে-চিন্তায় স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে—নূতন জীবন-দর্শনের সেই সমন্বয়-তত্ত্ব তাঁহার প্রতিভাতেই প্রথম, শুধু চিন্তায় নয়, সৃষ্টিকর্ম্মেও ধরা দিয়াছিল। এই-জন্যই আমি এই সমন্বয়-শক্তিকে তাঁহার প্রতিভার প্রধান গৌরব বলিয়া বার বার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সর্ব্ববিধ চিন্তায়, এমন কি ভাব-কল্পনায় ও কাব্যসৃষ্টিতেও, ইহাই যেন একমাত্র প্রেরণা হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের ভাষা-নির্ম্মাণে তিনি যেমন সাধু ও চলতি ভাষাকে একই ছাঁচে ঢালিয়া অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার উপন্যাস-গুলিতেও—কাব্য, নাটক ও আখ্যান—এই তিনের এক অপূর্ব্ব মিশ্র-রসরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই রূপও বাস্তব এবং আদর্শের মিলিত রস-রূপ। এখানেও ভোগ ও ত্যাগ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সংসার ও সন্ন্যাস, প্রেম ও morality—এক রসকল্পনায় নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যেমন পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় সাধনায় মিলন চাহিয়াছিলেন, তেমনই মানুষের ধর্ম্মসাধনাতেও, ব্যক্তি ও সমাজ, জ্ঞান ও ভক্তি, মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্ব—এই সকলকে এক সত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিই ভারতীয় দৃষ্টি; নূতন যুগের নূতনতর সমস্যায় এই সনাতনই আবার সাড়া দিয়াছিল; সর্ব্ব বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের সমতা সাধনেই যে সকল সমস্যার মূলোচ্ছেদ হয়—বর্জ্জন নয়, গ্রহণেই পূর্ণ সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়—এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ গৌরব। বঙ্কিমচন্দ্র সেই তত্ত্বকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন; কেবল সে বিষয়ে তাঁহার নূতনত্ব এই যে, তিনি যুগসমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জীবনের বাস্তবকে—মানুষের জন্মগত ও প্রকৃতিগত সংস্কারকে—আদৌ স্বীকার করিয়া, সেই সমন্বয়ের একটা পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; তাঁহার তত্ত্ব যত বড়

বা আদৌ যত উচ্চ হউক, তিনি সেই বাস্তবকে কিছুতেই হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্তী যে অপর দুই মহা-প্রতিভাশালী পুরুষ বাঙালীর এই জীবনযজ্ঞে প্রায় শেষ মন্ত্রপাঠ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলেই ইহার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে; তাঁহাদের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি যতই সঙ্কীর্ণ বা তাঁহার সাহস যত অনধিক বলিয়া প্রতিভাত হউক—তথাপি এই বাস্তব-বুদ্ধিই তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নিছক আধ্যাত্মিকতাকে যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া, এবং ভাবের তুরীয়-স্বর্গকে বিশ্বাস না করিয়া—কেবল একরূপ যুক্তি ও বিচারমূলক ভাবুকতার সাহায্যে তিনি যে সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবন-দর্শন তাহাতেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি যে-সমাজের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহাতেও তিনি তাঁহার আদর্শকে নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান-(New Learning)-এর দ্বারা রীতিমত শোধন করিয়া লইয়াছিলেন; তাই সে আদর্শ যতই স্থিতিশীল হউক তাহাতে গতির মাত্রাও অল্প নহে, ভারতের প্রাচীন ধ্রুব-তত্ত্বকে তিনি জীবনের গতিতত্ত্বে রূপান্তরিত করিয়া স্থিতি ও গতির বিরোধ মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; সত্য যত বড় হউক তাহা জীবনের সত্য হওয়া চাই—নহিলে তাহার কোন মূল্য নাই, ইহাই ছিল তাঁহার মূল ধর্ম্মমত। ইহারও একটি চমৎকার উদাহরণ না দিয়া পারিলাম না। সেই কালে হিন্দুত্ব সম্বন্ধে নব্য হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-একটি গৌরববোধ জাগিয়াছিল, মহামতি সার্ হেন্‌রি কটন তাঁহার 'New India' নামক গ্রন্থে তাহার সমর্থনে যাহা লিখিয়াছিলেন, এবং মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একটি প্রবন্ধে তাহার অনুকূল যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এ সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—

দ্বিজেন্দ্রবাবু বুঝাইয়াছেন যে, সমাজের স্থিতি ও গতি উভয় ভিন্ন মঙ্গল নাই।... গতির বেগ অধিক হইলে স্থিতির হ্রাস হয়, বিপ্লব উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবুর সারগর্ভ কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

"গতিরোধক স্থিতি সমাজের পক্ষে যতই কেন ভয়াবহ হউক না, স্থিতিভঞ্জক গতি তাহা অপেক্ষা আরও অধিক ভয়াবহ। ঐকান্তিক স্থিতির জড়তায় যখন সমাজের অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সমাজ পরিবর্তনের দিকে স্বভাবতই উন্মুখ হইয়া থাকে,...কোন

নূতন উপকরণ তাহার উপরে আসিয়া পড়িলে পুরাতনের সহিত নূতনের কিছুকাল ধরিয়া বোঝাপড়া চলিতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে নূতনটি কিছুতেই পরিপাক পায় না, তবে যখন নূতনের নূতনত্ব ঘুচাইয়া বসা পড়িয়া আসে, তখন পুরাতনের সঙ্গে তাহা কতকটা মিশ খায়,...নূতন পুরাতনের অঙ্গের সামিল হইয়া যায়। কিন্তু পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সদ্ভাব বসিতে না বসিতে যদি আর এক নূতন আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, এবং তাহাও স্থির হইতে না হইতে আর এক নূতন আসিয়া তাহার উপর চড়াও করে... তবে সমাজ নিতান্তই অস্থির হইয়া উঠে।...ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঋতুপরিবর্তন হইলে বৎসরের দশা যেমন ভয়ানক হয়, ক্রমাগত নূতনের স্রোত বহিতে থাকিলে সমাজেরও সেইরূপ দুর্দশা হয়।" [দ্বিজেন্দ্রনাথের চিন্তাশীলতার একটি উৎকৃষ্ট পরিচয়, এই উক্তির যাথার্থ্য আমরা এক্ষণে মর্মে মর্মে বুঝিতেছি।]

কটন সাহেবেরও ঐ কথা। তিনিও বলেন, "Better is Order without Progress, than Progress with Disorder"।

এখন এই বিষম সমস্যার উত্তর কি?...দ্বিজেন্দ্রবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা, তাঁহার ভরসা ব্রাহ্মধর্মের উপর।...কটন সাহেবের ভরসা হিন্দুধর্মে। এই মতভেদটা তত গুরুতর নহে, কেন না, আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হিন্দুধর্মমূলক। তাঁহারা হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না, অন্ততঃ "Historical Continuity" রক্ষা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমরা এ বিষয়ে কটন সাহেবের বাক্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

*"Hinduism is still vigorous and the strength of its metaphysical subtlety and wide range of influence are yet instinct with life....The innate conservatism of the nation is beyond the power of any foreign civilisation to shatter. The stability of the Hindu character could have shown itself in no way more conspicuously than by the wisdom with which it has bent itself before the irresistible rush of Western thought and has still preserved amidst all the havoc of destruction an underlying current of religious sentiment and a firm conviction that social and moral order can only rest upon a religious basis.

...They (the vast majority of Hindu thinkers, who have formed themselves into a party of reaction against the voice of a crude and empirical rationalism), adopt Theism in some form or other and endeavour in this way to give permanence and vitality to what they conceive to be the religion of their ancient Scriptures. At the same time they manage to reconcile with this teaching the ceremonial observances of a strictly orthodox Polytheism. They argue that these

rites are embedded in the traditions and customs of the people; that they are harmless in themselves and that their observance tends to bridge over the chasm which otherwise separates the educated classes from the bulk of the population. Their action is therefore animated by a large hearted tolerance.

[আশ্চর্য এই যে, বিদেশী দর্শক যখন এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, তখনও রামকৃষ্ণের বাণী ও বিবেকানন্দ কর্তৃক তাহার নির্ঘোষ বাংলার চিত্ত-গগন প্রতিধ্বনিত করে নাই; তাই, 'Polytheism' নামটিতে বিদেশীর সেই অনন্য সংস্কার যেমনই টানিয়া থাকুক, এই ইংরেজ মনীষীর অন্তর্দৃষ্টি সত্যই অসাধারণ। কথাগুলি অনুবাদ করিয়া দিলাম।—

"হিন্দুধর্ম এখনও বলীয়ান্; তাহার মূল আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি যেমন দৃঢ় তেমনই তাহাদের প্রভাব ব্যাপক ও প্রাণবন্ত। রক্ষণশীলতা হিন্দুজাতির এমনই মজ্জাগত যে, কোন বিজাতীয় সভ্যতা কখনও তাহাকে উন্মূলিত করিতে পারিবে না। হিন্দু যেভাবে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার দুর্দম শক্তিবেগের সম্মুখে নত হইয়াই তাহার অন্তরের অন্তঃশীলা সেই ধর্মভাবের ধারাটিকে এতবড় সর্বনাশের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছে, এবং কিছুতেই এ বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই যে, ধর্মই সমাজ ও লোকস্থিতির একমাত্র আশ্রয়—তাহাতে সে যেমন তাহার চারিত্রিক ধৃতি, তেমনই জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় দিয়াছে।

...(চিন্তাশীল হিন্দুসমাজের প্রায় সর্বত্র একটা প্রবল প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে,—এই অতিস্থূল বস্তুজ্ঞানবিজড়িত (পাশ্চাত্য) যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে সকলেই কোমর বাঁধিয়াছে।) ইহারা প্রাচীন শাস্ত্র হইতে স্ব-ধর্মের যে ধারণা করিয়াছে তাহাকেই খাঁটি ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বরোপাসনার একটা না একটা আদর্শ ধরিয়াছে; অথচ তাহারই সঙ্গে খাঁটি পৌরাণিক দেবদেবী-পূজার ধারা অক্ষুণ্ণ বজায় রাখিবার উপায় করিয়াছে। এ পক্ষে তাহাদের যুক্তি এই যে, এই সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এ জাতির একটা অত্যন্ত সংস্কার এবং তাহা বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত, ইহাতে কোন দোষ নাই—বরং এইগুলির দ্বারাই, নব্যশিক্ষিত সমাজ ও দেশের জনসাধারণ এই উভয়ের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইতেছে তাহা দূরীভূত হইবে। অতএব এইরূপ উদ্যমের মূলে আছে অতি উদার হৃদয়ের ধৈর্যশীলতা।]

উক্ত লেখকের মতে, আমাদের সমাজের স্থিতিবল প্রাচীন হিন্দুধর্মে, গতিবল আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায়।...একদল ইংরেজী শিক্ষা বলবতী হইয়া স্থিতি হ্রাস করিবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে।...এ পর্যন্ত দেশী ও বিদেশী লেখকে—ব্রাহ্মবাদী ও পজিটিভিস্টে একমত। প্রভেদ এই যে, দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভরসা ব্রাহ্মধর্মে, কটন সাহেবের ভরসা নব্য হিন্দুধর্মে।

বলা বাহুল্য, 'প্রচার'-লেখকেরা (যথা বঙ্কিম) এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতাবলম্বী না হইয়া কটন সাহেবের মতাবলম্বী হইলেন। তবে একটা কথা সম্বন্ধে উক্ত লেখক

হইতে আমার একটু মতভেদ আছে। তাঁহারা ধর্ম্মকে কেবল স্থিতিরই ভিত্তি মনে করেন। আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ যে ধর্ম্ম তাহা সমাজের স্থিতি গতি উভয়েরই মূল। কিন্তু শিক্ষাও আমার বিবেচনায় ধর্ম্মের অন্তর্গত। আমরা যাহাকে ইংরেজী শিক্ষা বলি, তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুশীলন-পদ্ধতি। অতএব ধর্ম্মের এই আংশিক সংস্কার হইতেই সমাজের আধুনিক গতির উৎপত্তি।...ইংরেজী শিক্ষাও নব্য হিন্দুধর্ম্মের অংশ বলিয়া আমি স্বীকার করি। অতএব স্থিতি ও গতি উভয়েই ধর্ম্মের বলে। উভয়েরই বল যখন এক মূলোদ্ভূত বলিয়া সমাজের হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং তদনুসারে কার্য্য হইতে থাকিবে, তখন আর স্থিতি ও গতিতে বিরোধ থাকিবে না। Order ও Progress এক হইয়া দাঁড়াইবে।

উপরে যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এ আলোচনার শেষ এবং বোধ হয় চূড়ান্ত কথা। বাংলার নবযুগের যে সমস্যা সে বিষয়ে তিনজন মনীষীর চিন্তা, এবং সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ইহাতে যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতেই আমার কথাও শেষ হইয়াছে। নবযুগের প্রধান প্রবৃত্তি ইংরেজী শিক্ষার ফলেই প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল—ইহাই স্থিতির বিরোধী একটা নূতনতর গতি। এই গতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও, অপর দুইজন তাহাকে স্থিতিধ্বংসকারী বলিয়া বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষণশক্তির উপরেই বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে গোঁড়া হিন্দুর মত আত্মপ্রসাদ লাভ করেন নাই। তাঁহার মতে, ধর্ম্ম সত্য হইলে তাহা dynamic হইবে, স্থিতি গতিরই আশ্রয়; ইহাতে ভয় পাইবার কি আছে? ইংরেজী শিক্ষা সেই গতির দিকটা মুক্ত করিয়া ধর্ম্মকেই ক্রিয়াশীল করিয়াছে—এই হিসাবেই তাহার যাহা-কিছু মূল্য। অতএব সে যুগের সমস্যা তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন করে নাই, বরং তিনি তাহাতেই একটা বড় আশায় আপ্লাবিত হইয়াছিলেন—সমাজের অচলায়তন আবার সচল হইবে, এবং প্রাচীনের সেই স্থিতিই বহুকাল পরে গতিলাভ করিয়া ভারতের সেই সনাতনকেই মহিমান্বিত করিবে। বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি নবযুগের জীবন-মন্ত্রের দ্রষ্টা কবি বলা সঙ্গত হয়, তবে তাহা এইজন্যই। স্থিতি নামক যে সনাতন—মূল তাহারই গতি-মূর্ত্তি; এবং জীবনের দিক দিয়া সাক্ষাৎভাবে এই গতির মূল্যই অধিক। প্রকৃতির অন্তঃপুরে যাহাই

থাকুক, আছিবে এই গতিই সর্ব্বস্ব। Static ও Dynamic দুইয়ের তত্ত্ব একই; আর বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই সেই সত্য ধরি-ধরি করিতেছে। বঙ্কিম বিজ্ঞান বা দর্শন কোনটারই তেমন সাধনা করেন নাই—তিনি কেবল জীবনের ধ্যান করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার দৃষ্টিতে শক্তির দিকটাই বেশি করিয়া পড়িয়াছিল, তিনি শাক্ত না হইয়া পারেন নাই; তাঁহার সমগ্র সাহিত্যিক সাধনারও মূল মন্ত্র ছিল—Creative Dynamism। তথাপি স্থিতিই যে গতির আশ্রয়, তাঁহার ভারতীয় মনীষা সেই পরম তত্ত্বটিকে কখনও বিস্মৃত হইতে দেয় নাই।

* * * *

বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া কতকটা বিশ্রামলাভ করিলেও, তাহার পথ তখনও শেষ হয় নাই। ভাব ও চিন্তার প্রধান ধারাগুলিকে একমুখী করিয়া একটা প্রশস্ত পথ নির্দ্দেশ করিলেও, বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষে নিজেই সেই যুগ-প্রবৃত্তির বেগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। আমি এই প্রসঙ্গের উপসংহারে যে আলোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার এক স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই যে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহারই সূত্র ধরিয়া আমাকে আরও কিছুদূর যাইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও কটন সাহেব উভয়ের যে উক্তি দুইটি পর পর উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমিও এখানে তাহা করিব; যথা—

"মধ্যাহ্নের বিষম সমস্যা এই যে, গতি স্থিতিকে ভঙ্গ করিবে না, স্থিতি গতিকে রোধ করিবে না, উভয়ের মধ্যপথ দিয়া বঙ্গ সমাজকে উন্নতির মধ্যে লইয়া যাইবে।" (দ্বিজেন্দ্রনাথ)

"Better is Order without Progress, if that were possible, than Progress with Disorder." (Sir. H. Cotton)

বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করিয়াছেন—"এখন এই বিষম সমস্যার উত্তর কি?" তিনি নিজে একটা উত্তর দিয়াছিলেন, আমরা তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু নব্য হিন্দু ও ব্রাহ্ম—কেহই তাহাতে নিরস্ত হন নাই;—একজন অধিকতর সাহস সহকারে, সেই প্রাচীন হিন্দুত্বকেই সর্ব্ব বাধা ও বন্ধন-মুক্তির উপায় করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই Dynamism-কে, সেই গতির শক্তিস্বরূপকে, চরমে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন; অপর পক্ষের প্রতিনিধি-স্থানীয় যিনি তিনি স্থিতি-তত্ত্বকেই কাব্যসৃষ্টির creative ভাব-কল্পনায় মণ্ডিত

করিয়া, পতিকে মূর্ত্ত-পুরুষের একটা লীলারূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, একজন বিবেকানন্দ, অপর পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দেই সে যুগের ভাবধারার শেষ ও স্বাভাবিক পরিণতি; রবীন্দ্রনাথের ধারা স্বতন্ত্র—একরূপ বিপরীত-মুখীও বলা যাইতে পারে। তিনি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, এক যুগকে গ্রাস করিয়া যুগান্তর কামনা করিয়াছিলেন; সেই যুগান্তর এখনও চলিতেছে, তাহার গতি-পরিণতি নির্ণয় করিবার সময় এখনও আসে নাই। তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই তাঁহার কবিপ্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ আরম্ভ হয়, এবং তাহাতেই যুগ ও জাতির প্রবৃত্তি হইতে তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পৃথক ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে,—সে আলোচনা পরে করিব; তৎপূর্ব্বে সেই নবযুগের যুগ-প্রবৃত্তির অনুসরণে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রিয়া

প্রিয়ার আবাস খুঁজি' সারাদিন ফিরি সযতনে,—
নাম-ধাম-গোত্র-গৃহ—বাঁধিবারে সহস্র বন্ধনে।
না খুঁজিয়া পাই দেখা, খুঁজিয়া সন্ধান নাই যার,
কি করি তাহারে ল'য়ে—এ যে বড় বিচিত্র ব্যাপার! • • •
শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে অর্দ্ধরাত্রে করিনু শয়ন;
—নিদ্রা, না সে জাগরণ! দেখিলাম অদ্ভুত স্বপন,—
সেই হাসি, সেই অশ্রু, সেই মূর্ত্তি—পার্শ্বে মোর আসি'
কহিল কৌতুক-কণ্ঠে স্মিত হাস্যে সাদর সম্ভাষি'—• • •
এ কি কৌতূহল বন্ধু,—কেন এই মিথ্যা খোঁজাখুঁজি?
ভাল যদি বেসে থাক, সেই মোর ঠিকানা-ঠিকুজি!'
কি বন্ধন চাহ আর,—বাকি কি রয়েছে, বল, দিতে?
—নাম? প্রিয়া;—গোত্র? প্রেম;—গৃহ? তব অন্তর-গলিতে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই প্রদর্শনীর হাঙ্গামা চুকে যাবার পরই ডফ কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমাদের অন্য আর একটা ইস্কুলে ভর্তি করা হ'ল। ডফ কলেজ আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দু মাইল দূরে ছিল। প্রতিদিন দু বেলা এতখানি রাস্তা টানা-প'ড়েন করা যে ঠিক নয়, এতদিন বাদে তা বুঝতে পেরে বাবা এবার বাড়ির কাছেই একটা ইস্কুলে আমাদের ভর্তি ক'রে দিলেন। এই ইস্কুলের হেডমাস্টার ও যাঁর ইস্কুল তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্ম। তখনকার দিনে মালিকিয়ানা হিসাবে অনেকে ইস্কুলের ব্যবসা করতেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ, তাঁরা এই সব ব্যক্তিগত কারবার তুলে দিয়ে সমস্তটাকেই নিজেদের যৌথ কারবারে টেনে নিয়েছেন।

ডফ সায়েবের ইস্কুলের চাইতে এই ইস্কুল আমার ঢের ভাল লাগল। তার প্রধান কারণ, এখানে আমার বন্ধু শচীন যে ক্লাসে পড়ত, ভাগ্যবশে আমি সেই ক্লাসে এসেই ভর্তি হলুম। এখানে ক্লাসে ছেলের সংখ্যা ও মারধোরের মাত্রা ছিল অনেক কম। একটা মুশকিল ছিল এই যে, ছাত্রের সংখ্যা কম থাকায় প্রত্যেক শিক্ষকই প্রত্যেক ছাত্রকে পড়া জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পেতেন, ও তার ফলে কে যে কেমন ছেলে তা ক্লাসের সব ছেলেরাই জানত।

অতীতের দিকে চেয়ে আজ মনে হয়, প্রত্যেক মানুষই তার ভাগ্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে। তার জীবন কি ভাবে গ'ড়ে উঠবে, কি অবস্থার মধ্যে তার মন তৈরি হবে; যাত্রাপথে চলতে চলতে কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে, কাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে; কত লোক সারা জীবন কাছে থেকেও আপনার হবে না, কত লোক দু দিনের পরিচয়ে আপনার হয়ে যাবে—সব আগে থাকতেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, কোন শক্তি দিয়েই তাকে প্রতিরোধ করা যায় না।

আমার বন্ধু শচীনের বাড়ির লোকেরা আমাকে সাংঘাতিক চরিত্রের ছেলে ব'লে জানত। ছ-সাত বছর বয়স থেকে পাড়ার ইস্কুলে যে দুর্নাম কিনেছিলুম, আজও তা স্খালন করতে পারি নি। এই কারণে আমার এই ইস্কুলে ভর্তি হওয়াটা শচীনের বাড়ির লোকেরা বিশেষ সুনজরে দেখলেন না, বিশেষ শচীনের বাবা ছিলেন সেই ইস্কুলের মালিক।

শচীন আগে থাকতেই ক্লাসের সেরা ছেলে ব'লে নাম কিনেছিল। আমি এসে জুটতেই একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ হ'ল। এখানে টুঁমারী বা বেত্রদণ্ডের রেওয়াজ তেমন ছিল না বটে, কিন্তু প্রায় সব মাস্টারই দেখতুম অকারণে অথবা সামান্য কারণেই শচীনকে নির্মম ঠেঙাতেন। শচীনের বাবা মাস্টারদের ব'লে দিয়েছিলেন, তার প্রতি যেন কড়া নজর রাখা হয়। সেইজন্যে শিক্ষকরা এইভাবে তাঁদের চাকরি বজায় রাখতেন।

শচীন আমার শৈশবের বন্ধু, তার প্রতি অকারণ এই অকরুণ ব্যবহার দেখে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ফলে দুই বন্ধুতে মিলে মাস্টারদের সঙ্গে তর্ক ক'রে মধ্যে মধ্যে এমন হাঙ্গামা শুরু ক'রে দিতুম যে, আমাদের শায়েস্তা করবার জন্যে হেডমাস্টার মশায়ের কাছে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হ'ত।

কিছুদিন এইভাবে চলবার পর মাস্টারেরা ক্লাসে এসেই আমাদের দুজনকে দু জায়গায় বসিয়ে দিতে আরম্ভ করলেন। দুই মাথা একত্র হ'লেই যে অনর্থের সূত্রপাত হয়, বহুদর্শিতার ফলে তাঁরা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা শচীনকে চোখের সামনেই অর্থাৎ 'ফার্স্ট বেঞ্চে' আর আমাকে শেষে অর্থাৎ একেবারে 'লাস্ট বেঞ্চে' বসতে হুকুম দিলেন। লাস্ট বেঞ্চে একটি মাত্র ছেলে বসত, তার নাম ছিল প্রমথ। আমার স্থান নির্দিষ্ট হ'ল এই প্রমথর পাশে।

প্রমথ আমাদের চাইতে দু-তিন বছরের বড় ছিল, কিন্তু তাকে দেখলে আট-ন বছরের চেয়ে বেশি ব'লে মনে হ'ত না। রোগে, বোধ হয় ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তার দেহের বাড়-বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাতজন্মে সে স্নান করত না। চুলগুলো পাতলা, তা থেকে খুশকি উড়ছে, হাতের তেলো থেকে আরম্ভ ক'রে সর্বাঙ্গ ফাটা,

আর যেই কাটার মধ্যে ময়লা জ'মে থাকায় মনে হ'ত যে, যেন তার গায়ে ম্যাপ এঁকে দেওয়া হয়েছে। ফুল প্যান্ট, লম্বা কোট প'রে এক তাড়া বই বগলে নিয়ে সে ইস্কুলে আসত। পড়াশুনো কিছুই করত না সে, গেল বছর বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় এই ক্লাসেই প'ড়ে আছে। মাস্টারেরা বেশ দয়াপরবশ হয়ে তাকে কোন প্রশ্ন করতেন না। প্রতিদিন ইস্কুল বসবার মিনিট পাঁচেক আগে এক তাড়া বই নিয়ে ক্লাসে ঢুকে তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে বসত, সমস্ত দিন কারুর সঙ্গে কথা বলত না। ক্লাসের কোন ছেলের সঙ্গেই তার ঝগড়া বা ভাব ছিল না। ছুটির ঘণ্টা বাজলে বিনা উচ্ছ্বাসে বইগুলি গুছিয়ে নিয়ে সে চ'লে যেত। মাস্টাররা চূড়ান্ত সাজা দেবার জন্যে এই রহস্যময় প্রমথর পাশে আমাকে বসবার হুকুম দিলেন।

প্রমথর পাশে ব'সে সারাদিন তার হালচাল পর্যবেক্ষণ করতে লাগলুম। দেখলুম, কখনও সে খেয়ালমত তার সেই বইয়ের তাড়া থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে পড়ছে, কখনও বা খাতা খুলে কি লিখছে, কখনও বা একটার পর একটা এমনই ক'রে পাঁচ-সাতটা পেনসিলই কাটলে। পেনসিল-কাটা কল, হাড়ের বাঁটওয়ালা ছুরি, ছুঁচমুখো Independent pen, মোটা লাল-নীল পেনসিল—কোন সরঞ্জামের ত্রুটিই তার কাছে নেই। কচিৎ কোনও শিক্ষক তাকে পড়ার প্রশ্ন করলে, সে দাঁড়িয়ে নীরব থাকত। শিক্ষক সে ইঙ্গিত বুঝতে পেরে অন্য ছাত্রকে প্রশ্ন করতেন, প্রমথ ব'সে পড়ত। এই কৃষ্ণবর্ণ, স্বল্পভাষী, ক্লাসে ব'সেই তার পরিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন প্রমথর মধ্যে আমি একটা রহস্যের ইঙ্গিত পেলুম।

একদিন অঙ্কের ঘণ্টায় দেখলুম, প্রমথ তার বইয়ের তাড়া থেকে বেঁটেসেঁটে চৌকো একখানা মসৃণ লাল বই টেনে বার ক'রে নিবিষ্ট মনে পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে। আমাদের বাড়িতে বইয়ের যে রাশি আবিষ্কার করেছিলুম, তার মধ্যে ঠিক এই রকম আকৃতির কালো মলাটের একখানা বই ছিল। সে বইখানার নাম ত্রৈলোক্য তারিণীর জীবন বা পাপীর আত্মকথা—এই রকম একটা কিছু। বইখানা প্রথম যেদিন খুলে বসেছি, সেই দিনই বাবার চোখে পড়ায় তিনি সেখানা পড়তে বারণ ক'রে

দিয়েছিলেন। ফলে এক দিনেই বইখানা শেষ ক'রে ফেলেছিলুম। সে বইয়ের কাহিনী ছিল লোমহর্ষক। এক গৃহস্থের কন্যাকে এক বৈষ্ণবী ফুসলিয়ে কুলত্যাগ করায়। শেষকালে মেয়েটি ধাপে ধাপে নামতে নামতে নরহত্যা পর্যন্ত করতে আরম্ভ করে। অনেকগুলি নরনারী হত্যা করার পর ধরা পড়ায় তার ফাঁসি হয়। কাহিনীটা খুব ভাল না লাগলেও আমার কি জানি ধারণা হয়েছিল যে, নিষিদ্ধ পুস্তকগুলির আকারই ওই রকম ছোট ধরনের হয়ে থাকে। প্রমথর এই বইখানা 'পাপীর আত্মকথা'-জাতীয় কোনও বই মনে ক'রে তার পাশে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কি পড়ছিস রে?

প্রমথ চমকে উঠে চট ক'রে বইখানা বন্ধ ক'রে ফেললে। দেখলুম, মলাটের ওপরে রূপোর জলে বড় অক্ষরে লেখা—'গীতা'।

এক মুহূর্তেই প্রমথর প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে গেল। সেই অতি ক্ষীণ, জরাগ্রস্ত, হেয়, গায়ের বোটকা গন্ধে যার কাছে বসতে আমরা ইতস্তত করতুম এমন যে প্রমথ, সে আমার কাছে মোহনীয় হয়ে উঠল।

আমাদের বাড়িতে বাবা ও তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যে সব ধর্মকথা ও ধর্মপুস্তকের আলোচনা হ'ত, তাই শুনে শুনে বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পতঞ্জলি, গীতা প্রভৃতি সম্বন্ধে এমন সব চটকদার কথা আমরা আয়ত্ত করেছিলুম এবং মাঝে মাঝে তালমাফিক ছাড়তুম, যা শুনে অভিভাবকেরা আমাদের সম্বন্ধে আশান্বিত, শিক্ষক-সম্প্রদায় ক্রোধান্বিত এবং বন্ধু-সম্প্রদায় আমাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠত। বুলিচালি ছাড়লেও বেদ, বেদান্ত বা গীতা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য এ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি।

যে গীতার কথা এতদিন অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে স্মরণ ক'রে এসেছি, সেই গীতা প্রমথর বইয়ের তাড়ার মধ্যে! এর চেয়ে বিস্ময়ের বস্তু আর কি হতে পারে!

বিস্ময়টা যতদূর সম্ভব চেপে জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে! গীতা পড়ছিস?

প্রমথ কিছু না ব'লে একটু হাসলে মাত্র। সে হাসির অর্থ—এতদিনে দেখলি! ও তো হাতের পাঁচ!

জিজ্ঞাসা করলুম, তুই গীতা মুখস্থ করিস বুঝি?

প্রমথ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, ও মুখস্থ হয়ে গিয়েছে কবে, তিন-চার বছর আগে। তারপরে গম্ভীর হয়ে বললে, গুরুর আদেশ কিনা।

সেদিন ড্রইং-মাস্টারের ঘণ্টায় নিছক আড্ডা না দিয়ে প্রমথর সঙ্গে গীতা নিয়ে আলোচনা হ'ল। প্রমথর গীতাখানার পেছনে 'মোহমুদ্গর' কবিতাটাও ছিল। সে আমাকে সুর ক'রে 'মোহমুদ্গর' আবৃত্তি ক'রে শোনালে। ভারী ভাল লাগল।

পরের দিন প্রমথ জানালে যে, সে শিগগিরই সংসার ত্যাগ ক'রে জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করবে। এর গুরুর আদেশ।

পরের দিন ইস্কুল বসবার অনেক আগেই প্রমথ এসে আমাকে আর একবার সুর ক'রে 'মোহমুদ্গর' শোনালে। উপরি উপরি তিন দিন নিয়মিত মুদ্গরের আঘাতে আমার মোহ প্রায় বোতলচুরের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় প্রমথকে বললুম, তোর সঙ্গে আমিও সংসার ত্যাগ ক'রে জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করব।

আমার প্রস্তাব শুনে প্রমথ উৎসাহিত তো হ'লই না, বরং মুখ গম্ভীর ক'রে রইল, কিছু জবাব দিলে না।

আমার মতন একটা লোক সঙ্গী হতে চাইছে তাতে আনন্দ প্রকাশ না ক'রে প্রমথ গম্ভীর হয়ে পড়ল দেখে আমার আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে?

প্রমথ বললে, তোরা আবার বেম্ম কিনা—

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। বললুম, যা যা ব্যাটা ম্যান্‌চেস্টার! বেম্মরা ছিল ব'লে আজ তোরা ভদ্রলোকের সঙ্গে একত্র বসতে পারছিস্।

প্রমথ বললে, রাগ করছিস কেন ভাই? আমি কি তোকে কিছু গালাগালি দিয়েছি? বেম্মরা যোগ-টোগ মানে না কিনা, তাই বলছিলুম।

প্রমথর সঙ্গে খুব ভাব হ'য়ে গেল। ঠিক হ'ল, আমরা দুজনে জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করব। প্রমথ কোথা থেকে—খুব সম্ভব সেগুলো বটতলা থেকে প্রকাশিত হ'ত—সব ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আসতে লাগল। তাকে

দিয়ে একখানা 'গীতা'ও আনিয়ে নিলুম। রোজ বিকেলে ঘুড়ি ওড়াবার আধ ঘণ্টা আগে গীতার শ্লোক খায় বটতলায় তার কণ্ঠস্থ ক'রে রাস্তে অহিরকে গীতা সম্বন্ধে লেকচার দেওয়া চলতে লাগল। মোট কথা, জগৎ যে মায়াময় ও বিরাট একটি যাতনা-যন্ত্র, সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহই রইল না। এই যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের একমাত্র পন্থা যে যোগ, তারই অনুশীলনে মনকে মাসখানেকের মধ্যেই একাগ্র ক'রে ফেলা গেল।

একদিন প্রমথ একখানা ম্যাপ নিয়ে এল। ভারতের কোথায় কোথায় জঙ্গল আছে, কোন্ জঙ্গলে কি কি শ্রেণীর জীব ও গাছপালা আছে, তার বিবরণ তার সঙ্গে দেওয়া ছিল : এই ম্যাপ দেখে আমরা একটা গভীর জঙ্গল ঠিক করলুম বটে ; কিন্তু কি ক'রে কোথা দিয়ে যে সেখানে পৌঁছতে পারা যাবে, ম্যাপ দেখে তা কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না। শেষকালে অনেক পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'ল যে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে চলতে চলতে পথে জঙ্গল নিশ্চয় পাওয়া যাবে। বেশ ঝরনা-টরনা ও ভাল ভাল ফলমূলের গাছ আছে, এমন একটা জঙ্গল দেখে ঢুকে প'ড়ে সেখানে আসন পাতা যাবে।

প্রস্তাবটা আমাদের দুজনেরই বেশ লাগল। গীতা পাঠ ও তপস্যার আনুষঙ্গিক মানসিক ক্রিয়াকর্মের ওপর মন নিবিষ্ট করবার জোর চেষ্টা চলতে লাগল।

এই ইস্কুলে এসে মাস্টারদের প্রশ্ন ও তদুপযোগী চাটি, গাঁট্টা ও বহুবিধ তাড়নার ইঙ্গিতে আমার উদ্দাম মন পাঠে কথঞ্চিৎ মনোনিবেশ করেছিল মাত্র, এমন সময় সংসারে দারুণ বৈরাগ্য উপস্থিত হ'ল। পড়াশুনো চুলোয় গেল, ফলে শ্যাম ও কুল অর্থাৎ ইস্কুল ও বাড়ি—দু জায়গাতেই নির্য্যাতনের মাত্রা হয়ে উঠতে লাগল নির্মমতর।

একদিন প্রমথকে জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা, জঙ্গলে কোনদিন যদি বাঘ-টাঘ আসে ?

প্রমথ বললে, সে তুই কিছু ভাবিস'নি। আমার কাছে গুরুর দেওয়া একটা বাণ আছে, সেটাকে জলে ভিজিয়ে সেই জল যে কোনও জিনিসে ঠেকানো যাবে তাই মারাত্মক হয়ে উঠবে।

বলিস কি! কি রকম শুনি ?

সে বাণের গুণ এই যে, কোন রকমে একবার কারুর পাঁজরায় ঠেকাতে পারলেই হ'ল, তা বাঘই হোক আর মানুষই হোক, তাকে আর বাঁচতে হবে না।

উঃ! প্রমথটা কি? আমার তো ভিরমি লাগবার উপক্রম হতে লাগল।

প্রমথ ব'লে যেতে লাগল, এই বাণ তার গুরুর দেওয়া। গুরুদেব গভীর রাত্রে ঘুমের মধ্যে রোজ তাকে দেখা দেন, বাড়ির কেউ কিছু জানতে পারে না, কারণ তার দেহটা বিছানায় প'ড়ে থাকে, তার আত্মাটা গুরুর সঙ্গে চ'লে যায় বাগানের এক কোণে, সেইখানে তিনি তাকে যোগ শিক্ষা দেন। গুরু থাকেন হিমাচলের কোন এক নিভৃত গুহায়, সেখান থেকে আসতে তাঁর এক মিনিট সময়ও লাগে না।

বাপ রে! প্রমথর কথা শুনে আমি তো শিউরে উঠতে লাগলুম। এই পুঁইয়ে-মরা প্যাংলা প্রমথ, তার মধ্যে এত গুণ!

আমি দেখেছি, আমার মনের মধ্যে দুটি বোধশক্তি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। একটি শক্তি—সে যে কোন জিনিস শোনা বা দেখা মাত্র তা থেকে সত্য তত্ত্বটি তৎক্ষণাৎ ধ'রে ফেলতে পারে, তার কাছে আর ফাঁকি চলে না। এই বোধশক্তিটি হচ্ছে আত্মরক্ষার সংস্কার, একে সত্যবোধ অথবা সংস্কারবোধ বলা যেতে পারে। এই আত্মরক্ষার সংস্কার অথবা সত্যবোধ প্রাণীমাত্রেরই আছে। আমাদের দর্শন বলেন যে, পূর্ব্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি আমাদের মন থেকে মুছে গেলেও মৃত্যু এবং মৃত্যুযন্ত্রণার স্মৃতি মনের অতি গভীর প্রদেশে থেকে যায়। বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার যে সহজাত প্রবৃত্তি জীবের থাকে, তার মূল হচ্ছে গতজন্মের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা।

মনের মধ্যে যে আর একটি বোধশক্তি আছে, তার বর্ণনা করা সহজ নয়। সে এক অদ্ভুত রাজ্য, বিচিত্র সেখানকার হালচাল। কোনও নিয়মকানুনের বেড়িতে সে বাঁধা নয়। মনের অনুকূল যে কোন জিনিস বা অবস্থাকে সে আঁকড়ে ধরতে চায়। তার মধ্যে অসত্য বা অসম্ভাব্য যা আছে—সংস্কারবোধ বা সত্যবোধ তা প্রকাশ করতে থাকলেও আমার মনের এই দ্বিতীয় বোধশক্তি তার ওপরে কল্পনার রং চড়াতে থাকে।

ক্রমে সত্য ও কল্পনায় একাকার হয়ে যায় আর সেই সত্যমিথ্যাজড়িত কল্পলোকে মহানন্দে বাস করতে থাকি। আমার অন্তরের এই দ্বিতীয় বোধশক্তি, যা কঠিন বাস্তবের ওপর নিয়ত রামধনুর রং চড়ায়, দেবতারা তাকে 'কুমতি' আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু এই বোধই সংসারকে আমার কাছে সহনীয় করেছে, এ না থাকলে আমার জীবন্মৃত্যু হ'ত।

প্রমথ যে আমার কাছে ডাহা মিথ্যা কথা বলছে, তা বুঝতে আমার এক মুহূর্তও দেরি হ'ল না। কিন্তু মনের মায়াকাননে যে দুটি ধ্যানস্তিমিত তরুণ তাপসমূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল, রূঢ় সত্যালোকের জ্যোতিতে তখুনি তারা শুকিয়ে যেত। বরঞ্চ আমি এমন ভাব দেখাতে লাগলুম, যাতে প্রমথ আরও উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগল। শেষকালে সে নিজে থেকেই বললে, তোকেও গুরুদেবের শিষ্য ক'রে দোব।

কোন্ বিশেষ দিনটিতে আমরা এই মায়াময় সুখদুঃখের সংসার পরিত্যাগ ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব, তা নিয়ে দিনকতক আলোচনা চলল। অবশেষে প্রমথ একদিন বললে, গুরুদেব বলেছেন, তিনি নিজেই দিন ঠিক ক'রে দেবেন।

আমি ও প্রমথ যখন সংসারত্যাগের নেশায় মশগুল, এইরকম সময়ে একদিন শচীন এসে বসল আমাদের পাশে। অনেকদিন দূরে থেকে সে আর সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করলে। আশ্চর্যের বিষয়, মাস্টার মশায়রাও সেদিন তার এই স্থানত্যাগের অপরাধটা লক্ষ্যই করলেন না।

শচীনকে কাছে পেয়েই ব'লে ফেললুম, আমরা দুজনে সংসারত্যাগ করছি, দুদিনের জন্যে কেন আর কাছে ব'সে মায়া বাড়াচ্ছিস?

শচীন তো আমাদের প্ল্যান শুনে একেবারে অবাক! বলা বাহুল্য, সেও বললে, আমিও তোদের সঙ্গে যাব।

ঠিক হ'ল, প্রত্যেকে খানদুয়েক ক'রে ধুতি আর দুটো ক'রে জামা নেওয়া হবে। তাতে যতদিন চলে চলবে, তারপরে বল্কল তো আছেই। দ্রব্যগুলোর একটা ফর্দ ক'রে ফেলা গেল। আধ মণটাক চিঁড়ে আর সেই অনুপাতে গুড়ও কিছু চাই। আরও অন্যান্য সমস্ত জিনিস মিলিয়ে পোঁটলা যা হ'ল, তার আয়তন প্রত্যক্ষ না করলেও সেটা যে প্রায় অক্ষৌহিণী হয়ে উঠেছে, তা মনশ্চক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হতে লাগল।

প্রমথ বললে, বিলাসিতা করা চলবে না। তিনটে সমান ওজনের পোঁটলা ক'রে তিনজনে ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

সেদিন এই পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে রইল।

পরদিন শচীন ক্লাসে এসেই আমাদের বললে, পোঁটলা ব'য়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক ক'রে ফেলা গেছে।

কি রকম?

শচীন বললে, আমাদের বাড়ির পাশেই একটা মাঠ আছে, সেখানে ধোপারা কাপড় শুকোতে দেয়। ওদের একটা ছেলে আমার খুব বন্ধু। সে বলেছে, পোঁটলা ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের সঙ্গে একটা গাধা দেবে।

আমি বললুম, তারপরে? আমরা জঙ্গলে ঢুকে গেলে গাধার কি হবে? সারাদিন তপস্যা করব, না গাধার তদারক করব?

শচীন বললে, সে ব্যবস্থা কি আমি করি নি? ধোপার ছেলে গাধা নিয়ে আমাদের সঙ্গে জঙ্গল অবধি যাবে। সেখানে আমাদের বসিয়ে-টসিয়ে দিয়ে গাধা নিয়ে আবার ফিরে আসবে।

যাক, কাঁধ থেকে মস্তবড় বোঝা নেমে গেল।

প্রমথ বললে, জানি, শচেটা চিরদিনই খুব ওস্তাদ।

দু-তিন দিন যেতে না যেতেই মাস্টারদের টনক নড়ল। শচীনকে আমাদের পাশ থেকে উঠে গিয়ে আবার তার পুরনো জায়গায় গিয়ে বসতে হ'ল বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ অসুবিধা হ'ল না। পরামর্শ ওরই ফাঁকে ফাঁকে জোর চলতে লাগল।

একদিন প্রমথ এসে বললে, কাল রাতে গুরুদেব এসে আমাদের যাত্রার দিন স্থির ক'রে দিয়েছেন। আগামী বুধবার বেলা বারোটার মধ্যে যাত্রা করতে হবে। তিনি আমাদের তিনজনকেই আশীর্ব্বাদ ক'রে গেছেন।

সেদিন ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ঘুড়ি লাটাই অস্থিরের হাতে দিয়ে ছাতের এক কোণে ব'সে প্রাণ খুলে গান গাওয়া গেল, তনয়ে তার তারিণী—

বুধবার এল। ঘুম থেকে উঠেই ছাতে গিয়ে মহানির্বাণতন্ত্রের ও নমস্তে সর্বলোকাশ্রয়ায় শ্লোকটি (ব্রাহ্ম version নয়) আবৃত্তি ক'রে নীচে নেমে এসে দুখানি ধুতি ও দুখানি শার্ট কাগজে মুড়ে একটি পরিপাটি প্যাকেট বানিয়ে রাখা গেল, বেরুবার সময় দাদার চোখে পড়লে যাতে সে সন্দেহ না করতে পারে। কোনও রকমে পায়ে পা ঠেকিয়ে মাকে একটা প্রণাম ক'রে নেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সুবিধা হ'ল না ব'লে মনে মনেই তাঁকে প্রণাম ক'রে মাত্র সংস্কৃত বইখানা ও একখানা খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল।

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখি যে, প্রমথ আগেই এসে আমাদের অপেক্ষা করছে। তাদের বাড়ি-সংলগ্ন যে বাগান, তারই পেছনে সে জায়গাটা। এর ধার দিয়ে যে রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে শচীন রোজ ইস্কুলে যাতায়াত করে। দশটা সওয়া দশটা অবধি রাস্তায় আপিসের লোকের ভিড় থাকে, সে সময় গাধা ঠেঙাতে ঠেঙাতে এলে নিশ্চয় কোন না কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় শচীন বলেছিল, সে একটু দেরি ক'রে আসবে। আমরা দুজনে বাগানের এক কোণে দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষা করতে লাগলুম। প্রমথ মস্তবড় একটা পোঁটলা নিয়ে এসেছে, তার মধ্যে ধুতি জামা ছাড়া রাজ্যের বই, তার সেই মারাত্মক বাণ আরও কত যে জিনিস আছে, তার ঠিকানা নেই। আশা, উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় নির্বাক হয়ে আমরা দুজনে রাস্তার মোড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু শচীনের দেখা নেই। ওদিকে ইস্কুল বসবার ঘণ্টা কানে এসে বাজতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে দূরে শচীনকে দেখতে পাওয়া গেল। দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে পান চিবোতে চিবোতে হেলে-দুলে সে এগিয়ে আসছে, তার ত্রিসীমানার মধ্যে রজক-নন্দন বা শীতলার বাহনের চিহ্নমাত্রও নেই।

আমি আর প্রমথ একবার দৃষ্টি বিনিময় ক'রেই দৌড়ে শচীনকে গিয়ে ধরলুম, কই রে, গাধা কোথায়?

শচীন অবাক হয়ে বললে, গাধা! কার গাধা রে? পাগল হলি নাকি?

প্রমথ ব'লে উঠল, উঃ, বিশ্বাসঘাতক!

আর, যেরি কয়া চলে না, তখুনি ইস্কুলের দিকে ছুটতে হ'ল। ক্লাস সব ব'সে গিয়েছে, আমাদের ক্লাসে পণ্ডিত মশায় পড়াচ্ছিলেন। আমরা তিনজনে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ক্লাসে ঢুকতেই পণ্ডিত মশায় বললেন, এই যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, একত্রে যাওয়া হয়েছিল কোথায় ?

ক্লাসশুদ্ধ ছেলে আমাদের এই নতুন নামকরণ শুনে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

বোধ হয় দু সপ্তাহ শচীনের সঙ্গে কথা বলি নি, তারপরে আবার ভাব হয়ে গেল।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

তত্ত্ববোধিনী সভা এত জনপ্রিয় হইল কেন ?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর (২১এ আশ্বিন ১৭৬১ শক) তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা কুড়ি বৎসর নিয়মিতভাবে চলিয়া ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি উঠিয়া যায়। সভা এই সময়ের মধ্যে ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ে এরূপ আন্দোলন উপস্থিত করে যে, তাহা সমাজের উপর একটি দৃঢ় ছাপ রাখিয়া যাইতে সমর্থ হয়। পরবর্ত্তী কালেও ইহার ফল অনুভূত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই একটি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। রক্ষণশীল প্রগতিবাদী সকলেই ইহার উদ্দেশ্য সাধনে সহায় হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার এরূপ জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করার সার্থকতা আজিকার দিনেও কম নহে।

শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে এই ধারণা বলবৎ যে, খ্রীষ্টান-বিরোধী আন্দোলন চালাইয়াই তত্ত্ববোধিনী সভা এরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল। ইহা একটি প্রবল ও প্রত্যক্ষ কারণ সন্দেহ নাই। তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সে যুগের কোন কোন খ্রীষ্টান পত্রিকা এই মর্ম্মে মন্তব্যও করিয়াছিলেন যে, বেদান্ত-প্রচারের চেয়েও

খ্রীষ্টান ধর্মের বিরোধিতায়ই সভার সভ্যদের অত্যধিক তৎপরতা।*
কিন্তু এ কারণও গৌণ। সভার জনপ্রিয়তা লাভের মূল কারণ অন্যত্র।
সভা প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যেই ইহার উদ্দেশ্য সমধিক প্রচারিত
হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা ইহার গুরুত্ব তখনই বুঝিতে পারিয়া
কিঞ্চিৎ আতঙ্কগ্রস্তও হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্যতম মুখপত্র 'দি
ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' (জুলাই ১৮৪০, পৃ. ৪০৫) লেখেন—

The last and most novel movement on the part of the Hindu is that of the Vedists. They have, we understand, determined to send out Missionaries to preach the doctrines of the Vedas amongst the people. They also design to establish a patshala for the vernaculars in which the Vedas shall alone be taught.

এখানে বেদের উল্লেখ পাইতেছি। পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম্মের কথা প্রচার করাই ছিল তত্ত্বোধিনী সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। দেবেন্দ্রনাথও ইহার উদ্দেশ্য আত্ম-জীবনীতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"আমাদিগের সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রচার।"† বস্তুত এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী তত্ত্বোধিনী সভার সভ্যগণ সাধারণ হিন্দুর ন্যায় বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন ও মান্য করিতেন। 'নববার্ষিকী ১২৮৪'ও বলেন,—"এই সময়ে সমুদয় বেদশাস্ত্রে ইহার [দেবেন্দ্রনাথের] শ্রদ্ধা জন্মিল।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ (১৮৪৩, ২১এ ডিসেম্বর) কুড়িজন সঙ্গীর সহিত

* "The papers give us a brief notice of the Tuttobodhinee Subha, or Society formed in the Metropolis for the diffusion of the doctrines of the Vedant; the original system of philosopical deism. The members of it are opposed to the prevailing system of idolatry, but, in a far more intense degree, to the progress of Christianity."—*The Friend of India* July 23, 1846: W. Ept. of News. Thursday, July 16.

† শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী।০ বিশ্বভারতী সংস্করণ। পৃষ্ঠা ৬৫।

ব্রাহ্মধর্মব্রত গ্রহণ করেন। এই সময়ে যে তাঁহারা বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিতেন এ সম্বন্ধে ইদানীং সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে; এমন কি কেহ কেহ বলিতেছেন যে, দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষে যে চারিজন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে কাশীধামে বেদ অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল বেদের অভ্রান্ততা বা অপৌরুষেয়ত্বে সংশয় বা অবিশ্বাস। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দেও যে দেবেন্দ্রনাথ তথা তত্ত্ববোধিনী সভা বেদ সম্বন্ধে উক্ত মত পোষণ করিতেন, দেবেন্দ্রনাথের নিজের উক্তিতেই তাহা প্রকাশ। ১৮৪৫, জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা 'দি ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "The Transition-states of the Hindu Mind" নামে একটি সমালোচনা-প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার ধর্মালোচনা ও প্রচার পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। ইহার উত্তরে তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন ১৭৬৭ শক) দুইটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রথম প্রবন্ধেই তিনি বেদ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করিলেন—

In our endeavours to spread a knowledge of our ancient theological doctrines, we declare our firm conviction in them to be the only inciting principle by which our exertions are guided. We will not deny that the Reviewer is correct in remarking that we "consider the Vaids and Vaids alone, as the authorized rule of Hindu theology." They are the sole foundation of all our belief, and the truths of all other shasters must be judged of, according to their agreement with them. Even the Smrities which are almost entirely founded on the principles inculcated in the Vaids, must bow to their authority, wherever there is the slightest possibility of mistake or misconstruction; and for this reason, that the Shrooties were uttered by inspiration, while the Smrities contain only an exposition of their precepts. Durshuns are no more than philosophical systems, and do not come within the proper sense of religion. What we consider as revelation is contained in the Vaids alone, and the last parts of our holy

Scripture treating of the final dispensation of Hinduism, form what is called the Vaidant.

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের এই মূল বিশ্বাস ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে (পৃ. ১০৭-৮) এই সময়ে নিজ (এবং সভারও) ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

যখন উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রাপ্ত হইলাম, এবং জানিলাম যে সেই উপনিষদ্ এই সমুদায় ভারতবর্ষের প্রামাণ্য শাস্ত্র, তখন এই উপনিষদের প্রচার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা আমার সহজ হইল। ঐ উপনিষদকে বেদান্ত বলিয়া সকল শাস্ত্রকারেরা মান্য করিয়া আসিতেছেন। বেদান্ত, সকল বেদের শিরোভাগ ও সকল বেদের সার। যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্ব্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে এবং শেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে,—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।

তন্ত্র-পুরাণেতেই পৌত্তলিকতার আড়ম্বর। বেদান্ত, পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দেয় না। তন্ত্র-পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া যদি সকলে এই উপনিষদ্ অবলম্বন করে, যদি উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া সকলে ব্রহ্মোপাসনাতে রত হয়, তবে ভারতবর্ষের অশেষ মঙ্গল লাভ হয়। সেই মঙ্গলের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র । ছিল।

কিন্তু যে-বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্, যে-বেদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য বেদান্ত-দর্শনের এত পরিশ্রম, সে-বেদকে আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। রামমোহন রায়ের যত্নে তখন কয়েকখানা উপনিষদ্ ছাপা হইয়াছিল, এবং যাহা ছাপা হয় নাই এমন কয়েকখানি উপনিষদ্ আমিও সংগ্রহ করিয়াছিলাম; কিন্তু বিস্তৃত বেদের বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না। বঙ্গদেশে বেদের লোপই হইয়া গিয়াছে। ...কেবল বেদ-বিরহিত বাঙ্গালার উপবীত-ধারী ব্রাহ্মণসকল রহিয়া গিয়াছেন। দুই একজন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভিন্ন, কেহ তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা-বন্দনার অর্থ পর্য্যন্ত জানেন না।

আমার [illegible] বেদ জানিবার জন্য বড়ই আগ্রহ জন্মিল। বেদের চর্চ্চা কাশীতে, অতএব সেখানে বেদ শিক্ষা করিবার জন্য ছাত্র পাঠাইতে আমি মানস করিলাম। একজন ছাত্রকে ১৭৬৬ শকে কাশীতে প্রেরণ করিলাম, তিনি তথায় মূল বেদ সমুদায় সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বৎসরে আর

তিনজন ছাত্র তথায় প্রেরিত হইলেন। আনন্দচন্দ্র, তারকনাথ, বাণেশ্বর এবং রমানাথ, এই চারি জন ছাত্র।

এই দীর্ঘ উক্তির মধ্যে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ কি তত্ত্ববোধিনী সভা কাহারও সংশয়ের বিন্দুমাত্রও আভাস পাওয়া যাইতেছে না। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার বিশিষ্ট সভ্য ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত এবং অন্যান্য সহকর্মীর সহিত আলাপ আলোচনা বিতর্কের ফলেই বেদের অপৌরুষেয়ত্বে দেবেন্দ্রনাথের মনে সংশয়ের উদয় হইতে থাকে। তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে (পৃ. ৬৫) লিখিয়াছেন—

ইংরাজী ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কিনা, ইহা সর্ব্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বরপ্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্য পূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।

তত্ত্ববোধিনী সভা নবাশিক্ষিত যুবদলের নিকট প্রিয় হইবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। সুবিখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই কারণ সম্বন্ধে তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস—তৃতীয় ভাগ'-এ (পৃ. ৪০-৪১) লিখিয়াছেন—

তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশীয় লোকের সামাজিক দোষ সংশোধনের প্রতিবন্ধক নয়—অথচ উহাই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। এমত স্থলে ঐ ধর্ম্মপ্রণালী বৈদেশিক শিক্ষার প্রচার ব্যবস্থাদির উপযোগিতা সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন যুবকদের যে মনোরম হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি !

তত্ত্ববোধিনী সভা জনপ্রিয় হইবার মুখ্য কারণগুলি আমরা এখন জানিতে পারিতেছি। দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে বেদ-বেদান্তের উপর নির্ভর ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সহজ ধর্ম্ম বলিয়া জানিলেন এবং ঐ সকল শাস্ত্র হইতে সারসংগ্রহপূর্ব্বক পুস্তক প্রকাশ ও বক্তৃতাদি দ্বারা তাহা প্রচার করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভাও নিজ কার্য্যভার ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পণ করিয়া ১৭৮১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে বিদায় গ্রহণ করিল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাংলা প্রবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সৎমা ও সৎমায়ের ব্যবহার উপলক্ষ্য করিয়া যে সব প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাও ইহার সঙ্গে ধরিতে হইবে। 'বাপের উপরেথে সৎমার পায়ে গড়' করিলেও, 'বিমাতা বিষের ঘর'—

সৎমার ছেন্দা পান্তা ঘি, মাথাটা মুড়িয়ে এস তেল-পলাটা দি॥

যাহারা দোজবরে, তাহাদেরও 'নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরা' নির্ব্বোধ আসক্তি ও কৌতুকের বিষয়—

ছেঁড়া কচুর পাত, এক মাগকে দিল না, আবার মাগের সাধ॥
দোজবরে ভাতারের মাগ, চতুর্দ্দশীর চোদ্দ শাক॥
একবরের মাগ হেলা-ফেলা, দোজবরের মাগ গলার মালা॥
দোজবরের মাগ গজরা হাতী, ভাতারকে মারে তিন লাথি॥

এবং যাহারা তৃতীয় বা চতুর্থ বার বিবাহ করেন, তাহাদেরও ব্যাখ্যা শুনিতে পাই—

একবরে ভাতারের মাগ চিংড়িমাছের খোসা।
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোসা।
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে বসে খায়।
চারবরে ভাতারের মাগ কাঁধে চড়ে যায়॥

সুতরাং 'বুড়ো বয়সে দুধতোলানি' যেমন বিসদৃশ, তেমনই হইতেছে বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা—

বুড়ো বয়সে নবীন নারী, জ্বর বিকারে বিলের বারি।
আধমরা হয় নয়নবাণে, দেখতে পায় না চোখে কানে॥
কড় দিয়ে কাঁপি, বয়স দিয়ে বিয়ে॥

প্রবাদের আর একটি চিরন্তন কৌতুকের বিষয় হইতেছে পোষা-পাখীর সামিল মেরুদণ্ডহীন হতভাগ্য ঘর-জামাই—

পহেলা কুত্তা কুত্তা বোলে, দোসরা কুত্তা ঘর-ঘর বোলে।
তিসরা কুত্তা জরুকা ভাই, চৌথা কুত্তা ঘরজামাই।
ঘরজামাইয়ের পোড়া মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ॥
বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মোধো।
ভাত খাওসে মধুসূদন, ভাত খেলে রে মোধো॥

যা ছিল আমানি পান্ত, মায়ে-ঝিয়ে খেলাম।
ঘরজামাই রামের তরে ধান লুকোতে দিলাম ॥
মুইয়ের মুড়ো কেঠো-মুড়ো, দাও আমার পাতে।
আড়ের মুড়ো ঘিয়ের মুড়ো, দাও জামাইয়ের পাতে ॥

কারণ, নিজের মর্যাদা নিজে না রাখিলে অন্যে তাহা রাখে না—

শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ি, তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি ॥
শ্বশুরবাড়ী জামাইয়ের বাসা, একজনেরে মারলে তিন জন গোঁসা ॥
জামাই এল কামাই করে, বসতে দাও গো পিঁড়ে।
জলপান করতে দাও গো সরু ধানের চিঁড়ে ॥
যাচলে জামাই খান না পিঠে, শেষে মরেন ঢেঁকশাল চেটে ॥
যাচলে জামাই খান না, শেষে আমানিও পান না ॥
যাচলে জামাই কাঁঠাল খান না, শেষে জামাই ভোঁতাও পান না ॥

সুতরাং ঘরজামাই পড়িয়াছে সংসারের অবাঞ্ছিতদের পর্যায়ে—

কান্কে বামুন, কটা শূদ্দুর, বেঁটে মোছলমান।
ঘরজামাই, পুষ্যিপুত্তুর—পাঁচ বেটাই সমান ॥

সন্তান-স্নেহ জীবনের সৌভাগ্য; 'ঘরের গাছা পেটের বাছা'—দুই সমান প্রিয়, তাই 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' বা 'গোগন ছেলের নাম স্বর্ণরাগীশ' হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এক সন্তান দুর্ভাবনার বিষয়—

এক পুতের আশা, বালুর তীরে বাসা ॥
এক পুত পুত নয়, এক কড়ি কড়ি নয়, এক চোখ চোখ নয় ॥

এক সন্তান—'আলালের ঘরের দুলাল'—কিরূপ 'বাঁদরে বাঁদর' হইতে পারে, তাহাও অজ্ঞাত নয়—

পুত, না ভূত ॥
হয় ত পুত, না হয় ত ভূত ॥
এক মায়ের এক পুত, খায় দায় যমের দূত ॥
একলা মায়ের ঝি, গরব করব না ত কি ॥

অপদার্থ সন্তানের প্রতি মর্মান্তিক বিদ্রূপও বিরল নয়—

অনেক কালের ছিল পাপ, ছেলে হল সতীনের বাপ ॥
বাছা আমার ছিরিখণ্ডী, বসে আছেন বড়াই-চণ্ডী ॥
বাছার কিবা মুখের হাসি, তবু হনুমান মাখেন নাই ॥
বাছার আমার কিবা রূপ, ঘুটে কুড়ানির নৌবিদ্যা খেংরাকাটির রূপ ॥
বাছার গুণে মেইক মুখে, কব কত লীলা।
বাপের গলায় শিকল দিয়ে মায়ের ভাতে শিলা ॥

কিবা মেয়ের ছিরি, বাঁশবনের প্যারী॥

যাহার আমার বাড়াবাড়ি, ছ' আনা কাপড়ে ন' আনা পাড়ি॥

যাহার অনেকগুলি সন্তান তাহার জ্বালাও অনেক—

অভাগীর দুটো পুত, একটা দানা, একটা ভূত॥

এক ছেলে তার ফুলের শয্যা, পাঁচ ছেলে তার কাঁটার শয্যা॥

যে করে পাপ, সে হয় সাত বেটার বাপ॥

কারণ, 'পাঁচ আঙুল সমান নয়', তাই—

এক লাউয়ের বীচি, কেউ বা করে কচর-কচর, কেউ বা আছে কাঁচ॥

এক ঝাড়ের বাঁশ, কোনটিতে হয় দুর্গার কাঠামো, কোনটিতে হয় হাড়ির ঝাড়ু॥

কিন্তু আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ছেলের আদর, মেয়ের অনাদর—

পুতের মুতে কড়ি, মেয়ের গলায় দড়ি॥

গাইয়ের বেটী, বউয়ের বেটা, তবে জানবে কপাল গোটা॥

পুত্র ও কন্যার মধ্যে তারতম্য থাকিলেও, উভয়কে মানুষ করার দায়িত্ব সমান—

ঝিয়ের জ্বালা বুকের খোঁচা, পুতের জ্বালা ছুতের বোঝা॥

ছেলে নষ্ট হাটে, ঝি নষ্ট ঘাটে॥

আঝালে না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টাঁস-টাঁস॥

পাশ, পায়রা, পাঁচালি—তিনে ছেলে মজালি॥

পড়াবি ত পড়া পো' না পড়াবি ত সভায় থো॥

কিন্তু কন্যা আমাদের গৃহে একটি মস্ত দায়—

মেয়ে মেয়ে মেয়ে, ভূব করলে খেয়ে।

হরিতকি উড়ে গেল মেয়ের পানে চেয়ে॥

সুতরাং 'মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ' এই প্রবাদ-বাক্য তাহার সহিষ্ণুতার নিদর্শক। মেয়েকে যত শীঘ্র পাত্রস্থ করা যায়, তত শীঘ্র এই দায়িত্ব হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, কারণ 'মেয়েমানুষের বাড়, না, কলাগাছের ঝাড়'। কিন্তু কন্যাকে অপাত্রে দানের মত আর পারিবারিক দুর্ঘটনা নাই। অতএব

অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি॥

ভাল মেয়ে হইলেই যে ভাল ঘরে পড়িবে, এমন নয়—

অতিবড় ঘরণী না পায় ঘর, অতিবড় সুন্দরী না পায় বর॥

অতিশূরের ভাত নেই, অতিসুন্দরীর ভাতার নেই॥

যেমন কন্যা রেবতী, তেমনি পাত্র গদাহাতী (=বলরাম)॥

গৌরী লো কি, তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কি॥

সকল মেয়ের সুখ-সমৃদ্ধি সমান নয়—

সকলেই ত মেয়ে, কেউ যাচ্ছে পালকি চড়ে, কেউ রয়েছে চেয়ে॥

কিন্তু বিবাহের পর মেয়ের বাপের বাড়ি থাকাও বিপজ্জনক ও অযশস্কর—

বাপের বাড়ি কি নষ্ট, পান্তাভাতে ঘি নষ্ট॥

কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান।

বাপের বাড়ি থাকলে মেয়ে বাড়ে অপমান॥

তথাপি মেয়ে নিজের নয়, পরের। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো নিশ্চিন্ত হইবার উপায় হইলেও, আমাদের দেশের একটি চিরন্তন অন্তর্বেদনা—

মেয়েছেলে কাদার ঢেলা, ধপাস্ করে জলে ফেলা॥

মেয়ের নাম ফেলী, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলে গেলি॥

কিন্তু 'যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ'—মেয়ের সুখ্যাতি জীবদ্দশায় নাই, মৃত্যুর কঠিন নিকষে তাহার যাচাই হয়—

মরবে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে তার গুণ গাই॥

ঘরের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন ভাব—

মার পেটের ভাই, কোথা গেলে পাই॥

ভাই ভাই, মেরে যাই ত ফিরে চাই॥

ভাইয়ের ভাই, বাঁ হাত দিলে ডান হাত পাই॥

রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই, রথে চড়ে স্বর্গে যাই॥

তেমনই আবার দ্বন্দ্ব—

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই॥

রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি॥

ঘরের শত্রু বিভীষণ॥

ভাইয়ের তুল্য মিত্র নেই, ভাইয়ের তুল্য শত্রু নেই॥

ভাই বোনের টান স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাতেও পার্থক্য আছে—

শশা খেয়ে যেমন জলকে টান, তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান।

গুড় খেয়ে যেমন জলকে টান, তেমনি বোনের ভাইকে টান॥

ভাইয়ের প্রতি বোনের দরদ বেশি হইলেও, ভাইয়ের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নয়—

ভাই রাজা, ত বোনের কি॥

ভ্রাতৃজায়ার হাড়জ্বোলা হইয়া থাকা আরও কষ্টকর—

ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত॥

তবে অনেক সময়ে যেমন ভাই, তেমন বোনও হয়—

আমার ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পণখা।
ধরামাঝে এমন জোড়া পারিস্ যদি দেখা॥

বাংলা গার্হস্থ্য-জীবনের এই সুখদুঃখের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, যদি পাড়ার প্রতিবেশী, বিশেষত প্রতিবেশিনীর, কথা এখানে না বলা হয়। বিপদে-আপদে প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা আছে। 'পাড়া-পড়শীর গুণ বেঁড়ে গরুও বিকিয়ে যায়'; কিন্তু

এক ভিকরে মাছ বেঁধে না, সেই বা কেমন বঁড়শি।
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না, সেই বা কেমন পড়শী॥

তথাপি ইহাদের অপরিসীম কৌতূহল প্রবাদের কৌতুকদৃষ্টি এড়ায় নাই—

পড়শী নয়, বঁড়শি,
পড়শী নয়, আরসি॥

খল পড়শী নাতান ভাই, তার সাথে বসত নাই॥

সব ঘরের সব কিছুর খবর রাখে, 'পরের ভাতে কাঁটি দেওয়া' ইহাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়—

ঘাটে গেছল জায়ের মা, দেখে এল বাঘের পা।
সে দেখল, আমি শুনলাম, মরি বাপ্ বাঘ দেখলাম॥
যার কি তোর জামাই, পাড়াপড়শীর কাটনা কামাই॥
মা বিয়ল, না, বিয়ল মাসী, ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়াপড়শী॥
মায়ের পোড়ে, না, মাসীর পোড়ে, পাড়াপড়শীর ধবলা ওড়ে॥
যার ভাতার তার ভাতার, কেঁদে মরে হরে ছুতার॥
খাইয়ে পরিয়ে রাখলাম দাসী, কিন্তু সে হ'ল পাড়াপড়শী॥
আমি খাই ভাতারের ভাত, তোর কেন গালে হাত॥

এহেন শুভানুধ্যায়ী পাড়াপড়শীর সকল বিষয়ে মাথা গলানো সত্ত্বেও

ঘাটে-কাটে দড় বড় শক্ত ঠেরে যেই।
পাড়াপড়শীর বুকে বাঁশে ঘর করছি তেই॥

Love thy neighbour—অতি উচ্চ আদর্শ, কিন্তু প্রাত্যহিক জগতে

হলুদে রঙ দিলে, বউ রঙ দিলে।
পাড়াপড়শী রঙ হয় চোখে আঙুল দিলে॥

এই সব প্রতিবেশিনীদের মধ্যে যিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তিনি হইতেছেন পাড়াকুঁদুলী; তাঁহার চিত্র খুবই পরিস্ফুট—

মিনসের কোলে ছেলে দিয়ে মাগী যায় লড়ায়ে খেয়ে॥

তিনি কোঁদল ভিন্ন থাকিতে পারেন না। যদিও 'কোঁদলে জাত নষ্ট, রোগেতে রূপ নষ্ট' তবুও

কুঁদুলে নাড়ী কোঁ-কোঁ করে, কোঁদল নইলে থাকতে নারে॥
নিয়ে আয় ত বউ নোড়া, খাই কোঁদলের পাড়া।
আর চাই না বউ নোড়া, পেয়েছি কোঁদলের গোড়া॥
পেয়েছি কোঁদলের গোড়া, আর যাব না উত্তর পাড়া॥
কি দিব কি দিব খোঁটা, গয়াতে মরেছে বাপবেটা॥
গেছলাম তোর বাপের দেশ, দেখে এলাম তোর মায়ের বেশ॥

কোঁদলের অন্ত নাই, কারণ

ঝগড়াটে লোক যারা ঝগড়া নাহি পায়।
বেনাগাছে খোঁদ চুলকে গড়াগড়ি যায়॥

চার

শুধু পারিবারিক সম্বন্ধ নয়, বাঙালীর গৃহের ও সামাজিক জীবনের এমন দিক নাই, যাহা হইতে বাংলা প্রবাদ-বাক্যের উপকরণ আহৃত হয় নাই এবং গৃহস্থালির এমন কোন বস্তু নাই যাহা উপেক্ষিত হইয়াছে। নেকড়া কানি, ছেঁড়া চেটাই, কাণা কড়ি, ভাঙা কুলো, ছাইয়ের গাদা, ঘটি বাটি, হাঁড়ি শরা, ঘড়া কলসী, থালা কাঁসি, ঢেঁকি চরকা, ছুঁচ চালুনি, ধান চাল, ভাত কাপড়, নুন তেল, শাক মাছ, ঘি বড়ি, পিঠে আসকে, খই কলা, মুড়ি মিছরি, লাউ কুমড়ো, আম কাঁঠাল, ওল থোল, তেঁতুল আমড়া, আদা সুপারি, শামুক শামুক, তামা তুলসী, দা কাটারি, বঁটি ঝাঁটা, কুড়ুল কোদাল, ঢাক ঢোল, জাঁক জমক, কোঁচা কামিজ, হাট বাজার, চাষ বাস, কাটনা কাটা বাটনা বাটা, ঘরদোর, চাল-চুলো, পথ ঘাট,—এমন কি গৃহপালিত গরু মোষ, ভেড়া ছাগল, হাতী ঘোড়া, কুকুর বেড়াল হইতে কাক বক, ছুঁচো ইঁদুর সাপ ব্যাং পর্যন্ত, নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া বাস্তব ভাব ও ভাবার, রঙ্গ কৌতুক, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, জ্ঞান ও গর্হার নির্ভরযোগ্য খোরাক যোগাইয়াছে।

সবগুলির বিস্তৃত উদাহরণ এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়। আমরা শুধু আমাদের নিত্যপরিচিত ঢেঁকির কথা উল্লেখ করিব। পূর্বের অনেকগুলি উদ্ধৃত প্রবাদে ঢেঁকির কথা আছে, কিন্তু তাহা ছাড়া অসংখ্য প্রবাদে আমাদের ঘরের ঢেঁকি লোকসমাজে মূর্তিমান

হইয়াছে। ঢেঁকি অনেক প্রকার—'বুদ্ধির ঢেঁকি', 'আমড়া কাঠের ঢেঁকি,' 'নারদের ঢেঁকি', 'ঢেঁকি অবতার', 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর'; তেমনই আবার 'ঢেঁকির আঁকশলী', 'ঢেঁকির কচকাচ ও ঢাকের বাদ্যি', 'ঢেঁকি ভজে স্বর্গে যাওয়া', 'উপরোধে ঢেঁকি গেলা', 'ঢেঁকশেল দিয়ে কটক যাওয়া', 'ফোপরা ঢেঁকির পাড়ে উমর', 'বুকে ঢেঁকির পাড় পাড়া' ইত্যাদি প্রবাদ বা চলতি কথা হইতে ঢেঁকির গুরুত্ব বুঝা যাইবে। তাহা ছাড়া—

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে॥
অবুঝে বোঝাব কত বুঝ নাহি মানে, ঢেঁকিরে বোঝাব কত নিত্য ধান ভানে॥
ওঠ্ কলসী, জলকে চল্, ঢেঁকি কুট্‌ক ধান॥
ঢেঁকির নর ছয়, কুলোর উনিশের বন্ধ॥
উঠলে ঢেঁকি, বসলে পাট, সাত পাথর আমানি, যত পায় ভাত॥
ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে পড়লেই হ'ল॥
ঢেঁকশেলে যদি মাণিক পাই, তবে কেন পর্ব্বতে যাই॥
ঢেঁকশেলে না উঠতে পায়, হাবলে-হাবলে কুঁড়ো খায়॥
আসল ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকশেলে চাঁদোয়া॥
ঢেঁকি আড় কাটে, আপনার ক্ষয় করে॥
ছিল ঢেঁকি, হ'ল শূল, কাটতে কাটতে নির্ম্মূল॥
চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো, বিধাতা করেছে মোর বুলো-বুলো॥
এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথাব্যথা॥
শখের ফোঁড়া, ঢেঁকি দিয়ে গালে॥
শাঁখের ঢেঁকি চড়ে ওঠে না॥
শাঁখের ঢেঁকি মাথায় চড়ে॥
যার ঘরে নেই ঢেঁকি মুষল, সে বউকির নেই কুশল॥
ভারি বাড়ি, তার ঢেঁকিশালা॥
হেলী কয় পেঁচীরে— শোন্ লো, ঢেঁকি দিয়ে কান বেঁধা লো॥
বামুনে দক্ষিণা ধরে, ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে॥
মা ডাকলে, খেলাম না, বাপ ডাকলে, খেলাম না।
সাতপুরুষের ঢেঁকি বলে—পান্তা খা, পান্তা খা॥
পিরীত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে॥

ইত্যাদি সর্ব্বত্র ঢেঁকির মহিমা বিরাজমান।

যেমন গৃহস্থালির নানা দিক ও দ্রব্যের, তেমনই সামাজিক জীবনে নানা শ্রেণী, সংস্থান ও সম্পদের উক্তরা ছবি অসংখ্য প্রবাদ-বাক্যে

পাওয়া যায়। এমন নিত্যদৃষ্ট বিষয় নাই, যাহা ইহার কৌতুক ও বিদ্রূপের পরিধির মধ্যে আসে নাই। চাষা গয়লা, তাঁতী নাপিত, কলু কামার, বেণে সেকরা, ন্যাকা বোকা, বামুন বোষ্টম, কায়েত বৈদ্য, কাজী পেয়াদা, পীর বাঁদী, গুরু চেলা, হিন্দু মোছলমান, প্রজা জমিদার, চোর ছ্যাচড়, ছোট বড়, ধনী কৃপণ, গরিব কাঙাল, আপন পর, বেকার বেগার, নেয়ে মেয়ে, ভূত পেত্নী, বুড়ো বুড়ী, মরদ মাগী, কাণা খোঁড়া, হাগুন্তী নাচুন্তী, ভড়ং ভণ্ডামি, চুরি বাটপাড়ি, নষ্টামি দুষ্টামি, আয়েশ আর্মারি, অনাচার অনাসৃষ্টি, স্বাস্থ্য সুখ, রোগ শোক, পরচর্চা পরনিন্দা, ঘোঁট দলাদলি, গঙ্গাস্নান তীর্থযাত্রা চড়ক গাজন, দুর্গোৎসব ঘেঁটুপুজো, মনসা শীতলা, ষষ্ঠী সুবচনী, পানাপুকুর ভাঙা বেড়া, খাল বিল, খানা নর্দ্দামা, গু গোবর, ভাগাড় আঁস্তাকুড়, ক্ষেত খামার, বাগান বাঁশবন,—কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। সবগুলির আলোচনার স্থান আমাদের নাই; কেবল উদাহরণস্বরূপ দুই-চারিটি বিষয়ের কথা বলিব।

ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেও, জন্মযজমানে, যজমানী কালির ব্রাহ্মণের লোভ, মূর্খতা ও অনাচার কিরূপ কঠিন বিদ্রূপের বিষয় ছিল, তাহা প্রবাদের 'গলায়-দড়ে জাত' এই অভিধান হইতেই সুস্পষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাইলে ঢেঁকির নামেও চণ্ডীপাঠ করে, তাহা কোন পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রবাদে দেখিয়াছি। আমরা আরও শুনিতে পাই—

> বামুন, বাদল, বান, দক্ষিণা পেলেই যান॥
> বামুন, বান্ধ, বাঁশ তিনে বাস্তুনাশ॥
> বামুন, মজুন্দী, ধোপা, গোমস্তা, তার নেই কোন যুক্ত-ব্যবস্থা॥
> লাখ টাকার বামুন ভিখারী॥
> যারে না বামুন বলি, তার গায়ে নামাবলী॥
> কালির অক্ষর নেইক পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে॥
> ভট্‌চায্যির ঘুটের ঘুটে, স্বস্ত্যয়নে সর্বনেশে জুটে॥
> ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে বেড়ার ঘর॥
> বারো নারকেল তেরো বামুনের গাড় ভাঙে॥
> মুখচোরা বামুনী, আর কেশোরোগী চোর॥
> চোর মরে কাশে, বামুন মরে আশে॥
> জপের সঙ্গে খোঁজ নেই কপালজোড়া ফোঁটা।
> বিদ্যাশূন্যে ভট্টাচার্য্যির পুজোর বুক ঘটা॥

কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, দর্শনী চোদ্দ টাকা॥
সেথাও পৈতে, মারো ভাত॥
মাগ্‌নোর ওপর টাক্‌না, তার ওপর ভিখারী বামনা॥
বাম্‌নে মরে খাবে ভাত, গোবর দেবে আড়াই হাত॥
পোঁদে গু বড়বড় করে, আলোচালের হবিষ্যি মারে॥
কলির বাম্‌ন ঢোঁড়া সাপ, যে না মারে তার পাপ॥

'শতমারী ভবেদ্‌ বৈদ্যঃ'. সুতরাং বৈদ্যের আনাড়ী চিকিৎসার বিদ্রূপও যথেষ্ট রহিয়াছে—

আথি চড়ে নাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ॥
আমার এমনি হাতযশ, এ-পাড়ায় যদি ওষুধ খাওয়াই ও-পাড়ায় মরে গণ্ডা দশ॥
মরণ নেই মরবি কিসে, আমার কাছে ওষুধ নিসে॥
বৈদ্যের বাড়ি, মলেই কড়ি॥
ঘরামির ভাঙা ঘর, বদ্যির বউয়ের নিত্যি জ্বর॥
হরি বাঁচান প্রাণ, বদ্যির বড় মান॥
নামে ধন্বন্তরি, কাজে যম॥
নাপিত, বদ্যি, ধোপা, চোর, মুগী বেরেণীর নেইক ওর॥

আধুনিক ডাক্তারির কথাও একটি প্রবাদে স্থান পাইয়াছে—

জল, জোলাপ, জোচ্চোরি, এই তিন নিয়ে ডাক্তারি॥

কায়স্থের মুন্‌শীয়ানার সঙ্গে তাহার ধূর্ত্ততা প্রবাদে প্রসিদ্ধ হইয়াছে—

কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফে রাজপুত।
বৈদ্য চিনি তারে, যার ওষুধ মজবুত॥

কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত॥
কায়েতের মুখ, কল্লে বদল॥
কায়েতের ঘরের বেরালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে॥
কাক ধূর্ত্ত, আর কায়েত ধূর্ত্ত।
কায়েতের মড়া হীরায় ধার, নাপিতের মড়া ছাকের ছার॥
কায়েতের বুদ্ধি আঁতে, বামুনের বুদ্ধি হাতে॥
কায়েতের মড়া কাকেও ঠোক্‌রায় না॥
কায়েতের হাড়, বেগুনের খাড়া॥
দাঁত থাকে না-বলে, কায়েত মায়ের পেটের বাসে থায় না॥

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, শাক্তের কথা বড় একটা শোনা যায় না, কিন্তু বোষ্টম বৈরাগীর নষ্টামি প্রবাদের একটি উপাদেয় বিষয়—

পাঁঠা ম'রে বোষ্টম ॥

বোষ্টম হবার বড় সাধ, তৃণাদপি ১ শুনে শুনে লেগে গেছে বাদ ॥

সাধ যায় বোষ্টম হ'তে, পোঁদ ফাটে মোচ্ছোব ২ দিতে ॥

জাত হারালে বোষ্টম ॥

তেলক কাটলেই বোষ্টম হয় না ॥

ভক্তিহীন ভজন, লবণহীন ব্যঞ্জন ॥

ভজনের সংখ্যা খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশ জাতে ॥

বৈরাগীর রাগটুকুও আছে, দ্বেষটুকুও আছে ॥

হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয় ॥

ভক্তের রজে গড়াগড়ি ॥

রসের ভরেই গৌর নাচে ॥

গৌর হতে বাকি কাঁদন ॥

শুধু গৌর নয়, গৌরহরি ॥

আগে বেশ্যা, পরে দাসী, মধ্যে মধ্যে কুট্‌নী।
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যজ্য, এখন বোষ্টমী ॥

মাছ খাই না মাংস খাই না, ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
সঙ্গে বেশ্যা তপস্বিনী যাচ্ছি বৃন্দাবন ॥

আগে ছিলাম ছোঁচা বেড়াল, ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
তুলসীমালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন ॥

দেখে এলাম, শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন-ধাম, কেবল নামই আছে ॥

তুমি রাধা, আমি শ্যাম, এই কাঁধে যাচ্ছি বলরাম ॥ ১

শুধু চৈতন্য ধর্ম্মী বৈষ্ণব নয়, রঘুনন্দনপন্থী গোঁড়া স্মার্ত্ত, বলরাম ভজা প্রবর্ত্তিত নেড়ানেড়ী দল, সকলকেই সমানভাবে উপলক্ষ্য করিয়া একটি সামাজিক ইতিহাসমূলক প্রবাদও প্রচলিত আছে, যাহা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

রঘো, চৈতা, বলা, এ তিন কলির চেলা ॥

১। চৈতন্যের বৈষ্ণব-লক্ষণের শ্লোক—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

২। বৈষ্ণবের মহোৎসব।

১। হুতোম পেঁচার নক্‌সায় বারোয়ারী পূজা নিবন্ধে বুদ্ধপ্রসাদের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মত, মুসলমান সম্প্রদায় ও তাহার পীর-মোল্লাও ব্যঙ্গবিদ্রূপের উপলক্ষ্য হইয়া প্রবাদের মধ্যে আসিয়াছে—

নেড়ে নয় ইষ্টি, তেঁতুল নয় মিষ্টি॥

ধানের মধ্যে আগুনবাণ ১, মানুষের মধ্যে মোছলমান॥

হাটের নেড়ে হুজুগ চায়॥

নেড়ে খোঁজে ঈদ্ পরব॥

পীর-বরাবর নেড়ে, সোনার-দরে এঁড়ে॥

মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ তক॥

পীর, না, পয়গম্বর॥

পাঁচে পূজলে পাথরে, সেও পীর হয়ে পড়ে॥

বাজারে আগুন লাগলে পীরের ঘরও বাঁচে না॥

পীরের কাছে মামদোবাজি॥

ডুব দিয়ে পানি খাই, সারাদিন রোজা থাই॥

মুরগীর পোঁদে তেল হ'লে মোল্লার মোর দিয়ে রাস্তা॥

য়ারের সঙ্গে যেমন তেমন, পীরের সঙ্গে মস্‌করা করণ॥

একটি প্রবাদে ধর্মপরিবর্তনেরও ইঙ্গিত রহিয়াছে—

এক একাদশী ছাড়াই, ত্রিশ রোজা বাড়াই॥

মুসলমান ভায়ারাও যে ছাড়িয়া কথা কহিত, তাহা নহে—যেমন

হিন্দুদের দুর্গাপুজো, উপরে চিকন-চাকন, ভেতরে খড়ের বুজো॥

সমাজের নানা শ্রেণীর কাজকর্ম 'ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত, অথবা বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক হইতে বিবিধ প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু সেগুলি সব এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনার স্থান নাই। তাস, পাশা বা দাবা খেলা হইতে 'হাতের পাঁচ', 'পোয়া বারো', 'উঠসার কিস্তিতে মাত' প্রভৃতি স্পষ্টই গৃহীত হইয়াছে। 'হালে পানি পায় না' 'হাল যদি ধরে ঠেসে, তুফানে নাও যায় কি ভেসে', 'দাঁড়কে মাঝি করা, মাঝগাঙে ডুবে মরা',—নৌকার মাঝির উক্তি; 'এক হেঁসেলে তিন রাঁধুনী, পুড়ে মরে তার ফেনগালুনী', 'কি বা করে রাঁধে জেলে, কি বা না হয় দমকা জ্বালে', 'ধুঁয়া যার সয় না, সে রাঁধুনী হয় না'—পাকা রাঁধুনীর বিদ্রূপ; 'এলো শ্রাদ্ধের গুড়ো দক্ষিণা'—শ্রাদ্ধের পুরোহিতের আক্ষেপ; 'সেকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা', 'শাঁখের করাত, আসতেও কাটে, যেতেও কাটে', 'কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না', 'কামার বুড়োলে লোহা শক্ত', 'খরে

১। এক রকম নিকৃষ্ট ধান।

তাঁতীর তসরে হাত',—শ্রমজীবীর অভিজ্ঞতা; 'কোন্ কালে বা চুরি করেছি, ধরে ভাত নেই তাই এসেছি'—চোরের সাফাই; 'চাকুরি না, গুখোরি'—চাকুরিজীবীর মন্দভাগ্য; 'গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন', 'আঁতি-চোর পাতি-চোর হতে হতে সিঁধেল চোর', 'ছিঁড়ে খুঁড়ে কাটুনী, পুড়ে ঝুড়ে রাঁধুনী'—অভ্যস্ত কার্যে তা বহুজ্ঞার ফল; 'উঠন্ত মূলো পত্তনেই চেনা যায়', 'দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাঁশ', 'ক্ষেতের কোণা, বাণিজ্যের সোনা', 'নোট খেটে আড়ারে, সজনন বারো মাস', 'আছে গরু বয় না হাল, তার দুঃখ সর্বকাল' প্রভৃতি—চাষবাসের কথা; 'আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি'—সকল সুদখোরই জানে; 'হাকিম ফেরে ত হুকুম ফেরে না', 'জামিন দের মরতে গাছে উঠে পড়তে', 'ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট' প্রভৃতি আইন-আদালতের বিচিত্র পদ্ধতি; 'বাপ পোয় বসতি, মায় পোয় এয়োতি', 'বাপ পুরুত মা এয়ো, ঘরের জিনিস বাইরে না যেও'—যজমানী বামুনের পেশা সম্বন্ধে উক্তি; 'রেওর স্বর্গেও চিঁড়ে দই'—রেওভাটের দুর্ভাগ্যের কথা; 'গুড়ের ঘরে ডেঁয়ো কর্তা'—ভাঁড়ারীর কথা; 'সাপের হাঁচি বেদের চেনে', 'সাপের কাছে বেঁজি নাচে, তুমি জান রোজা আছে'—প্রভৃতি সাপুড়ের কেরামতের বিবৃতি। নিজ নিজ জাত-ব্যবসাই যে সবচেয়ে ভাল, তাও বলা হয়েছে—'জাত-ব্যবসা নরের ভূষা, তার সব ফাস্‌ফুস্‌'।

কেবল সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া নয়, সাধারণভাবেও সমাজের নানা কৌতুককর বিষয় লইয়া অসংখ্য বাংলা প্রবাদ প্রচলিত আছে; তাহার দুই-চারিটি নমুনা দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের শেষ করিব। সংসারে 'কাছাখোলা ন্যাকা' ও বোকার অভাব নাই, কিন্তু

ন্যাকা, বোকা, চলচলে কাছা, তিনে প্রত্যয় ক'রো না, বাছা ॥
ন্যাকা, আজুলে, চাল্‌শে কাণা, জল বলে খায় চিনির পানা ॥

কারণ, অনেক সময় ন্যাকামি ও বোকামি ভাণ মাত্র—তাই

কুলোর পরে তুলোর দুধ খান ॥
তাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না ॥
নাচতে কি আমি জানি নে, মজায় ব্যথায় পারি নে ॥
ঘোমটার ভেতর খেমটার নাচ ॥
বড় ভাইয়ের মাগ নেই, সেই ভাবনায় ঘুম নেই ॥
খেতে পারি না পাকে না (রুচি হয় না), মুখে দিলে থাকে না ॥

আবক্লন্তীর ঠন্‌কোর ব্যথা॥
নাচতে নেমে ঘোমটা॥
নাচতে জানি নে, আমায় ধ'রে এনেছে।
যদি, নাচি, তবে আমার ছেলে নেবে কে॥
খাব না খাব না অনিচ্ছে, তিন রেক চাল এক উচ্ছে॥

প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোকদের প্রতি প্রযুক্ত। কিন্তু সংসারে নিতান্ত হাস্যকর ও অযৌক্তিক ঘটনা বা আচরণ নিত্যই দেখা যায়—

দেখে ঘোর কলি, হাড়ে মাসে জ্বলি॥
অবাক্ করলি, ভবি, অম্বলে দিলি আদা॥
অবাক্ কলি অঘোরে, গুড়ছালা খেলে গা ঘোরে॥
অবাক্ কলি বাক্ সরে না, গুড় দিয়ে মুড়ি পেট ভরে না॥
অবাক্ কিবা কলিকাল, মণ্ডায় লাগে বড় ঝাল॥
অবাক্ কলির অবতার, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার॥
কালে কালে কতই হ'ল, পুলিপিঠের লেজ গজাল॥
আ মরি, মিন্‌সে লোক হাসালে, গোঁফ রেখেছে তোবড়া গালে॥
আ মরি, আ মরি বালাই যাই, গুড় দিয়ে ছেঁচর গাল চেটে খাই॥
বিয়ের কনে বলে—হাগব॥
আমার হাগা পেলে জাগিয়ে দিও॥
খাঁদা নাকে নথ, আর গোদা পায়ে মল॥
চান্দিনিতে ঘোল বিলান॥
কোন্ কালে হবে পো নাকড়াকানি তুলে থো॥
হাগন্তীর লজ্জা নেই দেখন্তীর লাজ॥
এঁড়ে গরু, না, টেনে দো॥
আমানি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে, সিঁদুর পরবি কিসে?
মা আইবুড়ো, বেটী শ্বশুরবাড়ি যায়॥
রথ দেখতে ভাতার ম'লো, দোল দেখতে যাই॥
বুনলাম ধান, তুললাম তিল, ফলল রুদ্রাক্ষ, খেলাম কিল॥
কিসে নেই কি, পান্তা ভাতে ঘি॥
হাতী ঘোড়া গেল তল, বেতো বলে হাঁটু-জল॥
কত শতে গেল রথী, শেওড়াতলার চর্কে বি॥

মানুষের যোগ্যতার চেয়ে আশা বেশি, তাই সাধের অন্ত নেই—

মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁধ॥
কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় চুট্‌কি দিতে॥

কত সাধ যায় রে চিতে, ফোগলা দাঁতে বিলিমিলিতে॥
কত সাধ যায় রে চিতে, বেগুনে গাছে আঁকশি দিতে॥
সাধ করেছেন কাও, পাকলে খাবেন তাও॥
সাধ যায় বাদশা হতে, খোদা মেপে দেয় না খেতে॥
সাধ করে বেধালাম কান, কাঠি দিতে যায় প্রাণ॥
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল ফারসী পড়ে তাঁতী॥
বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি॥
বারো হাত কাপড়ের তেরো হাত দশী॥
ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারী॥

বাহিরে জলুস ভিতরে ফাঁকা, ব্যর্থ আত্মম্ভরিতা বা হামবড়াই—ইহাও এক শ্রেণীর ন্যাকামি, বোকামি, ভণ্ডামি বা ভড়ং, যাহা বিবিধ প্রকারে দেখা দেয়; তাই এ সম্বন্ধে বিবিধ প্রকারের প্রবাদের শেষ নাই,—

বাইরে কোঁচা লম্বা, ভেতরে অষ্টরম্ভা॥
বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন॥
ভেতরে ফাঁক হয়ে যায়, বাইরে ঢাকা তত তায়॥
ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত॥
ঘরে নেই ঘটিবাটি, কোমরে ঝোলাই চাবিকাঠি॥
ঘরে নেই ভাজাভুজা, নিত্য করেন গোঁসাই-পূজা॥
ঘরে নেই ভাত, মেঝে চাঁদোয়া॥
ইটে নেই, ভিটে নেই, চৌধুরীর পুত॥
ইটে নেই, ভিটে নেই, বাইরে মর্দ্দানি॥
পোঁদে নেই চাম, চৌধুরী নাম॥
চৌধুরী চৌধুরী বড় নাম, হাগলে চিবায় পোঁদের নাম॥
পোঁদে নেই ইন্দি, ভজ রে গোবিন্দি॥
উদ খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে কাজল দিতে॥
আজা এলে, ভাজা এলে, মুই পুতের মা।
পাইক এলে, পেয়াদা এলে, মুই কিছু না॥
জপের সংখ্যা খোঁজ নেই ফোঁটার বাড়া খোপ॥
ফটোনির মালা, ভিতরে কপনি উপরে জামা॥
পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে আলতা॥
ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে॥

ফেন দিয়ে ভা[illegible]য়, গল্পে মারে দই।
মেটে হুঁকোয় তামাক খায়, গড়গড়াটা কই॥
খড়ো ঘরে ঝাড় টাঙান॥
মেটে-দেওয়ালে পাকীর কাজ॥
ঘরে শাকসজনা, বাইরে বাবুয়ানা॥
পরের ঘরে খায় দায়, আঠারো মাসে বছর যায়॥
পেট ভরে না ভাতে, সোনার আংটি হাতে॥
পরবার নেঙ্‌টি নেই, দরগায় যেতে যায়॥
বাঁচতে পায় না ভাত কাপড়, মরতে হ'ল দানসাগর॥
যার জেটে বিয়ে হয় নি, তার ঠাকুরঝি বলবার সাধ॥
চাল নেই, তার ধুচুনি নড়া॥
খেতে পায় না শাকসজনা, ডাক দিয়ে বলে ঘি আন না॥
তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি॥
ভাত পায় না কুঁড়ের নাগর, আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর॥
ভাত পায় না, মল পায়ে নাচে॥
ক্ষুদের জাউ পায় না, ক্ষীরের জন্য কাঁদে॥
ক্ষুদ পায় না, মণ্ডকারে কাঁদে॥
পোঁদ নেঙ্‌টো মাথায় ঘোমটা॥
ফোগলা দাঁতে হাসি, জিভ দেখিয়ে হাসি॥
গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল॥
হাতার বলে—গাঁ আমার॥
চাল নেই, চুলো নেই, হাটের মাঝে রাজত্ব॥
ঢাল, না তলবার, নিধিরাম সর্দার॥
নিন্দে পিরানে আত্মারাম সরকার॥
কুকুর কি জানে তুলসী বন, ঠেঙ তুলে মুততে মন।
যত ছিল নাড়ুবুনে, হ'ল সব কীর্ত্তনে॥
বাপ মেরেছে উকুন, তাই ছেলে ধনুর্দ্ধর॥
মায়ের নাম পোঁটাকুমী, ছেলের নাম চন্দনবিলাস॥
ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটা ভাতাশালের মোড়ল॥
কোন কালে নেইক গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই॥
চুল নেই, তার পেটো পাড়া॥
চুলের সঙ্গে খোঁজ নেই, তার বেঁকা পাড় হয় দাঁড়ি॥

ছিল ঘুঁটে-কুড়োনী, পেয়েছে রাজপুত্তুর বর।
হাড়ি হড়াক দেখে বলে—কি গাছের ফল॥
কাঠ-কুড়োনীর মেয়ে, রাজা আনলে ঘরে।
খাট পালঙ্ক দেখে দেখে হেসে হেসে মরে॥

ক্রমশ

শ্রীসুশীলকুমার দে

উৎসব

দৈনিক দীনতাগুচ্ছে আঁটি বাঁধা বাঁধা
বৎসরে বৎসর,—
শুষ্ক তৃণস্তূপ,—
জীর্ণপ্রায় পাণ্ডু ক্ষিতি-প্রান্তর।
সহসা বিদীর্ণ করি তাম্র দিগম্বর
আসে না উৎসব কোন?
মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গ-পরশে
দাহন-হরণ আনি
ক্ষণতরে দেয় না রাঙায়ে প্রাণের আকাশ?
সমস্ত শূন্যতা
সুপ্রসন্ন, করি সুপ্রকাশ?

এস এস হে উৎসব!
হাসিমুখে একবার করহ আহ্বান;—
পতিত মাঠের মাটি
দিনেকের তরে পেয়ে প্রাণ
উঠুক প্রতিমা হয়ে পূজার মণ্ডপে।
তোমারি মায়ায়
একটি রজনীতরে ফুটা রাংতায়

উঠুক বাজিয়া
মহামূল্য মাণিক্যখচিত
কষিতকাঞ্চনসমাদর।
বাঁশের বাঁশির রন্ধ্রে, অধরের মুখে—
নহবতে উঠুক বাজিয়া—
দিব্য সুরে বুকের সানাই।
মরণান্তে প্রসাধিত
অবোলা পশুর চামড়ায়
কাড়া ও নাকাড়া ঢোল
করিয়া উঠুক কলরোল।
মণ্ডপের বদ্ধ নির্জ্জনতা
সহসা খুলিয়া দ্বার হোক মুখরিত
গীতে বাদ্যে গণ্ডগোলে,
আলোক-উজ্জ্বল চন্দ্রাতপতলে
দলে দলে জনসমাগমে।
এ মন্দিরে একদিন
সুন্দর সুন্দরী নবীনা নবীন
সাজিয়া আসুক সবে বিচিত্র সজ্জায়
গৌরবে গরবে অলঙ্কারে।
বালক-বালিকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রৌঢ় কি প্রৌঢ়ায়
মলিন আটপৌরে ছাড়ি
যে যার পোশাকী সাজে
একদিন সাজিয়া আসুক সারি সারি।
বহিয়া আসুক গন্ধ, মাল্য, মাঙ্গলিকী।
ভুলি নিত্য তুচ্ছতা ও কুৎসিতের স্মৃতি
এক সন্ধ্যা সুন্দরের করুক আরতি—
বাহুল্যের সহস্র শিখায়।
ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা,
পুষ্প পত্র মন্ত্র হোম দান,

নৃত্য হাসি গান,
দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ রব—
আন আন আন হে উৎসব।
তারি মাঝে—
কি আত্মীয় অনাত্মীয়ে
সসম্ভ্রমে করিয়া আহ্বান,
সুমধুর অশনে ভাষণে
সবারে হৃদয় করি দান।
গুরু বৃদ্ধে করিয়া প্রণাম
করপুটে লভিলাম
মুক্তাসম যত আশীর্বাদ,
গাঁথি মালা, পরায়ে তরুণ-কণ্ঠে,
পূর্ণ করি অন্তরের সাধ।

কার্পণ্যাকুঞ্চিত করে
তিন সন্ধ্যা কাচ্চা পোয়া ছটাকের জপ
একদিন ভুলাও উৎসব!
দিনেকের তরে
ভারে ভারে মণে মণে মাঠের সম্পদ
বহিয়া আনহ মোর ঘরে।
অনর্জ্জিত অসঙ্গত ঋণ
এক পাত্রে গনি,
এক রাত্রি কর মোরে ধনী,—
ঋণোজ্জ্বল পূর্ণচাঁদে পূর্ণিমা-রজনী সম।
মিথ্যা করি ভাগ্যলিপি, লজ্জিত বিধাতা,
বারেক করহ মোরে দাতা।
ল'য়ে তুচ্ছ অকাঞ্চন কাচে
প্রাণ যদি এতকাল বাঁচে,
কাঞ্চনে করহ আজ কাচ;

কুবেরের কনক-মন্দিরে
লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে উড়ে লাগুক ছোঁয়াচ,
হাঘোরিয়া উড়নচণ্ডীর !

... ...

তার পর ?
তার পর দেখিব চাহিয়া—
তোমার বিদ্যুৎ-সৃষ্ট ভস্ম তৃণস্তূপ,
তোমার উচ্ছ্বাসবন্যা আনন্দপ্লাবন,
গেছে ভাসি—
গেছে নামি ;—
আর—
ঘিরে চারি ধার—
সংশয়-সঙ্কুল সন্ধ্যা,—
সঙ্কট-পাণ্ডুর তেপান্তর !

তা হোক তা হোক,—
দিগন্ত নিতান্ত নিরুৎসব,
একবার এস, হে উৎসব !

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ধান

ধানে ক্ষেত একেবারে ভ'রে গেছে। কালু শেখের ছ-সাত বিঘা ক্ষেত্রের শ্যামা জননীর পীত অঞ্চলে যেন আর ধান ধরে না। কালু শেখের সাত বিঘে, তার ভাই মণি শেখের তিন বিঘে। তারপর গ্রামের আর সকলের, কারু বেশি, কারু কম। সিধু মোড়লের ধান-জমি কালুর সীমানার পাশেই।

কালু এসে দাঁড়াল ক্ষেতের পাশে। তারপর চলতে চলতে তার ঘরের সামনে গ্রামের মাঝে এসে পড়ল।

ঘরের দুয়ারে শিকল দড়ি দিয়ে বেশ শক্ত ক'রে বাঁধা, যেমন ক'রে বেঁধে রেখে চ'লে গিয়েছিল। কালু উন্মনভাবে এদিকে ওদিকে তাকাল। তার ভাইয়ের ঘরও সেই ভাবেই শিকল টানা আর কাঠি দিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা। কালু ক্লান্তভাবে দাওয়ার ওপর বসল। তা হ'লে কি তারা আসে নি? মাথাটা যেন কেমন হয়ে গেছে। মনে হ'ল, বিষম তৃষ্ণা পেয়েছে।

খানিক ব'সে থাকার পর তার হঠাৎ মনে হ'ল, হয়তো বাড়ির সবাই এসেছে, অন্য জায়গায় কিছু কাজে গিয়ে থাকবে। কিন্তু ঘরের দাওয়ায় ধুলোর ওপর পায়ের দাগ একটিও প'ড়ে নেই। কয়েক মাসের মধ্যে মানুষের গতিবিধি হয়েছে সেখানে এমন মনে হয় না; কিন্তু মন সে কথা ভাবতে চায় না। কালু উঠে দাঁড়াল। যদি ঘরে কলসী থাকে জলের, তা হ'লে একটু জল এনে খাবে, তারপর জল ভ'রে রেখে তাদের ওপাড়া থেকে ডেকে আনবে। একটু রান্নার যোগাড় করতে পারে যদি কারুর কাছে দুমুঠো চালের যোগাড় ক'রে। ক্ষেতের দিকে চেয়ে তার চোখে জল এল। কি দুর্দিনই গেছে, দীর্ঘ চার মাস ধ'রে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, জোয়ান ছেলে হবিব, তাদের মা, হবিবের বউ—আট-ন জন পথে পথে ঘুরে ঘুরে— তারপর ছোট ছোট তিনটি শিশুর মৃত্যু; হবিবের বউয়ের একটি মৃত সন্তান হয়ে জ্বরে ভুগে খেতে না পেয়ে অর্দ্ধমৃত অবস্থা। তারপর হঠাৎ তারা কোন্‌দিকে কি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে চ'লে গেল, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, বুড়ো কালু শেখ তা জানে না। কালুর বিবির কাছেই ছিল দুটি ছেলে—জমির আর ফকির। হঠাৎ দেখলে, তার সঙ্গে যেন তারা নেই। কলকাতার পথে পথে কদিন ধ'রে খুঁজে তাদের পায় নি। লরী ভর্ত্তি ক'রে লোক নিয়ে গেছে, লোকে বললে। কোথায়, তা কেউ বলে না। কালু ভাবলে, হয়তো তারা দেশেই সকলে এসেছে। কথা তো তাই ছিল, ধান পাকলে দেশে ফিরবে। তারা এলেই কালুও দেশে ফিরবে। কথাই ছিল, এই কটা মাস কোন-রূপে ভিক্ষে ক'রে প্রাণটা বাঁচলে আল্লা আর কোন অভাব রাখবে না।

কালুর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। ক্ষেতের দিকে চেয়ে সে চোখ মুছতে লাগল। উন্মনভাবে বিড়বিড় ক'রে মুখে বলে, বাবা-মায়েরা, বহুত

ধান হয়েছে। তোরা একমুঠো ভাত চোখে দেখতি পেলি না বাপ। আজ ভরপেট ভাত খেতে দিতাম বাপ। কালুর ঝাপসা চোখের সামনে সমস্ত ক্ষেত মিলিয়ে গেল, কেবলই ছোট ছোট তিনটি বালক-বালিকার শীর্ণ কঙ্কাল তনু ভেসে ভেসে আসতে লাগল। শহরে এত ভিক্ষায় মেলে নি, এবং অন্ন তো দৈবাৎই মিলেছে, তাদের সকলের তো নয়ই, শিশুগুলিরও পেট ভরে নি। শিশুগুলিকে বহু আশ্বাস দিয়ে নিজেরা বহু আশা ক'রে দিনের পর দিন ওরা পথে পথে বেড়িয়েছে, যদি কোন রকমে এই কটা মাস বাঁচিয়ে রাখা যায়, তা হ'লে আবার সব হবে। তারপর—

কালু ঘরের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলে। না, তারা কেউ এখানে আসে নি। জলের কলসী, ধান-চালের জালা, হাঁড়িকুড়ি, ধুলায় ধূসরিত। মেঝেতে বহু ইঁদুরের গর্ত। মাটি তুলে তুলে ঘরখানা ক্ষতবিক্ষত করেছে তারা। কালু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কলসীটা নিয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল।

চৌধুরীদের বড় পুকুরে জল নিয়ে ফিরবে, আর দেখবে, যদি এই দিকে কোথাও হবিব তার মাকে বউকে নিয়ে এসে থাকে। তা হ'লে কদিনের জন্যে চারটি চাল যোগাড় করুক। তারপর? আর এবারে অন্নের দুঃখ খোদা রাখেন নি।

চৌধুরী-পুকুরের আশেপাশে ঘাটে আঘাটায় কয়েকজন জল নিতে, স্নান করতে এসেছিল।

কালু কলসী নিয়ে নিজেদের ঘাটের দিকে গেল।

অন্য ঘাট থেকে পণ্ডিত রুইদাস জিজ্ঞাসা করলে, কালু শেখ আইলে নাকি? ভাল সব?

কালু কলসী রেখে বললে, হাঁ ভাই, আলাম তো। হবিব্রে দেখেছ নাকি?

পণ্ডিত স্নান করছিল; সে বললে, না ভাই। সবাই এসেছ তো? তোমার ক্ষেতে খুব ফসল হয়েছে ভাই। আর দেখ না, সব ক্ষেতেই কি ফসল ফলেছে! একটু নিশ্বাস ফেলে তারপর বললে, শুধু দেশে আর মানুষ নাই।

পণ্ডিত স্নান ক'রে চ'লে গেল।

কালু মাথায় মুখে খানিক জল দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। তা হ'লে এরা হবিবদের দেখে নাই!

খানিকটা জল খেয়ে কলসীটা ভ'রে কালু ঘাটের ওপরে একটু ছায়া দেখে বসল।

আশেপাশে এঘাটে ওঘাটে প্রায় জনহীন গ্রামের কয়েকটি লোক স্নান করতে এল। কেউ তারা কালুকে চেনে, কেউ চেনে না ভাল ক'রে। আর অনাথ আতুরের মত কালুর চেহারা হয়েছে, চেনাও শক্ত। কালু ভাবতে লাগল, একবার সিধু মোড়লের বাড়িতে খোঁজ করবে, সে হয়তো জানে হবিবের খবর। বেলা পড়তে আরম্ভ হয়েছে। কালু ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়াল।

• •

সিধু মোড়লের ঘরখানা কালুর ঘরের খানিকটা পেছনের দিকে। তার ঘরের দুয়ার খোলা। আঙিনায় একটা শীর্ণস্বর গরু, তার বাছুরটা নেই কোথাও। সিধুর একটা কুকুর ছিল, সেটা এখন যেমন খ্যাংরা তেমনই খেঁকি। কালুকে দেখে ঘেউঘেউ ক'রে এল। আঙিনায় জঙ্গল ভ'রে গেছে। দাওয়ার ওপর বহুকাল লেপা পড়ে নি।

কালু ডাকলে, সিধু ভাই, ঘরে আছ?

ঘরের মধ্যে থেকে অতি ক্লান্ত স্বরে জবাব এল, আছি, কে তুমি? উঠে এস, আমার জ্বর।

কালু ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, আমি কালু শেখ ভাই। তুমি জ্বরে প'ড়ে আছ? ভাই, হবিবের মারে—ওদের দেখেছ? এখানে আইল নাকি? তোমার কাছে এখানে কেউ নাই? সবাই কোথায়? খুব ধান হইছে তোমার, ক্ষেতেও দেখলাম।

কঙ্কালসার সিধু একবার উঠে বসবার চেষ্টা করলে, পারলে না। কোটরে-বসা চোখ দুটায় জল চকচক ক'রে উঠল। একটু পরে শান্তভাবে ধীরে ধীরে বললে, হাঁ ভাই, ধান হইছে। রাবের খুব অসুখ করল—জ্বর পেটের অসুখ, তার মায়েরও জ্বর হ'ল। তারপর—তারা দুজনেই আমায় ফেলে চ'লে গেল। সিধুর চোখের কোলের জল দু

কৌটা গড়িয়ে পড়ল। ভাই, পাকা হাড়ে খুব সয়; তাই আমি জ্বরে ভুগেও, না খেতে পেয়েও টিঁকে আছি। ওরা সইতে পারলে না।

কালুরও চোখে জল পড়ছিল। সে বললে, হাঁ৷ ভাই, আমারও তিনটা বাচ্চারে কলকাতাতে রেখে আলাম—ফতি, আয়েষা, সোনা। তারা খিদেতে শুকিয়ে গেল ভাই—ভাতের জন্যি। আর এত ধান—

দুজনেই নীরব হয়ে গেল। ঘরের সামনে থেকে দেখা যায়, সিধু মোড়লের ধানের ক্ষেত ফসলের ভারে নুয়ে পড়েছে। সিধু জিজ্ঞাসা করলে, আর সবাইরে নিয়ে এসেছ?

কালু শেখ উঠে দাঁড়াল, বললে, গেরামে তাদের দেখতি পাব মনে ভেবে আলাম তো। তারা যে কমনে গেল! খুঁজে দেখি। তোমাদের দিকে আসে নাই?

সিধু বললে, না তো। তোমার বিবিরে কি ছাওয়ালদের তো এদিকে দেখি নাই, তা আমি তো জ্বরে শুয়ে প'ড়ে, দেখি, মেয়েটা ছেলেটা ফিরলে শুধুব, তারা জানবে হয়তো।

কালু শেখ উন্মনভাবে সারা বেলা অনাহারে তাদের গ্রামে হবিবদের আর তার মাকে খুঁজে বেড়াল। না, তারা এ গ্রামে আসে নি। দুমুঠো চাল এনে সন্ধ্যাবেলা সিধু মোড়লের মেয়ে বললে, কালুকাকা, দুটো রেঁধে খাও আজ। এক মুঠো খেয়ে কাল আবার ভিন্ গাঁয়ে দেখো, হয়তো আসতেছে। পথ চিনতে দেরি লাগে তো।

পতিত রুইদাসও তাই বললে। গ্রামের ঘর বেশির ভাগই শূন্য, কোঠাবাড়িতেও লোক যেন নেই, চেনা পথের মাটিতে পায়ের দাগ যেন গুনে নেওয়া যায়—এত কম। গরু বাছুর বলদও নেই, লোকে বেচে দিয়ে চ'লে গেছে। যারা কিছু ধান রাখতে পেরেছিল লুকিয়ে চুরিয়ে, তারাই প'ড়ে আছে, হয়তো বেঁচেও আছে। বাকি সব পালিয়ে গেছে, চ'লে গেছে। বেঁচে আছে? কেউ জানে না। আর ফেরে নি।

কালু কোনক্রমে দুটো রাঁধে। মুখে গ্রাস ভাল ক'রে ওঠে না। মনে হয়, হয়তো তারও কবিলা নেই, আর জমির ফকির—কচিছেলে দুটা?

সিধু মোড়লের কথা মনে হয়, পাকা হাড়ে খুব সয়। তার মন হুহু ক'রে ওঠে, চোখে উচ্ছ্বসিত হয়ে জল আসে। অবশিষ্ট ভাতগুলি সিধুর গরুর কাছে কুকুরের কাছে ঢেলে দিয়ে ওদেরই দাওয়ার পাশে শুয়ে পড়ে। বললে, লক্ষ্মী, শুন্তি ঘরে যেতে মন সরছে না মা, আজ তোদের ঘরকে হেথায় প'ড়ে থাকি।

লক্ষ্মী ম্লানভাবে হেসে বলে, শোও তাই, একখানা মাদুর দিই। কার্ত্তিকের রাত্রের মাঠের কনকনে হিম ছেঁড়া কাপড়ে বাধা মানে না। কালুর ঘুম শীতেও আসে না, ভাবনাতেও আসে না।

রাত্রি শেষ হবার আগেই মন আশান্বিত হয়ে ওঠে। সত্যি ভিন্ গাঁয়ে—ওই পাশের গাঁয়ে হয়তো এসে ফিরছে তারা। খাওয়া নেই কতকাল, হয়তো জ্বরে পড়েছে, হয়তো কমজোর হয়ে গেছে। কালু ছেঁড়া কাপড়টা টেনেটুনে গায়ে দিয়ে প্রভাতের আগেই পাশের গ্রামের দিকে যায়।

সে গ্রামের প্রায় সকলেই অচেনা। মানুষ সেখানেও যেন নেই। কাকে জিজ্ঞাসা করবে, কে তাদের চেনে, কেবা ওকে চেনে, কিছুই যেন বোঝা যায় না।

অখাদ্য আহারে কঙ্কালসার রোগা জীর্ণকায় এক-একজনকে দেখে কালু জিজ্ঞাসা করতে যায়, কি জিজ্ঞাসা করবে যোগায় না। হতবুদ্ধির মত গ্রামের পথে পথে খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়ায়। তারা পাঁচজন, হরির, তার মা, বউ, ছেলে দুজন! যদি একজনকেও দেখতে পায়।

গ্রামে কোঠাবাড়ি নেই বললেই হয়, কাঁচা ঘর প্রায় খালি, যারা আছে তাদের দেখলে মনে হয় আর অল্প কয়েক দিনের জন্যেই আছে। গ্রামের আশপাশের ক্ষেত কিন্তু ফসলের ভারে হেলে পড়ছে। কিন্তু এখনও যারা বেঁচে আছে, পথে উঠে এসেছে, তাদের কারও দৃষ্টি উদাসীন, কারু বা হতবুদ্ধি, আতঙ্ক-অভিভূত। ফসল? ফসল কার? তাদের? লোকেরা কি ছিনিয়ে নিতে আসবে না আর? আর ফসল কে খাবে? কে কাটবে? খাবার লোক, অতিপ্রিয়তম যারা, তারা অনেকেই যে নেই। কাটবার জন্যে যারা আছে, আর তাদের শক্তিও নেই, প্রয়োজনবোধও নেই; শোকে রোগে ভয়ে ভাবনায় জড়ের মত হয়ে

আছে। সকালে একবার শুধু গ্রামের পথে উঠে আসে। তারপর ফিরে গিয়ে জীর্ণ 'খড়-ছাওয়া কুটিরখানিতে' গিয়ে ব'সে থাকে। বিকালের দিকে হয়তো জ্বর আসে, ছেঁড়া কাঁথাখানা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

কালু এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। ভদ্রলোক কারুকে দেখলে কাছে গিয়ে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়ায়। সকলে ভয় পায়, পাছে ভাত চায়, খেতে চায়। কালু বলে, না বাবু মশায়, খেতে চাচ্ছি না, মোর কবিলারে ছাওয়ালদেরকে খুঁজতে আলাম এধার পানে, মোরা মোছলমান। সে অন্ন চায় না, আশ্রয়ও না, শুধু ছত্রভঙ্গ সঙ্গীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজ আর অন্ন আশ্রয়ের অভাব তার খোদা রাখেন নি। কেউ সহৃদয়ভাবে বলেন, না বাপু, মোছলমান দেখি নি কারুকে এ গাঁয়ে। কেউ বিরক্ত হয়ে বলে, শোন কথা ব্যাটার, ওর কবিলা কোথায় আমরা তার হিসেব রাখি যেন।

কোনদিন আশপাশের গ্রামেই প'ড়ো ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়ে, কোনদিন গ্রামে ফিরে আসে। এমনই ক'রে দশ-বারো দিন গেল। পাশাপাশি কালুদের ক্ষেতের, সিধু মোড়লের ক্ষেতের, পতিতৈর ক্ষেতের, সকলের ক্ষেতেরই ধান পেকে উঠল। সিধুর ছেলে নিতাই দু-একজন আপন জন ডেকে জড়ো ক'রে ধান কাটতে আরম্ভ করলে।

কালু উদাসীন নির্বোধের মত ওদের দাওয়ার এক পাশে ব'সে থাকে নিজের ক্ষেতের দিকে পিছন ফিরে।

এখন সিধু কোনক্রমে শরীর টেনে নিয়ে তার পাশে এসে বসতে পারে। বলে, ভাই, তামুক খাও। কলিকাটি হুঁকা থেকে নাবিয়ে দেয়।

কালু কলিকাটি হাতে নিয়ে ব'সে থাকে। তারপর ফুঁ দিয়ে টানতে গিয়ে তার চোখ জলে ভ'রে যায়। কলিকা নাবিয়ে রাখে।

সিধু বললে, কি হ'ল ভাই, বিষম খালে?

কালু চোখ মুছে বলে, কি জানি।

কালু ব'সে ব'সে দেখে। লক্ষ্মী খুঁজে-আনা সঙ্গিনী জড়ো ক'রে ধান মাপে, কাড়ে, তোলে। নিতাইদের ক্ষেতের কাজ শেষ হয়ে এল।

এবার একদিন সন্ধ্যাবেলা নিতাই বললে, কালুকাকা, আমার কাজ হয়ে এল। এবারে তোমার খাতে নামব সবাই, কাল বাদে পরশু নাগাত।

কালু অবুঝের মত নিতাইয়ের পানে চাইলে।

সিধু ঘর থেকে বললে, হ্যাঁ, দশে মিলে কাজ করলে, তোমারও কাজ উঠে যাবে ভাই, ভাবছ কেনে?

কালু এবারে হাউহাউ ক'রে কেঁদে ফেললে।

ধান কাটা হয়ে উঠবে কি না, তার কাজ উঠে যাবে কি না, কালু ভাবে নি। সে ক্ষেতের দিকে আর চাইতেই পারে নি। কালু কিছু ভাবতেই আর পারে নি।

দুটি কিশোর তরুণ-বয়সের, তাদের বাপেরও চোখ শুকনো রইল না। কালুর কান্না সিধুর শোক জাগিয়ে তুলল। কিন্তু সিধুর ঘরে এখনও নিতাই আছে, লক্ষ্মী আছে। আবার ধীরে ধীরে তার সমস্ত দুঃখের ক্ষতে প্রলেপ পড়বে, আবার হয়তো এই আঙিনা ভ'রে নিতাইয়ের লক্ষ্মীর কোলের শিশুদেবতার পায়ের চিহ্ন পড়বে। নিতাইয়ের জননীর কথা, বাপের কথা তারা জানবে না, সিধুও হয়তো তাদের মধুর হাসি-কাকলির কলশব্দে আজকের গ্রামের জনহীন এই নিস্তব্ধ ভয়াবহ দুর্দিনকে ভুলে যাবে।

চোখ মুছে লক্ষ্মী বললে, কালুকাকা, কেঁদো না। কাকী বুড়ো হয়েছে, হয়তো হাঁটতে পারে না তেমন। আর হরিব ভাই তো সঙ্গে আছে। তুমি আজ দুটি বেঁধে খাও, কাল আবার খুঁজতে বেরিও। ওরাও তো জানে ধানকাটার সময়। ওরা আসবেই ফিরে।

নিতাই বলছে, হ্যাঁ, তাই কর। তুমি ফিরে এলে আমি তোমার ধান কাটতে শুরু করব।

সিধু বললে, তখন যদি গাঁ ছেড়ে না যেতে ভাই! তা হ'লে আর এমন হ'ত না। কালু চোখ মুছে নীরবে ব'সে রইল।

নিতাই বললে, ঘরে যদি খাবার চাল থাকত, তা হ'লে কি আর লোকে যেত বাবা! এমন ক'রে গাঁ 'লক্ষ্মীশূন্যি' ক'রে দিলে যে—

নিতাই চুপ ক'রে গেল। চোখের সামনে যেন ভেসে এল উর্দি-চাপরাস-পরা সরকারী লোকের শোভাযাত্রা। লোকে সভয়ে

আঙিনায় গোলার পাশ থেকে স'রে দাঁড়াল, বীজধানের জালা খুলে দেখিয়ে দিলে। কেউ বা কয়েকটা কাগজের টাকা পেলে, কেউ বা পেলে না। কি জন্তে কি নীতিতে গ্রাম লক্ষ্মীশূন্য অন্নহীন হয়ে গেল একদিনের মধ্যে, তা আজও নিতাই জানে না। দু-এক ঘর গৃহস্থ শুধু ধান চাল রাখতে পেরেছিল। তারা 'নিসপেকটার' সায়েবের কাছে সেলাম করতে গিয়েছিল। নিতাইরা তাদের কাছেই ধার চেয়ে ক্ষেত বাঁধা দিয়ে আজও মরে নি। নইলে ওরাও গাঁ ছেড়ে যেত না কি? তবু তো মা গেল, ভাই গেল।

দুখানি ইট দিয়ে উনান ক'রে লক্ষ্মী বললে, কালুকাকা, এখানেই দুটি ভাতে ভাত ক'রে নাও। কালু হতবুদ্ধির মত লক্ষ্মীর নির্দেশমত ভাতে ভাত বসিয়ে দিলে ওদেরই গোয়ালে। লক্ষ্মীদের ঘরে সকলের খাওয়া হ'ল। কালুর ভাতে ভাত সিদ্ধ হয়ে গেল। রাত্রি গভীর হয়ে আসতে লাগল। সিধু রোগা মানুষ, তার ঘরের আগল বন্ধ ক'রে লক্ষ্মী বললে, কালুকাকা, খেয়ে এসে আজ এই পাশের ভাঙা ঘরখানায় শোও। বাইরে বড় ঠাণ্ডা। আর রাত ক'রো না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে কালু মূঢ়ের মত চুপ ক'রে ব'সে ছিল। শুধু বললে আচ্ছা, তুমি শোও গা মা।

রাত্রি গভীরতর হ'ল। রাত্রি কত প্রহর হ'ল ওরা বোঝে ঘড়ি না দেখেই। কালু নিদ্রাহীন দৃষ্টিহীন চোখে আকাশের সীমান্তে চেয়ে রইল। মনে আসে তিনটি শিশু বালক-বালিকার কথা। গত বছরের কথা, তারপর হবিবের মা, হবিব, ফকির, জমির, বউ, ভাইদের বাড়ির সকলের কথা। সকলেই ছিল তারা। ধান কাটা, ঝাড়া, তোলা, তাদের কত কাজ, কত আনন্দ! চৌধুরী-বাড়িতে 'নবান্নর' (নবান্ন) জন্তে নতুন ধান কুটে চাল দিয়ে আসে হবিবের মা। তেনারাও তারে নবান্ন দেয়—কাঁচা চাল দুধ গুড় ফল সন্দেশ, তারা খেয়েছে সকলে। আর এবারে তারা কেউ নেই? ধান? ওরা কাটবে বলেছে। কিন্তু কি করবে কালু ও ধান নিয়ে? কে খাবে? কাদের খাওয়ার জন্তে ও ধান কাটবে? কোন্ সময় থেকে কালুর ভাত কটি উনান ঠাণ্ডা হ'লে থেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সেইখানেই ঘুমিয়েছে।

অকস্মাৎ পূর্ব্বদিক রাঙা হয়ে উঠল। কালু সোজা হয়ে বসল। তারপর আস্তে আস্তে দাওয়া থেকে নেমে গেল। সরু পথের দুধারে ওদেরই ক্ষেতের ফলন্ত ভারী ধানের শীষ নুয়ে এসে তার গায়ে লাগে—যেন সাপের স্পর্শের মত তার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠে। চোখে আকুল হয়ে জল আসে। সে অভিভূতের মত দ্রুতপায়ে ক্ষেতের সীমানা, গ্রামের সীমানা অতিক্রম ক'রে যেতে চায়। কিন্তু কোথায় খুঁজতে যাবে? মহানগরীর মানুষের অরণ্যেই কি কোথায় তারা হারিয়ে গেল? অথবা—? অথবার কথা কালু ভাবতে পারে না। দূরে—বহুদূরে মানুষ দেখে। মনে হয়, ওরা কি জানে তাদের কথা, হোক অচেনা, হয়তো জানে। হয়তো ওদের মাঝেই হবিবকে, জমিরকে, ফলিরকে—একজনকেও দেখতে পাওয়া যাবে।

• • •

সরকারী খাদ্য-বিভাগের কর্ম্মচারীরা এসে দেখছিল, কোন গ্রামে কত ধান হয়েছে।

গাছে ঠেস দিয়ে সাইকেল রেখে খাকি স্যুট পরা দু-তিনটি লোক পন্ডিত রুইদাসের ক্ষেতের পাশে এসে দাঁড়াল। এই নতুন ধানের শীষের মত নধর হৃষ্টপুষ্ট গোল সবল চেহারা, পরস্পরের মধ্যে বললে, বাঃ, চমৎকার ফসল হয়েছে তো!

পন্ডিত ধান কাড়ছিল, আতঙ্কে তার হাতের কাজ থেমে গেল।

খাকি-পরা একজন জিজ্ঞাসা করলে, এ ক্ষেত কার, তোমার?

সভয়ে পন্ডিত বললে, আজ্ঞে।

ওটা? সামনে সিধু মোড়লের ক্ষেতের সামান্য ধান মাপা বাকি ছিল।

ওটা সিদ্ধেশ্বর মোড়লের।

এবারে পন্ডিতের আশেপাশে কয়েকজন জড়ো হ'ল—নিতাই, লক্ষ্মী, পন্ডিতের ভাই, তার লোকজন।

আর ওটা? ওটা যে কাটাই হয় নি, কার?—ঠিক নাকের নীচে কাঁঠালে মাছির মত ক'রে গোঁফ ছাটা একজন জিজ্ঞাসা করলে।

নিতাই বললে, ওটা কালু শেখের।

কাটে নি যে?

তারা হেথায় নেই। তারা চ'লে গিয়েছিল মন্বন্তরের সময়।—পণ্ডিত বললে।

মস্ত ক্ষেত যে, কতজন তারা? একজন পকেট থেকে নোটবই পেন্সিল নিয়ে লিখে নিচ্ছিল কি সব।

তা উনিশ-কুড়ি জন হবে। কালু শেখ, তার বউ তার চার ছেলে দুই মেয়ে, এক ছেলের বউ, তার ভাই মণি শেখের দুটো পরিবার, তাদের সাত-আটটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে।—নিতাই বললে।

আশ্চর্য হয়ে মাছি-গোঁফওয়ালা বললেন, কেউ নেউ তারা? কেউ ফেরে নি? এত ধান হয়েছে, কাটবে না?

নিতাই বললে, কালু শেখ এসেছিল, চার দিন হ'ল তাকে আর দেখছি না। মণি শেখের যোরা কোন খবর জানি না। বর্ষার সময় গাঁ ছেড়ে চ'লে গিচল তারা।

অন্নাভাবে পলাতক মারীতে উজাড় জনহীন গ্রামে তাদেরই হাতে রোপণ করা শস্যভারানত ক্ষেত্রের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই লোকেরা কি সব লিখে লিখে নিতে লাগল।

কালু শেখের সাত বিঘে, মণি শেখের তিন বিঘে, পীতাম্বর কুমোরের দু বিঘে, সরস্বতী মাইতির খানিকটা ক্ষেত, সোনা বাউরীর আর করিমের ভাগের ধান-জমি, আরও কার কার সব নাম লেখা হয়ে গেল। শুধু তারা যে কোথায় গেছে বা আছে, লেখা গেল না।

খাকি-পরা তারা জিজ্ঞাসা করলে, এদের তোমরা চেন?

পণ্ডিত নিতাই হাতজোড় ক'রে বললে, হ্যাঁ বাবু, এক গেরামে বাস ছোট কাল থেকে। চিনি বইকি।

বেশ।

তারপর তারা সাইকেল চ'ড়ে পাশের গ্রামের দিকে চ'লে গেল। সরু নুঁড়ি পথের আশেপাশে তাদের সামনে পিছনে প্রায় জনশূন্য, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবার পথে সোনার শীষে ভরা ধান নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল। যেন কাদের জন্য তাদের আর মিনতির শেষ নেই।

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

চকোর-শিক্ষা

আকাশে আকাশে টো-টো ক'রে আজও জ্যোৎস্না করিস পান?

ছি ছি রে চকোর-দল,

নেহাত পুরোনো সাবেক সেকেলে খাঁচা!

যা বলছি বাপু, মন দিয়ে শোন্,

ইজ্জতটাকে বাঁচা।

জ্যোৎস্না খাবি কি! 'দাপসি'-ভোজন করি সমাপন

কালের জলেতে আঁচা।

তার পর ছুটে চল্

সেলুনেতে ঢুকে দাড়ি-ফাড়িগুলো চাছা,

ল্যাজ-ফ্যাজগুলো ছাঁটা,

তার পর সেটা নাচাতে চাস তো দিসের-মাফিক নাচা।

বুকে-পেটে-পিঠে লেবেল-টেবেল সাঁটা।

তার পর গিয়ে শিক্ষা নে

ভিক্ষা নে

দীক্ষা নে…

টানতে শেখ্, মানতে শেখ্,

শুষতে শেখ্, লুসতে শেখ্,

হাফপ্যান্ট প'রে নানান নামরা ঘুসতে শেখ্।

তার পর?

কর ফরফর, নয় ফড়ফড়।

উড়তে চাস তো ডানা দুটো মুড়ে লাফিয়ে চড়—

'রয়েছে 'প্লেন

ষ্টীমার ট্রেন'

বাইক 'কার

চমৎকার

(কিনবি? আমার রয়েছে একটা নতুন 'বুইক্'।)

উড়তে উড়তে বাটুন্‌হোলের কিস্‌-মি-কুইক:
মাঝে মাঝে শোঁক্
পিড়িং পিড়িং ভোঁ প্যাক পোক
বাজনা বাজা—
ওরে ও খাজা
জবরদগব ভব্য হ
কাগজ পড়, 'ইজম্‌' শেখ্‌, সভ্য হ।

"বনফুল"

বন্ধন-মুক্তি

চলা মোর শুরু হোক রাত্রি আর দিন
নিঃশব্দ যাত্রায় রত পাদপের মত।
প্রাপ্ত মোর হোক ক্ষয় বৃন্ত-বন্ধ-হীন
ধূসর ধূলিতে লীন পত্র শত শত
মরণ লভিছে যেথা, সর্ব্ব ক্ষতি মম
পূর্ণ হোক ছন্দে রসে, মাধুর্য্য সম্ভারে
নব বসন্তের পল্লবিত তরু সম
বর্ণগন্ধ-মেলা শত পুষ্প অলঙ্কারে।
নিরাসক্ত হোক মোর সকল বন্ধন;

প্রাপ্ত মোর যত সুখ, হাসি স্বপ্ন যত
ঝ'রে যাক তারা মুক্তি-পথে আলিম্পন
তরুতলে ঝ'রে-পড়া কুসুমের মত।
বন্ধন-মুক্তির ছন্দে চ'লে যেন যাই
তারি টানে পেয়ে যাকে তবু নাহি পাই।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

নাদ

[হৃদয়ে ভাবাবেগ সৃষ্টির পক্ষে অর্থযুক্ত শব্দ অপেক্ষা নিছক ধ্বনিই যে অধিক বলবান— এ কথা জানিতে আর কাহারও বাকি নাই। এই নাদ-ব্রহ্মই সমস্ত রসসৃষ্টির মূল, বস্তুত অর্থযুক্ত বাক্য নিরঙ্কুশ রসাস্বাদে বাধা প্রদান করে মাত্র। আমি তাই স্রেফ 'ভাবানুগ অর্থহারা' নাদের সাহায্যে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করিয়াছি। কবিতাটি বীররসাত্মক। পাঠকের মনোমত হইলে অন্যান্য রসের নাদ-কবিতাও লিখিবার ইচ্ছা আছে।—চন্দ্রহাস]

ঝট-ঝট-ঝট হুড্ডট-কট পট্টিয়া,
ঘন্ন বিছট ঝণ্টিয়া!
বন্দুক লুক বাণ্ডা
হণ্ডুল-গুল ভাণ্ডা—
পড়ু-পুহিন গণ-গণ-গণ ঘণ্ডিয়া!
চিম্পট কুটু? গুম্‌ফট লগ ফম্বরে
ভণ্ডুর গুজু গম্বরে!
ঝঙ্কিলি কিল ঝুক্কি
অর্ণ-জটুল ফুক্কি
চিক্কিল চিন ঝণক-ধনক লম্বরে।
কয়-থল-মথ ডাঙুলি-ঝগ ডণ্টিয়া
হুমুল পিলু পট্টিয়া!
ঐ বলবলি হঙ্কে
কিকিড়ু দিলু ডঙ্কে
গম্বু-গজর লম্বুক পবিচণ্টিয়া!
ঝট্টু-ঝটক হুড্ডট-কট পট্টিয়া!

"চন্দ্রহাস"

প্রত্যাখ্যান

সুখ যদি কোন দিন সম্ভোগের শত উপচারে;
বঞ্চিত অঞ্জলি মোর চাহে ভরিবারে
তার সে নির্লজ্জ ছলনায়
বদ্ধমুষ্টি হতে মোর দণ্ড যেন না খসে ধুলায়।

দুর্ভাগ্যের বন্ধু মোর যত আছে স্বদেশে বিদেশে,
জীবনের উৎসবের শেষে
পরিত্যক্ত অন্নমুষ্টি প্রতি কণা তিক্ত অপমানে
ক্লান্ত দিবসের শেষে যারা নিজ ভাগ্য বলি মানে,
সভ্যতার রথচক্র যারা প্রতিদিন
অকৃপণ বক্ষরক্তে যুগে যুগে করিছে মসৃণ,
আমি তাহাদেরি সাথে, ললাটে মুদ্রিত অপমান,
বঞ্চনার বিষপাত্র নিঃশেষে করিতে চাহি পান।
কলঙ্কিত ভাগ্যের উৎকোচে
উদ্ধত বিদ্রোহ মোর নতশির হবে না সঙ্কোচে।

বঞ্চিতের রক্তপুষ্ট ঊর্ণনাভ বুনিতেছে জাল
চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ শোষিতের বিশুষ্ক কঙ্কাল;
তবু তার ক্রূর তন্তুপাশে
আলোকে শিশিরে যেন ইন্দ্রধনু ফিরে ফিরে আসে;
মনে হয় বুঝি
এই তো পেয়েছি যাহা জীবনের মাঝে নিত্য খুঁজি
রূপ রস আনন্দের সুমহান সহজ প্রকাশ!
তবু অবিশ্বাস
হৃদয়ের উৎস হতে সতর্ক করিছে বার বার—
জালিকের চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ নর-মক্ষিকার
বিশুষ্ক কঙ্কালরাশি ইন্দ্রধনু-বর্ণের বিন্যাসে
অমোঘ সত্যের মত হাসিছে নিষ্ঠুর পরিহাসে।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

১৩৫১ আসিয়াছে। ১৩৫০কে চৈত্র সংখ্যায় বিদায় দিয়াছিলাম; সে বিদায় গ্রহণ করিল কি না, আজও তাহা জিজ্ঞাসা করিবার মত সাহস পাইতেছি না। ব্যক্তিগতভাবে একটি বৎসরের পরমায়ু আমাদের সকলেরই শেষ হইয়াছে। কিন্তু যে সময়ে চোখের সম্মুখেই লক্ষ লক্ষ লোকের পরমায়ু চিরকালের মত শেষ হইতে দেখিয়াছি, সে সময়ে এক বৎসরের পরমায়ু খোয়াইয়াই যদি নিষ্কৃতি পাইয়া থাকি, তাহা হইলে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবিতে হয় বইকি। বাঁচিয়া থাকা, 'mere living', সে যে কত বড় আনন্দের কথা তাহা কবিরা বলিয়াছেন। সে যে কত পুণ্যের ফল, কত কৌশলের কৃতিত্ব, তাহা ১৩৫০এর বাংলা দেশে না জন্মিলে কে বুঝিতে পারিত? সেই বহু সাধনায় আয়ত্ত কৌশলের কথা আজ প্রকাশ করিবার প্রয়োজনও নাই। যাহারা আমাদের সঙ্গে গত বর্ষকাল এমনই করিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িতে পড়িতে উঠিয়া ছুটিয়াছেন, তাঁহারাও সকলেই এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন—পরস্পরে হাত মিলাইয়া আমরাও সকলেই দোকানীর সম্মুখে চাউলের জন্য হাত পাতিয়াছি, তেলের জন্য প্রার্থী হইয়াছি, চিনির জন্য ঝি ও বস্তির বন্ধুদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি, কয়লার জন্য রণনীতির সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করিয়াছি, স্ট্যাণ্ডার্ড বস্ত্রের দর্শনাশা ত্যাগ করিয়া বারে বারে মেয়াদ-বাড়ানো 'ভদ্র' আচ্ছাদনই কিনিয়াছি, আর ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়মান সাদা কাগজের পিছনে ধাবিত হইয়াছি। এক সঙ্গেই আমরা হাত মিলাইয়া এই দিকে হাত বাড়াইয়াছি, হাতাহাতি করিয়াছি, যে যাহাকে পারিয়াছি পাশে ঠেলিয়া ফেলিয়াছি, যে যেমন করিয়া পারি অন্যের আগে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছি, যে যাহাকে পারি মারিয়াছি, বুদ্ধির কৌশলে, কাগজীয় মুদ্রার বলে, পদস্থ বন্ধু-বান্ধবের পরিচয়ে আপনাকে আগে বাঁচাইয়াছি, এবং এই সনাতন পথেই পিতৃনাম রক্ষার সনাতন কর্তব্য পালন করিয়াছি। ভাগ্যবান আমরা ১৩৫০এর বাঙালী, যাহারা ১৩৫১-এর মুখ দেখিতে পাইলাম।

"হয়তো সকলে মিলিয়া এইরূপে সর্বাগ্রে বাঁচিবার চেষ্টা না করিলে বাঁচা এতটা দুঃসাধ্য কর্ম হইয়া উঠিত না, মরাও, যাহারা মরিল তাহাদের পক্ষে, এমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িত না। কিন্তু এই সদুপদেশ ও মহাজন-সুলভ সত্য উচ্চারণ করিয়া কি লাভ—'এ আমার, এ তোমার পাপ'? সহজ এবং বাস্তব সত্য সম্মুখে দেখিতেছিলাম—মৃত্যু আমার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সহজ জৈব প্রেরণাতেই বাঁচিতে চাহিয়াছি—যেমন করিয়া হউক, বাঁচিয়াছি। মৃত্যুর ছায়া তোমার চোখের তারায় ঘনাইয়া উঠিল কি না, পথের পাশের গ্রাম-গৃহহীন ভূমি, বা অর্ধভুক্তা ও অভুক্তা তুমি প্রতিবেশীর গৃহিণী ও পরিবার,—তাহা দেখিবার মত আমার অবকাশ কোথায়? প্রাণ-বিজ্ঞানের পবিত্র ইঙ্গিতই আমি মান্য করিয়াছি, প্রাণ বাঁচাইতে চাহিয়াছি; সামাজিক চেতনার সমস্ত তাগিদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি—ভুলিয়াছি, প্রাণ বাঁচাইবারই দায়েই আমরা সমাজবদ্ধ হইয়াছি। যে সামাজিক বোধ আমরা বহু বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়া তিলে তিলে আয়ত্ত করিয়াছি এই মন্বন্তরে তাহা ভুলিয়াছি, ভুলিয়াছি প্রতিবেশীর জন্য প্রতিবেশীর সহজ সহমর্মিতা, ভুলিয়াছি আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়ের রক্তের বন্ধন, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর বহুদিনের সৌহার্দ্য—হয়তো অনেকেই ভুলিয়াছি স্ত্রীপুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নীকেও; হয়তো আরও অনেকে ভুলিতাম এই সব স্নেহ-প্রেম-মমতার ডোর—যদি দুর্বিপাকে তেমনই করিয়া জড়াইয়া পড়িতাম।

• • •

অথচ বিস্ময়ের তবু অবধি খুঁজিয়া পাই না—ভুলিলাম কি করিয়া? আমাদের জাতি স্বভাবত অতিথিপরায়ণ, আমরা স্বভাবত সংবেদনশীল, স্বভাবত আমরা ভাবপ্রবণ। ইহাই আমরা জানিতাম; সে জানা একেবারে মিথ্যা, আজও তাহা ভাবিতে পারি না। তাহা হইলে এমন স্বাভাবিকভাবেই এই 'স্বভাবকে' খোয়াইলাম কি করিয়া? ইউরোপের কথাও বুঝিতে পারি। সেখানে মানুষে মানুষে সম্পর্ক বড় কাটা-ছাঁটা; আদান-প্রদান হিসাব করা, বাকি-বকেয়ার কারবার তাহাদের নাই—সেখানে পণ্যোপজীবী বিপুল সমাজ মানুষকে 'পণ্যের' খতিয়ান বুঝিয়া চলিতে শিখায়, সামাজিক সম্পর্ক সেই দান-প্রতিদানের চুল-চেরা হিসাবেই

চলিতে বাধা হয়, আর মন্দার বাজারে তাহাতেও মন্দা নামে। এই ইউরোপকে বুঝি। কিন্তু আমরা এ দেশের মানুষ, আমাদের ঢিলা-ঢালা জীবনযাত্রা,—বাণিজ্য আমাদের সর্বস্ব হইয়া উঠে নাই, একান্নবর্তী পরিবারের স্মৃতি একেবারে লোপ পায় নাই, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী মরিলে এখনও বাস্তুত অশৌচ পালন করি, এখনও এই কলিকাতা শহরেও প্রতিবেশীর গৃহিণী আমার গৃহিণীকে দিদি বলিয়া ডাকেন, সে গৃহের পুত্র কন্যারা মাসীমা বলিয়া আমার গৃহে কারণে ও অকারণে উপস্থিত হয়, আমিও জগৎতারণবাবুর সহিত মোহনবাগানের খেলা ও তপসেমাছের মূল্য বিষয়ে গবেষণা করি। গ্রামে এখনও আমাদের হরু শেখ ও মদন মাঝি দাদা ও ভাই, মহেশ দোকানী এখনও হরুর চাচা, আর গঞ্জের হাটে এখনও আমাদের আড়তদার ব্যাপারী ছিলেন জ্যাঠা আর খুড়া—ওদিকে জমিদার-গৃহে কর্তামা, গিন্নীমা, সকলেই আছেন তো—জীবনযাত্রায় আমরা সেই মধ্যযুগের সরলতর দিনকেই টানিয়া টানিয়া চলিতেছি। এই একটি বৎসরের মধ্যে সেই মধ্যযুগীয় জীবন-মূল্যও বদলায় নাই,—তেমনই আফিস আদালত, বাজার হাট, ক্ষেতের ধান, গঞ্জের দোকান, সবই রহিয়াছে,—তবু কি করিয়া আমাদের সেই সহজ স্বাভাবিক ঢিলা-ঢালা স্নেহ-প্রেম-আত্মীয়-বান্ধবতা-মাখা সেই বাঙালী জীবন-যাত্রা এমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িল? এমন করিয়া আপনাকে বাঁচাইবার খুন আমাদের চাপিয়া বসিল? জেলেরা, মাঝিরা, চাষীরা গ্রামে মরিল, বাবুরা হাত বাড়াইয়া দিতে পারিলেন না; চাষীরা গ্রাম ছাড়িয়া মরিতে চলিল; জোতদারেরা কৃষাণের কথাও ভাবিল না; বাজারের উপর পরিচিত মৃতদেহ পড়িয়া রহিল, আড়তদারের মজুত চাউল বাহির হইল না; চোখের সম্মুখে নিরন্ন নিঃসম্বল নারী আপনার দেহ বিক্রয় করিতে লাগিল, ধর্মপ্রাণ মহাজন ও ব্যবসায়ীর বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হইল না; লক্ষ লক্ষ ক্ষীণায়ু-প্রাণ মহামারীর মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে বলি গেল, প্রাণদায়ী কুইনাইন ও ঔষধপত্র—সরকারের হাত খুলিলেও পীড়িতের মুখে পৌঁছিল না; ফৌজের কণ্ট্রাক্টের টাকার স্রোতে বাংলা দেশের জীবন ডুবিয়া গেল, তবু মন্বন্তরের বাংলায় নরনারীর জন্ত বাঙালীর নূতন-পুরাতন ধনীর স্বর্ণথলি উন্মুক্ত হইল না?

হয়তো ইহার উত্তরও আছে। আমাদের ঢিলা-ঢালা সমাজ-সম্পর্কেরও তলায় তলায় বহু বৈষম্যের স্তর রহিয়াছিল। আজ এক সংকটের দিনে তাহার স্বার্থান্ধ নগ্ন রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। দেখিলাম, এই পুরাতনীর মূল রূপ—সেখানে দয়া নাই, মায়া নাই, মমতা নাই, বন্ধুত্ব নাই। ইউরোপের পচ-ধরা ধনতন্ত্রকে দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, স্বার্থের নগ্ন রূপ সেখানে কত ভয়ঙ্কর; আমাদের জরা-জর্জর সমাজের এই শেষ পর্যায়ে দেখিলাম, স্বার্থের এই নগ্ন রূপ কত বেশি বীভৎস! ইহাও বুঝিলাম, ইউরোপের সেই ধনিক-বুদ্ধি তবু আপন স্বার্থেই,—আপন বৈষম্যময় ব্যবস্থার দায়েই, তাহার স্বার্থের সীমানা টানিয়া তাহার জন-সমষ্টিকে জীয়াইয়া রাখিতে চায়। সেখানেই তাই দ্রব্যের মূল্য টাকায় এক সিকির বেশি বাড়ে না; চোরা-বাজারের অস্তিত্ব প্রায় অসম্ভ হয়। কিন্তু এখানকার আমাদের দায়িত্ব-বঞ্চিত, অধিকার-বঞ্চিত ধনীর পক্ষে আপনার মুনাফার সেই সীমা টানিবার প্রয়োজনও নাই। জন-সমষ্টিকে জীয়াইয়া রাখিবার অধিকার তাহার নাই, সে দায়িত্বই বা সে স্বীকার করিবে কেন? প্রজাপালকের নির্ভুল বিধানে বাজারের দ্রব্যমূল্য যখন এক টাকার স্থলে তিন টাকা হইয়া উঠিল, ছোট বড় বিভিন্ন সরকারই যখন কোমর বাঁধিয়া মুনাফার মৃগয়ায় নামিয়া পড়িল, স্বয়ং বাংলা সরকারও যখন এক হাত ইহারই মধ্যে খেলিয়া লইলেন,—চোরা-বাজারই যখন সদর-বাজার হইয়া উঠিল,—তখন এ রাজত্বের জগৎশেঠ ও খাস পোদ্দারের দল, আমাদের কাশেম ভাই ও কেশব ভাইয়ের, আর রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক কোন বাধাই রহিল না, মুনাফার মৃগয়া এক মৃত্যুর মৃগয়া হইয়া উঠিল।

বুঝিলাম অনেক কথাই, কিন্তু তবু নিজেকে বুঝাইতে পারি না— অবাঙালীর প্রাণ যদিই বা কাঁদিয়া উঠিল, তবু বাংলার সাহায্য-সমিতিতে এবার কেনই বা এমন দক্ষতার, কর্তব্যনিষ্ঠার, এমন কৃতজ্ঞতাহীনতার শোচনীয় অভাব ঘটিল? কেন এমন মন্বন্তরের মুখেও আমরা, কি মন্বন্তরের বিশ্লেষণে, কি তাহার প্রতিকার নির্দেশে, কি আর্তত্রাণে এক হইতে পারিলাম না?

১৩৫১এর সম্মুখে দাঁড়াইতে তাই আজ ভরসা পাই না, তাই ভাবিতে সাহস পাই না ১৩৫০ বিদায় লইয়াছে কি না! অনেক সহিয়াছি, কিন্তু শিখিয়াছি কতটুকু? শিখিয়াছি শুধু আপনার প্রাণ বাঁচাইবার দায়ে হাতাহাতি করিতে; কিন্তু হাত মিলাইতে শিখি নাই তো। অথচ এই ৫১র দুয়ারে দাঁড়াইয়া বুঝিতেছি, দুর্দিন তো শেষ হয় নাই। কলিকাতায় আমরা বরাদ্দমত চাউল পাই,—ভাল পাই, খারাপ পাই, পাই; পাইব—এইটাই আমাদের দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের পক্ষে আশার কথা। সে খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর না হওয়া চাই, আর চাই শ্রমিকের পক্ষেও অন্তত যথেষ্ট পরিমাণ হওয়া। বরাদ্দমত আজ আমরা তবু কলিকাতায় চাউল পাই, চিনি পাই, আটা পাই, রুটিও পাই, লবণও এখন পাই; পাই না কয়লা, পাই না কাগজ। কিন্তু গ্রামে আমাদের স্বজনেরা জমি-জমা বেচিয়া ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়া পঞ্চাশের পার পাইয়াছিলেন, আজ এই ষোল টাকা কণ্ট্রোল-দরে তাঁহাদের চাউল কিনিবার মত সামর্থ্য কই? অথচ সর্বত্র তো চাউলের দর কুড়ির নীচেও নামে নাই। বুঝিতেছি, বেচিবার মত কিছু থাকিলে তাঁহারা বাঁচিবেন। কিন্তু দেহ ছাড়া আর কি সম্বল কাহার আছে, তাহা জানি না। অথচ, ডাল, তেল, কেরোসিন, কাপড়, কয়লা, সর্বশেষে আজ লবণ পর্যন্ত সব কিছুই চাউলের সহিত পাল্লা দিয়া ঊর্ধ্বে চড়িতেছে, চোরা-বাজারের শোভাবর্ধন করিতেছে। আর আমেরি সাহেবের কথায় জানিতেছি, নিয়ন্ত্রিত মূল্য চালাইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য এখনও কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ করে নাই। অথচ সংবাদপত্রের নিস্তব্ধতাকে ধন্যবাদ দিয়া হাটে গঞ্জে ও বাজারে গাড়ি আর নৌকা বোঝাই ধান চাউল আবার গত বৎসরের পথেই যাত্রা শেষ করিতেছে। এক দিকে জোতদার মজুতদারের হাতে কৃষকের জমি আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহাদেরই গোলায় ও ঘরে কৃষকের ধান জমিয়া বসিয়া আছে, আর দিকে ছোট-বড় ব্যাপারী-ব্যবসায়ী মুনাফার নেশায় হাটে-বাজারে ধান-চাউল কিনিয়া ফিরিয়াছে, মজুত করিতেছে; আর ইহারই মধ্যখানে জানিতেছি আজ কৃষকের জমি নাই, হালের বলদ নাই, আউশ ধানের বীজ নাই, মজুর খাটিবার লোক নাই; তাঁতীদের তাঁত বন্ধ, জেলেরা যাহারা বাঁচিয়া আছে বসিয়া আছে, ছোট দোকানী গত বারই

নিঃশেষ হইয়াছে ; আছে বসন্ত, আছে কলেরা, আছে শোথ, আছে মহামারী।"

* * *

বড়লাট আসিয়াছিলেন, একটা বড় রকমের আয়োজনও করিয়াছিলেন—জঙ্গী অভিজ্ঞতার বলে তিনি জঙ্গী বিভাগের সহায়তায় বাংলাকে মন্বন্তরের ও মহামারীর হাত হইতে রক্ষা করিবেন। কিন্তু আশা ও আশ্বাস এখনও আমরা ফিরিয়া পাই নাই, দিল্লী ও লণ্ডন তাহা আমাদের শুনাইয়া দিয়াছে। আর ইহারই মধ্যে সেই ক্ষীণ আশাকে আকুলিত করিয়া আমাদের দ্বারে যে নূতন বিপদ সমুদিত হইল, তাহাতে স্বভাবতই স্মরণপথে উদিত হইল এই কথাটি—লর্ড ওয়াভেল তো বাংলাকে বাঁচাইতে এ দেশে আসেন নাই, তিনি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ভাবী অভিযানের সামরিক আয়োজনই সুসম্পূর্ণ করিতে এ দেশে আমাদের শাসনভার লইয়াছেন। অতএব সামরিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি প্রধানত আজ আবার সামরিক ক্ষেত্রেই পড়িবে, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার ও ভারত সরকারের সমস্ত শক্তিও নিয়োজিত হইবে। রেল যানবাহন আর খাদ্য ও ঔষধ কতটা যোগাইবে, কতটা আমাদের সম্মুখে আবার সামরিক ভ্যান 'ফুড ফর পিপ্‌ল' এই আশ্বাস-বাণী বহন করিয়া ফিরিবে, তাহা জানি না। মোট কথা, যে সামরিক পদ্ধতিতে মন্বন্তর ও মহামারীর প্রতিকার-চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহা কতটা সার্থক হইত জানি না, 'পিপ্‌লকে' প্রাধান্য না দিয়া 'পিপ্‌লের' ফুড বণ্টন করা যায়, তাহাও বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু আসাম-সীমান্ত জুড়িয়া যে জাপানী আক্রমণ আজ অগ্রসর হইতেছে তাহাতে স্বভাবতই মনে হইতেছে, ব্রিটিশ ও আমেরিকান সামরিক প্রয়াস আজ সেখানেই কেন্দ্রীভূত না হইয়া পারে না, আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে "একপেট খাইতে পারিব"—এই যে আশা ও আশ্বাস আমাদের ১৩৫০এ আমেরি-ওয়াভেল ব্যবস্থায় ও নীতিতে জন্মিতে পারিল না, তাহা এই ১৩৫১ সালে জন্মিতে পারিবে তো?

* * *

সামরিক হিসাব জানি না। যুদ্ধের খবর লইয়া তর্ক করিতে পারি, কিন্তু বাঙালীসন্তান-হিসাবে যুদ্ধকে নিষিদ্ধ বস্তু বলিয়াই গণ্য করি।

সে দিকে তাই আশা-নিরাশায় দোলা খাইবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। কলিকাতার বুকের উপর দিয়া সামরিক সামগ্রীর বর্ষাধিক-কালব্যাপী যেরূপ বিজয়যাত্রা দেখিয়াছি, তাহাতে এ বিষয়ে একটা অন্ধ-বিশ্বাসই আছে; ইম্ফাল, কোহিমা, ডিমাপুর লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার কারণ দেখি না। পৃথিবীব্যাপী চার বৎসরের যুদ্ধেও দেখিতেছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অতি সামান্যই লোকক্ষয় হইয়াছে—১ লক্ষ ৫৮ হাজার মরিয়াছে; মোট হতাহত ও বন্দী ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার, ইহারও মধ্যে ভারতবাসীই আবার ১ লক্ষ ৯ হাজার ৮ শত। এ দিকে আমেরির হিসাবেই এক বাংলা দেশে গত এক বৎসরে আমরা মৃত্যুসংখ্যায় চার বৎসরের যুদ্ধকে একেবারে ম্লান করিয়া দিয়াছি—বরাবরের মরারও উপরে আমরা এবার মরিয়াছিই ৬ লক্ষ ২৯ হাজার বেশি;—বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবে ৩৫ লক্ষ, সাধারণের চাক্ষুষ অনুমানে ৫০ লক্ষ। মোট কথা, যুদ্ধে রুশ বা জার্মানদের লোকক্ষয় যাহা হইবার হউক, ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ বাঁচিবার কৌশল জানে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকক্ষয় সামান্য, আর তাহার অন্য সামরিক উপকরণও এখন অতুলনীয়। অতএব, সরল কথা আমরা বুঝিতেছি—অপরিমেয় ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি (সোভিয়েটকে ছাড়াই) একদিন জাপানকে পরাজিত করিতে পারিবে। জোয়ার-ভাটা মাঝখানে আসিবে,—ক্যাসিনো-অ্যানজিও চুকিয়া যাইবে, 'দ্বিতীয় রণাঙ্গন' দেখা দিবে, তারপর ইউরোপের যুদ্ধ-আয়োজন হইতে মুক্ত হইয়া একবার ইঙ্গো-মার্কিন শক্তির এই এশিয়ার দিকে ফিরিতে মাত্র দেরি। বিশ্বাসের অভাব নাই; এই দেরিতেও আমাদের আপত্তি ছিল না,—দেরি দেখিলে আমরা সোভিয়েটের মত ও কম্যুনিস্ট বন্ধুদের মত হৈ-চৈ জুড়িয়া দিই না—'দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোল,' 'দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোল'। এ দেশেও আমরা বলিতাম না—'বর্মা অভিযান চাই,' 'বর্মা অভিযান চাই'। কারণ এত কাল ব্রিটিশ নিয়ম-নীতি দেখিয়া আমরা বিস্মৃত হই নাই যে, তাঁহাদের নড়িতে-চড়িতে একটু দেরি হয়, কিন্তু 'যথাসময়ে' তাঁহারা সব করেন। তাই লৌকিক হিসাবে 'বর্মা অভিযানে' দেরি দেখিলেও আমরা কিছু মনে করিতাম না। কিন্তু অভিযানটা যখন 'বর্মাভিযান' না হইয়া উল্টা 'বঙ্গাভিযান' হইবার উপক্রম

করিতেছে, তখনই আমাদেরও পক্ষে একটু হিসাব করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। জানি, ইঙ্গ-মার্কিন সমরায়োজন প্রচুর, কলিকাতার পথ ও পথিকও তাহার সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু যুদ্ধ যখন ভারতভূমির দ্বার উত্তীর্ণ হইয়াছে, আমাদের দেশ যখন সমরক্ষেত্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি, শুধু আমাদের আকাশেই যখন আর মৃত্যুর গর্জন সীমাবদ্ধ থাকিবে না, মনে হয়,—আমাদের শ্যামল ক্ষেত্র দগ্ধ হইবে, আমাদের জীর্ণ কুটীর চূর্ণ হইবে, আমাদের ভগ্ন জীবনযাত্রার উপরে নামিয়া পড়িবে উৎকট বিশৃঙ্খলা, যুধ্যমান বাহিনীর গতায়তের পথে আমরা খড়ের মত, কুটার মত দলিত বিদলিত হইয়া যাইব, আমাদের জিলায় জিলায় যাতায়াতের বাধা ঘটিবে, আত্মীয়ে-আত্মীয়ে বিচ্ছেদ ঘটিবে, আধুনিক যুদ্ধের সমস্ত বিভীষিকা আমাদের ভাগ্যে জুটিবে—তখন সন্দেহ জাগে, এই মন্বন্তরে নিষ্পিষ্ট, মহামারীতে নিঃশেষিত বাঙালী নরনারীর জন্য এই ভাগ্যলিপি লইয়াই কি আসিয়াছে ১৩৫১ সাল?

মনিব বদলাইবার সম্ভাবনাও নাই, সাধও নাই। বয়স হইলে এই তত্ত্বও সহজবোধ্য হয়। যাঁহার সঙ্গে বরাবর ঘর করিয়াছি, আজিও যখন রোগশয্যায় সেই পুরাতন গৃহিণী তাঁহার নিজহস্তে কমলালেবুর শরবতটুকু তৈয়ারি করিয়া আনেন, তখন কলাকার তাঁহার ঝাঁটা-হস্তিনী মূর্তিও উহারই মধ্যে খাপ খাইয়া যায়; অন্তত নূতন কোনও পঞ্চদশীর আধুনিকী ঝাঁটার জন্য মনে মনে নিজেকে একবারও প্রস্তুত করিতে পারি না। অতএব, মনিব বদলাইবার সাধও নাই। কিন্তু বাঁচিবার সাধ আমাদেরও আছে। এত করিয়াও সেই বাঁচার সম্ভাবনাই এখনও যখন সুস্থির হইল না, তখন অত্যন্ত সরল চিত্তেই একবার বলিতে চাহি—সামরিক উপায়ে যতটুকু মন্বন্তর ও মহামারী দূর করিবার তাহা তো হইয়াছে, এবার বাকি যাহা আছে, সেইটুকু আমাদের জাতীয় নেতা, আমাদের জাতীয় কর্মীদের উপর ছাড়িয়া দাও না কেন? তাঁহাদের সাহচর্য পাইলে আজ ১৩৫১র যে ভয়ঙ্করতর বিভীষিকা আমাদের সম্মুখে দেখিতেছি—দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধজ্বালা যেভাবে আমাদের সম্মুখে

. আর্যর বিশ্বাস হয় না বিদিশা জোলো। বিশ্বাস হয় না, আকালী। বিশ্বাস হয় না, অবন্তী-দি জামিন রেখে যান নি।

কিন্তু নেতিয়ে-পড়া বাসব-দা'কে চেতাইয়া তুলিতে হইলে হেকিমি দাওয়াইয়ের প্রয়োজন। হাকিম অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন। এই হেকিমি দাওয়াইয়ের সাঙ্কেতিক প্রয়োগই গল্পের মুখ্য বক্তব্য। সঙ্কেতেই বলিতেছি—

দেখেছে অনেক চোখ। কুট ও বধির। অনেক হাসি। তিক্ত ও তির্যক। এবার দেখে চুল। গহন ও বিক্ষুব্ধ। বিদ্যুৎ। বজ্রঘাত। এবার দেখে অরণ্য। নির্জন, নিষ্প্রবেশ। এত চুল থাকতে পারে, পিঠ ছেয়ে কোমর ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে প্রায় পায়ের গোছার উপর এ না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। বিপুল বিপর্যাস। এত যার চুল সে নিশ্চয়ই নিয়ে আসতে পারবে ঝড়। অন্ধ অন্ধকার। নিশ্চয়ই জাগাতে পারবে বাসব-দাকে।...

'পারবো ঘুমিয়ে দিতে।' হঠাৎ হাত আলগা করে চুলের ভারটা বিদিশা ছেড়ে দেয়। কাঁধ বেয়ে পিঠ ভরে পাছা ঢেকে ভেঙে পড়ে। শব্দ হয় অরণ্যের চাপা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো।...

'কী করছ?'

'ঘর ঝাঁট দিয়ে বিছানা করে চুল বাঁধছি।' বিদিশার চুল আজ বুকের উপর স্তূপ-করা।...

আর্য দু'হাত দিয়ে মুঠ-মুঠ ক'রে ধরে বিদিশার চুল। পুঞ্জীকৃত ঝড়। বিদ্যুৎ-বিদারিত।...

বিদিশা'র দিকে তাকাতে লজ্জা করে। ভয় করে। বিদিশা কাঁচি দিয়ে তার চুলগুলি সব ছেঁটে ফেলেছে।

চৌলিক দাওয়াইয়ে ফল ফলে নাই। বাসব-দা চলিয়া গিয়াছেন। জেলে। 'ইতি গল্পশেষঃ। হেকিমি ব্যর্থ হইয়াছে, সুতরাং হাকিমের জেরা নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটি মাত্র জিজ্ঞাস্য আছে, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রচারকার্যের জন্য কত টাকা উপরি পান?

—

আজ বর্ষশেষ-দিনে সংবাদপত্রে বাংলা সরকারের একটি বিজ্ঞাপনে অবগত হইলাম যে, মাংসের দোকানে অথবা হোটেলে সোমবার ও বৃহস্পতিবার মাংস পাওয়া যাইবে না। অনেক প্রকারের মাংস সংক্রান্ত

প্রবীণ, ইডিয়ম, গালাগালি ও কটূক্তি আমাদের সাহিত্যে ও মজলিসে প্রযুক্ত হয়। উক্ত দুই দিনে সেই সকলের ব্যবহার আইনসঙ্গত হইবে তো?

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষা-দানরীতি প্রবর্তিত হইবার পর যেমন আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তেমনই ক্রমশ বাংলা-প্রশ্নপত্র রচয়িতাদের এক একটি প্রশ্নে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছি। দেখিলাম, এবারকার ম্যাট্রিকুলেশন প্রশ্নপত্রে 'ঋ'র উচ্চারণস্থান নির্দেশ করিবার ভার নিরীহ ছাত্রদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু স্থানের খবর রাখিলেও আমাদের পক্ষে 'ঋ'এর উচ্চারণস্থানটি বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পন্থা অনুসরণ করিয়াও আজ পর্যন্ত স্বরবর্ণের আদি অক্ষরের উচ্চারণস্থানটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। কিন্তু প্রশ্নকর্তা যে আমাদের অপেক্ষা উচ্চমার্গে উঠিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

*   *   *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তবু পদে আছেন, কিন্তু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় যুদ্ধক্ষেত্রের 'রেঞ্জ' হইতে দূরে থাকায় সম্পূর্ণ অকুতোভয়ে বিহারে বসিয়া বাংলা ভাষাকে আক্রমণ শুরু করিয়া দিয়াছেন। এবারকার আই. এ. ও আই. এস-সি. ইংরেজী পরীক্ষাপত্রে ইংরেজীতে অনুবাদ করিবার জন্য যে বাংলাটি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার স্বরূপ নিয়ে প্রদর্শিত হইল। পাঠকবর্গ ক্রস-ওয়ার্ড পাজলে খুব দক্ষ হইয়ে ইহার মর্মার্থ বাহির করিতে পারিবেন।—

মনুষ্যগণ অভিপ্রেত কিছু করিবার জন্ত। একজন লোককে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা এবং তাহাকে কিছু করিতে না দেওয়া, সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর যে সকল শাস্তি তাহাকে দিতে পারি, তাহার মধ্যে অন্যতম। যদি একজন মানুষের এত টাকা থাকে যে তাহার কাজ করিবার প্রয়োজন না হয়, তাহার নিজের জন্ত কাজের উদ্ভাবন করিতে হইবে। বন্যজন্তুর সহিত যুদ্ধ বা খাদ্যের জন্ত মৃগয়া করিবার তাহার দরকার নাই, কিন্তু তামাসার জন্ত সে খেঁকশিয়াল বা হরিণ শিকার করে। যদ্যপি সে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়, সে জানে যে এইসব কার্যকলাপ তাহাকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সন্তুষ্ট করিতে পারিবে

না। কোনো লোক কিছু না করিয়া বা স্বচিত্তবিনোদন করিয়া সুখী হইতে পারে না।

এই অদ্ভুত বাংলাটি আসলে প্রশ্নকর্তা মহাশয় নিজে করিয়াছেন। ইহার উর্বর মস্তিষ্কের পূর্ণ পরিচয় নিম্নলিখিত ইংরেজী ছত্রটি পাঠ করিলেই পাঠকবর্গ অনুধাবন করিতে পারিবেন। জে. সি. হিলের *Introduction to Citizenship* পুস্তকের ৪৩ পৃষ্ঠায় আছে—

Human beings are designed to do things. To lock a man up and let him do nothing is one of the most cruel punishments we can give him. If a man has so much money that he does not need to work, he has to invent work for himself···He does not need to fight wild animals or hunt for food, but he hunts foxes or deer for the fun of it. If, however, he is an intelligent man, he knows that these activities cannot satisfy him for long.···No man can be happy either doing nothing or working for his own amusement.

"কোন লোক কিছু না করিয়া বা স্বচিত্তবিনোদন করিয়া সুখী হইতে পারে না" সত্য কথা। সেই কারণে ছাত্রদের উপর যাহা খুশি করিয়া বোধ হয় প্রশ্নকর্তার সুখ ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে। প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় শেষের দিকে এই ধরনের পণ্ডিতদের বাহুল্যবশতই বোধ হয় ধ্বংস হইয়াছিল।

—

জনৈক আধুনিক কবি অতি স্পষ্টভাবে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। কবি চটিয়া প্রথমে লিখিয়াছেন—

আর কতকাল বুর্জোয়া-খেলায়
চংক্রমণ রথচক্রে পিষ্ট হবে চক্রবাক্ ধূসর ধূলায়?

তাহার পর তিনি নিজের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া বলিতেছেন—

আধুনিক কবি আমি
আমার প্রথম প্রিয়া
চলে গেছে দূরে—বহু দূরে—
পতি পরম গুরুর পাশে।
তবু আঁকো তার
অলক-সৌরভ দিয়ে
রক্তমাখা মিষ্ট ওষ্ঠপুট
দিয়ে যায় চুম্
আমার মরমে এসে

জনশূন্য পাহাড়িয়া স্রোতস্বিনীকূলে।
ঘুমহারা কাঁপে জলে।

পরস্ত্রী সম্বন্ধে কবিরা নাম না করিয়া এরূপ উক্তি করিতে পারেন অবশ্য; কিন্তু তাহার পর কবির অবস্থা শুনুন—

মাঝে মাঝে শুয়ে পড়ি
রিক্ত বক্ষে মাথা রেখে অলস তন্দ্রায়।

পাঠক, এইভাবে একবার শুইবার চেষ্টা করিয়া দেখুন তো, কায়দা করিতে পারেন কি না? যদি বলেন যে, প্রেয়সী কথাটা উহ্য আছে, এটুকু বুঝিতেছ না? বুঝিতে পারিতাম যদি না তৎক্ষণাৎ—

কি প্রলাপে সর্ব্ব অঙ্গ ওঠে কেঁপে
শুনে তার হৃদয়ের গুঞ্জন

শুনিতাম। 'রিক্ত বক্ষে'র সহিত শেষোক্ত দুইটির যোগ না থাকাতেই গোলমাল হইয়া গেল।

—

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্" উচ্চারণ করিয়া একদিন বৈদিক যুগে মহীয়সী মৈত্রেয়ী সকলের হৃদয় মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, আজ বহুদিন পরে কবি নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি. এল. বাণীকণ্ঠ সেই ভাবধারায় আমাদেরও অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছেন। কবি ওই নামের অন্তরালে খুব ভাল কথা বলিয়াছেন—

কিছু টাকাকড়ি, কিছু নাম যশে
কি হবে আমার
অমৃতেরে লাভ হবে না যাহাতে
বৃথা সে,—অসার!

সত্য কথা। কিছু টাকাকড়িতে এ যুগে কিছু করা মুশকিল। যদি দাও তো ভাল করিয়াই দাও—অন্তত একটা বড় মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট!

—

নব বৈশাখের 'ভারতবর্ষে'র প্রথম প্রবন্ধের উপর সবে দৃষ্টি পড়িল— "প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক অবস্থা"। গোল ঠেকিবার কারণ নাই। কারণ লেখক ডক্টর "শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পি-এচ্-ডি, ডি-লিট্"। অতএব, সম্পাদকের দায়িত্বও ওই সঙ্গেই ফুরাইয়াছে।

১৩৫০ বঙ্গাব্দের ভয়াবহ মন্বন্তরের সর্ব্বশেষ দুঃসংবাদ সাহিত্য-জগতে আমাদের অগ্রজ, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক, অমায়িক নির্বিরোধ স্বল্পবাক্ জ্ঞানপ্রবীণ বন্ধু প্রফুল্লকুমার সরকারের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু। মধ্যবিত্ত সমাজে এরূপ মুহুর্মুহু মৃত্যুর জন্ম আমরা প্রস্তুত হইয়া আছি—সুতরাং ইহা অপ্রত্যাশিতও নয়। আমরা যখন শিশু, "ডন-সোসাইটি"র অন্যতম সদস্য হিসাবে প্রফুল্লকুমার তখন এই হতভাগ্য দেশের মুক্তি, এবং দুর্ভাগ্য সমাজের উন্নতির জন্ম নিরলস সাধনা করিয়াছিলেন; আমাদের শৈশবেই রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন-নবপর্য্যায়ে' তাঁহার ধারাবাহিক সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসও আমাদের অজ্ঞাত নয়। সেই সুদূর অতীত হইতে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত নানাভাবে তিনি বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, কখনও গৌরাঙ্গ-ভক্ত, কখনও এই ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতি ও সমাজের কল্যাণকামী সংস্কারক, কখনও ঔপন্যাসিক, কখনও শিক্ষক এবং কখনও সাংবাদিক হিসাবে লেখনীবৃত্তিই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। কিন্তু নানা কারণে, তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় সাধারণের অজ্ঞাত থাকাতে তাঁহার শেষ সাংবাদিক পরিচয়টিই দেশের কাছে তাঁহার সর্বশেষ পরিচয় হইয়া রহিল। তাঁহার বিয়োগে আমরা একজন স্বভাবত-ভদ্র সহিষ্ণু সুহৃদকে হারাইলাম। বর্ষশেষে আমাদের বিষণ্ণচিত্তে তিনি এই ভাবনাই জাগ্রত রাখিয়া গেলেন যে, শুভ নববর্ষারম্ভে এই দুঃখের আনন্দবাজার আমরা কাহাদের লইয়া জমাইব? নচিকেতা যমগৃহ হইতে কি এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর আনিতে পারিয়াছে? পারে নাই। তাই আমরামূঢ় ভয়ে নির্বাক্ শোচনা করিতেছি। গীতায়—

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ

[সর্বপ্রাণীর অন্তর্নিহিত জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, সেইহেতু তাহারা সুখদুঃখ পাপপুণ্য ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া মোহে পতিত হয়]

ইত্যাদি চিরন্তন সত্য উক্তিতেই বা আমাদের মত তামসবুদ্ধির সান্ত্বনা কোথায়?

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

"Each nation like each individual, has one theme in this life, which is its centre, the principal note round which every other note comes to form the harmony....If any one nation attempts to throw off its national vitality, the direction which has become its own through the transmission of centuries, that nation dies.... Every man has to make his own choice ; so has every nation. We made our choice ages ago...and it is the faith in an Immortal Soul.···I challenge anyone to give it up.···How can you change your nature ?"

"Never forget the glory of human nature ! We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which *I am*."—Vivekananda

উপরে যে কথা কয়টি উদ্ধৃত করিলাম—বাংলার নবযুগের, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় অবসানকালে, একজন বাঙালীর মুখেই তাহা উচ্চারিত হইয়াছিল। এই বাণীর পশ্চাতে যে জ্ঞান-শক্তি ও পৌরুষের ঐকান্তিক প্রেরণা ছিল—যুগনায়ক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'অনুশীলন'-ধর্ম্মে মানবত্বের এই উপাদানকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করিলেও, তাহার এমন একাধিপত্য মনুষ্যসাধারণের জীবনে সম্ভব বা সুফলপ্রসূ বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু রহস্য এমনই যে, তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে আকাশ হইতে দৃপ্ত দৈববাণীর মতই ওই বজ্ররব ধ্বনিত হইল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন মৃত্যুশয্যায়, তখনই ভাগীরথীতীর হইতে বহুদূরে, সাগরপারে—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'র সেই প্রাচীন ভঙ্গী ও ভাষায়, এক বাঙালীর কণ্ঠে যে বাণী প্রথম পুনরুদ্গীত হইল, সে বাণী—আত্মার

সর্ব্ববন্ধন-মুক্তির স্বাধিকার-ঘোষণার বাণী, তাহাতে প্রকৃতির সহিত বোঝাপড়া করার কোন চিন্তাই নাই। এ যেন সমতল পৃথ্বী ভেদ করিয়া সহসা এক পর্ব্বতচূড়ার অভ্যুদয় হইল; যে যজ্ঞানল এতদিন ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছিল তাহারই এক শিখা যেন আচম্বিতে আকাশ স্পর্শ করিল! বাংলার নবযুগের এই শেষ ও অভিনব বাণীর পরিচয় দিতে বসিয়াছি বটে, কিন্তু ইহা তো শুধুই বাণী নয়,—প্রতিভার দিব্য শক্তিও নয়; একদা এক দিব্য আবেশে কবি যাহা কামনা করিয়াছিলেন—

শঙ্খের মতন তুলি' একটি ফুৎকার হানি' দাও
হৃদয়ের মুখে।

—ইহাও মহাপ্রাণ-নিঃশ্বসিত হৃদয়-শঙ্খের সেই ফুৎকার। সে প্রাণ, সে পৌরুষ একটা আবির্ভাবের মত; সেই মহাজীবন হইতে পৃথক করিয়া বাণীর আলোচনা আদৌ সম্ভব নয়। এ মূর্ত্তির দিকে চাহিলে যুগের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়, সনাতনের সংজ্ঞাও লোপ পায়। আজ যে প্রয়োজনে আমি এই পুরুষের প্রসঙ্গে উপনীত হইয়াছি তাহার পক্ষে অতি ধীরভাবে আলোচনায় অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত, কিন্তু ভয় হয়, এবার হয়তো আমাকে হার মানিতে হইবে। আমার ব্যক্তিগত সাধনায় যাঁহাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি তাঁহাদের কথা বলিতে আমার কণ্ঠ কাঁপে নাই—আমার সাহিত্যগুরু সেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আমার বিদ্যা ও বুদ্ধি সর্ব্বদাই অতি সচেতন। কিন্তু প্রথম যৌবন হইতে আজ পর্য্যন্ত যখনই এই পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি তখনই সকল অভিমান নিমেষে অন্তর্হিত হইয়াছে; কেবল একটি বিরাট পুরুষ-সত্তার মহিমা আমাকে আবৃত করিয়াছে—সাগর-সঙ্গমে নদীস্রোতের মত আমার প্রাণস্রোত ক্ষণেকের জন্ত তাহাতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। পরক্ষণে ইহাও মনে হইয়াছে, এবং সে বিশ্বাস আজিও তেমনই আছে, যে—পুরাকালের কথা বলিতে পারি না—ইদানীন্তন কালে বাঙালী জাতির মধ্যে এত বড় পুরুষ আর জন্মে নাই। তাই যখনই দেশী ও বিদেশী সকল সাক্ষীর মুখে এই একই কথা শুনি—

I was impossible to imagine him in the second place. Wherever he went he was the first.

কিংবা—

His pre-eminent characteristic was kingliness, and nobody ever came near him either in India or America, without paying homage to his majesty.

—তখন আর এক অভিমানে আত্ম-সম্বিৎ ফিরিয়া পাই, সে অভিমান বাঙালীদের অভিমান। যে বেদান্তকে ভারতীয় সাধনা আত্মার উত্তুঙ্গ শিখরে বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগের আশ্রয় করিয়াছিল, সেই বেদান্তের বাণীকে শুধু জ্ঞানে নয়—প্রেমে ও কর্ম্মে—মানুষের গভীরতম হৃদয়-সংবেদনায় এমন করিয়া প্রাণের ছন্দে স্পন্দিত করিতে একমাত্র বাঙালীই পারিয়াছে, আর কেহ পারে নাই—পারিত না। বৈষ্ণবের ভাব-কল্লোলিনী-বিধৌত পলিমাটি এবং শাক্তের হৃদয়াবেগ-বর্জ্জিত কঠিন সাধনার এই সুদৃঢ় তটভূমিতে—এই শ্যামলিমাবেষ্টিত শ্মশান-মৃত্তিকায়—হিমালয়ের দেওদার কে রোপণ করিয়াছিল? জল-মাটির গুণেই সেই দেওদার-শাখায় এমন সুস্বাদু পিপ্পল ফলিয়াছে! বাংলার নবযুগ সম্পর্কে বাঙালী প্রতিভার সেই দিকটির পরিচয় লওয়াও যেমন আবশ্যক, তেমনই, সেই প্রতিভা যে শুধুই বাণী-প্রতিভা নয়, তাহাও বুঝি, তাই বাণীকে অতিক্রম করিয়া যে ব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে, আমি সেই ব্যক্তি-চরিত্রের বৃন্তটি ধরিয়া বাণীর রূপ সাজাইবার চেষ্টা করিব।

* * *

উনবিংশ শতাব্দীর সেই যুগ-বন্যার প্রধান ধারায় বৃহত্তর তরঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে বহু জ্ঞানী ও সাধকের বিচিত্র প্রয়াস নানারূপে প্রবাহিত হইয়াছে; সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, এবং সর্ব্বশেষে রাষ্ট্রনীতি—এই সকল ক্ষেত্রেই অত্যধিক উদ্যম—সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সন্ধান শেষ পর্য্যন্ত একরূপ অব্যাহতই ছিল। খণ্ড খণ্ড ভাবেও এ সকলের পরিচয় ঐতিহাসিকের পক্ষে কর্ত্তব্য বটে, আমি কেবল তাহাদের অন্তর্গত প্রধান প্রবৃত্তি এবং তৎসম্পর্কিত কার্য্যকারণ-তত্ত্বের একটা স্থূল পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমি এ পর্য্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা ও তজ্জনিত সাহিত্যিক ভাবচিন্তার ভিতর দিয়া এই যুগের প্রধান প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়াছি; এবং তাহারই প্রসঙ্গে এ জাতির জাতীয় সংস্কারে যে আধ্যাত্মিকতার বীজ

নিহিত আছে—যাহা তাহার প্রতিভার মূলে স্বপ্ন-চেতনার মত অস্ফুট রহিয়াও শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, তাহার কথাও বলিয়াছি। যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাতিভ দৃষ্টিতে—নবযুগ-প্রবৃত্তির সহিত জাতির এই প্রাক্তন সংস্কারের দ্বন্দ্ব কি আকারে দেখা দিয়াছিল, এবং কোন্ মন্ত্রে তিনি তাহার নিরসন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তারে বলিয়াছি। কিন্তু এ জাতির অস্থিমজ্জাগত সংস্কার সেই সমস্যাকে যে এত সহজে বিদায় করিবে না—সমস্যার মূল যে আরও গভীর, তাহার প্রমাণ ইতি-পূর্ব্বেই পাওয়া যাইতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবং-কালেই আর এক ক্ষেত্রে আর এক আন্দোলন ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। নবজাগরণের অনতিকালমধ্যেই, প্রথমে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে, এবং শেষে আধ্যাত্মিক কল্যাণ-পিপাসার বশে, এক গুরুতর ধর্মান্দোলন শুরু হইয়াছিল—সে আন্দোলন শুধুই চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, শুধুই সমাজ-চৈতন্যে নয়, ব্যক্তির স্বকীয় চৈতন্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাই স্বাভাবিক। অতি দীর্ঘ নিদ্রার অবসানে এ জাতি এক নূতন জগতে চক্ষুরুন্মীলন করিল—সে জগৎ তাহার সেই প্রাক্তন পল্লীসমাজের জগৎ নয়; আকাশ যেন অনেক দূরে উঠিয়া গিয়াছে, এবং তাহারই দিক্-দিগন্ত হইতে মানবেতিহাসের বিপুল ও বহুবিচিত্র ধারার কলরোল তাহার জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছে—শুধুই কর্ণে কলগর্জ্জন নয়, সেই স্রোত তাহার বক্ষতটে প্রহত হইতেছে। সেই আঘাত সর্ব্বশেষে তাহার প্রাণধাতুকে স্পর্শ করিল, এবং প্রতিঘাতে তাহার স্বকীয় সংস্কার যেন ভিতরে ভিতরে প্রবলভাবে নাড়া পাইল। নবযুগের সংক্রমণ ও তাহার প্রভাব রামমোহনের চিন্তায় সর্ব্বপ্রথম ধরা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখপ্রসারী হইলেও উপরের দিকেই নিবদ্ধ ছিল; নূতন আবহাওয়ার উপযোগী একটা স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্ম্মাণ করিবার পক্ষে ভিত্তি যতটুকু দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি তাহার অতিরিক্ত ভাবনা করে নাই—ভূমিকম্প প্রভৃতির চিন্তাকে তিনি কখনও আমল দেন নাই। ধর্ম্মের ব্যাপারেও, কেবল সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের প্রতি একটিমাত্র আঘাতে ছেদন করিবার উদ্দেশ্যে, তিনি খ্রীষ্টান বা সেমিটিক ঈশ্বরবাদকেই বেদান্তসূত্র দ্বারা শোধন করিয়া একটি অতি সহজ

অস্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। রামমোহনের ধর্ম যতই যুক্তিসিদ্ধ ও সুকল্পিত হউক, তাহা মূলে অ-ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত—তাহাতে এমন সঞ্জীবনী অধ্যাত্ম প্রেরণা ছিল না, যাহার বলে মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজের আত্মার উপরে আস্থা না হারাইয়া একটা মহাসঙ্কটে উদ্ধার পাইতে পারে। যে য়ুরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ ও যে ধর্মনীতি একদা রামমোহনকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, তাঁহার যুক্তিবাদের সহায় হইয়াছিল, সে আদর্শ ও সে নীতির পরিণাম শতাব্দী-শেষে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বরং রামমোহনের প্রতিভার অসাধারণত্ব ইহাই যে, তিনিই প্রথম ভারতীয় সাধনার সংস্কার-স্রোতধারাকে ছিন্ন-পরণ্য করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই সাময়িক পঙ্কোদ্ধারের কাজ হইয়াছিল। সেই বুদ্ধির জাগরণই সে যুগের প্রথম লক্ষণ,—চৈতন্য-স্ফুরণের আদি অবস্থা যে তাহাই। দ্বিতীয় অবস্থায় হৃদয় বা প্রাণের জাগরণ—বিদ্যাসাগরে ও মধুসূদনে, দুই দিক দিয়া তাহাই ঘটিয়াছিল। তৃতীয় অবস্থায় বুদ্ধি ও হৃদয়, দুইয়েরই সমান জাগরণ—সুস্থ মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ, তাহার বিগ্রহ বঙ্কিমচন্দ্র। ইহারও পরে, শতাব্দীর শেষভাগে, জাতীয় জাগরণের প্রায় তৃতীয় বা চতুর্থ অবস্থায়, সেই সকলের সহিত আর এক যে-বস্তুর উন্মেষ হইল, অন্য নামের অভাবে তাহার নাম দিব 'আত্মা'। মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও প্রাণ—সকলই ইহার সেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত; এই আত্মার দৃষ্টিতে যুগসমস্যা এমন একটি আকার ধারণ করিল যে, তাহা যুগ-জাতি-দেশ অবলম্বনে সর্বকাল ও সর্বদেশের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

২

জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও জীবন-জিজ্ঞাসা—ইহাতেই যুগপ্রবৃত্তির আরম্ভ, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াও হইতে থাকে। প্রতিক্রিয়ার কারণ—বহুকাল-অর্জিত সংস্কার; এই সংস্কারই অন্ধসংস্কাররূপে জীবনকে গতিহীন করিয়াছিল। নবযুগ ও তাহার অনুবর্তী সেই পাশ্চাত্য প্রভাব, এই সুপ্ত সংস্কারের এতই বিরোধী যে, দেশের রক্ষণশীল সমাজ একটা অজ্ঞাত অস্পষ্ট ভয়ের বশীভূত হইয়া সেই প্রভাবের প্রতিরোধ করিতে চাহিল; কোথায় যে বিরোধ—ভিতরের কোন্ মূল ধরিয়া টান পড়িতেছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, বিচার-বুদ্ধিকে

এমন, এবং অবোধ চিত্তবৃত্তিকে প্রাণপণে আশ্রয় করিয়া, নির্জ্জীব শাস্ত্র-বচনের মহিমা-ঘোষণায় অধীর হইয়া উঠিল। অপর দিকেও উৎকণ্ঠা কম ছিল না; প্রাণের প্রবল মুক্তি-কামনা—জীবনকে বিধিমতে ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষাও যেমন জাগিয়াছে, তেমনই ব্যক্তির আত্ম-চেতনা প্রখর হইয়া উঠিয়াছে; তাহার ফলে আধ্যাত্মিক সত্য-মীমাংসাও নবযুগের আন্দোলনে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল; শেষের দিকে ইহাও একটা পৃথক খাতে বহিতে শুরু করিয়াছিল। রামমোহন-পন্থীরা এই আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাকে বুদ্ধির শাসনে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাহা যে সফল হয় নাই, তাহার প্রমাণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত পুরুষেরও অবশেষে সন্ন্যাস-গ্রহণ। আবার নিছক যুক্তি-বিচার যে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল নয়, সেই গভীরতর পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য জাগ্রত বুদ্ধিবৃত্তির উপরে একপ্রকার রস-চেতনাকে প্রাধান্য দিতেই হয়, সে যুগের ধর্ম্মান্দোলনের সর্ব্বপ্রথম ও শক্তিমান নেতা আচার্য্য কেশবচন্দ্রই তাহার প্রমাণ। কিন্তু এ সকলের দ্বারা যুগ-সমস্যার কোনরূপ সমাধান হয় নাই; কেবল ইহাই প্রমাণ হয় যে, যুগধর্ম্মের প্রভাবে এ জাতির চেতনার উপরি-স্তরে যত তরঙ্গই উত্থিত হউক, তলদেশে একটা গভীরতর আকূতি উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল; যুগ ও সনাতন, সর্ব্বমানবীয় চেতনা ও জাতীয় সংস্কার, এই দুইয়ের সংঘর্ষ ভিতরে ভিতরে বৃদ্ধি পাইতেছিল; ফলে, একটা ঘোরতর আধ্যাত্মিক সংশয়-সঙ্কট আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা অতিশয় মেধাবী অথচ তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল—তাই জীবনের আদি-অন্ত সম্বন্ধে যাহারা কোন কাটা-ছাঁটা ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই, তাহারা শেষ পর্য্যন্ত জীবন সম্বন্ধে নাস্তিক হইয়া পড়িতেছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে যুগের আদি-প্রবৃত্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপ্তি ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহা প্রশমিত হইয়া বাঙালীর জীবনযাত্রায় তথা চরিত্রে যে পরিণতির আভাস দেখা দিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই লক্ষ্য করিয়া অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহারই নিবারণকল্পে তিনি তাঁহার প্রতিভার সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়া

জাতির জীবন-রক্ষার একটা পন্থা নির্ণয় করিয়াছিলেন। নব্যশিক্ষিত সমাজের দাসত্ব-প্রীতিও তিনি যেমন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তেমনই তাহার চরিত্রে দারুণ স্বার্থসুখলোলুপতা ও তাহার কারণ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন; তাহার এই মনুষ্যত্ব-লোপ এবং অচিরকালের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অধঃপতনের সম্ভাবনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। তথাপি তাঁহার ভরসা ছিল শিক্ষিত বাঙালীর উপরেই; তাই উৎকৃষ্ট ভাব ও চিন্তারাজি অকাতরে ছড়াইয়া তিনি তাহাদের চিত্তশুদ্ধির প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই চিন্তারাজির মধ্যে দুইটি ছিল প্রধান—সার্ব্বজনীন মনুষ্যপ্রীতি ও বিশেষভাবে দেশপ্রীতি, এবং সমাজের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করিবার জন্য আত্মানুশীলন,—দেহ, মন ও প্রাণের উৎকর্ষসাধন। ইহা যে আপামর সাধারণের জন্য নয়, তাহা তিনি জানিতেন, সে আদর্শ ও তাহার সাধনা কেবল শিক্ষিত-সমাজেরই আয়ত্ত। বৃহত্তর সমাজের দারুণ দুর্গতি ও অবনতির অবস্থা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, সে সমস্যাও তাঁহার চিন্তায় অল্প স্থান অধিকার করে নাই; কিন্তু সে সকলের দায়িত্ব তিনি আধুনিক কালের 'ব্রাহ্মণের' উপরেই দিয়াছিলেন; এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন আদর্শবাদী, তেমনই aristocrat। তথাপি নব-মানবধর্ম্ম-প্রচারক বঙ্কিম, দেশপ্রেম-মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিম, এই aristocrat বঙ্কিম একদা যেমন 'সাম্য' নামক প্রবন্ধমালা রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার সেই আদর্শবাদী ভাব-চিন্তার মধ্যেই এমন বীজ নিহিত ছিল, যাহা অতঃপর সেই আদর্শের উচ্চভূমি বিদীর্ণ করিয়া বাস্তবকেই আরও বিরাট আকারে সঙ্কট-সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই বিবেকানন্দ একের সহিত অপরের যুগগত পরম্পরতার যোগই শুধু নয়, ভাবগত যোগও নিশ্চয় ছিল—সে যোগ সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ যোগ না হইতে পারে, কিন্তু এতবড় বাণীবীরপুত্রের সেই বহুপ্রচারিত বাণী বিবেকানন্দের মত পিপাসু যুবকের পানীয় হয় নাই, ইহা সম্ভব নয়; রামমোহন, কেশবচন্দ্রকে যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রকেও তেমনই তিনি তাঁহার দিক দিয়া হজম করিয়াছিলেন, এবং বঙ্কিমের চিন্তাধারার প্রায় বিপরীত মুখে হইলেও, বঙ্কিম যেখান শেষ করিয়াছিলেন ঠিক সেইখান হইতেই তাঁহার যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাও মনে হয়, বিবেকানন্দের গন্তব্য

পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি ছিল না, বরং অতিশয় হৃষ্টচিত্তেই তিনি তাহাতে সম্মত হইতেন; কিন্তু পন্থ্র পক্ষে সেরূপ পিরিলঙ্ঘন তিনি আদৌ সাধ্য বলিয়া মনে করিতেন না, এমন অসীম সাহসের যোদ্ধৃ-মনোভাব তাঁহার ছিল না। বঙ্কিম ছিলেন ভাবুক ও চিন্তাশীল, প্রাকৃতিক নিয়তি-নিয়মের অনুবর্ত্তী, ক্রমবিকাশবাদী। বিবেকানন্দ আত্মার স্ব-শক্তিতে আস্থাবান, তিনি প্রকৃতির ধমক মানিতেন না। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী যতই বিপরীত হউক, মূল সমস্যা উভয়ের নিকটেই এক; আবার তত্ত্বের দিক দিয়া যেমনই হউক, ভাব-প্রেরণায় উভয়ের সগোত্রতা এত অধিক যে, এককালে বাঙালী যে উভয়কে একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। মনুষ্যত্বের উদ্ধার-সাধন যেমন উভয়েরই ছিল একমাত্র ব্রত, তেমনই প্রেম ও পৌরুষ, এই দুই ছিল উভয়ের সাধন-মন্ত্র; এবং উভয়েরই মতে, সেই প্রেম ও পৌরুষের মুখ্য সাধনক্ষেত্র ছিল স্বদেশ ও স্বজাতি-সমাজ। কিন্তু বিবেকানন্দেই সে যুগের জাগরণ প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। সে জাগরণের এইরূপ ক্রমনির্দ্দেশ করা যায়:—প্রথম, মনুষ্য-জীবনের গৌরব বোধ; দ্বিতীয়, জীবন-জিজ্ঞাসা, মনুষ্যত্বের আদর্শ-সন্ধান, ও জীবনের মাহাত্ম্য-ঘোষণা; তৃতীয়, জীবনের মহিমাই মানুষের মহিমা নয়; জীবন-সাধনার কোন স্বতন্ত্র আদর্শ নাই; মানুষই মানুষের আদর্শ, মানবাত্মার মহিমাই সকল মহিমার মূল; জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে বন্ধনমুক্ত আত্মার সেই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠাই মনুষ্যজীবনের নিঃশ্রেয়স। এবার এই বাণীর কিছু পরিচয় দিব, কিন্তু বাণী ও ব্যক্তির পরিচয় একই—বরং ব্যক্তিই আগে, বাণী পরে।

৩

তখন ঊনবিংশ শতাব্দী প্রায় শেষ পাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাঙালী তখন বড় মোহকর স্বপ্ন দেখিতেছে, সে স্বপ্ন সফল হইতেও যেন আর বিলম্ব নাই; বাঙালী তখন জাতীয় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেও আরম্ভ করিয়াছে! এদিকে সরকারী চাকুরির মাহাত্ম্য সমাজে এক নূতনতর কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন শুরু হইয়াছে। কলিকাতা শহর এক নূতন নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইয়াছে; অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত

বাঙালী যেখানে যেটুকু সংস্কৃতি অর্জন করিয়াছিল এই নগরী তাহারও সবটুকু আকর্ষণ করিয়াছে; বাঙালীর চিত্তভূমির—তাহার হৃদয় ও মস্তিষ্কের—সবটুকু শক্তি তাহার একাধিকারে বর্ত্তিয়াছে। শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্ম-সম্পর্কিত, এমন কি, নূতন সাহিত্যের জন্মঘটিত যত কিছু আন্দোলন, এই শহরেই সব হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনের হিসাবনিকাশ প্রায় শেষ করিয়া বাঙালী তখন নূতনের সঙ্গেও একটা আপস করিয়া লইয়াছে, সম্মুখে যেন বাঁধা পথ; সে পথ যেমন উন্মুক্ত, তেমনই নিঃসঙ্কট। দাসত্বের অন্ন সুলভও বটে, রুচিকরও বটে; নিজের উপরে অথবা ভগবানের উপরে যে বিশ্বাস তাহা ইংরেজের উপরে স্থাপন করিয়া বাঙালী একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

কিন্তু আসলে এই স্বপ্ন-বিলাস ও সুখের আশ্বাস—নিরুপায়ের আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র; তলে তলে একটা ক্লান্তি আসিয়াছে, সংশয়ও দেখা দিয়াছে—পশ্চিম ঐ জাতির মস্তিষ্কে হানা দিয়াছে—তাহার জীবনকে দুর্ব্বল করিয়াছে। একদিন যাহার নূতনত্বে সে অধীর হইয়াছিল—সেই নূতনকে লইয়া লোফালুফি করিয়া, তাহাকে বাজাইয়া এবং চতুর্দ্দিকে ছুঁড়িয়া ছড়াইয়া সে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, এক্ষণে সেই নূতনের উন্মাদনা-শেষে তাহার দেহে-মনে একটা বেদনা জাগিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম সেই বেদনা সজ্ঞানে অনুভব করিয়াছিলেন। সেই যুগের যত কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভরসাকে তিনিই একটি প্রকৃষ্ট বাণীরূপ দিয়াছিলেন বটে—যুগনায়করূপে জাতীয়-জাগরণের প্রধান পুরোহিতরূপে তিনিই দাঁড়াইয়াছিলেন—তথাপি, এই বেদনা তাঁহাকে বিহ্বল করিয়াছিল, জাতির সেই হীন আত্ম-সন্তোষ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য দর্শনে তাঁহার লজ্জা ও ক্ষোভের অবধি ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার পদ্ধতি-দোষে তাহার সুফল অপেক্ষা কুফল বৃদ্ধি পাইল, সে শিক্ষার একমাত্র ফলাফল হইল চাকুরি-লাভ—সরস্বতীর কমলবনে কমলবিলাসী বাঙালী, চাকুরি-মধু-পানে বিভোর হইয়া উঠিল। বাঙালীর নিজস্ব সমাজ-জীবনও নষ্ট হইতে চলিল; পল্লীর প্রতিবেশে, মাঠে, ঘাটে, প্রান্তরে সেই সরল উন্মুক্ত জীবন যাপন করিয়া সে যেটুকু প্রাণশক্তি বজায় রাখিয়াছিল তাহা ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল;

কলিকাতা শহরের বদ্ধ বায়ুতে নূতন নাগরিক সুখোপকরণ তাহার সেই স্বাস্থ্য নাশ করিয়া অহিফেন-সুলভ জড়তা বৃদ্ধি করিল—প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু নেশার ঘোরে, নূতনত্বের মোহে, সেই অস্বাভাবিক অবস্থা ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া আসিল; পল্লীসমাজের বন্ধন যেমন দুঃসহ, পল্লীবাসও তেমনই অসুখকর হইয়া উঠিল। বাস্তব জীবনে দাসত্বপ্রীতি যতই বাড়িতে লাগিল—মনে ততই স্বাতন্ত্র্য-অভিমান জাগিয়া উঠিল; ইংরেজের চাকুরি ও ইংরেজের আইন সেই স্বাতন্ত্র্যের পোষকতা করিল; ইংরেজী বিদ্যার অভিমানও মনের সঙ্কোচ ঘুচাইল। এক দিকে চাকুরি-গৌরব, আর এক দিকে Mill, Bentham, Spencer; এক দিকে দাশুরায়ের পাঁচালি, আর এক দিকে Shakespeare, Milton, Byron; এক দিকে মাহেশের রথ, বাগানবাড়ির আমোদ, অপর দিকে ব্রাহ্ম-মন্দিরের উপাসনা—সে যেন এক অপূর্ব্ব প্রহসন! এই দুইয়েরই রস যে সমভাবে উপভোগ করিতে পারে, সে 'হুতোম পেঁচার নক্‌শা' লিখিয়া প্রবল হাস্যবেগ প্রশমিত করে। এই জীবনই সেকালের চতুর্ব্বর্গকামী বাঙালী-সন্তানের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজ তখনও একেবারে মরে নাই—এই সমাজই ক্ষতবিক্ষত হইয়াও জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ এ পর্য্যন্ত সমাজের স্থিতি রক্ষা করিয়াছে; আবার এই সমাজই সর্ব্বপ্রকার বিদ্রোহের বীজ ধারণ ও পালন করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে, ইংরেজী শিক্ষার সুফলস্বরূপ, যত কিছু আন্দোলন ঘটিয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিতে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছে—এই শ্রেণীর মানুষ; শুধুই বিদ্রোহের মন্ত্র-রচনা নয়, তাহার আগুনে ঝাঁপ দিয়াছে ইহারাই। উৎকৃষ্ট প্রতিভারও জন্ম হইয়াছে ইহাদেরই মধ্যে, কেবল দুইজন এই শ্রেণীভুক্ত নহেন—রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ। ইহার কারণ আছে; বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের যে একটি মহৎ গুণ—তাহা এই শ্রেণীর জীবনেই সম্ভব। তখনকার একান্নবর্ত্তী পরিবারে জীবিকা-অর্জ্জনের ভার প্রায় একজনের উপরেই থাকিত, অথবা পৈতৃক জমিজমার দ্বারাই তাহা এক প্রকার নির্ব্বাহ হইত, তাহাতে এক দিকে যেমন আলস্য প্রশ্রয় পাইত, তেমনই স্বল্পসুখসন্তুষ্ট, দায়িত্ববন্ধনমুক্ত, ভাবুক ও চিন্তাপ্রবণ বাঙালীর ভাবচর্চ্চার

বড় অবকাশ হইত। যে বিলাস-ব্যসন অভ্যস্ত নয়, অথচ জাতিস্বভাব-সুলভ চিন্তা ও কল্পনাশক্তির অধিকারী—কোন একটি ভাব-সত্যের প্রতিষ্ঠায় তাহার পক্ষে সর্ব্বস্বত্যাগ আদৌ দুষ্কর নয়, ইহার প্রমাণ বাংলা দেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও শেষে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাসে প্রচুর পাওয়া যাইবে। সেকালের কলিকাতার সেই সমাজে, সেই নব্য জীবনযাত্রার অবসাদকর আবহাওয়ায়, রুদ্ধ আলোক ও বদ্ধ বায়ুর সেই শ্বাসকৃচ্ছ্রতার মধ্যে, স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের সংঘর্ষে জাতির সেই মানস-বৈকল্যের অবস্থায়, আত্মক্ষয়কারী দারুণ দাসত্ব-ব্যাধি যখন সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে, তখন কলিকাতারই এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সেই শ্রুতি-প্রসিদ্ধ নাচিকেত-অগ্নির একটি শিখা সকলের অগোচরে জ্বলিতে আরম্ভ করিল; এবারে শুধু জীবনের আরাধনাই নয়, মৃত্যুর বজ্রমুষ্টি হইতে অমৃত-ভাণ্ড উদ্ধার করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিল।

অতি অল্পবয়সেই এই তেজ—সর্ব্ববন্ধনমুক্তির সেই দুর্দ্দমনীয় পিপাসা—বিবেকানন্দের জীবনে দেখা দিয়াছিল; ইহাকেই আমাদের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় 'শৈব তেজ' বলে। অপরের উপদেশ নয়, পরের সাক্ষ্য নয়, কোন তর্ক-যুক্তির পুঁথিগত সিদ্ধান্ত নয়—পরোক্ষ আপ্তবাক্যের আশ্বাস নয়, নিজেরই জ্ঞান-বুদ্ধি ও অপরোক্ষ অনুভূতির সাহায্যে, জীবনের তথা মানবীয় সত্তার অর্থ সন্ধান করিতে হইবে, যদি কোন সত্য থাকে তাহা সাক্ষাৎকার করিতে হইবে—ইহাই ছিল সেই বালকের প্রাক্তন সংস্কার, সে সংস্কার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তর হইয়াছিল। সেকালের স্কুলে ও কলেজে অধ্যেতব্য যাহা কিছু ছিল তাহা যেন গণ্ডূষে পান করিয়া, জ্ঞানপন্থী অধ্যাত্মবাদীদের সঙ্গ করিয়া তাহাদের তত্ত্ববিচার শুনিয়া কিছুতেই পিপাসা মিটে না; বরং সংশয় বাড়িয়া যায়, আত্মা আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিবেকানন্দ ছাত্রাবস্থাতেই যুক্তিপন্থী নব্য-সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিলেন—সেও যেন অন্ধভক্তি ও গুরুবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। দেশে তখন পাশ্চাত্য বিদ্যার মোহ কিছু কমিয়াছে, বন্যার সেই জলরাশির নিম্নে পঙ্ক দেখা দিয়াছে; মানবত্বের মহিমা-বোধ যতই টিকিয়া থাকুক সেই ভাবের আবেগ বাধা পাইতে আরম্ভ করিয়াছে; কারণ ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য

জাতির সেই মানবতন্ত্র-শাস্ত্রের সাধন-পীঠে আর এক মন্ত্র মানবতাকে পরিহাস করিয়া জয়ী হইতে চলিয়াছে। মানবধর্মকে প্রকৃতিধর্মের সহিত বাঁধিয়া লওয়ার ফলে, যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিধর্ম উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করিতেছিল তাহাতে মানুষের আত্মা ক্রমেই জড়শক্তির বশীভূত হইতেছিল—প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি মনুষ্যজীবনের আত্মিক সম্পদ মানুষ তখন হারাইতে বসিয়াছে। কিন্তু তখনও সে ঘটনা আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই—আত্মার স্বাতন্ত্র্য-মহিমা নয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের অনুকূল যে যুক্তিবাদ তাহাই পরম উপাদেয় হইয়াছে; তাহার কারণ, জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগও ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। তাই সেই নূতন নাগরিক জীবনে সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া ব্যক্তির যে আত্ম-প্রসাদ—পুঁথিগত যুক্তির বলে কুসংস্কার-মুক্তির যে দুঃসাহস—তাহাই পরম জ্ঞানের পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। এক দিকে শাস্ত্র, গুরু ও ব্রাহ্মণে ভক্তি, এবং অপর দিকে মানস-মুক্তির ওই যুদ্ধঘোষণা—এই দুইয়ের মধ্যে যুবক বিবেকানন্দ যে শেষেরটির দিকেই আকৃষ্ট হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। সংস্কার-বৈকল্যের উচ্ছেদ—মনের মুক্তিই তো আত্মার উদ্ধারসাধনের প্রাথমিক উপায়—মনুষ্যত্বের যাহা সার সেই পৌরুষের ("পৌরুষং নৃষু") ইহাই তো প্রথম পরীক্ষাস্থল। কোন জ্ঞান, কোন তত্ত্ব কোন গুরুবাক্যে প্রয়োজন নাই—আগে চাই নিজ আত্মার স্বাধীনতা-বোধ, তাহার তুলনায় আর সকলই তুচ্ছ।

বিবেকানন্দ-চরিত্রের এই প্রধান লক্ষণ তখন হইতেই, অথবা আরও পূর্ব্ব হইতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সে চরিত্র যেন একটি শাণিত ইস্পাত-ফলক, তাহার ধার—ওই প্রখর মুক্তি-পিপাসা, সর্ব্ববন্ধন-অসহিষ্ণুতা। কিন্তু প্রথম জীবনের সেই দুর্দ্দম আত্ম-স্বাতন্ত্র্য এবং আজন্ম-শাণিত সেই জ্ঞান-পিপাসার তীক্ষ্ণ তরবারিও শেষে বড় কাজে লাগিয়াছিল, তাহার অন্তরস্থ সেই অতি-কঠিন ইস্পাতের দ্বারাই যে নূতন অস্ত্র নির্ম্মিত হইল তাহাতে মাটির উপরকার বনজঙ্গলতাই নয়, তলদেশের শিকড়গুলা পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিবার উপায় হইল; বঙ্কিমচন্দ্র মাটির উপরকার ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন, ভিতর পর্য্যন্ত দৃষ্টি করা তখনই আবশ্যক বোধ

করেন নাই; তিনি ছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, সমন্বয়পন্থী শাক্ত সাধক, এমন উগ্র অদ্বৈতবাদকে তিনি ভয় করিতেন।

৪

বিবেকানন্দের চরিত্র ও জীবন-কথা বলিতেছিলাম। তাঁহার প্রথম যৌবনের সেই অদম্য জ্ঞান-পিপাসা ও স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহার কথা বলিয়াছি; এ চরিত্রের মূল গ্রন্থি তাহাই বটে, কিন্তু তাহাই সব নয়। সে চরিত্রের যে দিকটি অসাধারণ, যাহা মহামনীষীগণকেও মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে, সেই দিকটির কথা এইবার বলিব। ভগবান বুদ্ধের প্রসঙ্গমাত্রে তাঁহার নিজের সেই অপূর্ব্ব ভাবাবেগের কথা স্মরণ হয়, এবং তাহাতেই অনুমান করা যায়, বিবেকানন্দ কি কারণে আজীবন বুদ্ধকে এত ভক্তি করিতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেও যেমন তিনি বুদ্ধগয়ায় গিয়া বোধিবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া রোমাঞ্চ-কলেবর হইয়াছিলেন, তেমনই জীবনের সর্ব্বশেষ তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন সারনাথে। তিনি এমন কথাও বলিতেন যে, অতি অল্প বয়সে ভাবাবেশে তিনি বুদ্ধের সাক্ষাৎ-দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ইহা আশ্চর্য্য নয়, বুদ্ধের সঙ্গে তাঁহার আত্মার সগোত্রতা ছিল—তিনিও অতীত ও অনাগত বুদ্ধগণের বংশে জন্মিয়াছিলেন; বুদ্ধের মতই তিনি যত বড় সন্ন্যাসী, তত বড় প্রেমিক। যে-পুরুষ কোন বন্ধন মানিবে না, দেহের বন্ধনও যাহার কাছে দুর্ব্বিষহ, কৈবল্য-মুক্তিতে পরমানন্দ ভিন্ন আর কিছুতেই যাহার রুচি ছিল না, সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী দেশকে ও দেশের মানুষকে যেরূপ ভালবাসিয়াছিলেন, তেমন ভালবাসা বোধ হয় আর কেহই বাসে নাই। ইহার কারণ যাহাই হউক, সেই প্রেমের অপূর্ব্ব আবেগ তাঁহার ব্যক্তিগত মুক্তিপিপাসাকেও দমন করিয়া, দেশের মুক্তি-কামনা হইতেই জগতের হিতার্থে, তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। এই প্রেম একটা আধ্যাত্মিক রসাবেশ নয়, ইহাতে এক বিশাল হৃদয়ের অসীম দুঃখবোধ ছিল; এ প্রেম খাঁটি মানবীয় প্রেম। বিবেকানন্দের ত্যাগ-বৈরাগ্য এতই বিশুদ্ধ ও এমনই মজ্জাগত যে, তাহার সহিত এই ধরনের প্রবল হৃদয়-সংবেদনা স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। যে একদিন এক মুহূর্ত্তও আত্মার স্বরূপ-মহিমার কথা ভুলে নাই—সেই আত্মার

লেশমাত্র অজ্ঞান-মোহ, বন্ধন বা দুর্ব্বলতা, যে সহ্য করিতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার হৃদয়াবেগকে যে মাত্রাস্পর্শ-জনিত ভাবালুতা ("overflow of the senses") বলিয়া ধিক্কৃত করে, তাহার সেই জ্ঞানাগ্নি-শুষ্ক আঁখিপল্লবে এমন অশ্রুধারা উদ্গত হয় কেমন করিয়া?

এ রহস্য দুরবগাহ; হয়তো মানব-মাহাত্ম্যের এই অভিনব রূপ এ যুগের শেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, Humanism-এর অন্তর্গত যে গভীরতম তত্ত্ব, তাহারই চরম ও পরম প্রকাশ। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহার যে কারণই নির্দ্দেশ করি না কেন, ইহার এই রূপকে—বুদ্ধির দ্বারা নয়, একরূপ মিষ্টিক চেতনার দ্বারাই—উপলব্ধি করা সম্ভব। কারণ, দেহ ও আত্মা, জীবন ও মহাজীবন, দ্বৈত ও অদ্বৈত এখানে এমন একটা নির্দ্বন্দ্বতার ইঙ্গিত করিতেছে, "বাচো যতো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। এখানে জ্ঞান যেন প্রেমের দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া আরও স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—নিদাঘ-দিনের দাহশেষে তারকাখচিত আকাশ যেমন আরও উজ্জ্বল, আরও সৌম্য-গম্ভীর হইয়া উঠে। মহাযোগী মহাদেবের কণ্ঠে সেই যে গরল-নীলিমা, তাহার জ্বালা-বোধ কি কম? সেই গভীর জ্বালাকে নিঃশেষে পান করিয়াই তিনি ব্যোমকেশ হইয়াছেন; তাই তাঁহার ললাটনেত্রের সেই জ্ঞান-বহ্নিও শশিকলার স্নিগ্ধকিরণে করুণ হইয়া উঠে! তথাপি বিবেকানন্দ মহাদেব নন—মানুষ।

উপমা-রূপকের ভাষা ছাড়িয়া—মনুষ্যচরিত্র হিসাবেই ইহার কারণ-সন্ধান ও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব। বালক বিবেকানন্দের সেই দুর্দ্দম জ্ঞানাভিমানের ঊর্দ্ধফণা কোন্ মন্ত্রৌষধির বলে রুদ্ধবীর্য্য হইয়াছিল তাহা আমরা জানি। কিন্তু এই প্রেমের অঙ্কুর তাঁহার নিজের চরিত্রেই আজন্ম নিহিত ছিল—কেবল বিকাশের অপেক্ষা মাত্র। আমি বিবেকানন্দ-চরিত্রের যে উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যস্পৃহার কথা বলিয়াছি, তাহা ব্যক্তির ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বাভিমান নয়—তাহা পরের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞান নয়, সেই মর্য্যাদা-বোধ ব্যক্তির নয়—আত্মার। আত্মারই সেই মর্য্যাদা-বোধ তাঁহাকে এত বড় প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল কেমন করিয়া, তাহাই বলিব।

ক্রমশ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একদিন, সেদিন কিসের ছুটি ছিল। সারাদিন পিসীমার বাড়িতে কাটিয়ে বেলা প্রায় তিনটে নাগাদ গলি দিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরছি, এমন সময় আকাশ অন্ধকার ক'রে এল মুষলধারে বৃষ্টি। ব্যাপার গুরুতর দেখে আমি অস্থিরকার জন্যে একটা বাড়ির উঁচু রোয়াকে আশ্রয় নিলুম।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও বৃষ্টি থামল না। জলের ছাটে প্রায় আধভেজা হয়ে গিয়েছি। রাস্তায়ও বেশ জল দাঁড়িয়েছে, যাহা বাহায় তাঁহা তিপ্পান্ন—মনে ক'রে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বাড়ির দিকে রওনা হব মনে ক'রে ধুতি সামলাচ্ছি, এমন সময় প্রায়-সামনের এক বাড়ি থেকে ছাতা নিয়ে একটি ছেলে রাস্তায় বেরিয়েই মুখ তুলে বললে, কে রে, স্থবির নাকি ?

কে রে, ললিত ?

ললিত সুলতার ছোট ভাই। সেই বছর সে মেয়ে-ইস্কুল ছেড়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছিস ? এঃ, ভিজে গেছিস যে !

আর ভাই বলিস নি, ঘণ্টাখানেক ধ'রে ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছি।

এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিস আর বাড়ির মধ্যে যাস নি, এই তো আমাদের বাড়ি।

আরে, ওইটে তোদের বাড়ি ? আমি তো জানি না।

ললিত ছাতা বন্ধ ক'রে আমার হাত ধ'রে বললে, আয় আয়।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে ললিত চীৎকার ক'রে উঠল, দিদি, দেখ, কে এসেছে।

ললিতের চীৎকার শুনে তার ভাইবোনেরা ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হ'ল, সবার পেছনে এল সুলতা হাঁপাতে হাঁপাতে।

ললিত চেঁচাতে লাগল, আজ ঠিক ধরেছি, এইখানে দাঁড়িয়ে ছিল।

সুলতা আমাকে দেখেই বললে, এতদিনে মশায়ের সময় হ'ল বুঝি? মিথ্যেবাদী কোথাকার! প্রতিজ্ঞা করেছিলি না?

সুলতার কথায় কোন জবাব দিতে পারলুম না। তাকে দেখে শুধু মনে হ'ল,'কি সুন্দর দেখতে হয়েছ তুমি!'

সুলতার ছোট বোন সুজাতা আমাদের দু ক্লাস নীচে পড়ত। ইস্কুলময় চড়ুইপাখীর মতন নেচে বেড়াত সে। সুজাতা চড়ুইপাখীর মতই কিচকিচ ক'রে উঠল, আবার কথা কওয়া হচ্ছে না বাবুর!

সুলতা এগিয়ে এসে আমার হাত ধ'রে বললে, চল মা'র কাছে।

মা বড় ভালমানুষ। প্রণাম ক'রে বসতে না বসতে কয়েক মিনিটের মধ্যে একেবারে আপনার ক'রে নিলেন। তিনি বললেন, লতু কতদিন থেকে বলছে, তুমি আসবে, তা ছেলের বুঝি সময়ই হয় না?

তখুনি তাস পাড়া হ'ল। ললিত এক বোঝা মুড়ি আর তেলে-ভাজা এনে হাজির করলে। এই তেলে-ভাজা কিনতে যাবার মুখেই আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

'গ্রাবু' খেলা শুরু হ'ল। আমি আর সুলতা এক দিকে, সুজাতা ও ললিত আর এক দিকে। বাকি যারা ছিল, তারা আমাদের ঘিরে বসল। হৈ-হৈ ক'রে খেলা জ'মে উঠল।

ওদিকে আকাশ বিরাট আর্তনাদে বার কয়েক দিখিদিক চমকে দিয়ে আমাদের ঘিরে একঘেয়ে ঝরঝরানি সুরে বিনিয়ে কাঁদতে থাকল।

সময় যে কোথা দিয়ে কাটতে লাগল, তা বুঝতেই পারি নি। দিনের আলো আর রাতের অন্ধকার মিলিয়ে ঘরের মধ্যে যে স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই মায়ায় আমার আত্মজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নিজের বাড়িতে নিয়ত নানা প্রকার মন্‌ আমার সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকত। উদ্যত শাসনকে কত মিথ্যায় ও ছলনায় যে ঠেকিয়ে রাখতে হ'ত তার আর ঠিকানা নেই, কিন্তু লতুদের ওখানে দেখলুম, ঠিক তার উল্টো। বাবা-মার সঙ্গে তাদের ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ; ঠিক বন্ধুর মতন। অথচ তাদের কেউ লেখাপড়ায় আমার চাইতে খুব ভাল ছিল না। তা ছাড়া অনাত্মীয় পরিবারের মধ্যে এমন ভাবে মেশা এর আগে জীবনে

হয় নি। আমার স্নেহলোলুপ অন্তর তাদের আদরে এমন সাড়া দিলে যে, কিছুক্ষণের জন্যে নিজের বাড়ির কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। হঠাৎ পাশের ঘরের একটা ঘড়ি ঢংঢং ক'রে জানিয়ে দিলে, সাতটা বাজল যে হে স্থবির শর্মা, আর কত আড্ডা দেবে? আজ বরাতে দুঃখু আছে তোমার।

আর নয়। তড়াক ক'রে উঠে পড়লুম। আমার ও লতুর কাঁধে তখনও একটা পাঞ্জা ও একটা ছক্কা চাপানো রয়েছে।

উঠে পড়লুম। আর নয়, আর নয়, আর নয়।

সুজাতা বললে, কাল আসতে হবে কিন্তু।

নিশ্চয় আসব।

লতু বললে, না এলে দেখবে মজা। আজকের হারের শোধ দিতে হবে, মনে থাকে যেন।

চলতে চলতে বললুম, নিশ্চয় আসব।

পথে একবুক জল ঠেলে চলতে চলতে মনে হতে লাগল, কাল নিশ্চয় এসে আজকের হারের শোধ নিতে হবে।

পরাজয়ের বন্ধনে আমার ও লতুর মধ্যে বন্ধুত্ব হ'ল।

সেদিন রাশিচক্রের কি সমাবেশ ছিল বলতে পারি না। সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যের পর ভিজে বাড়িতে ফেরার অপরাধে প্রহার তো হ'লই না, বাবার কাছে কিছু জবাবদিহিও করতে হ'ল না। বরং তিনি আমার অবস্থা দেখে তক্ষুনি এক কাপ গরম চায়ের হুকুম দিয়ে দিলেন।

পরদিন অস্থিরকে নিয়ে লতুদের ওখানে গিয়ে হাজির হলুম। অস্থির ওদের অচেনা নয়। লতুর ছোট বোন সুজাতা ওললিত অস্থিরের সঙ্গে পড়ত, তাকে পেয়ে ওরা ভয়ানক খুশি হয়ে উঠল। এর পর থেকে আমরা প্রায় রোজই বিকেলে লতুদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে লাগলুম।

ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বাবার হুকুমমত আমাদের তিন ভাইকে এক পাতা ইংরেজী, এক পাতা বাংলা ও এক পাতা সংস্কৃত হাতের লেখা লিখতে হ'ত। এ ছাড়া আবার দশটা ক'রে অঙ্ক কষতে হ'ত।

প্রতিদিন সকালবেলায় বাবাকে এইগুলো দেখাতে হ'ত। নিয়মমত এইগুলো দেখাতে না পারায় সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একদিন আমাদের তিন ভাইয়ের কেউ না কেউ মার খেত। আমি আর অস্থির ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি লেখা-টেখাগুলো সেরে ঘুড়ি লাটাই নিয়ে ছাতে উঠে যেতুম। আমাদের ছাত থেকে পাশের বাড়ির ছাত, তার পাশের বাড়ির ছাত ঘুরে সেই সন্ধ্যের সময় নেমে পড়তে বসতুম। ঘুড়ি ওড়ানোটা বাবা বিশেষ পছন্দ করতেন না, তবে রাস্তায় বেরুনোর চাইতে ভাল মনে ক'রে সেটা সহ্য করতেন মাত্র। এই ছাতের ওপরে ওঠা ও সেখান থেকে নেমে আসা পর্য্যন্ত সময়টুকু আমাদের আর খোঁজ হ'ত না।

আগেই বলেছি, ইস্কুলে যাওয়া ও বাড়ির কাজ ব্যতীত বাইরে বেরুনো আমাদের মানা ছিল। বিনা অনুমতিতে অন্য সময় রাস্তায় পা দেবার জো ছিল না। দিন কয়েক লতুদের ওখানে যেতে না যেতেই একদিন ধরা প'ড়ে বাবার কাছ থেকে বেশ কিছু নগদ পাওয়া গেল; আমরাও বুদ্ধি খাটিয়ে আর একটি উপায় আবিষ্কার ক'রে ফেললুম। আমরা ঘুড়ি লাটাই ও সেই সঙ্গে জামা ও জুতো নিয়ে ছাতে উঠে পাশের বাড়িতে লাটাই ঘুড়ি রেখে তাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে লাগলুম। সন্ধ্যে হবার কিছু আগে ঐ প্রণালীতে আবার বাড়িতে ফিরে আসতুম।

কিছুদিন এইভাবে বেশ চলল। ওদের ওখানেই আমাদের লাটাই রেখে আসা গেল। চলছিল বেশ, কিন্তু একদিন আবার ধরা প'ড়ে গেলুম। উত্তম-মধ্যম তো হ'লই, সঙ্গে সঙ্গে ছাতে ওঠাও বন্ধ হয়ে গেল।

এই বাইরে বেরুনো নিয়ে আমাদের তিন ভাইকে বাল্যকালে সব-চেয়ে বেশি দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে। বাবা মনে করতেন, ছেলেরা বাইরে গেলেই তাদের পরকালটি একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাবে। ছেলেদের জগতে ইহকাল ব'লে যে একটা বড় জিনিস আছে এবং সেটি বাঁচাতে না পারলে পরকালটির ঝরঝরানি যে অনিবার্য্য, সে সত্য তখনকার দিনের অনেক অভিভাবকই স্বীকার করতেন না।

বাড়ির মধ্যে ছেলেরা যে নিরুদ্বিগ্নতার আওতায় বেড়ে ওঠে, সে রকম নিরুদ্বিগ্নতা ছেলেবেলায় কখনও উপভোগ করি নি। শুনতুম, লেখাপড়ার প্রতি বালকদের স্বাভাবিক অনুরাগ থাকে, কিন্তু আমার তা ছিল না; বরং বিরাগই ছিল। লেখাপড়া করাকে আমি ভীষণ, ভয়ালি, ভয়ঙ্কর মনে করতুম। শৈশবে ইস্কুলে যাবার আগে বাড়িতে অক্ষরপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহই ছিল, কিন্তু ইস্কুলে ভর্ত্তি হবার পর লেখাপড়ার জন্যে যে দিন থেকে চাপ শুরু হ'ল, সেই দিন থেকে ধীরে ধীরে তার বিরুদ্ধে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণাই সঞ্চিত হতে লাগল। ইস্কুলের বই ছাড়া যে-কোন বিষয়ের যে-কোনো বই আগ্রহের সঙ্গে পড়তুম ও তার মর্ম্মার্থ জানবার চেষ্টা করতুম। পড়ার বই ছাড়া অন্য বই পড়তে দেখলে বাবা যে তার মর্ম্মার্থ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবেন, সেই ভয়ে এই সুখও পেতুম কচিৎ। এই সব কারণে বাড়ির বাইরেই আমি পেতুম স্ফূর্ত্তি, আর যদি সেখানে স্নেহ-ভালবাসার আকর্ষণ থাকত, তা হ'লে পেতুম স্বর্গ।

বাবার ধমক ও প্রহারের জন্যে হয়তো তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি বেড়ে যাওয়া উচিত ছিল। হয়তো মনে হওয়া উচিত ছিল যে, ভদ্রলোক আমাদের জন্যেই চাকরি করেন। সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত শরীর নিয়েই আমাদের পড়াতে আরম্ভ করেন। আমাদেরই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যে অপত্যস্নেহের প্রস্রবণকে রুদ্ধ ক'রে নিজের অন্তরকে নির্ম্মমভাবে পীড়ন ক'রে আমাদের এমন শাসন করেন যে, সন্তানবতী প্রতিবেশিনীরা ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকেন। হয়তো আরও অনেক কিছু মনে করা উচিত ছিল, কিন্তু আমার কল্পনা জীবনের ব্যবহারিক দিকটাকে সর্ব্বদাই উপেক্ষা করেছে, তাই প্রহারের পূর্ব্বে হ'ত ভয় এবং পরে হ'ত রাগ। রাগটা ছিল নিষ্ফল এবং প্রহার থেমে যাবার পরই ভয়টা যেত চ'লে। তাই বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ হওয়ার অভিজ্ঞতা জোরসে পাস হবার পরও লতুদের ওখানে যাওয়া বন্ধ করবার ইচ্ছা তো দূরের কথা, কোন্ সুযোগে আবার সেখানে রোজ হাজিরা দিতে পারা যায়, দিনরাত দুই ভাইয়ে তারই পরামর্শ চলতে লাগল।

পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে সুযোগও এসে গেল। এসে গেল বললে বোধ হয় ভুল হবে, সুযোগ ক'রে নেওয়া গেল। ছেলেবেলায় সুযোগ জুটিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আমার ও অস্থিরের বুদ্ধি খেলত অদ্ভুত ও চমকপ্রদ। এ বিষয়ে অস্থির আমার চাইতে ঢের বেশি ওস্তাদ ছিল। ভাগ্যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতিভার এই দিকটা ম্লান হয়ে এসেছিল, নইলে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াত, তা ঠিক বলা যায় না। সুযোগকে কি ক'রে টেনে নিয়ে এসে কাজে লাগাতুম, সেই কথাটা বলি।

আমাদের দরিদ্রের সংসার হ'লেও চাকরবাকর, ঝি, আশ্রিত প্রতিপাল্যের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। এ ছাড়া বাবার ও আমাদের তিন ভাইয়ের কুকুরের শখ থাকায় বিলাতী অভিজাত-সম্প্রদায়ের গুটি পাঁচ-ছয় সারমেয়নন্দন আমাদের বাড়িতে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে পালিত হ'ত। তা ছাড়া মার নিজের ছিল ছাগলের শখ। বাড়ির একতলা থেকে তেতলা অবধি গুটি বারো-তেরো ছাগল অবাধে বিচরণ করত। এই মানুষ, কুকুর ও ছাগলের প্রত্যেকটিকেই মা অতি যত্নে পালন করতেন। এদের প্রত্যেকে কে কি খেতে ভালবাসে, কার কি সহ্য হয় না, সব তাঁর একেবারে নখদর্পণে থাকত। বিশেষ ক'রে জানোয়ারদের তদারক সম্বন্ধে তাঁর নজর ছিল খুবই কড়া। প্রত্যেকে ঠিক সময়ে তার নির্দ্ধারিত খাদ্য পাচ্ছে কি না, তা তিনি নিজে দেখাশোনা করতেন। জানোয়ারদের প্রতি মার এই দুর্ব্বলতাটা আমরা নিজেদের সুযোগে খাটিয়ে নিলুম।

দুই ভাই বিমর্ষ হয়ে রকে ব'সে আছি, সন্ধ্যে হয় হয়, এইবার পড়তে বসতে হবে, এমন সময় ঘাসওয়ালা এল ছাগলদের ঘাস নিয়ে। ঘাসওয়ালাকে দেখেই মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের প্ল্যান তৈরি হ'য়ে গেল। তাকে ব'লে দিলুম, মা ব'লে দিয়েছেন, আজ থেকে আর ঘাস নেওয়া হবে না।

আমাদের কথা শুনে সে বেচারীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এমন বাঁধা খদ্দের হঠাৎ কি কারণে বিগড়ে গেল ভেবে সে হতভম্বের মত আমাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমরা বললুম, সব ছাগল বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মা বলেছেন, ছাগল বড় অপয়া জাত।

ঘাসওয়ালা বেচারী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে আবার ঘাসের বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে চ'লে গেল দেখে আমরা গিয়ে পড়তে বসলুম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে, ঘাস দিয়ে গিয়েছে?

কই, না।

আবার কিছুক্ষণ পরে মা বললেন, দেখ তো, ঘাস দিয়ে গিয়েছে কি না। ও আবার মাঝে মাঝে কারুকে না জানিয়েই ঘাসের বোঝা ফেলে দিয়ে চ'লে যায়।

আমি উঠে মোড় অবধি গিয়ে ফিরে এসে বললুম, ঘাস দেয় নি মা।

মা সেই যে বকতে শুরু করলেন রাত্রি এগারোটায় গিয়ে তা থামল।

প্ল্যান আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল। পরদিন ইস্কুল থেকে এসেই শুনলুম, মা ভীষণ চেঁচামেচি করছেন। রাত্রে ঘাস খেতে পায় নি ব'লে ছাগলেরা দুধ দিচ্ছে না। আমরা দুজনেও ছাগলের দুঃখে দলিত-গলিত হয়ে ঘাসওয়ালার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সম্বন্ধে অনেক রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। অনেক বকাবকির পর ঠিক হ'ল যে, আমরা দুজনে রোজ ঘাস নিয়ে আসব। এতে আমাদের কষ্ট হবে বটে, কিন্তু সেজন্যে ছাগলগুলোকে কষ্ট দেওয়া কিছু নয়। আহা, অবোলা জানোয়ার!

পরদিন থেকে আমরা ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে হাতের লেখা ইত্যাদি কর্তব্যকর্ম সম্পাদন ক'রে ঘাস আনতে যেতে লাগলুম। ঘাস আনবার প্রোগ্রামটা ছিল এই, বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে লতুদের বাড়ি যাওয়া। সেখানে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে ও খেলা ক'রে মিনিট দশ-পনেরো বেলা থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়তুম ঘাস আনতে। তেরো আঁটি ভিজে নোনাঘাস দুই ভাইয়ে সমান ভাগ ক'রে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ফিরতুম বাড়িতে।

লতুদের বাড়ির সবার সঙ্গে আমাদের দুজনের এত ভাব হয়ে গিয়েছিল যে, একদিন না যেতে পারলে সেখানে একেবারে হাহাকার

উপস্থিত হ'ত। পরদিন তাদের বাবা মা থেকে আরম্ভ ক'রে চাকরদের পর্য্যন্ত অনুপস্থিতির জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত।

মাস কয়েক বেশ চলল। একদিন ইস্কুল থেকে এসে শুনলুম, ঘাসওয়ালা ব্যাটা দুপুরবেলায় এসে মার সঙ্গে দেখা ক'রে আবার ঘাস দেবার ব্যবস্থা ক'রে গেছে।

হায় ভগবান! এত দুঃখও তোমার ভাণ্ডারে আছে! সেদিনও কিন্তু নিয়মিত সময়ে লতুদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে সমস্তক্ষণটাই ঘাসওয়ালার বিশ্বাসঘাতকতা মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগল। আবার নতুন সুযোগ আহরণের পরামর্শ শুরু হয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যের সময় দু-একটা চড় ও কানেটি দিয়েই বাবা ক্ষান্ত হলেন। পড়তে ব'সে যাওয়া গেল।

দিন দুই আর লতুদের বাড়িমুখো হলুম না। তৃতীয় দিন অস্থির সেখানে গেল, আমি বাড়িতে রইলুম। বাবা আপিস থেকে ফেরবার আগেই সে ফিরে এল। পরের দিন আমি গেলুম। এই রকম চলতে লাগল।

একদিন অস্থির ওখান থেকে ফিরে এসে বললে, সুজাতার অসুখ করেছে।

পরদিন দুই ভাইয়ে একসঙ্গে লতুদের ওখানে চ'লে গেলুম। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে পেয়ে তাদের ভাইবোনদের মধ্যে খুশির হুল্লোড় লেগে গেল। দেখলুম, সুজাতা শুয়ে রয়েছে, তার গলায় একটা ফ্ল্যানেল বাঁধা, গলায় ভয়ানক ব্যথা। জ্বর রয়েছে, বুকেও খুব বেদনা।

আমরা তাকে ঘিরে বসলুম। আমাদের পেয়ে সুজাতাও তার রোগ-যন্ত্রণা ভুলে গেল। কয়েকদিন পরে বেশ লাগতে লাগল। আমরা ঠিক করেছিলুম, বাবা বাড়ি ফেরবার আগেই চ'লে আসব, কিন্তু সুজাতা কিছুতেই উঠতে দেয় না। বাবা বাড়ি ফেরবার আগেই আমাদের যাওয়া যে বিশেষ প্রয়োজন, সে কথা সেখানে প্রকাশ করতে পারি না, ওদিকে লতু ও সুজাতা কিছুতেই ছাড়ে না। শেষে অনেক কষ্টে কাল তাড়াতাড়ি আসবার প্রতিজ্ঞা ক'রে সেদিন পালিয়ে এলুম।

বাড়িতে ফিরে দেখি যে, বাবা এসে গিয়েছেন। বার কয়েক খোঁজও

হয়েছিল। বেশ কিছু প্রহার সেবান্তে পাঠে নিযুক্ত হওয়া গেল। বাবা বললেন, তোমাদের বাইরে-যাওয়া রোগ আমি ছাড়াতে পারি কি না একবার দেখব।

পরের দিন সাহস ক'রে আর লতুদের ওখানে যেতে পারলুম না। দিন দুই পরে সেই পুরানো কায়দায় অস্থির সেখান থেকে চট ক'রে একবার ঘুরে এল। অস্থির বললে, সুজাতার নিমোনিয়া হয়েছে, কথা বলতে পারছে না।

রাতে ঘুমোবার আগে খালি সুজাতার কথাই মনে হতে লাগল। সুজাতা কি ভাল হবে? কতদিনে সে একেবারে সেরে উঠবে? নীলরতন সরকার যখন দেখছেন, তখন আর কোনও ভাবনা নেই। আজকাল নিমোনিয়ার অনেক ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে, এই ভাবতে ভাবতে অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথমে সুজাতার কথা মনে পড়ল।

সারাদিন দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটিয়ে বিকেলে অস্থিরকে বাড়িতে রেখে সুজাতাদের বাড়ি চ'লে গেলুম।

রোগিণীর ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। একটা তীব্র ঝাঁজালো গন্ধে ঘর ভরপুর হয়ে রয়েছে। সন্তর্পণে সুজাতার কাছে এগিয়ে গেলুম, তার দুই চোখ অর্দ্ধনিমীলিত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। লতু তার মাথার কাছে ব'সে, মা এক পাশে ব'সে আছেন। আমি কাছে যেতেই তিনি মুখ তুলে বললেন, কে, স্থবির? আয়, এদিকে ব'স।

মায়ের দুই চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ।

আমি ধীরে ধীরে লতুর পাশে বসলুম। মা বললেন, কালও তোদের নাম করেছে কতবার।

সুজাতার দিকে চাইলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারলুম না। কি এক অস্বাভাবিক ধরনের নিশ্বাস টানছিল সে। উজ্জ্বল গৌর তার বর্ণের ওপর কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। জেগে আছে কি ঘুমিয়েছে, তা বুঝতে পারলুম না। সুজাতার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে লতুর দিকে চাইলুম। রহস্যময় দৃষ্টিতে সে আমার দিকে অনিমেষ চেয়ে রইল। গভীর সে দৃষ্টির মধ্যে কি মৃত্যু লুকিয়েছিল? তার দিকেও

চেয়ে থাকতে পারলুম না, মায়ের দিকে চাইলুম। তাঁর চোখে চোখ পড়তেই তিনি আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কেমন আছিস বাবা? চেহারাটা তো ভাল দেখাচ্ছে না!

বাবা ফেরবার আগেই যে বাড়ি পৌঁছতে হবে সে জ্ঞান তখনও হারাই নি, তাই মিথ্যে ক'রেই বললুম, শরীরটা তেমন ভাল নেই।

মা বললেন, তা হ'লে তাড়াতাড়ি বাড়ি যা।

কিছুক্ষণ ব'সেই বাড়ি চ'লে এলুম।

পরের দিন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আধ মাইল ঘুরে ইস্কুলে যাবার আগে সুজাতাকে দেখতে গেলুম। তাকে তখন গ্যাস দেওয়া হচ্ছে; শুনলুম, সে গ্যাস নিতে পারছে না। ঘরের মধ্যে ঢুকতে আর সাহস হ'ল না, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে থাকবারও উপায় ছিল না, তাড়াতাড়ি যেতে হবে, নইলে ইস্কুল ব'সে যাবে। লতু ব'লে দিলে, তাড়াতাড়ি আসিস।

ইস্কুল থেকে ফিরে নাকে-মুখে চাট্টি গুঁজে দুই ভাই ছুটলুম সুজাতাকে দেখতে। তাদের গলির মোড়ে পৌঁছেই চীৎকার শুনে বুঝতে পারলুম, সুজাতা চ'লে গেছে।

সেইখান থেকেই কাঁদতে কাঁদতে ছুটলুম তাদের বাড়িতে। বাড়ির ভেতরের সে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের খুঁটিনাটির কথা আজ আর সমস্ত মনে নেই। পুজোবাড়িতে শাঁখ, ঘণ্টা, জয়ঢাক, কাঁসর মিলিয়ে যে অখণ্ড আওয়াজ বাতাসে গুমরোতে থাকে, তেমনই নানা কণ্ঠের চীৎকারোত্থিত এক অখণ্ড আওয়াজ নিষ্ফল অভিযোগে সেখানে আর্তনাদ করছিল। কত পুরুষ ও নারী যে সেখানে এসে জমেছে, তাদের এতদিন দেখি নি। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই হাহাকার করছে—সুজাতা চ'লে গেছে। • • •

মৃতদেহ যে ঘরে সে ঘরে মেয়েদের ভিড়। তাঁরা সকলেই কাঁদছেন—কেউবা চীৎকার ক'রে, কেউবা নীরবে। লতু ও তার বাবা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিলেন, আমাদের দেখে তাঁরা দুজনেই চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। আমরা দুজনে একেবারে দৌড়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম।

দেখলুম, সুজাতার মৃতদেহ খাটের ওপরে শায়িত। তাকে স্নান করিয়ে নতুন একখানা শাড়ি পরানো হয়েছে। রুক্ষ চুলগুলিকে যতদূর সম্ভব গুছিয়ে আঁচড়ানো। কৈশোরের চাপল্য ও জীবনের চাঞ্চল্যের চিহ্ন সে মুখে নেই, এতদিন রোগযন্ত্রণার যে ছায়া তার মুখে দেখেছিলুম তা একেবারে অপসারিত হয়ে গিয়েছে। শান্ত সৌম্য সে মুখমণ্ডল, বুকের ওপরে দুটি হাত জোড় করা, সে মূর্তি আমার মনে একাধারে শোক ও শ্রদ্ধার প্রস্রবণ ছুটিয়ে দিলে। মনে হ'ল, আমাদের এই অতি নিকট বন্ধু পরম শান্তিতে মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করেছে। সে যেন আর আমাদের নয়, আমাদের চাইতে অনেক দূরে অনেক উঁচুতে চ'লে গেছে। সংসারের প্রতি দারুণ অভিমানে তার মুখে এই যে গাম্ভীর্য্য ফুটে উঠেছে, কোন কিছুতেই আর তা ভাঙবে'না।

অস্থির ঘরের মধ্যে ঢুকে কিছুক্ষণ সুজাতার মৃতদেহের প্রতি শঙ্কিত বিস্ময়ে চেয়ে থেকে চীৎকার ক'রে তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল।

মৃতদেহ ঘিরে ব'সে যে সব মহিলারা এতক্ষণ কান্নাকাটি করছিলেন, হঠাৎ অস্থিরের এই কাণ্ড দেখে তাঁরা প্রথমে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, তারপরে সেই শোকাশ্রুপ্লুত চোখগুলিতে ফুটে উঠতে লাগল বিশ্বজোড়া কৌতূহল—কে এই ছেলেটি?

অস্থিরের চীৎকার শুনে সুজাতার বাবা ঘরের মধ্যে এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

লতুদের বাড়িতে তাদের এক আধপাগলা মামা থাকত। আধপাগলা হ'লে কি হবে, সেই তাদের সংসারের বিষয়-আশয় থেকে আরম্ভ ক'রে সব দেখাশোনা করত। মামা সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে সুজাতার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। এগারো বছরের ললিতও তাদের সঙ্গে গেল, কারুর মানা সে শুনলে না।

সেদিনকার বিকেলের একখানি মধুর ছবি আজও আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে, স্মৃতির পরশ লাগলেই সেটি ঝকঝক ক'রে ওঠে। দোতলার খোলা ছাতে একখানা শতরঞ্চি পাতা। মধ্যিখানে লতুর বাবা অস্থিরকে কোলে নিয়ে ব'সে আছেন। অস্থির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর তিনি মধ্যে মধ্যে তাকে বুকের মধ্যে চেপে

ধরছেন। এক ধারে নতুর মা ব'সে আছেন, তাঁর দক্ষিণ উরুতে মাথা রেখে নতু শুয়ে আছে, বাঁ পাশে আমি ব'সে, মা ধীরে ধীরে বাঁ হাতখানি আমার পিঠে বুলোচ্ছেন। শোকের আগুনে আমাদের বয়েস ও সাংসারিক অবস্থার তারতম্য ঘুচে গেছে। সকলেই আত্মহারা, সবারই মন একই কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরছে। আমাদের চারিদিকে বাড়ির আত্মীয়, বন্ধু ও প্রতিবেশীর দল, নারী ও পুরুষ—কেউবা ব'সে, কেউবা দাঁড়িয়ে।

বেলা প'ড়ে আসার সঙ্গে একে একে সকলে বিদায় নিতে লাগলেন। আমাদের চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল, সেই অন্ধকারে আমাদের চোখে ঝরতে লাগল অশ্রু আর মন ফিরতে লাগল অমর্ত্যালোকের সন্ধানে।

সময়ের জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ নতুর মা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, স্থবির, অস্থির, এবার বাড়ি যাও বাবা। তাঁরা আবার ভাববেন।

নতুদের একজন চাকর চলল আমাদের বাড়ি অবধি পৌঁছে দিতে। বাড়ির দিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই আমরা চাকরকে বিদায় দিয়ে রাস্তার ধারে গরু-ঘোড়ার জল খাবার জন্যে যে লোহার চৌবাচ্চা তখন থাকত, তারই একটাতে বেশ ক'রে চোখ-মুখ ধুয়ে ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে বাড়িতে ঢুকলুম। পথে ঠিক হ'ল যে, বলা হবে, গড়ের মাঠে খেলা দেখতে গিয়ে ফেরবার সময় পথ হারিয়ে গিয়েছিলুম।

পড়ার ঘরের কাছে গিয়ে দেখলুম, বাতি জ্বলছে বটে, কিন্তু সেখানে বাবাও নেই, দাদাও নেই। তাড়াতাড়ি নিজেদের ঘরে গিয়ে জামা ছেড়ে বই নিয়ে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় মা এসে বললেন, পোড়ারমুখোরা, গিয়েছিলে কোথায়? আজ যে খুন ক'রে ফেলবে। শুনলুম, দাদাকে নিয়ে বাবা বেরিয়েছেন আমাদের খোঁজে।

পড়তে বসলুম। অচিরেই সাংঘাতিক রকমের একটি ফাঁড়া রয়েছে জেনেও মনের মধ্যে কোনও ত্রাসই হচ্ছিল না। নিদারুণ মানসিক ক্লান্তি সারা দেহমনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে লাগল।

মিনিট পনরো পরেই বাবা দাদাকে নিয়ে ফিরে এলেন। মিনিট

পাঁচেক জিজ্ঞাসাবাদের পরই প্রহার শুরু হ'ল, প্রহারের সরঞ্জাম আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল।

সেদিনকার প্রহারের বিবরণ আর দোব না। শুধু এইটুকু বললেই হবে যে, উত্থানশক্তিবিরহিত অবস্থায় আমরা মেঝেতে প'ড়ে গোঁ-গোঁ করছি, আর বাবা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে আমাদের হত্যা করবার জন্যে বঁটি খুঁজছেন, এমন সময় কয়েকজন প্রতিবেশিনী আমাদের বাড়িতে ঢুকে মাকে গালাগালি করতে আরম্ভ করায় তিনি বাবাকে নিরস্ত করলেন।

চাকরেরা তুলে নিয়ে আমাদের বিছানায় শুইয়ে বাতি নিবিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। আমাদের চোখ দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রু ঝ'রে পড়তে লাগল বালিশে। পিতা ও পরম পিতা উভয়ের অত্যাচারে জর্জ্জরিত সেই দুটি বালককে সুপ্তি এসে মুক্তি দিলে।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

বাংলা প্রবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুতরাং মরদের মরদের বলিহারি প্রায়ই শোনা যায়—

মরদ চলেছে পথে, দস্তার কোস্তা হাতে॥
মরদ বড় তেজী, তাড়া করেছে বেঁজি॥
মরদ বড় ভারী, তার ভেড়া পাগড়ি॥
মরদ বড় হেংগা, তার শনকাঠিখান ঠেংগা॥
মরদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান॥
তিনি আছেন রাজপথে, দস্তো ঘাসের কোঁৎকা হাতে॥
গজপৃষ্ঠে যে বা যায়, কেউ দেখে সে ডরায়॥
মরদের নেই সীমে, রথ দিয়েছে নিমে॥
জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসের রথ॥
বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট॥
মরদ বটি, চিঁড়ে কুটি, যখন যেমন তখন তেমন॥
একশ কোঁড়া পথে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান॥

কচুর বেটা ঘেঁচু, বড় বাড়েন ত মান॥
আমার নাম রণরঘু, ভিটেতে চরাই ঘুঘু॥
আমার নাম নিতাই, এক খাই এক খিতাই॥
পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হ'ল বক্র,
গোঁড় গুগুলি, বলে এরা—আমরা শঙ্খ।
ডেংরা কাক বলে—আমি করব একাদশী,
লেজকাটা কুকুর বলে—যাব বারাণসী॥

পরচ্ছিদ্রের অন্বেষণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা, কিন্তু আত্মচ্ছিদ্রের কথা মনে থাকে না—

ছুঁচ বলে—চালুনি তোর পোঁদ কেন ছেঁদা।
আপন দোষ দেখেন না যার সর্বাঙ্গেই বেঁধা॥
পরের দোষ আকাশ জোড়া, আপন দোষ ছোটো।
চালুনি বলে—ধুচুনি ভায়া, তুমি বড় ফুটো॥
চালুনির পোঁদ ঝর ঝর করে, চালুনি ছুঁচের বিচার করে॥
ওল বলে—মানকচু ভায়া, তুমি নাকি মন্দ॥
গুয়ে বলে—গোবরদাদা, তোর গায়ে বড় গন্ধ॥
রসুন বলে—কাঁচকলা ভাই, তোর বড় খোসা॥
আনারস বলে—কাঁঠাল ভাই, তোর গা বড় খসখসে॥
পেঁচা পিঁপড়েকে বলে—সর লো সর, খেঁদড়ামুখী॥
আত্মচ্ছিদ্র ন জানাতি, পরচ্ছিদ্র পদে পদে॥
পরের ছিদ্র বেল, নিজের ছিদ্র সরষে॥
ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে, সবার একদিন আছে শেষে॥
আজ খেয়ে নেড়া নাচে, কালকে গোবিন্দ আছে॥

সুতরাং, আপন ও পর এই পার্থক্যের প্রতি মানুষের মন খুবই সজাগ। এ সম্বন্ধে বহুসংখ্যক প্রবাদ আছে, তাহার কতকগুলি এখানে চয়ন করা যাইতে পারে—

আপনি রাঁধি, আপনি খাই, আপনি তার বলিহারি যাই॥
আপনার বেলা আঁটাআঁটি, পরের বেলা দাঁত-কপাটি॥
আপন বেলা চাপন-চোপন, পরের বেলা কুরকুরে মাপন॥
পরের ভিটায় জরিপ এলে—মাপ রে মাপ।
নিজের ভিটায় জরিপ এলে—বাপ রে বাপ॥
আপনার বেলায় ছ কড়ায় গণ্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা॥
আপনারটিতে খোদার দোহাই, পরেরটিতে আনু খাই॥

তোরে, না, মোরে, প্রতি ঘরে ঘরে ॥

আপন চোখে সোনা বর্ষে, পরের চোখে রূপা।
যত লোকে কথা কয় গাপা আর গপা ॥

আপন ছাগল বেঁধে রাখি, পরের ছাগল ছেড়ে দিই ॥

আপন ঘোল কেউ টক বলে না ॥

আপন কোলে ঝোল সবাই টানে ॥

আপন কেটে পাই, চিঁড়ে কুটে খাই ॥

আপনি বড় ভালো, তাই পরকে বলে কালো ॥

আপন বগলে গন্ধ নেই, পরের বগলে গন্ধ ॥

আপনার পানে চায় না শালী, পরকে বলে টেঁবো-শালী ॥

আপনার হাতে পড়লে হাঁড়ি, ভাত রেঁধে আমানি বাড়ি

মোর ঢাকা থাক্, তোর বিকিয়ে যাক্ ॥

কাঠালটি আমায় দাও, বীচি গুণে কড়ি নাও ॥

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা ॥

পরের মাথায় হাত বুলান ॥

পরের গোয়ালে গোদান ॥

পাসরে পাসরে মরি, পরের হাঁড়ির ভাত নিয়ে নিজের হাঁড়ি ভরি ॥

আপনার কথা পাঁচ কাহন ॥

পরের মাথা কেটে নাপিত ॥

পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাত ॥

পরের জিনিস পায়, হেগো পোঁদে খায় ॥

পরের ধন, আপন ছালা, যত ইচ্ছা ভরে ফেলা ॥

পরের ভাত, আপন হাত ॥

আপনি নেঙাই, পরকে ভেঙাই ॥

আমার নাম যমুনাদাসী, পরের খেতে ভালবাসি।
পরকে দিতে জ্বরে গা', পরের নিতে সরে গা' ॥

আমার দইয়ের এমনি গুণ, এক সের দইয়ে তিন সের নুন ॥

আপন ঘরের ধোঁয়ায় নিজের চোখ কাণা ॥

পরের ধনে পোদ্দারগিরি, লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী ॥

পরের ধনে যমের বাপ ॥

পরের পিঠে বড় মিঠে ॥

পরের ভাতে কুকুর পোষা ॥

পরের কাপড়ে ধোপার নাট ॥

পরের খোল খাবার লোভে নিজে গোঁফ কামান॥
পরের ঘি পেলে, প্রদীপ দেয় মেলে॥
পরের ডাল, পরের চাল, নন্দে স্বরেন বিয়ে॥
পরের ছেলে ছেলেটা, খায় দেখ এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা।
নিজের ছেলে ছেলেটি, খায় শুধু এতটি, বেড়ায় যেন লাটিমটি॥
পরের ফোড়া, ঢেঁকি দিয়ে গালা॥
পরের ধন, আপনার পরমায়ু, কেউ অল্প ক'রে দেখে না॥
পরের লেজে পা পড়লে ভুলোপানা ঠেকে।
নিজের লেজে পা পড়লে কেঁক করে ডাকে॥

কিন্তু পর আপন হয় না, পরকে বিশ্বাস নাই, পর-প্রত্যাশী হওয়া বা পরহিংসা বিড়ম্বনামাত্র—

পর আর পরমেশ্বর॥
পরচিত্ত অন্ধকার॥
পরের মন, আঁধার কোণ॥
আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পরবুদ্ধিতে বাদশা নই॥
আপন বুদ্ধিতে তর, পরবুদ্ধিতে মর॥
নিজের বুদ্ধিতে ভাত, পরের বুদ্ধিতে হাভাত॥
পর-প্রত্যাশী নর, উপোস ক'রে মর॥
পর-প্রত্যাশী ধন, পর নিয়ে গমন॥
পর রেখে ঘর নষ্ট॥
পরে দেবে চেয়ে, পেট ভরবে খেয়ে?
পরের কথায় লাথি চড়, নিজের কথায় ভাত-কাপড়॥
পরের ঘর ঢুকতে ডর, নিজের ঘর হেগে ভর॥
পরের ছেলে খায়, আর পথ পানে চায়॥
পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে॥
পরের দুধে দিয়ে ফু, পুড়িয়ে এলেন আপন মু'॥
পরের দেখে তোলে হাই, যা ছিল তাও নাই॥
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ॥
নিজে ম'রে জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলান॥
পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ॥
পরের মুখে ঝাল খাওয়া॥
আপন চরকায় তেল দাও॥
আপন ঘরে সবাই রাজা॥

আপন কোটে কুকুরও বড়॥
আপনার মান আপনি রাখ, কাটা কান চুল দিয়ে ঢাক॥
আপন মুখ আপনি দেখ॥
আপনার কামার, আপনার খাঁড়া, যেখানে পড়াবি, সেইখানেই পড়া॥
ছিঁড়ি কুটি নিজের সুত, মারি ধরি নিজের পুত॥
আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা॥
আপনার আপনি, ডোর আর কপনি॥
আপনার হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটোপাত॥
আপন ধন পরকে দিয়ে, দৈবকী বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে॥
আপন পাঁজি দিয়ে পরকে দৈবজ্ঞ বেড়ায় পথে-পথে॥
আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
নিজে আগে সামাল কর, পরে গিয়ে পরকে ধর॥
নিজের আছে ত খাও, নইলে ফেলফেলিয়ে চাও॥
সময় গুণে আপ্ত পর, খোঁড়া গাধার ঘোড়ার দর॥
ফেল কড়ি, মাখ তেল॥
দয়া আছে, মায়া আছে, গলা ধরে কাঁদি।
আধ পয়সার আটটি কলা, পরাণ গেলেও না দি'॥
চাচাই বল, কাকাই বল, কলাটি পাঁচ কড়া॥
ফেল কড়ি, ত দেব বড়ি॥

ভালবাসার বিচিত্র পদ্ধতি ও নারী জাতির ভালমন্দ সম্বন্ধে প্রবাদের অভাব নাই, কিন্তু অধিকাংশরই বিদ্রূপ, তীক্ষ্ণ ও তিক্ত। দাম্পত্য-প্রীতি ও দাম্পত্য প্রহসনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, এখন প্রেম সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি প্রবাদ তুলিয়া দেওয়া হইল—

যার ইষ্টি তার মিষ্টি।
চোখে চোখে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ॥
কাছে আছে যতক্ষণ, আমার আমার ততক্ষণ।
পথে গেলে পোড়ে মন, বাড়ি গেলে ঢনঢন্॥
ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমন চুণ।
বেশি হলে পোড়ে গাল, কম হলে লাগে ঝাল॥
পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, সে পিরীতে কিবা কাজ॥
মনেরে পাথর করে যেই, পিরীত-পথের পথিক সেই॥
যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম।
যারে যেমন গড়েছে বিধি, সেই তাতারের পরম নিধি॥

পিরীতের নৌকা পাহাড়েও চলে॥
চেতনেতে অচেতন, পিরীতে যার টানে মন॥
পিরীত যখন জোটে, ফুট্‌কলাই ফোটে।
পিরীত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে॥
পিরীত আর গীত, জোরের কাজ নয়॥
পিরীত থাকলে তেঁতুলপাতায় দুজন শোয়া যায়।
অপিরীতে মানপাতায় জায়গা না কুলায়॥
পিরীত, আগুন, কাস—রয় না অপ্রকাশ॥
পিরীতের কত খেলা বুঝে ওঠা ভার।
চুলের সাঁকোয় তুলে দিয়ে করল সাগর পার॥
পিরীতের পেত্নীও ভাল॥
মিষ্টির মধু, ইষ্টির বধু॥
অতিভাব যেখানে, নিত্যি যাবে সেখানে।
যদি যাবে নিত্যি, ঘটবে একটা কীর্ত্তি॥
যেখানে কম জোর, সেখানে ছেঁড়ে ডোর॥
যেখানে নেই আসল মায়া, সেইখানেই বেশি আহা॥
পুরুষ আর স্ত্রী, আগুন আর ঘি॥
ভাবে ডগ্‌মগ্‌ তেলাকুচো, হেসে মরে যত কালো ছুঁচো॥
যেখানে গুড়, সেখানে পিঁপড়ে॥
মধুপান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি॥

কিন্তু যাঁহারা পুরুষের ব্যাখ্যা করেন ও বলেন—'পুরুষের ভালবাসা, মোল্লার মুরগী পোষা'—সেই মেয়েদের স্বরূপ ও গুণ কীর্ত্তন, অনেক সময় মেয়েদেরই মুখে, কিছু কম যায় না, বরং মাঝে মাঝে ভব্যতার বাহিরে চলিয়া যায়—

গড় করি মেয়েদের পায়, ধানভানা চাল ঠাকুরে খায়॥
নারীর বল, চোখের জল॥
তুফানে যে হাল ধরে না, সেই বা কেমন নেয়ে।
পড়লে কথা বুঝতে নারে, সেই বা কেমন মেয়ে॥
ধার বোঝে না, চর বোঝে না, সেই বা কেমন নেয়ে।
টিপ বোঝে না, টাপ বোঝে না, সেই বা কেমন মেয়ে॥
তিন মাইয়া যেখানে, কাজীর বিচার সেখানে॥
নদী, নারী, শৃঙ্গধারী—এ তিনে না বিশ্বাস করি॥
সিঁড়ি তুমি কার? যে যায় তার॥

ঝাল, টক আর কড়া ভাতার ॥*
ছাদন-দড়ি গোদা-বাড়ি, যে আমার আমি তারি ॥
নাও, ঘোড়া, নারী—যে চড়ে তারি ॥
মেয়ে চিনি হাসে, পুরুষ চিনি কাসে ॥
যার হাতে খাইনি, সে বড় রাঁধুনী।
যার সঙ্গে ঘর করিনি, সে বড় ঘরণী ॥
গরবের গরবিনী, এই পরেন নাকে নথ, এই পরেন কানে ॥
সতী হবি কবে? না, সে মরেছে যবে ॥
জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডান ॥
সব জন্তু মোট বয়, ধরা পড়েছে গাধা।
সবাই সতী করলায়, ধরা পড়েছে রাধা ॥
সবে মিলে খাবে ননী, বাঁধা পড়বে নীলমণি ॥
শনিবারেও হাট, বুধবারেও হাট।
সহজে রাধা কলঙ্কিনী, সঙ্গে চিতির হাট ॥
মাগ ভাতারের দেখা নেই, ষষ্ঠীপুজোর ধুম ॥
যতই কর শিব-সাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না ॥
সাতভাতারীর পাঁয়তারা, বৃদ্ধকালে সতী হয় ॥
মাছ খায় না মহুলী, পাতে তিনটে দিনুসে।
কি খায় না মহুলী, কোণে তিনটে দিনুসে ॥
সকল ব্রত করলেম সখী, বাকি আছে ভীম একাদশী ॥
সকল পাখীতে মাছ খায়, মাছরাঙার কলঙ্ক ॥
ঘর করলাম, ব্রত করলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি।
যৌবনকালে রঙ্গ করে বৃদ্ধকালে সতী ॥
বৌ হয়ে এলাম, বেশ্যা হলাম, কুল করলাম ক্ষয়।
এখন কিনা ভাতার শালা ধমকে কথা কয় ॥
বারো কাঁদি নারকেল, তের কাঁদি কলা।
আজ আমাদের রাণীর উপবাসের পালা ॥
ভবী হল বনবাসী, বাসনকোসন একরাশি ॥
ভাবনী লো ভাবনী, তোর ঘর পড়ে যায়।
যাক্‌গে মোর ঘর পড়ে, মোর ভাবন বয়ে যায় ॥
মিষ্টি লাগল ছাই (=পিঠের পুর), স্বামী-পুত্তকে নাই ॥
লাজের বহুড়ী আগে হাঁটে ॥

লোকলজ্জায় রাঁধি-বাড়ি, পেটের জ্বালায় খাই।
লজ্জাসরম আছে ব'লে কাপড় প'ড়ে যাই॥
সাত রাঁড়, এক এয়ো, যার কাছে যাই সেই বলে—আমার মত হয়ো॥
সাতভাতারী সাবিত্রী॥
ভাবনা কি তোর, হাবী, তোর পেটের তলায় যে ধন আছে
তাই ভাঙিয়ে খাবি॥

ভাল ভাল করে গেনু কালোর মার কাছে।
ছেলের মা বলে—আমার বেটার সঙ্গে আছে॥
ভালমানুষের কাছে ব'সে খাই গুয়াপান।
অমানুষের কাছে গিয়ে কাটাই দুটি কান॥
কপালে ছিটে-ফোঁটা, তুম্বি ঝুলি হাতে।
মাইরি দিদি, তোর মাথা খাই, কিছু নেইক তাতে॥
দেখে গেছ সেই, নিয়ে বসেছি এই, তবু আবাগীরা বলে কই কই॥
কাঁকালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কে, কাল মঙ্গলবার করবে যে।
ও ত বরং দাঁড়িয়ে আছে, আমার শুনে কাঁকাল ভেঙে গেছে॥
দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি।
যে ঘরেতে রাঙা বউ, সেই ঘরেতে চুরি॥
নাক নেই বেটীর নথের সখ, ফেল্না বেটীর কত ঠমক॥
মরদের জিদে বাদশা, মাইয়ার জিদে বেশ্যা॥

এইরূপ সাংসারিক জীবনের বিবিধ বিষয়ের বিবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। উপরের উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, একই ধরণের বা মূলত একই বিষয়বস্তু লইয়া, নানা অভাস্ত পদার্থের চিত্র অবলম্বন করিয়া, একাধিক প্রবাদ-বাক্য রচিত হইয়াছে। আগে আমরা ছুঁচ ও চালুনি সম্বন্ধে সুপরিচিত প্রবাদের বিভিন্ন রূপান্তর দেখিয়াছি, তেমনই—

উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ॥

এই সুপ্রসিদ্ধ প্রবচনটি বিবিধ সরসরূপে দেখিতে পাই—

হাটে কলা, নৈবেদ্যায় নমঃ॥
গাছে ফুল, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥
ফাটলে পড়ল নাড়ু, গোপালায় নমঃ॥ ইত্যাদি

অল্প যে তুচ্ছ নয় বা, অল্পেও বৈশিষ্ট্য আছে, এ সম্বন্ধে অনেকগুলি একই ধরণের প্রবাদ আছে—

অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী॥

অল্প আগুনে শীত হরে, বেশি আগুনে পুড়িয়ে মারে॥
অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়, অনেক বৃষ্টিতে সাদা হয়॥
অল্প মারে কাঁদে বাঁদী, অল্প বোঝায় ফাটে চাঁদি॥
বোঝার ওপর শাকের আঁটি॥
অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর॥
অল্প জলের মাছ, ফরফরানি বেশি॥
আধ গাগরী জল, করে ছলছল॥
অল্প আগুনে তামাক খাওয়া, আর ছোট লোকের খোসামোদ করা॥
অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও॥
ধানি লঙ্কা॥
সরষের দানা ছোট হলেও, ঝাল কম নয়॥
ছোট কলসীর বড় কানা॥
সজনে শাক বলে—আমি সকল শাকের হেলা।
আমার বোঁক পড়ে কেবল টানাটানির বেলা॥
ছোট কাঁটাটি ফোটে পায়, তুলে ফেল, নইলে যায়॥ ইত্যাদি।

একধর্মী লোকের পরস্পর সংগতি প্রবাদ-প্রসিদ্ধ কৌতুকের বিষয়—
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই॥
চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল॥
আমে দুধে এক হয়, আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়॥
যেমন উনানমুখো দেবতা, তেমনি ঘুঁটে ছাই নৈবেদ্য॥
যেমন গুরু, তেমনি চেলা, ঠিক যোগ হয় ছেঁদা মালা॥
যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল॥
যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা, যেমন নটী তেমনি চড়া॥
এক চন্দ্র তম হরে, দোষ গুণ বহু তারা॥

সুতরাং বিপদের ঘরে ব্যথার ব্যথীর অভাব নাই—
কান কাঁদেন সোণা রে, সোণা কাঁদেন কান রে॥
তুই থলুসে, মুই থলুসে, একই বিলের মাছ।
তোর মরণে মরব আমি, আমার কোমর ধরে নাচ॥

কিন্তু পরস্পরের চালাকি পরস্পরের অবিদিত নয়—
কানের সোণা কান কাটে॥
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।
তুমি ফের ডালে ডালে, আমি ফিরি পাতে॥
আমায় না দিয়ে খাবে ননী, কত ধন বাঁধবে, ধনী॥

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কতকগুলি জনশ্রুতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাহার মধ্যে সহজ প্রাত্যাহিক অভিজ্ঞতা স্বল্প কথায় ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে—

আঁতে তেতো, দাঁতে নুন, পেট খালি এক কোণ।
এবেলা ওবেলা শৌচে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়॥
খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে, তার গতি কভু না লাগে॥
খায় না খায় সকালে নায়, হয় না হয় তিনবার যায়।
তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়॥
সকাল বিকাল নিকাল দেয়, তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়॥
একবার যায় (=শৌচে যায়) যোগী, দুবার যায় ভোগী,
তিনবার যায় রোগী॥
সকালে শুয়ে সকালে উঠে, তার কড়ি না বৈদ্যে লুঠে॥
কানে কচু, চোখে তেল, তার শক্তি না বৈদ্য গেল॥
নিমনিসিন্দা যেথা, মানুষ মরে না সেথা॥
তাল, তেঁতুল, দই, বৈদ্য বলে ওষুধ কই॥
পুঁই, কচু, ঘেসো, তিন অম্বলের মেসো॥
কখনো খেও না ওলে আর ঘোলে, কখনো ভুলো না তেলনার বোলে॥
মুড়ি আর ভুঁড়ি, সব রোগের গুঁড়ি॥
শাক, অম্বল, পান্তা, তিন ওষুধের হন্তা॥

তেমনই অভিজ্ঞতার নির্যাস-স্বরূপ অবাঞ্ছিত ব্যক্তির বা অযশস্কর কার্যের কতকগুলি উপাদেয় ফিরিস্তি পাওয়া যায়। ইহার দুই চারটি পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে, আরও কয়েকটি যথেষ্ট কৌতুকজনক—

ছেঁদা ঘটি, চোরা গাই, পাপ পড়শী, ধূর্ত ভাই।
মূর্খ ছেলে, মাগ নষ্ট, এ ছয়টি বড় কষ্ট॥
নদীর ধারে চাষ, বালির ওপর বাস।
দু-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস।
এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাতপুরুষে কাটে ঘাস॥
হাস, তামাক, পাশা, এ তিন কর্ম্মনাশা॥
আহার, নিদ্রা, ভয়, যত কর তত হয়॥
চোর, ছিনার, চোপায় দড়, আগে যায় শীতলা মাড় (=মন্দির)॥
টাক, প্রকৃতি, গোদ, মলে হয় শোধ॥
তাল, তেঁতুল, মাদার, তিনে দেখায় আঁধার॥
তাল, তেঁতুল, কুল, তিনে বাস্তু নির্ম্মূল॥

সৎসঙ্গ, প্রেম, গঙ্গাবারি, এ তিন বড় উপকারী ॥
ইষ্টকালয়, শ্যামা নারী, বটচ্ছায়া, কূপবারি ॥

ক্রমশ

শ্রীসুশীলকুমার দে

নাক—উনবিংশ শতাব্দী

"সন্দেহ ক'রো না, ওহে একেলে-রতন,
আমাদেরই নাক ছিল নাকের মতন।
নস্য, লোম, চশমা যেথা পাইত আদর,
ঘুঁষি, লাথি, সিকুনি, আতর
স্থান পেত সমভাবে যেথা,
যে নাকেতে কাঁদিতাম আদাব করিয়া যেথা সেথা,
তুলি যাহা করিতাম বাদ-প্রতিবাদ,
কুঁচকাইয়া চুলকাতাম দাদ,
ফুলাইয়া করিতাম মান,
তিল-ফুল-জিনি নহে—ছিল যাহা খড়্গ-সমান,
হাঁচিতাম উচ্চরোলে কাঁপাইয়া ছাদ,
ডাকাতাম তুলি ভীমনাদ,
যার 'পরে চড়ায়ে তিলক
দোমনা-যজমান-বক্ষে গাড়িতাম ভক্তির কীলক,
উপদংশ-প্রহারেও যাহা অলজ্জিত,
খাঁজা-ভাঙা কেউটে সম ফুঁসিত গর্জিত—
তোমাদের সেই নাক কই ?
থাঁদা খিন্ন তুলতুলে—ওই
পাউডার মাখায়ে যারে রাখো,
ফিনফিনে রুমালেতে অহরহ ঢাকো—
তাহারে কি নাক বল বাছা ?"
—এই বলি বাচস্পতি গুঁজিলেন কাছা।

"বনফুল"

শনিবার

অমরেশের কথা আমি অপরোক্ষ রীতিতেই ব'লে যাচ্ছি—

আইনমত অফিস থেকে বেরুবার কথা একটায়; কিন্তু সে আইন যাদের পক্ষে পাটে তাদের ধাত তো দূরের কথা, চামড়ার রঙই আলাদা। ফলে অফিস পেছনে ফেলে সত্যিই যখন রাস্তায় হাঁটতে আরম্ভ করেছি, তখন বেলা পৌনে তিনটে। শনিবার না হ'লে আরও ঘণ্টা চারেক বিজ্ঞানের ভাষায় নেহাত ইনার্সিয়ার বলেই চ'লে যেত। কারণ পাঁচটায় অফিস থেকে বেরুবার জন্যে হাকুপাকু করে কাঁচা কেরানীরা, যারা এখনও বাড়ি-ট্রাম-ডালহৌসি এবং ডালহৌসি-ট্রাম-বাড়ি ছাড়াও আরও কিছুর প্রত্যাশা রাখে জীবনের কাছ থেকে; অবশ্য পায় না। না পেয়ে ধীরে ধীরে এই বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট অফিস-বীণাটিতে আর একটি তার নিজের জীবন দিয়ে যোজনা করে। এইরূপ বিবর্তনের ইতিহাসের যে একটা আরম্ভ ছিল এ কথাও আজ বিস্মৃতপ্রায়। সে ইতিহাসে নিজেকে সত্য ক'রে তোলাই বর্তমানে যৌবনের সৃষ্টিপ্রেরণার সাধনা।

তবু আজ শনিবার। সারা সপ্তাহের অবহেলিত উষর জীবন একটু হাত-পা নাড়তে পাবার আশায় চঞ্চল হয়ে উঠে, যে কোন রকমের মুক্তি, যে কোন রকমের অবাধ শিথিলতা। তাই ভিড় স্থানে অস্থানে। স্থান আর কোথায়! রুচিমানদের মতে সবই তো অস্থান। যে কেরানী কলেজে পড়ার সময় শকুন্তলা প'ড়ে আনন্দ পেয়েছে, সে যখন ছোটে 'বার্থ অব এ বেবি' দেখতে, তখন আর আশা করবার কি থাকে? জিজ্ঞাসা করলে বলে, না হে, ছবিটা ইন্‌স্ট্রাক্টিভ। এ তো আর আমাদের দেশ নয় যে, 'অশ্লীল, অশ্লীল' ক'রে চেঁচিয়ে উঠবে। ওরা জীবনটাকে 'ফেস' ক'রে বোঝবার চেষ্টা করে। রুচিমানদের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে সায় দিয়ে ভাবি, হবেও বা। জীবনের 'ফেস' কি রকম তা তো আর সত্যিই কেউ জানে না। পশ্চিমের অতি-সন্ধানী দৃষ্টি মাংসের নীচে হাড়ে হয়তো জীবনের মূল সত্য আবিষ্কার করেছে। হাড় কামড়ে মুখ ছ'ড়ে গেলে নিজের রক্তের স্বাদও কম সুস্বাদু নয়। সেও একটা অভিজ্ঞতা। সক্রেটিস ব'লে গিয়েছেন, 'নো দাইসেল্‌ফ'। যেমন ক'রেই হোক নলেজ চাই।

তারপরে এই ভিড়ের আনন্দে আত্মবিসর্জনও ধীরে ধীরে গতানুগতিক হয়ে ওঠে। তবু নূতন গতানুগতিক হ'লেও নূতন,—সে টানে। এই টানটা বড় অদ্ভুত। রাতের একঘেয়ে ঝিঁঝিঁপোকার শব্দের মত; থামলেই মনে হয়, বড্ড নির্জন। প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। তখন ঘুম না এলে বিপদ।

আমার বয়স ছ মাস। হাসি পাচ্ছে, কিন্তু সত্যিই তাই। আমার কেরানীজীবনের অন্নপ্রাশন হয়েছে এই ছ মাস—দাঁত ওঠে নি ভাল ক'রে। ডালহৌসিরও মূর্তি তাই আমার শনিবারের দৃষ্টিতে বেশ অরুণ হয়ে উঠল। সার্ আর্. এন.-এর মাথায় কাক বসেছে। সত্যিই অবশ্য সার্ আর. এন. নয়; তাঁর প্রতিমূর্তি। একটু হাসি পেল। আচ্ছা, প্রায়ই তো ওই জায়গাটায় কাক বসে। দেখে অন্য দিন মনে হয়, মাথায় কাক বসা তো দূরের কথা, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়াই অকল্যাণকর। আর আজ কিনা আমার সটান হাসি পেয়ে গেল! সার্ আর. এন.-এর মত লোকের মাথায় সত্যিই কাক বসলে ব্যাপারটা যে কি রকম হাস্যকর হয়, এ কথা কেন এর আগে মনে আসে নি!

রসিকতাটা গিয়ে অরুণার সঙ্গে করতে হবে। অরুণা আমার স্ত্রী।

কিছু অধীরতা এল আমার মনে—এখনও বাড়ি যেতে কত দেরি! কাচের চুড়ি, টি-পট, কমলালেবু আর ফুলকপি নিয়ে বাসে ক'রে মেসে ফিরলে এই শনিবারের বাজারে কিছু আর আস্ত থাকবে না। অতএব হেঁটেই যেতে হবে এই দু মাইল পথ। পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করতেই অরুণা এতটুকু হয়ে গিয়ে বলবে, কেন একটা রিক্শ করলে না? আমার উত্তর তৈরিই আছে—তা হ'লে তোমার চুড়িগুলি—। অরুণা সমস্ত-মূল্য-শোধ-ক'রে-দেওয়া হাসি হেসে বাঁ হাতখানি এগিয়ে দেবে আমার সামনে—হাতে গৃহস্থালির চিহ্নস্বরূপ আমার আগমন-সম্ভাবনায় প্রচুর মশলা বাটার দাগ।

এমন সময় ছোট্ট খুকী এসে উপস্থিত—বাবা, মাকে কি পরিয়ে দিচ্ছ? আমাকে একটা দাও। চাপা-কণ্ঠে অরুণার শাসন—এই টুকু! কি দুষ্টু মা! এখনই মা শুনতে পাবেন। খুকী ইতিমধ্যে বস্তুটি নিরীক্ষণ ক'রে দু হাতে তালি দিয়ে নাচতে নাচতে ঠাকুমাকে ব্যাপারটা

জানিয়ে দিলে, ঠাম্মা, বাবা চুড়ি এনেছে। মাকে—অরুণা উপায়ান্তর না দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে মেয়ের মুখ চেপে ধরলে। আমি মন্তব্য করলাম, কি পাকা হয়েছে দেখেছ!

মা এসে চুড়ি দেখে আমার রুচির তারিফ ক'রে বউমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, আমাদের সময়ে কিন্তু বাছা বেলোয়ারী চুড়ি মেথরানীরা পরত। তোমাদের আজকাল সোনাদানা ছেড়ে এ কেমন ধারা শখ! তারপর টুকুকে সম্বোধন ক'রে, তুমি দিদি, কখখনও কাচের চুড়ি প'রো না। তা হ'লে মেথরে ধ'রে নিয়ে যাবে। ব'লে, হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন টুকুকে কোলে ক'রে। আমি, অরুণা নিশ্চিন্ত হলাম।

চিৎপুর রোডে বন্ধু মীনাক্ষীপ্রসাদ আমার গতিরোধ করলে। বাড়ি পৌঁছতে এখনও অনেক দেরি। হাতের দ্রব্যসম্ভার এবং দ্রুত গতি বন্ধুর মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফোটাল। ভাবটা এই: তুই তো ভারী বোকা! ফুলকপিগুলি বন্ধুর হাত থেকে নিয়ে বন্ধুকে একটু লঘুভার ক'রে মীনাক্ষী বললে, এগুলো আমার এখানে দিলে ঠাকুর তোফা রান্না করবে গলদা চিংড়ি দিয়ে; রাত্তিরে আমার এখানেই খাবি। বাড়ি যাবি কি দুঃখে? একটু থেমে বললে, যে টাকাটা খরচ ক'রে বাড়ি যাবি সে টাকাতে এখানে—চোখ দুটো একটু টিপে ফের বললে, কি না করা যায় বল্ তো? হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, তুই গত শনিবারে গিয়েছিলি কেন?

ছ মাস পরে; স্ত্রীর সান্নিধ্যলাভ উপলক্ষ্যে।—ব'লে একটু হাসলে।

মদ ধরেছিস নাকি?

রসিকেই রসিক চেনে। তবে আমি বাবা নিমচাঁদ নই, আর তুমিও অটল নও, ভয়ের কোন কারণ নেই।

যে ভাবে তোর চোখ ওপরে নীচে, আশে পাশে, আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাতে তুই এখানে এতক্ষণ কি ক'রে অপেক্ষা করছিস তাই ভাবছি।

মীনাক্ষী একটা বাড়ির ওপরের বারান্দায় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে মুচকি হেসে বললে, ডুবে ডুবে জল খাও বাবা, তা আর জানি না। কালকের সেই যে কবিতাটা, ওটি কি স্ব-স্ত্রীক প্রেম? ব'লে—অপেক্ষা না ক'রেই কপিগুলো নিয়ে একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। পেছনে পেছনে ছোটার

কোন মানে হয় না দেখে এগিয়ে চললাম। মীনাক্ষী কি মনে করেছে, কপি ফিরে নেবার লোভে আমি তার পশ্চাদ্ধাবন করব? কবিতা প'ড়ে কবি সম্বন্ধে এমন নির্দ্ধারণ অবশ্য নূতন নয়; কিন্তু আসলে কবিতাটা আমার নয়, অলোক্‌বরণ সেনের। মীনাক্ষীর কাছে ভাবাতিশয্যে কাল সন্ধ্যাবেলা নিজের ব'লে প্রচার করেছিলাম। কাল সন্ধ্যাবেলা সত্যই বড় ক্লান্ত লেগেছিল; আজ যেন মনে হচ্ছে সেই ক্লান্তির কিছু অপনোদন হবে; কাল অতীত স্মৃতিতে গা ঢেলে দিতে বড় ভাল লেগেছিল। কবিতাটি এই—

আমার উপেক্ষিত যৌবনের নৈরাশ্যের মাঝখানে
তোমার চকিত দৃষ্টি
সৃষ্টি করেছিল আশার মরূদ্যান।
জীবনের, যৌবনের, বসন্তের সমস্ত সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য আভাসিত হয়েছিল
সেই চাওয়ায়।

* * *

তারপরে কেটে গেছে দিন, কেটে গেছে রাত্রি,
এসেছে সন্ধ্যা, এসেছে প্রভাত।
সত্য শুধু এখন দ্বিপ্রহরের নীলিমাহারা আকাশ।

* * *

চলেছি গৃহে
দিনের কাজশেষে,
অন্নের সংস্থান ক'রে।
রাস্তা পার হওয়ারই সতর্কতায় আচ্ছন্ন আমার মন।
সামনে দিয়ে ট্রাম চ'লে গেল,
ওঠবার উপায় নেই লোকের ভিড়ে।
বাসেও নেই স্থান।
চিৎপুরের মোড়,
বিচিত্র পণ্যনারীর ভিড়ে আমোদিত পথ,
দৃষ্টি বিহ্বল হয়ে ওঠে,
লোভাতুর মন সংস্কারবশে আত্মসংযম করে।

ট্রামে উঠি,
মানুষের মাঝে আবার স্বাভাবিক হয়ে আসি।
হঠাৎ মনে আসে,
অরুণ যৌবনে পাওয়া,
সেই চকিত, অভাবনীয় দুর্লভ দৃষ্টি।

মীনাক্ষী কবিতাটা বোঝে নি তা হ'লে। না বুঝুক; আমি কিন্তু প্রায়ই কেন অফিসের লেডি টাইপিস্টের সুডৌল দেহের দিকে তাকিয়ে থাকি? দেহকামনা? হঠাৎ সেই উত্তরই মনে আসে বটে। কিন্তু সারাদিনের শ্রমক্লান্ত চোখ যখন সন্ধ্যার আবছায়ায় চারিদিকের ঘনীভূত অবসাদের মধ্যে এই পরম আরামে উপবিষ্ট কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত আত্মতৃপ্ত দেহের দিকে তাকায়, তখন সে চোখে কামনা জাগে সত্যি; তবে সে কামনা জনতার কোলাহল থেকে দূরে সীমাহীন মাঠে ঘনপত্র বটগাছের তলা থেকে আসা বাঁশীর ধ্বনির প্রতি কামনার মত। উন্মাদনা থেকে দূরে তন্ময়তার তৃষ্ণা সেই দৃষ্টিতে; মীনাক্ষী এইখানে গিয়ে যে আনন্দ পায়, সে এই তন্ময়তার আনন্দ। নিজের স্ত্রীর কাছে সে শুধু আত্মপ্রচার করে, আর এখানে সে আত্মবিলোপ করে, বেশ্যার ভালবাসায় নয়, নিজেকে ভালবাসার হাত থেকে এই প্রবঞ্চনাহীন মুক্তিতে। সারাদিনের অপ্রয়োজনীয় কাজের পর, সংসারে আমার প্রয়োজনে কেউ কিছুক্ষণের জন্যও নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করছে, এইটেই সুখ। বেশ্যার সেই আত্মদানের মধ্যে কোন বাধা নেই, কুণ্ঠা নেই, ভালবাসার অভিনয় আছে, কিন্তু সেটা অভিনয় হিসাবেই গ্রহণীয়। গার্হস্থ্য প্রেমের মত এ প্রকাশের অভাবে মৃতপ্রায় নয়। ঐ প্রেমের অভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কালকে হ'লে মীনাক্ষীর আহ্বান হয়তো এত সহজে প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম না। কিন্তু আজ? হাসি পায় মনে করলে। ছটায় ট্রেন, এক ঘণ্টার পথ। তারপরেই আর পরিশ্রম নেই, ক্ষোভ নেই, নিরানন্দের ঘের নেই চারিদিকে, শুধু নেওয়া, অঞ্জলি ভ'রে নেওয়া, সে দেওয়ার মধ্যে কার্পণ্য নেই, চাওয়া নেই, মিথ্যা নেই। সে যেন প্রয়োজনাতিরিক্তের জগৎ।

আবার কপি কিনতে হবে। মেসে ফিরে জিনিসপত্র রেখে বাজারে

গিয়ে কপি কিনে, শীতকালে কলকাতার বিখ্যাত মাছ—ভেটকিও একটা নিতে হ'ল। পথে আসতে কি একটা চা-এর বিজ্ঞাপন দেখে মনে পড়ল, বাড়ির চাও তো এতদিনে ফুরিয়ে যাবার কথা। এক পাউণ্ড চা নিয়ে গিয়ে অরুণার নাকের ডগায় ধ'রে দিয়ে বলব, দেখ, তোমার বলার অপেক্ষাতেই আমি ব'সে থাকি না। গিন্নীপনাটা সেইজন্যে আমার ওপর একটু কম ক'রো। অরুণা তখন, কি গিন্নী আমার! চা এখনও এক সপ্তাহ চলত।—ব'লে চা-টা নিয়ে ছুট। চায়ের কৌটোটা দেখলে বোঝা যেত, মিথ্যাভাষণটা গিন্নীপনার একটা অঙ্গ। যখন জিনিস থাকে না, তখনও ছল-চাওয়া লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধানের আশঙ্কায় মেয়েরা বলে, চাল বাড়ন্ত, কি, নুন বাড়ন্ত। এ যেন মায়ের-দয়া হওয়া।

আছি বেশ! জিনিসপত্র গুছতে হবে; বিছানাটা গুছিয়ে এমন ক'রে রাখতে হবে, যাতে ঘরের অন্য সভ্যেরা আমার অনুপস্থিতিতে সেটিকে অব্যবহার্য না ক'রে তোলে। জুতো পালিশ করতে হবে; সকালে তাড়াতাড়িতে দাড়ি কামানো হয় নি। যাক ব্লেডটা তবু নতুন, মোটে একবার কামানো হয়েছে। গিলেট ব্লেডে দ্বিতীয় শেভ যা হয়, আঃ! একটা ভাল শেভ সত্যিই একটা আনন্দ।

বাঁধা-ছাঁদা সেরে দাড়িটি কামিয়ে এক কাপ চা খাচ্ছি। সত্যেন দত্ত সাত কাপ পর্যন্ত চালাতে পারতেন; কিন্তু এই এক কাপের যে কি শক্তি, এ তিনি বোধ হয় জানতেন না।

জিনিসপত্র সব ফিটফাট। এখন শুধু নিয়ে বেরিয়ে পড়া। সত্যি, এ একটা অভিসার। নয়? কিসে কম? কথাটা ব'লে ফেলেছি ব'লে লোকে বলবে সেন্টিমেন্টাল, ভাবালু, ছেলেমানুষ। একটা কেরানী—শনিবারে বাড়ি যাবে, আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে এই রকম যাতায়াত কেরানীরা ক'রে আসছে, এতে আর নূতনত্ব কি আছে? নূতনত্ব নেই ঠিক। তবু একেবারে কিছুই নয়, এ কথাও একেবারে নিছক প্রগতিবাদীর মত শোনাল; কারণ প্রগতিবাদী সাহিত্যের মূল কথা হচ্ছে, 'পৃথিবী বিগতযৌবনা'। আচ্ছা, অভিসার নয় কিসে? রসিকতা করছি না, সত্যি জিজ্ঞাসা করছি। কিন্তু এ কথাগুলোই এমন যে, ভেতরে যতই গুমরে মর না কেন, লোকের কাছে বললেই লোকে হাসবে। কথা

যত অন্তরের হবে, বাইরে সেটা তত বেশি অপ্রকাশ্য। ফলে মাঝে মাঝে অসামাজিক প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই মীনাক্ষীপ্রসাদ ছুটেছে ওইখানে, সে এই স্থানকেই প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ ব'লে মনে করে। কি করবে? কেউ কারও কথা শুনতে চায় না; সকলেই নিজের কথা বলতে ব্যস্ত—এই মশাই ছোট ছেলেটার আজ দশ দিন হ'ল আমাশা; বড় মেয়েটার পাত্র ঠিক করেছি, কিন্তু বাপ বেটা চামার, চোখের চামড়া নেই; আর মশাই কদিনই বা আছি, ইত্যাদি। অথচ যে শুনছে, সে যে এখনও কিছুদিন আছে এ কথাটা বক্তা আমলেই আনেন না।

তাই বলছিলাম, অভিসার নয় কিসে? সোমবার থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে, সমস্ত পারিপার্শ্বিককে অনুকূল ক'রে এনে কুটিলা-রূপী বড়বাবুকে ফাঁকি দিয়ে, আয়ান-রূপী অর্থকৃচ্ছ্রতাকে সারা সপ্তাহ ধ'রে সামলে সামলে এই যে একটি মুহূর্তকে পরিপাটি ক'রে তৈরি করা গিয়েছে, যেটা এই একটু পরেই জীবন্ত হয়ে উঠবে, এটা একেবারেই তুচ্ছ!

চায়ের ধোঁয়ার মতই চিন্তাগুলি একের পর এক আমার সামনেই মিলিয়ে গেল। উঠে পড়লাম। স্নানটা ক'রে আসা যাক। শীতকাল হ'লেও দুবেলা স্নান আমার অভ্যাস। আর আজকে স্নানটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এটা অফিস যাবার আগের স্নান নয়। প্রাক-অফিস-যাত্রা স্নানটা হচ্ছে 'চান', সেটা খাটি কলকাতাই। এটা হ'ল সারা সপ্তাহ ধ'রে সঞ্চিত ক্লেদের এবং শতবেপানার পরিশোধন, সাপ্তাহান্তিক স্নান। তারপরেই আসবে সংপরিপ্রাপ্তি। সং এবং পরি দুটো উপসর্গ শুধু প্রাপ্তির গভীরতার কিঞ্চিৎ আভাস দেবার চেষ্টা; হয়তো ব্যাকরণের ভুল হ'ল। কিন্তু মনোভাব, যাকে বলে, রূপায়নের চেষ্টায় শব্দসৃষ্টি এই নূতন নয়।

মুখে সাবান দিতে গিয়ে দেখি দাড়ির নীচে দাড়ি। দাড়ি-কামানো খারাপ হ'লে এমন বিরক্তি লাগে! অফিসে দাড়ি-ভরা মুখ দেখে সাহেব জ্ঞাবি বললে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতাম, আশি টাকা মাইনেয় রোজ চার আনা ক'রে ব্লেড কেনা যায় না। সে উত্তরের মধ্যে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ থাকে। আজকের ব্যাপারে উত্তরের কোন বালাই নেই। তবু মাকে গিয়ে প্রণাম করলেই চুমো খেতে গিয়ে তাঁর হাতে যখন

দাড়ির খোঁচা লাগবে, তখন বড় লজ্জা লাগবে। ছেলে বড় হয়েছে সত্যি, তার দাড়িও নিশ্চয় গজিয়েছে, না গজালে লোকে মাকুন্দে বলবে। তবু মায়ের কাছে সেটা গোপন থাকলেই যেন ভাল হয়।

আবার ক্ষুরটি লাগিয়ে দুবার টান দিলাম। একটু ক্রীম ঘ'ষে গালকে যত সুখ দিলাম, মনকে দিলাম তার চেয়েও বেশি। খাসা লাগে ওই মৃদু গন্ধটুকু, ঘরে লেগেছে সন্ধ্যার আবছায়া, বাইরে এখনও আলো। সন্ধ্যা ঘনালে আমাদের বাড়িতে জলবে প্রদীপ। জলে কি না জানি না, শুধু কল্পনা করি। কারণ সন্ধ্যার আগমন কলকাতায় শঙ্খে শঙ্খে যেমন ধ্বনিত হয়, পাড়াগাঁয়ে আজকাল আর তেমন হয় না। সেখানে অকাল-সন্ধ্যা বহুকাল আগেই তার শঙ্খ বাজিয়েছে। তবু রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় যে ছবিটি ফুটেছে সে কি মিথ্যা—

'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা।

সোনার আঁচল বহুদিন খসেছে। এখন আঁচলেরই একান্ত অভাব। তবু—তবু, কল্পনা কিছুতেই মরে না কেন? প্রগতিবাদীরা আমাদের দেখে রোমান্টিক ব'লে মুখ বেঁকায়।

রিক্শ—রিক্শই সই; বাসে যাব না কিছুতেই। ওই ঘাম আর পেট্রোলের গন্ধের মধ্যে না হয় একদিন নাই গেলাম। তারপরে প্রত্যেকেই বাড়িমুখো, নিজের জিনিসটুকু বাঁচাবার জন্যে অতিসতর্ক, ফলে বিরক্ত। আমি না হয় বিরক্তিটা নাই বাড়ালাম। নিজেকে আজ ভিড়ের থেকে একটু বিচ্ছিন্ন রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে। অতএব দশ আনা পয়সা রিক্শা-ওয়ালার পকেটে যাবেই। শ দুই টাকা মাইনে হ'লে না হয় দশ আনার চারগুণ ট্যাক্সি-ওয়ালার পকেটে যেত। ভিড় থেকে আলাদা হবার জন্যে দাম দিতে হবে বইকি। সবাই কিছু কিছু দিয়ে থাকি। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা জিজ্ঞাসা করলে বলি, আমি কমিউনিস্ট। মিথ্যা কিছু বলি না। মানুষকে ভালবাসি ব'লে তো আর অমানুষকে ভালবাসতে পারি না। নোংরা জিনিসকে মানুষ চিরকালই ঘেন্না করে।

ভিড় হবে স্টেশনে জানতাম। আমাদের গাড়িতে টিকিট দেওয়া

বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই পাঁচ সিকের জায়গায় ন সিকে লাগল এবং তোরণ-রক্ষকও একেবারে নিরামিষাশী রইলেন না। মনে মনে হিউম্যানিটারিয়ান করুণা হ'ল এদের ওপর আজ। যুগোপযোগী রাগ ঘনিয়ে উঠল মনে অর্থগৃধ্নুদের ওপর; মনটা গিয়ে পড়ল স্টালিনের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে। সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে মনের আনন্দে ঘুষ দিয়ে, 'মশাই পা-টা একটুখানি, হেঁ-হেঁ, দুয়োরটা একটু ছেড়ে দিয়ে, বসবার জায়গা চাই না, এটা একটু রাখতে দিন' করতে করতে গাড়ির কামরায় ঢুকলাম বলা যায় না, প্রবেশিত হলাম। এ বরং ভাল। ঢোকবার দায়িত্ব আমার নয়। কেউ খিঁচিয়ে উঠলে বলি, কি করব মশাই, পেছনটা একবার দেখুন।—বলতে বলতে ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ধীরে ধীরে তিনি সঙ্কুচিত হন, আমি প্রসারিত হই, ঘটনাটা অলক্ষ্যেই হয়। ভদ্রলোক একটু পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করে সম্ভবত।

কোন্ স্টেশন অত লক্ষ্য করি নি, 'নাম, নাম' রব উঠল। কেন রে বাবা? শুনলাম, বাবাই বটে, মিলিটারি উঠবে। আমরা যাব কোথায়? সে ভাবনা রেল-কর্তৃপক্ষের নয়, আমাদের। নামতে গিয়ে এক ভদ্রলোকের কমলালেবু ছড়িয়ে প'ড়ে গেল। এতদিনে বুঝলাম কেন ওদের আমরা যা-তা বলি—আমরা মানে আমাদের মধ্যে অবিমৃষ্যকারীরা, যাদের যা-তা বলবার সাহস আছে। নিমেষের মধ্যে পতিত কমলালেবুগুলি প্ল্যাটফর্ম থেকে উধাও হ'ল। নিজের ভেটকিমাছটা সামলে দেখি, প্ল্যাটফর্ম কমলালেবুর খোসায় ভ'রে গিয়েছে। ভদ্রলোক ওই সৈন্যগুলোকেই বাধ্য হয়ে নিজের ছেলেমেয়ে ভেবে নিলেন। আমরা স্থান খুঁজে নিতে ব্যস্ত। কেউ মন্তব্য করবারও অবকাশ পেলাম না।

যুবক এবং যুবকল্পরা স্থান ক'রে নিলে, কিন্তু প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধের দল পরের গাড়িতেই যাবেন স্থির করলেন বোধ হয়। যুবকরা তো সব বিষয়ে এগিয়ে যাবেই। আমি ভেটকিমাছ নিয়ে এই নামা-ওঠার গণ্ডগোলে আগের চেয়ে একটু ভাল জায়গাই পেয়ে গেলাম। কে কোথায় অন্যায় করলে এবং সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হ'ল না, এ নিয়ে

মাথা ঘামাবার সময় নেই। নিজের সঞ্চয় নিয়ে বাড়ি পৌঁছতে পারলে হয়। এ ট্রেনটায় পৌঁছতে না পারলে খুকী ঘুমিয়ে পড়বে; মা হতাশ হয়ে খেতে ব'সে যাবেন আর অরুণাকেও বলবেন খেয়ে নিতে। অবশ্য ভোজননিরত অরুণাকে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সচকিত করা মন্দ নয়। সে তাড়াতাড়ি উঠে পালাবে, আর আমি বলব, আরে, উঠছ কেন? আগে ক্ষিদে পেলে আগেই খেতে হয়।

তবু আগে পৌঁছনোই যেন ভাল।

শিরশির ক'রে সারি সারি অশ্বত্থগাছের পাতাগুলো কাঁপছে শীতের হাওয়ায়, মানুষের মত হি-হি ক'রে কাঁপছে আর আলোয় ঝলমল করছে—চাঁদের আলোয়। প্রিয়জন আঘাত করলে যেমন বলি, না, লাগে নি এবং ব্যথায় ঈষৎ-কম্পমান দেহকে পুনরাঘাতের জন্য উৎসর্গ করি, ওই অশ্বত্থগাছগুলো তেমনই আলোয় বিহ্বল হয়ে কাঁপছে আর বলছে, আরও দাও, আরও দাও, আমাকে একেবারে ডুবিয়ে দাও। কিশোর বালকের মত স্পর্শকাতর ওই অশ্বত্থের পাতাগুলি, ভারি স্পর্শকাতর, একটুতেই উদ্বেল হয়ে ওঠে। তফাত এই—অশ্বত্থের পাতা আনন্দ পায় আর মানুষ শুধু ব'লে উঠতে পারে—

নিঃসঙ্গতার মাঝে
এস তুমি দু হাতে ভ'রে নিয়ে আলাপন।

আবার অলোকবরণকেই স্মরণ করতে হ'ল; কিন্তু সবটা মনে নেই। ভারি সুন্দর লিখেছিল কবিতাটা। তারপরে কি ছিল,

তোমার সত্তার দুর্নিরোধ্য স্রোতোবেগে ?…

দূর! আর মনে আসে না। আর আগের লম্বা কবিতাটা স—ব মনে প'ড়ে গেল।

ইতিমধ্যেই চারিদিক চুপ। ভালই হয়েছে। কলকাতা থেকে এক সপ্তাহ পরে ফিরছি, হাতে সুদৃশ্য ভেটকিমাছ দোদুল্যমান; রাস্তার দুপাশ থেকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে আধমরা হয়ে বাড়ি পৌঁছতে

হ'ত। তারপরে সকালবেলা উঠেই শুনতে হ'ত, কি হে ভায়া, ভেটকি-মাছটা একাই খেলে? এই প্রশ্নের মধ্যে সত্যিকারের রসিকতা ছাড়াও একটু অন্য কিছু থাকে, এইজন্তেই এদের এড়াতে চাই। কলকাতার এবং ট্রেনের অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন ভিড়ের পর এই নির্জনতার যে এত প্রয়োজন ছিল আমার, তা এঁকে বাস্তবে অনুভব না করলে বুঝতে পারতাম না। এ যেন এক মুহূর্তে সব অপচয় পূর্ণ ক'রে দেয়।

ছুটো শেয়াল একটা মেটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে অপরাধীর মত রাস্তার পাশের ঝোপে ঢুকে গেল। ও বাড়িটা আমাদের জমির ভাগীদার অত্নু শেখের। রাষ্ট্রের অস্বীকৃত দুর্ভিক্ষে এদের মৃত্যু স্বীকৃত হয়েছে। অত্নুর স্ত্রী বেরিয়ে গিয়েছে; বিধবা মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে; আর ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ছেলেটাকে শুনেছি শেয়ালে ঘুমন্ত অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে। অত্নু ধান রোয়া শেষ ক'রে সেই যে বিবাগী হয়েছে আর ফেরে নি। বোধ হয় রাষ্ট্রের আশ্রয়কেন্দ্রে গাজর খেয়ে ঘোড়া হয়ে পুনর্জন্ম নিয়েছে।

শেয়াল ডেকে উঠল হুকি-হুয়া। বাড়ি পৌছলাম।

এতক্ষণে একটু গা-ঢেলে-দেওয়া বিশ্রাম।

৩

সংসারের কাজ সেরে অরুণা যখন শুতে এল, অমরেশ তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। অরুণা কি বুঝে তার পায়ে একটা চিমটি কাটলে। অমরেশ গভীর বিরক্তিতে দীর্ঘায়িত স্বরে 'আ' ব'লে আগ্রহভরে স্নিগ্ধ আলিঙ্গন করলে পাশ-বালিশটাকে। অরুণা জানলা দিয়ে বাইরে একবার তাকিয়ে অমরেশের দিকে পেছন ফিরে শুয়ে পড়ল।

শেয়াল ডাকল, হুকি-হুয়া।

শ্রীশীতাংশু মৈত্র

চলতি সাহিত্য-সভা

সভা !···সাহিত্যের,
বিশেষিত ব্যক্তিদের শুভ-সম্মিলন।
নানান সংবাদপত্রে বিঘোষিত নির্দিষ্ট সময়ে
অনির্দিষ্ট অসময়ে
যে যার সময়মত সভ্য-সমাগম
বঙ্গীয় নিয়মে সনাতন।
অতঃপর
পরস্পর-পরিচয়, কুশল-জিজ্ঞাসা,
এলোমেলো আলাপন,
সতর্ক পোশাকী সম্ভাষণ,
ঈষৎ সংযত হাসি, শুদ্ধ উচ্চারণ,
অমায়িক অভিনয়ে স্বরূপের স্নিগ্ধ আবরণ,
অর্থহীন আমড়াগাছি, দম্ভের মুখোশ,
পরপরিবাদে মত্ত নিরুদ্ধ আক্রোশ—
শহরের প্রাজরূপ
আধুনিকতার
হেরতম দলাদলি ক্লীব অহঙ্কার।
নানা তর্ক বিতর্ক বিচার—
অর্থহীন উপন্যাস, দুর্বোধ্য ধোঁয়াটে কবিতার,
সভা—

আধুনিক সাহিত্যের
সাম্রাজ্যের লালিত্যের
প্রাণচাপা মনঢাকা সাময়িকতার।
কপট গাম্ভীর্যে ঢাকা ঔদাস্যমধুর শিষ্টতার
বৈদগ্ধ্যের প্রতিযোগিতার
সেখানে সেখানে কোলাকুলি
ভদ্রতার বাঁধাবুলি—
পাণ্ডিত্যের বুলি,

নিঃশেষে উজাড় করা আলাপের ছলে
সত্তপরিচিত দলে
বাক্যবলে আত্ম-বিজ্ঞাপন
প্রাণখোলা মনঢালা সত্য-বিস্মরণ !

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

সুখ-দুঃখ

বুকের কষ্টিপাথরে উজ্জ্বল এক সোনার দাগ—
সেই মেয়েটি !
দূর থেকে দেখে তাই যেন মনে হ'ল।
কিন্তু দূরদর্শন সব সময়ে খাঁটি হয় না।
কাছে গিয়ে অণুবীক্ষণে দেখলাম,
নাঃ, তত সুন্দর নয়,
তেমন মারাত্মক নয় মোটেই।
মন থেকে একটা বোঝা নেমে গেল যেন—
দীর্ঘনিশ্বাসের বোঝা।
বাসে উঠে চ'লে গেল সে,
কিন্তু কোন দুঃখ দিয়ে গেল না।
কিন্তু সত্যিই যদি সে সুন্দর হ'ত—
সেই অজানিতা, সেই অজেয়া, সেই অলভ্যা—
কি মন খারাপই না করত তা হ'লে আমার।
সারাটা বিকেল নিজের অন্ধকার হৃদয় প্রভাক হয়ে থাকত
সেই উজ্জ্বল সোনার রঙে।

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

"সব পেয়েছির দেশ"

এক

দেশবিশ্রুত ডাক্তার সত্যপ্রিয় সেনের বাড়ি। ঘড়িতে সাতটা। সত্যপ্রিয় মাস দুয়েক জরুরী কেসে বিদেশে কাটাইয়া এইমাত্র বাড়ি ফিরিয়াছেন। নিতাই চাকর মালপত্র গুছাইয়া ঘরে তুলিতেছে। সত্যপ্রিয় প্রফুল্লমুখে শিষ দিতে দিতে উপরে উঠিতেছিলেন, সিঁড়িতে পত্নী কুন্তী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ। কুন্তী দেবীর পোশাকে ও চেহারায় বাহিরে যাইবার সুস্পষ্ট প্রসাধন-ইঙ্গিত। স্বামীকে দেখিয়া কুন্তী দেবী যেন ঈষৎ থতমত, ঈষৎ যেন বিরক্ত হইলেন।

কুন্তী। ও মা, তুমি! আমি বলি এই বেরুবার মুখে আবার কোন্ আপদ এসে জুটল! তা তুমি এত শিগগির ফিরে এলে যে! এর মধ্যেই কাজ হয়ে গেল?

সত্যপ্রিয়। (ম্লান হাসিলেন) খুব বিরক্ত হয়েছ মনে হচ্ছে! এত শিগগির ফিরে এসে বোধ হয় অন্যায় করে ফেলেছি কুন্তী। আমার আরও কিছু দিন বিদেশে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তোমায় না দেখে আর থাকতে পারছিলাম না, বিশ্বাস কর।

কুন্তী। তোমার যত কথা! বাড়ি ফিরবে তার আবার ন্যায় অন্যায় কি? তোমার ঘরবাড়ি, তোমার ছেলেমেয়ে। আমি কে? একটা পরের মেয়ে বই তো নয়! সংসারের আর কোনও আকর্ষণই নেই আমার। তা তুমি জান।

সত্যপ্রিয়। আমিই এ বাড়ির কেউ নই কুন্তী। আমি বাড়ি ঢুকলেই এ বাড়ির হাওয়া মৃত্যুপুরীর মত আনন্দ-উৎসবহীন হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়ে? অজয় তো শুধু পালিয়ে ফেরে। দেবীর সাড়াশব্দই মেলে না। তুমি তো আজকাল ধরাছোঁয়ারই বাইরে। ছবিটা এখনও আদর ক'রে 'বাবা' ব'লে ছুটে আসে। বোধ হয় ছোট আছে তাই।

কুন্তী। অত শত ঘোরালো কথাবার্তা বুঝি না বাপু। তোমার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে নাকি? তা হ'লে আমরা ওতেই যাই।

সত্যপ্রিয়। এতদিন পরে আমি বাড়ি ফিরলাম আর তুমি চললে!
অথচ আশ্চর্য্য, সারাপথ ভাবতে ভাবতে আসছি, গিয়েই ওকে পাব।

কুন্তী। কি করি বল? তুমি তো মা-মহামায়ার নাম শুনলেই আগুন
হয়ে ওঠ। কিন্তু সারা শহর তাঁর নামে পাগল। অত বড় একটা
নামী মানুষ। আমার হাত ধ'রে অনুরোধ করলে আমি কি এড়াতে
পারি? ওঁর আজ বিশেষ অধিবেশন সভা। আমাকে আর বেবীকে
যেতেই হবে। আচ্ছা, তোমার ভাবনাটা কিসের? খানসামা, বয়,
নিতাই সবাই রইল। আমি ওদের না হয় ব'লেও দিয়ে যাচ্ছি।
কই বেবী, তোর হ'ল?

কুন্তী দেবী ত্বরিতপদে নীচে নামিয়া গেলেন। অরিন্দম অন্যমনস্ক-
ভাবে সিঁড়িতেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। হাই হীলের খটখট শব্দে বেবী
নামিয়া আসিল। বেবী সত্যপ্রিয়ের চোদ্দ বছরের মেয়ে। বেশ
সুন্দরী। পরনে আগুন-রং মারাঠী শাড়ি। বেবী ক্রয়েডের একটি
বিশেষ ভক্ত। তাঁহার কোন বই বেবী বাদ দেয় না। বাবাকে
দেখিয়াই বেবী গায়ের কাপড়টা সুসংবত করিয়া লইল। লজ্জায় তাহার
মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

সত্যপ্রিয়। (সোৎসাহে) মাই গড, তোকে লাভলি রেড রোজ বলব,
না লিলি অফ দি গ্রীন ভ্যালি বলব রে? এ ব্লুমিং বিউটি অফ
মডার্ন ক্যালকাটা দেখছি। বেবী, তুই একেবারে হঠাৎ যেন
বদলে গেছিস। বাঃ বাঃ, গায়েও একটু লেগেছিস মনে হচ্ছে।
এ মেওয়ার অ্যাণ্ড টেওয়ার মেড, কি বলিস্?

বেবী শাড়ির আঁচলটা আরও ভাল করিয়া গায়ে জড়াইল। বাবাটা
যেন কি! খালি তাহার রূপের কথা! ছিঃ ছিঃ! বেবীর ভারী লজ্জা
করে। অন্য কথা কি জগতে নাই? মৃদু সলজ্জ স্বরে কহিল, মার সঙ্গে
মায়া-আশ্রমে যাচ্ছি।

সত্যপ্রিয়। শুভ। বাড়িসুদ্ধ সবাই যে এক জোটে 'মায়ের চরণ অভয়
শরণ পরম তীর্থ রে' করেছ, তা তো জানতাম না। বেশ বেশ। তা
দুজনে কেন? ছি ছি, কি অন্যায়! অজয়, বউমা, ছোট খোকা,
ছবি, খানসামা, বয়, নিতাই সবাইকে তাঁর মালকোঁচা মোরটা

বাতলে দাও না। আর এ বাড়িটাও যদি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্ঘ্য দিতে চাও—। দি আইডিয়া, আমি পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে হোটেলে গিয়ে উঠব। এখানেও বয়-খানসামার তদ্বির, সেখানেও তাই। বাই দি বাই, তোমার দাদা কোথায়? রাত্রে ঘরে ফেরে? ইলেকশন নিয়েছে? বউমা কেমন? খোকাটা ভাল আছে তো?

প্রশ্নের জবাব প্রত্যাশা করিয়া সত্যপ্রিয় সাগ্রহে দেবীর মুখের পানে চাহিতেই দেবী লজ্জায় মাথা নামাইল।

দেবী। দাদা রাত্রে প্রায়ই ফেরে না। বউদির গয়না চুরি ক'রে কোন অ্যাক্‌ট্রেসকে দিয়ে এসেছে। তারপর থেকে আর ওপরেই যায় না। মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রেই বেরিয়ে যায়। খোকাটার গায়ে বিশ্রী ঘা। তাকে নিয়ে বউদি চুপচাপ ঘরেই ব'সে থাকে।

সত্যপ্রিয়। তোমার মা কিছু বলেন না অজয়কে?

দেবী। মা তো বাড়িতেই কম থাকেন। আর মা বউদিকেই বেশি বকেন। বলেন, তুমিই হাবা মেয়ে, তাই আগলাতে জান না, বাঁধতে পার না।

সত্যপ্রিয়। হুঁঃ, তা হ'লে মহামায়া-আশ্রমই এখন তোমার মার একমাত্র আকর্ষণ, কি বল?

দেবী। হুঁ, ওখানেই মা খাওয়া-দাওয়া করেন। মা-মহামায়া মাকে খুব ভালবাসেন। তিনি সকলকেই নির্বিচারে ভালবাসেন। মাকেই একটু বেশি বোধ হয়। আশ্রমের ভাগলপুরী গাই আছে। টাটকা নানা রকম মিষ্টি তৈরি হয়—সরের খাঁটি ঘি, দুধ থেকে দই, ঘোল সবই হয়। বাগানে ঢের ফলমূল আর পুকুরে বিস্তর মাছও আছে।

সত্যপ্রিয়। বা! বা! আর তুমি যাও কিসের টানে?

দেবী। ওখানে নানা রকম আলাপ-আলোচনা হয়। বেশির ভাগই ধর্ম আর বৈষ্ণব-সাহিত্য নিয়ে। তা ছাড়া গান হয়, মাথুর হয়, পদাবলী কীর্তন হয়। মা-মহামায়া ভাবাবেশে ভাবনৃত্য করেন।

সত্যপ্রিয় ব্যঙ্গ হাসিলেন।

সত্যপ্রিয়। নাঃ, মা-মহামায়ার কেরামতি আছে স্বীকার করি। এতগুলো শিক্ষিত নরনারীকে নিয়ে কি যে সহজ অবলীলায়

বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছেন। আশ্চর্য্য! শ্রীমতীর বয়স কত? দেখতে কেমন?

বেবীর লজ্জাতুর মন বয়সের কুশ্রী ইঙ্গিতে লজ্জা অনুভব করিল।

বেবী। বয়স এই চল্লিশের মত হবে। দেখতে অপরূপ সুন্দরী না হ'লেও আশ্চর্য্য একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। ওঁর চোখে চোখে চাইলেই মন আকর্ষণ ক'রে নেন।

সত্যপ্রিয়। (হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন) আকর্ষণ ব'লে আকর্ষণ, একেবারে মাধ্যাকর্ষণের শেষ পর্ব্ব পাতালপ্রবেশের মত ব্যাপার। শুধু মনকে কেন? সুন্দর সাজানো-গোছানো পরিপূর্ণ আনন্দময় একখানি সোনার সংসারের মূল শেকড় ধ'রে উপড়ে টেনে নিয়েছেন, কম ক্ষমতা তাঁর! কি বল?

নীচের তলা হইতে মায়ের ডাক শুনিয়া বেবী চলিয়া যাইতেছিল, সত্যপ্রিয় ফিরিয়া ডাকিলেন, শোন, তোমার মাকে ব'লো যেন তোমার দাদাকেও একটু বুঝিয়ে-পড়িয়ে ওই "সব পেয়েছির দেশের" ভক্ত ক'রে দেন।

পিতার ব্যঙ্গ বেবী বুঝিতে পারিল না। ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

বেবী। হাঁা, মা-মহামায়াকে মা দাদার সব কথাই খুলে বলেছেন। মার সঙ্গে দাদারও আজ আশ্রমে যাবার কথা আছে। নটিদের বাড়ি থেকে তাকে তুলে নেবেন।

সত্যপ্রিয় চিন্তিত বিরস মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বেবীদের গাড়ি স্টার্ট দিয়া গেটের বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল।

দুই

মায়া-আশ্রমের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ গাড়ি দণ্ডায়মান। গাড়িগুলির প্যাটার্ন, শোফারের পোশাক এবং আরোহীদের চালচলনে উগ্র আভিজাত্য-মার্কা প্রতিভাত। দামী চুরুট, উগ্র সেণ্ট পাউডার ও কেশ-তৈলের সুগন্ধে আকাশ-বাতাস পর্য্যন্ত সুরভিময়িত। অতিথিরা অধিকাংশ তরুণ-তরুণী। কুন্তী দেবীর মত স্থিরযৌবনাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। আশ্রমের বাগান, লতাকুঞ্জ, হরিণ-হরিণী, ময়ূর-ময়ূরী,

হলঘরের সাজসজ্জা, অয়েল পেন্টিং ও মর্মর মূর্তির আর্ট একবিংশ শতাব্দীর অনুরূপ। আশ্রমের দামী ঘড়িটি সুমধুর বাদ্যধ্বনি সহ যেন আশ্রমভক্তদের অভ্যর্থনা করিল। অতিথিরা এতক্ষণ যুগলে বেড়াইতেছিলেন, এবার নীরবে ভক্তি-অবনম্রচিত্তে হলঘরে প্রবেশ করিলেন। হলঘরের দরজায় অর্ঘ্য-মার্কামারা একটি ক্ষুদ্র বাক্স। ইহাতে প্রতিদিনের প্রণামী সংগৃহীত হয়। এ ছাড়া মোটামুটি দান তো প্রচুর আছে, কারণ আশ্রমের ভক্ত সন্তান-সন্ততিরা প্রচুর বিত্তপ্রতিপত্তিশালী। এই কুন্তী দেবীই তো গত সপ্তাহে আশ্রমের বিজলী-পাখাক্রয়কল্পে বাইশ ভরির একটি নেকলেস সঁপিয়া দিয়াছেন। হলঘরে প্রকাণ্ড স্টেজে ভারী রেশমী পর্দা খাটানো। পাদপ্রদীপ জ্বলিতেছে। আজিকার বিশেষ আকর্ষণ মা-মহামায়ার রাধা সাজে বিরহ-নৃত্য। ভক্তবৃন্দেরা নীরবে আসন গ্রহণ করিবার পর মনোমুগ্ধকারী সুমধুর ঐক্যতানবাদ্য বাজিয়া উঠিল। পর্দার অন্তরাল হইতে অপূর্ব লাস্য-ভঙ্গিমায় নাচিতে নাচিতে মা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হইলেন। দর্শকবৃন্দের তরফ হইতে সজোরে হাততালি পড়িল। কেহ কেহ বা ভক্তিভরে উঠিয়াও দাঁড়াইলেন। কেহ ফুল ও রুমালে বাঁধা প্যালাও ছুঁড়িলেন। কালিদাস-ভবভূতির যুগের মেয়েরা যে ধাঁচে কাপড় পরিত, মায়ের পরনে সেই বেশ। চারুবাবু-সঙ্কলিত বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের পূর্ণবাবুর হাতে আঁকা পটের রাধাই মনে হয় বটে। মা ভাবনৃত্যে বিভোর। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিশ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ। দেবীর চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছে, কুন্তী দেবীর মাথা ঘুরিতেছে। অমন ডাকসাইটে ছেলে, অক্রূর পর্যন্ত একেবারে চুপ। একা মা নাচিতেছেন, আর কীর্তনিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিতেছে—

কৃষ্ণ কালো তমাল কালো তাই তো কালো ভালবাসি সখী
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরই ডালে
দেখো যেন ভুলো না সখী।

ঘণ্টাখানেক পরে রুদ্ধশ্বাস ভক্তবৃন্দদের নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দিয়া মা-মহামায়া নৃত্য থামাইয়া নামিয়া আসিলেন।

ইতিমধ্যে পাশের ঘরে গিয়া এক গ্লাস পেস্তা-বাটা মাখন ও মিছরি মিশ্রিত উষ্ণ দুগ্ধ (রং ও গলা ভাল থাকে, চামড়া মসৃণ লাবণ্যযুক্ত হয়)

এবং এক কাপ আনারসের রস (ক্যাট কমে) পান করিয়া আসিয়াছেন। নিন্দুকেরা বলে প্রসাধনেও নাকি কিছু কিছু কারিগরি সামলাইয়া লইয়াছেন।

কুন্তী। (সগর্বে পুত্রের প্রতি) কেন, কিসের টানে এখানে আসি বুঝতে পারলি। যত বাজে মেয়ে নিয়ে তোর কারবার। রূপে গুণে, ধর্মে, জ্ঞানে এমনটি আর কোথাও পাবি না। একেবারে নিখুঁত, কি বলিস ?

অজয়। (অভিভূত মুগ্ধ বিস্ময়ে) সত্যি মা, অদ্ভুত! চমৎকার! (স্বগত) মার্ভেলাস, এ বয়সেও এমন চার্মিং, ষোল বছরের মেয়েরাও ওঁর পাশে দাঁড়াতে এলে মরে খেয়ে হার মেনে যাবে। মিছেই শুধু এতকাল ধ'রে পান্‌সে অ্যাংলোগুলো আর থিয়েটারের ওই নাচওয়ালী পেত্নীগুলোর পেছনে টাকা ঢেলে ঢেলে রোগ কিনলাম। বাবা-আশ্রমের যে এত মজা, আগে জানলে কোন্‌কালে আশ্রমবাসী হয়ে পড়তাম।

কুন্তী। তোকে এখানেই রেখে যাব। বাড়িতে তোর বাবা আর ওই বউটা তোকে অষ্টপ্রহর টিকটিক ক'রে টিকতে দেয় না। এখানে ওঁর অমন যত্ন-আওতায় থাকলে দুদিনে তোর রোগবালাই সারবে। ওঁর কাছে ভাল ভাল তত্ত্বকথা শুনলে, দু দিনে মন ফিরে যাবে তোর। চুপচাপ ক'রে থাকবি তো এখানে ? না পালাই পালাই করবি ? যে চঞ্চলমতি ছেলে বাপু তুই।

অজয়। এমন জায়গায় থাকব না ? আলবৎ থাকব। (স্বগত) একে বিলিতী ক'রে ভেনাস, ক্লিওপেট্রা, হেলেনও বলা যেতে পারে, আবার স্বদেশীয়ানা ক'রে উর্বশী মেনকাও বলা যায়।

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।

তুমি আর আমায় বাড়ি ফিরতে ব'লো না মা। ওই থসথসে ভিজে কাঁথার মত ওই বউ, আর বায়কাঁদুনে ইঁদুরছানার মত এক ছেলে। হোঃ, অসহ্য।

কুন্তী। (চিন্তিতমুখে) কিন্তু তোর বাবা যা ওঁর ওপরে চটা,

এখানে এসে আছিস শুনলে কি আর রক্ষে রাখবেন? ওঁর সব সম্পত্তি হাসপাতালে দিয়ে যাবেন। তোকে একটি আধলাও দেবেন না। আচ্ছা, সে আমি ঠিক মানিয়ে নেব 'খন।

অজয়। সম্পত্তি না দিলেন তো ব'য়েই গেল। এমন মা পেলে জগতের সব ক্ষতি সহ্য হয়। (সোৎসাহে) ঠিক হয়েছে। তুমি বাবাকে একদিন ভুলিয়ে ভালিয়ে এখানে আনতে পার? বাস্, দেখবে, সব প্রবলেম জলবৎ তরলং হয়ে গেছে। বাবা তখন মা-মহামায়াকেই না সব লিখে দিয়ে যান। তাই বা মন্দ কি? আমরা সবাই মিলে তখন আশ্রমসেবক হয়ে যাব। বেবীর বুঝি ওই ঘাড়-ছাঁটা ছেলেটার দিকে মন পড়েছে? ফুল দেওয়া-নেওয়া করছে দেখছি। তা মন্দ কি? মা-মহামায়াকে ব'লে ওদের বিয়েটা লাগিয়ে দাও। কি বলছ? জাতে ধোপা? তাতে কি? তিন আইন ছ আইন কতই আছে তো। হাতে পয়সা, বিলেতফেরত, মনের মিলও হয়েছে। বিয়ে না হয়, ইলোপমেণ্টও করতে পারে। আর যোদ্দা একটি কথা ব'লে রাখি মা, ওই প্যানপেনে সতী-সাধ্বী বউটাকে তোমার বাপের বাড়ি চালান ক'রে দাও। ওটার নাকী কান্নার জন্যেই বাবা আমায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছেন।

মাতাপুত্রের কথার মাঝখানে মহামায়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। কুন্তী দেবী, বেবী ও অজয় প্রণাম করিল।

মহামায়া। আঃ, থাক থাক। বলেছি না, ওসব আমি ভালবাসি নে?

মহামায়া। (অজয়ের চোখে চোখ রাখিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে) এটি কে? চিনতে পারছি নে তো! কি কমনীয় ওর মুখশ্রী! ঠিক যেন আমার ধ্যানের শ্রীকৃষ্ণ দিব্যমূর্তি ধ'রে ধরায় ধূলায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

কুন্তী। (বিগলিত মুখে) আমার ছেলে। ওর কথাই আপনাকে বলেছিলাম মা।

মহামায়া। তুমি থাকবে এখানে?

অজয়। আপনি রাখলেই থাকি।

মহামায়া। (হাসিয়া মিষ্টস্বরে) তুমি থাকলেই রাখি।

বেবী। (মহামায়াকে) আপনার সঙ্গে আমার একটি গোপন পরামর্শ আছে।

মহামায়া। বেশ তো, চল ওদিকে। (বাইরে যাইতে) তুমি যে দিন দিন সর্ব্বনাশা অগ্নিশিখার মতই রূপময়ী হয়ে উঠছ বেবী। ব্যাপারখানা কি? কাকে পুড়িয়ে মারবার মতলব? প্রবীর নিশ্চয়। ঠিক ধরেছি, না?

বেবী। না না, বাজে কথা নয় মা। আপনি একটা উপায় ব'লে দিন। বাড়িতে বাবা বড় বিশ্রী ব্যাপার শুরু করেছেন। দেখা হ'লেই ডারলিং, তুই গায়ে লাগছিস, সুন্দর হচ্ছিস, সুইটি; তোর চুল আমার মায়ের মত, রং আমার ঠাকুমার মত—হেনো তেনো সাত সতেরো রূপব্যাখ্যানা! ওসব আমার ভাল লাগে না। বিশ্রী কদর্য্য মনোভাব। মা তো ওইজন্যেই বাবাকে সইতে পারেন না। সারাক্ষণ শুধু আদর সম্বোধন আর ডিয়ার ডিয়ার ডারলিং—যত অশ্লীল নাটুকেপনা! আমি এখানে থাকব না তা হ'লে।

মহামায়া। (ছোট্ট মেয়ের মত খিলখিল করিয়া হাসিলেন) বাঃ রে, তোমার আর তোমার মায়ের ভাগ্য দেখে তো হিংসেই হচ্ছে আমার। আমায় কেউ অত আদর করলে আমি তো বর্ত্তেই যেতাম। তোমাদের মায়ে-ঝিয়ের সব উল্টো হিসেব বাপু। বীজ যিনি পুঁতবেন, ফলেমূলে সমৃদ্ধিশালী হ'লে, সে গাছটিকে তিনি প্রশংসাও করতে পারবেন না! এ তোমার অন্যায় বিচার বেবী। তোমার বাবা অত্যন্ত রসিক সুজন ব্যক্তি। চল, তোমার দাদার সঙ্গে আলাপ করিগে। কি সুন্দর ওর চোখ দুটি! চাইলেই মন কেড়ে নেয়।

বেবী। ওই চোখের জন্যেই তো দাদার ছেলেবেলা থেকে মেয়েমহলে আদর। ব'খেও গেল ওই ক'রে। কিন্তু বাজে কথা নয়। আমি কি করব বলুন? (উভয়ে আগাইয়া চলিলেন।)

মহামায়া। তোমার একমাত্র উপায় দেখছি প্রবীরকে নিয়ে কোন দূরদেশে পালিয়ে যাওয়া। কারণ প্রবীরের পয়সা খেতাব থাকলেও, ধোপার ছেলে জামাই, তোমার বাবা সইবেন না।

তিন

রাত্রি প্রায় দেড়টা। উজ্জ্বল আলোকিত একখানি অতি-আধুনিক ধরনে সুসজ্জিত শয়নকক্ষে অজয় একা। অস্থিরভাবে কখনও অর্গ্যান বাজনা বাজাইতেছে, কখনও ছবির অ্যালবাম ঘাঁটিতেছে, একবার একটি বই উল্টাইয়া দেখিল, পরক্ষণেই পায়চারণা শুরু করিল। মা-মহামায়া হাতে এক গ্লাস দুধ, কিছু কাটা ফল ও মিষ্টি লইয়া ঢুকিলেন।

মহামায়া। লক্ষ্মীটি, শোবার আগে এইটুকু খেয়ে নাও দেখি। আজ তোমায় আমি গীতা প'ড়ে শোনাব।

অজয়। রোজ রোজ বলছি, ওসব আমি চাই নে চাই নে চাই নে। কেন আমায় জোর ক'রে ধ'রে রেখেছ মায়া? ছেড়ে দাও এবার।

মহামায়া। কি চাও তবে তুমি, বল?

অজয়। (ক্রুদ্ধ চোখে) কি চাই, তা তুমি জান না, না?

মহামায়া। (নাটকীয় বিস্ময়ে) ও মা, দেখ দিকি ছেলের কথা! আমি কি অন্তর্য্যামী ভগবান না কি যে, কারও মনের কথা টের পাব?

অজয়। বেশ, না জান ক্ষতি নেই। তোমার পায়ে ধরি এবার ছেড়ে দাও আমায়, আর মিছে ধ'রে রেখো না। এ কারাবাস আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। কালই ভোরে চ'লে যাব আমি।

মহামায়া। ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়্যার, নট এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক। কি বল? (মধুর দুষ্ট হাসি হাসিয়া) জানি গো জানি, আমি সব জানি, দেখবে?

দেওয়ালের আলমারির তালা খুলিয়া জনি ওয়াকার, সোডা, এক প্লেট ঝাল মাংস, কাঁকড়ার তরকারি, সিগারেট ও দেশলাই টেবিলে রাখিলেন। মায়-দেশলাই জ্বালাইয়া সিগারেটটি পর্য্যন্ত ধরাইয়া দিলেন।

মহামায়া। দেখলে জানি কি না? সব গুছিয়ে রেখে গেছি এক ফাঁকে। কারণ (চুপিচুপি) তোমায় হারানোর ক্ষতি আমার সইবে না। (খানিক পরেই কহিলেন) কিন্তু আজ আর আমায় নাচতে ব'লে ব'লো না বাপু। বাতের ব্যথাটা আবার দিব্যি চাগিয়েছে দেখছি।

ইহার পরের খবর আর জানি না। তবে অজয়ের মত ডাকসাইটে ভবঘুরে ছেলে পর্য্যন্ত একেবারে ভেড়া বনিয়া গিয়াছে। আর কোথাও

যাইবার নামটি পর্যন্ত করে না, এবং শোনা যায়, মা-মহামায়ার প্রোপাগাণ্ডা-মিনিস্টারের পদটি পর্যন্ত সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে।

চার

দিন কয়েক পরের কথা। সেদিন অধিবেশনশেষে অন্য ভক্তরা সবে বিদায় লইয়াছেন। হলঘরে বেবী, কুন্তী দেবী ও অজয় মা-মহামায়াকে ঘিরিয়া গল্প করিতেছিল। এমন সময় ঝড়ের মত বেগে ক্রুদ্ধ সত্যপ্রিয়ের প্রবেশ। তাঁহার সঙ্গে একগলা ঘোমটায় মোড়া অজয়ের স্ত্রী বিমলা। বিমলার কোলে কচি খোকা।

সত্যপ্রিয়। (বিমলাকে) এস তো মা, দেখি, সোনার প্রতিমা বউ ফেলে বাঁদর কিসের টানে এখানে আস্তানা গেড়েছে! (বেবীর প্রতি) কই, তোমার মেরী কুইন অব স্কটস—মহামায়া দেবী কোথায়? আমার সাজানো বাগান, আমার সোনার সংসার পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়েছে, ওই রাক্ষসী। কোথায় এখন? ডাক -তাকে। নীরবে অনেক সহ্য করেছি, আর নয়।

মা-মহামায়া অপূর্ব্ব লীলায়িত ভঙ্গীতে সত্যপ্রিয়র সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন বিদ্যুৎবর্ষী মধুকটাক্ষ হানিয়া, হাসিতে রাঙা ফুল ফুটাইয়া সুধামাখা স্বরে শুধাইলেন, আমায় কিছু বলবেন?

সত্যপ্রিয় সেন, দেশবিশ্রুত ডাক্তার সত্যপ্রিয় সেন, কুন্তী দেবীর একান্ত অনুগত স্বামী সত্যপ্রিয়, অজয়-বেবী-ছবির বাবা সত্যপ্রিয়, বিমলার শ্বশুর সত্যপ্রিয়, বিমলার ছেলের পিতামহ সত্যপ্রিয়, নিতাই-খানসামা-বয়ের মনিব সত্যপ্রিয় সেন আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য জগৎ ভুলিলেন। হতভম্বের মত দুই পা পিছাইয়া আসিলেন, পরক্ষণেই তিন পা আগাইয়া গেলেন। তারপর বিস্ময়ে বিস্ফারিত আবেগে উদ্বেলিত প্রেমে মন্ত্রমুগ্ধ সত্যপ্রিয় কহিলেন, মায়া, তুমি? 'মাই ওল্ড ফ্লেম, মাই ফার্স্ট সুইট ড্রিম, মাই লাভ, তুমি এখানে! সেই যে পঁচিশ বছর আগে দার্জ্জিলিং স্নো ভিউ থেকে অকারণে অভিমান ক'রে তুমি নিরুদ্দেশ হ'লে, তারপর দেশদেশান্তরে কত খুঁজেছি, কত কেঁদেছি, আর শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে যখন করতেই হবে, ওই কুন্তীকে বিয়ে করলাম! আজ এতদিন পরে—, এ কি স্বপ্ন? কি আশ্চর্য্য!'

মহামায়া। হ্যাঁ, সে রাত্রে ঝগড়াটা হবার পর হঠাৎ মনে হ'ল যে, তোমাকে বিয়ে করলে দুঃখ অনিবার্য্য। রাত্তে চুপিচুপি বেরিয়ে সোজা গেলাম গ্রোভে অশোক গুপ্তর ফ্ল্যাটে, তোমার মত অত দহরম-মহরম ওর সঙ্গে ছিল না সত্যি, কিন্তু বেশ কিছু পরিচয় ছিল তা তুমি জান। সেখান থেকে দুজনে আলমোরায় চ'লে গেলাম বিয়ে করব ব'লে। সেখানে গিয়ে সবে নেমেছি, কোথেকে খবর পেয়ে তার মা এসে ওত পেতে ব'সে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধ'রে নিয়ে গেল। এক সপ্তাহের ভেতর সুসেন রায়ের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়েও হয়ে গেল। রাগে দুঃখে অপমানে কলকাতায় ফিরেই বিয়ে ক'রে ফেললাম আদিত্য গুপ্তকে। বেচারা অনেক কাল থেকে ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা করছিল।

সত্যপ্রিয়। (উৎসাহভরে) করবেই তো। তুমি যে তখনকার একটি প্রধানতমা বালিগঞ্জ বিউটি ছিলে, কত পাঁচ ছেলের বাপ তোমার জন্যে লোরেটোর পাঁচিল টপকাবার ধান্ধা করত। কিন্তু কি নামটি বললে? আদিত্য গুপ্তকে বিয়ে করলে?

উপস্থিত প্রত্যেকেই চমকাইয়া উঠিল।

মহামায়া। হ্যাঁ গো, চেনো নিশ্চয়। মস্ত ধনী। প্লাইউডের কালাও কারবার। ভদ্রলোক, মিথ্যে কথা বলব না, সুখেই রেখেছিল খুব। কিছুরই অভাব ছিল না, একটা মেয়েও হ'ল। তবে জান তো আমার চালচলন। একেবারে পর্দানশীন সেলিমাবেগম ক'রে রেখেছিল। তা আমার সইবে কেন? একদিন বেশ মোটা কিছু টাকা আর গয়নাগাঁটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আর কি? এই তো দেখছই আজ।

বিমলা এতক্ষণ ঘোমটা তুলিয়া অবাক বিস্ময়ে গল্প শুনিতেছিল। এক্ষণে সহসা আগাইয়া আসিয়া মা-মহামায়াকে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল।

বিমলা। মা, মা, তুমি তবে বেঁচে আছ? বাবা যে বলেন, তুমি পুরীর সমুদ্রে ডুবে গেছ মা। উঃ, এতদিন পরে মা পেলাম?

মহামায়া মেয়ের মাথায় স্নেহস্পর্শ রাখিলেন।

অজয়ও আসিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। ডাকিল, মা, আশীর্ব্বাদ ?
মহামায়া। বেঁচে থাক বাবা। ভাগ্যমানী হও। (আশীর্ব্বচন করিলেন।)
কুন্তী। সে কি, আদিত্য গুপ্তের স্ত্রী তুমি ? বউমার মা ? আমার অজুর শাশুড়ী ? দিদি দিদি, বেয়ান ভাই! (আগ্রহে মহামায়াকে জড়াইয়া ধরিলেন।)
বেবী। কি আশ্চর্য্য! আপনিই আমার মাউইমা ? (প্রণাম করিল।)

এই পরিপূর্ণ মিলন-উৎসবে শুধু একটি দুঃখের সংবাদ রহিয়া গেল। অজয়ের ছেলেটির এখনও দিদিমা ডাকিবার বয়স হয় নাই। তবে সান্ত্বনা, সে কিছুদিন পরেই ডাকিবে।

অবাক হইয়া বড়দার গল্প শুনিতেছিলাম। বড়দা থামিতেই কহিলাম, কি বলছ যা তা ? যত গাঁজা; এ হতেই পারে না; রাবিশ, এ আমি বিশ্বাসই করি না।

বড়দা গম্ভীরমুখে কহিলেন, আমিও না।

কহিলাম, তবে ?

বড়দা এবার চোখ নাচাইয়া হাসিয়া কহিলেন, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অতিআধুনিক সাহিত্যগুলি প'ড়ে শেষ করবার পর, খনামধন্য মনীষী ক্যাপারামবাবু একটি পুরাতন প্রবাদে নতুন লেজুড় জুড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যাণ্ড ওয়ার ছিল তো ? কথাটাকে আরও বাড়িয়ে 'অ্যাণ্ড লিটারেচা'র জুড়ে ছেড়েছেন।

প্রতিবাদে কিছু বলিতে যাইতেছিলাম। বড়দা হাত নাড়িয়া থামাইয়া দিলেন। কহিলেন, আরে ভায়া,—কলির শেষ পোয়া পূর্ণ হতে চলল। আজকের এই জগতে অসম্ভব ব'লে কিছু আছে নাকি ? জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করলে, ইংরেজ রাশিয়া বনাম ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম কম্যুনিজ্‌মে গলাগলি হ'ল, নাকখ্যাবড়া অসভ্য জাপান সভ্য-সমাজকে গোলা খাওয়ালে, মুসোলিনীর পতন হ'ল, যার চেতাবনীর যৌবনে

আমরা সত্যযুগ পর্য্যন্ত চোখে দেখে নিলাম। এতই বিপরীতবর্ণের সব অঘটন ঘটছে, আর নগণ্য একটা গল্প কি আর এমনটি হতে পারে না?

বহুদার কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত। হার মানিয়া শেষ পর্য্যন্ত সায়ই দিলাম।

শ্রীমতী গোপা বসু

[বহুদার গল্পটির নাট্যরূপ সম্প্রতি কলিকাতায় প্রদর্শিত হইয়াছে, যাঁহাদের আসিবার কথা তাঁহারা সকলেই আসিয়াছিলেন, মহামায়া-আশ্রমের স্ত্রী-পুরুষেরাই অভিনয় করিয়াছিল। শুনিতেছি কেচুগঞ্জের বেতারকেন্দ্রেও নাটকটি অভিনীত হইবে।]

পরিচয়

আমরা তিমির-রাত্রিতলে
দলে দলে চলিতেছি, দলে দলে করিতেছি ভিড়—
গায়ে গায়ে ছোঁয়া লাগে স্পর্শটুকু হয় শুধু চেনা ;
মনের গহনলোকে কল্পনায় মায়ার পরশ
কখনো রচনা করি, হয় না গভীর পরিচয়।
আঁধারের চন্দ্রাতপ-তলে
রচিয়া বিভিন্ন নীড়, কুণ্ডে কুণ্ডে ক্ষীণ বহ্নি জ্বালি
ছায়ামূর্ত্তি সম মোরা নিত্য করি রাত্রির উৎসব।
হে অচেনা, পথ ভুলে গিয়েছিনু তোমার গণ্ডিতে,
চকিতে হইল চেনা মশালের প্রদীপ্ত আভায়,
তুমি মোরে শুনাইলে তিমিরের বন্দনা-সঙ্গীত।
আলো-অন্ধকারে
সঙ্গীতের ব্যবধান অকস্মাৎ দূর হ'ল বাহুর বন্ধনে।

তুমি শিল্পী—আমি কবি, এই পরিচয়
বিলুপ্ত হইয়া গেল। মানুষের আবেদন মানুষের কাছে—
(দেহের বন্ধনে বাঁধা অসহায় হায় রে মানুষ!)
অন্ধকারে সত্যতর হয়ে ওঠে দেহের সঙ্গীত।

আমরা বিদেহী নহি, সে নহে মোদের অপরাধ,
ভয় পেয়ে করাঙ্গুলি খুঁজে মরে অঙ্গুলি-আশ্রয়—
ছন্দ-মায়াজাল হতে সেই সত্য এ গাঢ় তিমিরে।
গনিও না অপমান, ওগো বন্ধু, কর মোরে ক্ষমা,
মানসের বার্তা হতে বড় বার্তা এই দেহে আছে,
নভ-পরিচয় হতে বড় মৃত্তিকার পরিচয়।
কবিতা—বিদেহী সুর শব্দের আকাশে মরে ঘুরে,
দুই দেহ এক হয় জীবনের ঘনিষ্ঠ স্পন্দনে।

শোন বন্ধু, সত্য কহি শোন।
ছন্দোবদ্ধ কাব্যে মোরা জীবনের গাহি জয়-গান;
জীবনে বাসি না ভাল—প্রেমহীন নিষ্ফল জীবন।
সে কাব্য আমার নহে, হে মোহান্ধ, মোরে কর ক্ষমা—
জীবনেরে দূরে ঠেলি পাখা মেলি কাব্যের অসীমে
এ আঁধারে কাজ নাই কুড়ায়ে ধরায় করতালি।
তুমি শিল্পী, আমি কবি—মনোরাজ্যে ভিন্ন মোরা দুয়ে,
মিলিবার পথ নাই ছন্দে সুরে ভাবে ও ভাষায়;
শিল্পের বিচিত্র লোকে এ উহার জন্মাই বিস্ময়।
গুণীরে চাহি না আমি, এ আঁধারে নেমে এস তুমি—
হাতে হাত রাখি মোর নিরুদ্বেগে আত্মসমর্পণ
না যদি করিতে পার, জীবলোকে দিও গো বিদায়—
কাব্যলোকে মিলনের তাহাতে হবে না অন্তরায়।

সংবাদ-সাহিত্য

গোড়ায় কিছু কাজের কথা বলি।

কাগজ-সমস্যা জটিলতর হইবার ফলে 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশে এই বিলম্ব অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকগণের কাছে পূর্বেই আমাদের নানা অসুবিধার কথা নিবেদন করিয়া রাখিয়াছি। আজ ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে "সংবাদ-সাহিত্য" লিখিতে বসিয়া সর্বাগ্রে তাঁহাদিগকে আবার সেই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। বাংলা দেশের বৃহত্তম কাগজের মিলের কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগজ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াও কোন্ কারণে তাহা রক্ষা করিতেছেন না জানি না, ফলে আমরা বাধ্য হইয়া অন্য মিল হইতে অথবা তিমিঙ্গিল-ধর্মী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কাগজ লইয়াছি। আমাদের এই অপরাধে প্রথমোক্ত মিল আমাদের উপর চোখ রাঙাইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা কাগজও দিবেন না, পথও ছাড়িবেন না। আমরা বিনীতভাবে পুনর্বার তাঁহাদের ধর্মবুদ্ধির নিকট আবেদন জানাইয়াছি। তাঁহারা কৃপা করিবেন এই আশায় এখনও আমাদের পাঠকদের সম্বোধন করিতে পারিতেছি। তাঁহারা ভিন্ন মূর্তি ধরিলে আমাদিগকেও রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে হইবে। আশা করিতেছি, তাহার প্রয়োজন হইবে না।

গত পক্ষকালের মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রে কাগজ-সমস্যা সম্পর্কে নানা চিঠিপত্র, সভার বিবরণী ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্যা-সমাধানের চারিটি মাত্র উপায় দেখা যাইতেছে। এক, অসামরিক ব্যবহারের জন্য শতকরা ত্রিশ ভাগকে কিছু বাড়াইয়া দেওয়া; দুই, বৈদেশিক কাগজ বেশি পরিমাণে আমদানি করা; তিন, চোরাবাজার বন্ধ করিয়া কাগজের বাজারে ধর্ম এবং সাম্য বজায় রাখা; এবং চার, অনাবশ্যক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক মুদ্রণ আপাতত বন্ধ রাখিয়া যাহা একান্ত প্রয়োজন তাঁহার প্রচার অব্যাহত রাখা। প্রথম তিনটি উপায় সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে হওয়া সম্ভব নয়; চতুর্থ উপায় অবলম্বিত হওয়া এই কারণে সম্ভব নয় যে, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বিচার কে করিবে! সুতরাং আমরা একান্তভাবে কাগজ-প্রস্তুতকারকদের খামখেয়ালী দয়ার উপর নির্ভর করিয়া যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিতে বাধ্য হইব। তাঁহাদের

দয়া-ধর্ম ও ন্যায়বুদ্ধির তারিফ করিয়া করিয়া তাঁহাদের সংকল্প-হৃদয় বিদীর্ণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। পয়সা দিয়া এরূপ চোর বনিয়া থাকার ইতিহাস পৃথিবীতে এই নূতন। তাই মনে হইতেছে, ইতিহাসে পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে। সে পরিবর্তন কি আমরা সাধন করিতে পারিব?

*   *   *

এই গেল ব্যক্তিগত কাজের কথা। সম্প্রদায়-গত কাজের কথা মাধ্যমিক শিক্ষাবিল-সংক্রান্ত। ইহার ফলে আমাদের কি ক্ষতি অথবা সর্বনাশ হইবে, তাহা সম্যক না বুঝিলেও আমরা এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। কারণ, আমাদের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আমাদের শ্যামাপ্রসাদ এবং হিন্দু-মুসলমান অন্যান্য আরও যে সকল নেতাকে আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকি তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন, এই বিল বিধিবদ্ধ হইলে বাংলার হিন্দু-সমাজের সর্বনাশ হইয়া যাইবে। শুনিয়া মনে হইতেছে, পুরা সর্বনাশ তাহা হইলে এখনও হয় নাই। বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে কৃষক-প্রজাদলের দুই-একজন মুসলমান নেতা যুক্তির সহিত বলিয়াছেন যে, ইহা মুসলমান-সমাজেরও অকল্যাণ আনয়ন করিবে। ইহা সত্য জানিয়া আমাদের প্রতিবাদ তীব্রতর করিতেছি। বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তকাদি যে সমিতি এই শিক্ষাবিলের পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করিবেন, সেই সমিতির সদস্যদের বৃহত্তম অংশ সরকারকর্তৃক মনোনীত হইলে এই লোক-দেখানো ঘনঘটায় প্রয়োজন কি? মারিবার জন্য সরকারী স্লটার হাউস যেখানে খোলা আছে, সেখানে সমারোহ করিয়া কালীঘাট পর্যন্ত আমাদিগকে টানা হইতেছে কেন? সুতরাং এই শিক্ষাবিল অনাবশ্যক, অযৌক্তিক ও নির্দয়।

*   *   *

জাতিগতভাবে আমাদের অবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে আর বাকি নাই। পূর্বপ্রত্যন্তে ইংরেজ ও কমিউনিস্ট মতে ভারতবর্ষের বৃহত্তম ও নৃশংসতম শত্রু জাপানীরা ওত পাতিয়া বসিয়া আছে; পশ্চিমে চব্বিশপরগণা-মেদিনীপুর-চুম্বী লবণাক্ত সমুদ্র ও অজয়-দামোদর-দ্বারকেশ্বরের অকস্মাৎ জলোচ্ছ্বাস, অনাবৃষ্টি ও ম্যালেরিয়া মহামারী; সারা বাংলা দেশ জুড়িয়া বিগত ও আসন্ন দুর্ভিক্ষের স্মৃতি ও শঙ্কা এবং

গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্ একজরীবৎ ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বাঙালীর প্রাণশক্তি যে কতখানি প্রবল, এই বহুবিধ মৃত্যু-সমারোহের মাঝখানেও তাহার ধুকধুক হৃদ্‌স্পন্দন তাহার প্রমাণ দিতেছে। যাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, গত পঞ্চাশ সনের মহামন্বন্তরে বাঙালী জাতির অধমাঙ্গ সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত (মৃত্যুজনিত) হইয়াছে, তাঁহারা আজিও দৈনিকপত্রে কলিকাতায় দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকের মৃত্যুসংখ্যা প্রকাশিত হইতে দেখিয়া হয়তো চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু এই সংখ্যা প্রকাশের দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না যে, রবীন্দ্রনাথের গল্পের কাদম্বিনীর মত ইহারা মরিয়া দেখাইতেছে যে ইহারা বাঁচিয়া ছিল। সরকার দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া মৃত্যুর হার দেখাইয়াও যে সত্যের মহিমা স্বীকার করিতেছেন, সেটাও কি কম কথা!

* * *

কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যাইবে, এটি সরকারী ভ্রান্তি মাত্র, আসলে সরকার বাহাদুর প্রবল উদ্যমে প্রচুর অর্থব্যয়ে জীবনেরই জয়গান করিতেছেন—"গ্রো মোর ফুড—ফসল বাড়াও" নামক জাতীয় সঙ্গীতে। যেখানে গ্রামে গ্রামে নামমাত্র ফসল ফলাইয়াও শুধু কিষাণ-মজুরের অভাবে মাঠের ধান ঘরে তোলা সম্ভব হয় নাই, যেখানে হাজার হাজার বিঘা সুফলা জমির উপর পুষ্পকরথের নৃত্য দেখিয়াও চাষী-মজুরেরা স্থানান্তরে পলায়ন ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে মৃত্যু বরণ করিয়াও বিদ্রোহ করে নাই, সেখানে দীর্ঘদিনের পতিত জমিতে ফসল ফলাইবার এই হুকুম পঞ্চাশোর্ধ্বগতা বিধবার পুনর্বিবাহ হুকুমের মত কৌতুকপ্রদ নয় কি? বাংলা দেশে ভাল জমি যদি সত্যই কোথাও অনাবাদী পড়িয়া থাকে, তাহা আছে এই সকল ফসল-বাড়াও আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের উর্বর মস্তিষ্কে। হাজার হাজার হ্যাণ্ডবিল ও প্রচার-পুস্তিকা সর্বত্র ছড়াইয়া ইহারা সাদা কাগজ ও ছাপাখানার ব্যবসায়ীদের ফসল বাড়াইয়া নিজেদের কতখানি উপকার সাধন করিতেছেন জানি না—বাংলা দেশের ফসল এক ছটাকও বাড়িতেছে না। তাহা করিতে হইলে ছাপাখানা ও কাগজের দোকান ছাড়িয়া কলেরা-ম্যালেরিয়া-সাপ-শিয়াল-অধ্যুষিত গ্রামে গ্রামে ধাওয়া করিতে হইবে, মৃতকল্প চাষীদের দেহে স্বাস্থ্য ও প্রাণে

আশার সঞ্চার করিতে হইবে এবং সর্বোপরি গোখাদক সৈন্যদের কবল হইতে চাষীর হালের গরু-মহিষদের রক্ষা করিতে হইবে। এই সব করিতে ইঁহাদের দায় পড়িয়াছে। চাষীরা হাজারে হাজারে কলিকাতায় সিনেমা দেখিতেছে, মাসিকপত্রাদি পড়িতেছে—সুতরাং ইঁহারা সিনেমার পর্দা ও পত্রিকার পৃষ্ঠা 'ফসল বাড়াও' বিজ্ঞাপনে ভরাইয়া দিতেছেন। বাংলা দেশের ফসল চমৎকার বাড়িয়া চলিয়াছে।

* * *

গোপালদার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া আজকাল তাঁহার কথায় বড় একটা আমল দিই না—আমাদের অসহায় অস্বাচ্ছন্দ্য ভাব দেখিয়া সেই পাগলই একদিন একটা উপায় বাতলাইয়া দিলেন। বলিলেন, মরিবেই তো একদিন; বীরের মত মর। কাগজ সরবরাহ বন্ধ করিয়া তোমাদের কাগজ একদিন উঠাইয়া দিবে, তাহা ঘটিতে দিও না। ব্যাঙ্ক সিডিশন লেখ। উহারাই নোটিশ দিয়া কাগজ বন্ধ করিয়া দিবে। জেলে লইয়া গেলে অধিকন্তু লাভ।

এই উপায় আমাদের পছন্দ নয়, এই স্তিমিত পত্রিকা-জীবনযাত্রা কোনক্রমে নির্বাহ করিতেই হইবে। খোশামোদি করিয়া মোসাহেবি করিয়া ভাঁড়ামি করিয়া এবং মাঝে মাঝে বিকল্পে চোখ রাঙাইয়া আর সবাই যেমন টিঁকিয়া আছে, আমাদিগকে তেমনই করিয়াই টিঁকিয়া থাকিতে হইবে। "কর্ণ-কুন্তী সংবাদে"র কর্ণের মত আমাদিগকেও বলিতে হইবে—

> আজি এই রজনীর তিমির-ফলকে
> প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
> ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধক্ষণে
> অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
> জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত,—আশাহীন
> কর্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময়
> শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
> সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।

* * *

এই নিরুদ্যম নিশ্চেষ্টতার মধ্যেই মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি আমাদের মোহমুক্তির কি কোনও সূচনা করিতেছে? তিনি নিজের স্বাস্থ্য ও

জনাব জিন্নার জগিবৃৎ লইয়া কতদিন ব্যস্ত থাকিবেন জানি না, কিন্তু আর আমরা সহিতে পারিতেছি না। কংগ্রেসের মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে উচ্চনীচনির্বিশেষে যে চেতনা সঞ্চারিত হইয়াছিল, কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া ভারত গবর্মেণ্ট সেই চৈতন্যকেই মোহগ্রস্ত করিয়াছেন। গান্ধীজীর মুক্তি আশাপ্রদ বটে, কিন্তু কংগ্রেসের মুক্তি এই দুর্দিনে সর্বাপেক্ষা অধিক কাম্য। দেবীচৌধুরাণী-রূপী প্রফুল্লকে ধরিবার জন্য যখন নদীবক্ষে আয়োজন চলিতেছিল, তখন প্রফুল্ল যে আশায় নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেই ক্ষীণতম আশা কি আমাদের প্রাণেও সঞ্চারিত হইতেছে?

এদিকে পাঁচ দিক হইতে পাঁচখানা ছিপ আসিয়া বজরার অতি নিকটবর্ত্তী হইল। প্রফুল্ল সেদিকে দৃক্‌পাতও করিল না, প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ শরীরে ছাদের উপরে বসিয়া রহিল। প্রফুল্ল ছিপ দেখিতেছিল না—বরকন্দাজ দেখিতেছিল না। দূর আকাশপ্রান্তে তাহার দৃষ্টি। আকাশপ্রান্তে একখানা ছোট মেঘ, অনেকক্ষণ হইতে দেখা দিয়াছিল। প্রফুল্ল তাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, যেন মেঘখানা একটু বাড়িল; তখন "জয় জগদীশ্বর" বলিয়া প্রফুল্ল ছাদ হইতে নামিল।

আমাদের বজরাখানাকে নানা দিক হইতে নানা ছিপ আসিয়া ঘিরিয়াছে; দুই-একটির মাত্র পরিচয় দিয়াছি, কিন্তু সবগুলিই সমান সর্বনাশা, সমান মারাত্মক। আমাদের ভাগ্যাকাশে কোথাও কি উদ্ধারকারী মেঘ দেখা দিয়াছে? "জয় জগদীশ্বর" বলিয়া আমরাও কি মুক্তিসাধনার কর্মক্ষেত্রে দেবী চৌধুরাণীর মত নামিতে পারিব?

—

গত প্রায় দুই মাস কাল অসুস্থ দেহে শয্যা আশ্রয় করিয়াছিলাম। এই অবসরে বাংলা সাহিত্য-জগতের নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্যগোচর হইয়াছে, যাহা সুস্থদেহে সহজ অবস্থায় নজরেই পড়িত না। যুগপ্রভাব এমন প্রবল ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণ মানুষ আর স্বেচ্ছায় পথ চলিবার অধিকারী নয়, সম্মুখ ও পিছনের মানুষের ভিড় ও কর্তব্যের ঠেলা তাহাকে অনুক্ষণ নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঠেলিয়া লইয়া চলে। বাধা দিতে গেলে শুধু জখমই হইতে হয়, নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। রোগী সাজিয়া বসিয়া সাময়িকভাবে মুক্তি পাইয়াছিলাম। সমুদ্রতটে বালিতে বুক দিয়া পড়িয়া থাকিয়া যেমন

প্রবল ঢেউয়ের ধাক্কা সহজেই এড়ানো যায়, এ যেন তেমনই। ঢেউয়ের মাথায় চাপিয়া যাহারা দোল খায়, দোল খাওয়ার মত্ততাই তাহাদিগকে পাইয়া বসে—আশেপাশের আর কিছু দেখিবার অবকাশ তাহাদের হয় না। সময়ের তরঙ্গে আমরা সর্বদাই এরূপ দোল খাইয়া থাকি. বলিয়া বহু বিচিত্র জিনিস আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। তরঙ্গচূড়াচ্যুত হইয়া খাটিয়া আশ্রয় করিলেই বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিতে হয়।

বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলাম, বাংলা দেশে যে সকল পুস্তক-পুস্তিকা বর্তমানে প্রকাশিত হইতেছে, তাহার শতকরা পঞ্চাশটিরও অধিক সোভিয়েট সভ্যতা, সোভিয়েট সংস্কৃতি, মার্ক্সবাদ অথবা রুশদেশ সম্পর্কিত। সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ গল্প কবিতার শতকরা চল্লিশ ভাগ হয় সোভিয়েট, নয় মার্ক্সীয়। সোভিয়েট ও মার্ক্সবাদ যেন ভূতের মতন বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্যের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া আছে। আমাদের নিজস্ব কোন বক্তব্য নাই, নিজস্ব কোন চিন্তা নাই, নিজস্ব কোন অনুভূতি পর্যন্ত আছে কি না সন্দেহ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষে একবার এইরূপ চিন্তাদৈন্য দেখা গিয়াছিল। বাঙালী তখন ইংরেজীতে হাসিত, ইংরেজীতে কাশিত এবং ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখিত। আজ প্রায় শতাব্দী কাল পরে বাঙালী সোভিয়েট মতে হাসিতেছে, সোভিয়েট মতে কাশিতেছে এবং মার্ক্সীয় স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে। ইংরেজী শিক্ষায় অত্যধিক শিক্ষিত কয়েকজন ইয়ং-বেঙ্গল সেদিন মাতৃভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে এক রকম গায়ের জোরে ঝোঁক দিয়া এক শোচনীয় ব্যর্থতা হইতে স্বদেশ ও স্বজাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সোভিয়েট সংস্কৃতিতে সত্য সত্যই সংস্কৃত আমাদের আধুনিক ইয়ং-বেঙ্গল বন্ধুরা কি এখনও নিশ্চিন্ত থাকিবেন?

মজা এই যে, এই সকল পুস্তক ও প্রবন্ধের অধিকাংশই দুর্বোধ্য—যাঁহারা লেখেন সম্ভবত তাঁহাদের কাছেও। মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় পঞ্চাশটির অধিক বই দেখিলাম, কিন্তু কোনটিই ডায়ালেকটিকের চক্রান্তের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিল না, দাড়ির দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আসল মানুষটাই হারাইয়া গেল। বেফয়দা এতখানি কালিকলম ও কাগজ

কোনও দেশে কোনও কালে খরচ হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। [এই হিমালয়-প্রমাণ ব্যর্থতার মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশোভনচন্দ্র সরকারের 'মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ'-এ, বেনামীতে (অমিত সেন) তাঁহারই লেখা 'ইতিহাসের ধারা'য় এবং সরোজ আচার্যের 'মার্ক্সীয় দর্শন'-এ সফলতার কিছু পরিচয় পাইয়া সত্যই আনন্দিত হইয়াছি। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ কথা এখানে জানাইয়া রাখিলাম।] কয়েকটি সাময়িক-পত্রে ইংরেজী বুকনি-মিশ্রিত মার্ক্‌স-চচ্চড়ি তো ক্রমশই আতঙ্কজনক হইয়া উঠিতেছে। যে সকল ধাড়ী লেখক এককালে "দোহাই মা কালী" বলিয়া অলাবুবিষয়ক প্রবন্ধেও গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজিতেন, তাঁহারাই দেখিতেছি বুড়া বয়সে কার্ল মার্কসের তোবা:না করিয়া কথা বলেন না। এ এক ভাল জুয়াচুরি বাংলা দেশে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

প্রবন্ধগুলা না হয় সভয়ে পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারিতাম, কিন্তু গল্পে কবিতাতেও কাস্তে হাতুড়ি ও লালে-লালের এমন ভয়াবহ ছড়াছড়ি যে, বাংলা দেশের রবিবার-শনিবারগুলা পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে। মদ সুলভ হইলে এ লালের তবু একটা অর্থ ছিল। এই পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার তীরে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ সর্বাঙ্গে মাখিয়া নীপারের বাঁকের লালঝাণ্ডা উঁচা করিয়া উড়াইতে দেখিলে এ ম্যালেরিয়ার দেশেও গায়ে জ্বর আসে। জনস্রোতে ভিড়ের ঠেলায় এই বিচিত্র দশা কাহারও লক্ষ্য-গোচর হইতেছে না, সকলেই 'গৌর গৌর' করিয়া নাচিতেছে।

* * *

গত চৈত্র মাসের (ষষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা) 'চতুরঙ্গে' দেখিলাম ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ সম্ভবত আমাদের মত রোগশয্যায় শুইয়া "মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র কে" ভিন্ন চোখে দেখিবার অবকাশ পাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

সমাজতন্ত্রের অসংখ্য রূপ আছে। শুনা যায় যে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপ হইল মার্ক্সবাদ, কারণ ইহাই নাকি বিজ্ঞানসম্মত বা scientific; এবং মার্ক্সবাদ রূপ যে শ্রেষ্ঠ সমাজতন্ত্রবাদ তাহাই ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। যদিও মার্ক্সবাদ একটি দুর্বোধ্য গ্রন্থের মধ্যেই 'পঙ্গু' হইয়া পড়িয়া আছে, যদিও কার্যক্ষেত্রে তৎপরিবর্তে লেনিনবাদ, ট্রটস্কিবাদ, ষ্ট্যালিনবাদ প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, যদিও স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এই লেনিনবাদ প্রভৃতিরও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্যকর বিভিন্ন মূর্তি দেখা দিয়াছে

এবং যাইতেছে, এবং যদিও ইহাও ঠিক যে রাশিয়ায় ট্রট্স্কির পরাজয় না ঘটিলে মার্ক্সবাদ বলিতে আজ ট্রট্স্কিবাদই বুঝাইত—তথাপি এক শ্রেণীর ভারতীয় সমালোচক অনবরতই বলিয়া থাকেন ভারতের যাহা প্রয়োজন তাহা হইল মার্ক্সবাদ (অর্থাৎ ষ্ট্যালিনবাদ)। স্বীকার করিতে হইবে যে, যাঁহারা এই কথা বলেন ও বিশ্বাস করেন তাঁহাদের মনে যুক্তি ভক্তির নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে।…

মার্ক্সবাদ-এর "বৈজ্ঞানিকত্ব" একটি অভাব মাত্র, দোষ নহে। ইহার দোষ হইল পরমার্থসত্যের (transcendental absolute truth) অস্বীকরণ। এবং এই দোষের জন্যই মার্ক্সবাদ একটি যুক্তিসহ দর্শনপ্রস্থান রূপে পরিগণিত হইতে পারে না।… মার্ক্সবাদী ভগবানে বিশ্বাস করেন না কিন্তু দাবী করেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল, তিনি সত্যে বিশ্বাস করেন না কিন্তু বলিয়া থাকেন যে আর্থিক জগতে (পারমার্থিক জগতের প্রশ্নই তাঁহার নাই) মার্ক্সবাদ-ই একমাত্র সত্য; স্ব-তন্ত্র সৌন্দর্যে তাঁহার আস্থা নাই, কিন্তু তাঁহার মুখেই আবার শুনা যায় যে ভবিষ্যৎ মার্ক্সবাদীয় জগৎ সুন্দর। মার্ক্সবাদীর মুখে এ সকল কথার কোনই অর্থ হয় না।

Vandalism যদি একটি বিশিষ্ট শিল্পপদ্ধতি বলিয়া পরিগণিত না হয় তবে মার্ক্সবাদ যে কেন একটি বিশিষ্ট দর্শনপ্রস্থান রূপে স্বীকৃত হইবে তাহা বাস্তবিকই আমি বুঝিতে পারি না। স্বার্থোদ্ধারই যাহার একটি সত্যমিথ্যা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি সে দুর্জন, সজ্জন নহে,—একথা বোধ হয় মার্ক্সবাদীও অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু জনসাধারণকে স্ব-তন্ত্র পরমার্থসত্য অস্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়া মার্ক্সবাদী কি এই স্বার্থবুদ্ধিরই প্রচারক হইয়া পড়েন নাই? সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মনোবৃত্তি যদি স্বার্থবোধিত হয় তবে তাহা হইতে কি জগতের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে? প্রত্যেকে ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থোদ্ধারকেই চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিবে অথচ সেই সঙ্গেই জাতীয় জীবনে এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবে যে সকলের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ—মার্ক্সবাদীর এই আশা কি একান্ত অযৌক্তিক নহে? মার্ক্সবাদী বলিতে পারেন, রাশিয়াতে যখন এই আশা সফল হইয়াছে তখন ভারতেই বা তাহা হইবে না কেন? কিন্তু রাশিয়াতে যাহা সফল হইয়াছে তাহা মার্ক্সবাদ নহে, ষ্ট্যালিনবাদ, এবং অন্তর্বিপ্লবের ভিতর দিয়া রাশিয়াতে এই ষ্ট্যালিনবাদ-এর আরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হইত যদি সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রতিকূলতায় রুশদিগকে বাধ্য হইয়া অন্তরোন্নতির পরিবর্তে আত্মরক্ষার প্রতিই অধিক মনোযোগ দিতে না হইত।

…H. G. Wells-এর কথায় সায় দিতে হয় যে মার্ক্সবাদ হইল "Sabotage of civilization by the disappointed"। ক্ষুধায় সকল মানুষই পশুতে পরিণত হইতে পারে। মার্ক্সবাদ হইল ক্ষুধার তাড়নায় পশুভাবাপন্ন গণমানবের চরম তিক্ততার পরম পরিণাম। সেই অবমানিত ও ক্ষুৎপীড়িত গণমানব যদি আজ জগতের সমস্ত খাদ্য কেবল তাহাদেরই বলিয়া দাবী করে তবে কাহারও তাহাতে আপত্তি করা নৃশংসতা। কিন্তু

সে যদি বলে যে অন্নসমস্যাই মনুষ্য-সমাজের প্রধান সমস্যা, এবং সেই সমস্যার যেরূপ সমাধান যে-সমাজে হয় তাহাই হইল সেই সমাজের সভ্যতার প্রধান নির্দেশক, তবে তাহাতে আপত্তি না করিয়া পারা যাইবে না। ইহা কিন্তু মার্কসবাদীর কথা, এবং ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মার্কসবাদী যদি প্রগতিবাদী হ'ন তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে প্রগতির ফলে এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে যেদিন অন্নসমস্যাকে আর সমস্যা বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ থাকিবে না। কিন্তু এই অন্নসমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাটির সমাধাতৃ মার্কসবাদীর-ও অবসান ঘটিবে, কারণ মার্কসবাদী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে অন্নসমস্যাই তাঁহার প্রধান সমাধেয় বস্তু। কাজেই মার্কসবাদীর নিজের কথা হইতেই অনুমিত হয় যে অন্নসমস্যার সমাধানের পর প্রকৃত মানবত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্মুখে যে অনন্ত উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে তৎসম্বন্ধে মার্কসবাদীর কোন কৌতূহলও নাই। অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রীর নিকট পশুচিত জীবনসংগ্রামের অন্তে প্রকৃত মনুষ্য-জীবনের আরম্ভ, যে-জীবনে প্রতি মানুষ প্রতি বিষয়ে আপনার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া প্রকৃত মানবোচিত উচ্চতর কৃষ্টির অধিকারী হইবার সুযোগ লাভ করিবে; মার্কসবাদীর কিন্তু নিজেরই প্রতিজ্ঞা এই যে অন্নসমস্যাশূন্য প্রকৃত মানবোচিত সমাজে তাঁহার কোন স্থান নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, যিনি নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই মানবোচিত সমাজের বহির্ভূত তিনি কিরূপে মানব-সমাজের নেতৃত্ব করিবেন? কাজেই ভারতীয় বা বৈদেশিক সকল সমাজতন্ত্রীরই কর্তব্য মার্কসবাদীর নেতৃত্ব অস্বীকার করা।

মার্কসবাদ ভাল কি মন্দ—সে কথা পণ্ডিতেরাই বিচার করিবেন, আমরা শুধু বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে এই যে মার্কসীয় ও সোভিয়েট পরিবেশের সৃষ্টি হইতেছে তাহা পছন্দ করিতে পারিতেছি না, কারণ Henry Drummond-এর মত আমরাও বিশ্বাস করি

Environment is going to bring about great revolutions in the world. Environment will shake the foundations of the earth.

যে রুশীয় environment আমরা ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি করিতেছি, তাহা যে ভারতের মাটিতে সুফলপ্রদ হইতে পারে না তাহা বিশ্বাস করি বলিয়াই এত কথা লিখিলাম।

—

রোগ-শয্যায় আর একটি বিস্ময়কর পদার্থ নজরে পড়িল। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার দুর্বোধ্যতা ও ভঙ্গীসর্বস্বতার বিরুদ্ধে অভিযানের জন্যই একদিন 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নিরুক্ত' বাহির হয়। প্রথম সংখ্যা 'নিরুক্তে'র গোড়ায় রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় ব্লক করিয়া একটি

পত্র ছাপা হইয়াছিল, তাহাতে এই ভঙ্গীসর্বস্বতা ও দুর্বোধ্যতাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছিল। সম্পাদকেরাও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন বাংলা কাব্যকে হিংটিংছট্ করিয়া তোলা মোটেই তাঁহাদের অভিপ্রেত নয়। সেই ঘোষণাকে উপহাস করিয়া আজ 'নিরুক্ত' পত্রিকা তিন মাস অন্তর অন্তর অমেধ্য দুষ্পাচ্য কতকগুলা শব্দযোজনাকে কবিতা আখ্যা দিয়া পরিবেশন করিয়া চলিয়াছে—ভিড় হইতে দূরে আসিয়া বিস্ময়ের সহিত তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। চৈত্র ১৩৫০-এর সংখ্যা অর্থাৎ চলতি সংখ্যাটি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

চেষ্টা অনেক :
হ'লনাক' তবু ধ্রুব নিধন।
বার্থ সাধনা বড় আয়োজন
সবই বিফল।
চাঁদের রাত্রি
ধরেছে কঠোর খচিত কাস্ত্রী কালো পেখম।
সুখ কি ধরে
কাঁটা তারে ঘোড়া ফকিরটার?
সুখ সমাধি অসম্ভব।

কোথায় রাত্রি
চাঁদের পাখা যে হ'ল বেহাত।
খাড়া পাহাড়ের উপরে জোরের
কী অক্লপিয়া।
পরাজিত তাই কালো কিরাত :
সাতরঙা রঙে অঙ্গীকার।

দিনের যাত্রা
দলে দলে তাই চলে মিছিল।
জীবন পূর্ণ এ ধর রক্তে
মাহিমায় হল মহামহিম।
চেষ্টা অনেক :
হ'লনাক' তবু ধ্রুব নিধন।
চাঁদের রাত্রি
ধরেছে কঠোর খচিত কাস্ত্রী কালো পেখম।
পরাজিত হল কালো কিরাত :
সাতরঙা রঙে অঙ্গীকার।

* * * *

আরও অনেক বিস্ময়ের ব্যাপার আছে, কিন্তু আমাদের বিস্ময়-প্রকাশের স্থান নাই।

এই দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা বাংলা সাহিত্যে অতিশয় ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীর মত পণ্ডিতজনের আশ্রয় লাভ করিয়া এই পাপ মহারাজ নন্দের সভায় বচিালের মত বাংলা সাহিত্য-রাজ্যে বিপুল বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিতেছে। কর্তাভজার দেশে নাম-ডাকের মোহ বড় ভয়ানক, অথচ জ্ঞানপাপীদের শূলে দেওয়ার ব্যবস্থা তথাকথিত সভ্যজগৎ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। মনুর শাসন সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা অদ্যাপি মানিয়া থাকি, কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা ভিন্ন রূপপরিগ্রহ

করিয়াছে বলিয়া সর্বচোরেরা শাস্তি পায় না। মনু একটি শ্লোকে সর্বচোরদের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন—

বাচ্যর্থা নিয়তাঃ সর্বে বাঙ্‌মূলা বাগ্‌বিনিঃসৃতাঃ।
তাং তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্বস্তেয়কৃন্নরঃ॥

অর্থাৎ, মনুষ্যমাত্রেরই সমস্ত ব্যবহার বাক্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। পরস্পরের বিচার-আলোচনা পরস্পরকে জানাইবার পক্ষে শব্দের ন্যায় দ্বিতীয় সাধন নাই। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের আশ্রয়স্থান ও বাক্যের যে মূল উৎস, তাহাকে যে ব্যক্তি ঘোলাইয়া ফেলে অর্থাৎ বাক্যের সহিত প্রতারণা করে, সে ব্যক্তি সর্বচোর ব্যতীত আর কিছুই নহে। * * *

'ছোটো গল্প গ্রন্থমালা'র তৃতীয় সংখ্যা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "ধরা বিয়ে"। বায় লিখিতে লিখিতে হাত টাটাইয়া গেলে ছোট আদালতের হাকিম যে ভাষায় ডাইরি লেখেন, এ সেই ভাষা। না লিখিলেই নয় তাই সাঁটে লেখা। "বাধ্যতামূলক" সৃষ্টিকে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে প্রচার করার বাহাদুরি আছে। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কি ভাগ্য!

সব আবছা-আবছা। মনের মধ্যে এঁটে আছে শুধু সেই মেয়েটার নড়াচড়া। হেলা-দোলা। 'ডাবা হুঁকোর ছুঁচলো করে ঠোঁট রাখা। ধোঁয়া ছাড়া। ঘাসের মতো পান চিবানো। শব্দ করে পিক ফেলা। ফকড়্‌ছ্যাবল মেয়ে।...সোদপুরের ক্রসিং-লেভেল (?)...

গল্পের নায়িকা দিব্যমণির মত অচিন্ত্যবাবুরও এখন সাঁটে কাজ সারিবার ঝোঁক চাপিয়াছে—ভাবী স্বামী ভক্তদাসকে দিব্যমণি যে ভাবে চুমু খাওয়াইয়া ভাগাইতে চায়, পাঠককেও এ যেন তেমনই তাড়ানো। হাঁপানির ধমকও হইতে পারে।

চোখে ঝিলিক মেরে বলে দিব্যমণি, "চুমু খাবি তো? চুমু খেলেই তো হবে? খা না—যত তোর খুসি। 'আমার মুখে খুব মিষ্টি পান। নে, শিগগির, সাটে সেরে নে চট করে। তার পর বাড়ি পালা।"

এখনও যাহারা পলাইতে পারে নাই, তাহাদের দুর্গতি কে নিবারণ করিবে! * * *

জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে "নারীর গোত্রান্তর···" এবং "নারী অপরাধী" সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়িলাম। পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম সচিত্র "মহিলা-জগৎ" 'প্রবাসী' হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। স্পষ্ট বুঝা গেল নীতির পরিবর্তন হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। * * *

ফাল্গুনের 'আগন্তুকে'র প্রথম প্রবন্ধ, প্রক্ষিপ্ত—অমিয় চক্রবর্তী।' "প্র" উপসর্গের প্রয়োগ সুষ্ঠু হইয়াছে কি না ব্যাকরণবিদ্ বলিতে পারিবেন। গোটা "প্রক্ষিপ্ত"টা ধরিলেও একটা অর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে মূল, সেখানে অমিয় চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু মূলের সঙ্গে এমন বেমালুম মিলিয়া যাইতে মেঘদূতের শ্লোকও পারে নাই। * *

জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "কাব্য ও আধুনিক কাব্য" শীর্ষক প্রবন্ধ শেষ হইল। তিনি যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে আধুনিক প্রগতিবাদী কবিদের কাব্য বিচার করিয়া তাঁহাদের স্খলন-পতন-ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। সে কাজ ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে করিয়া গিয়াছেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী সত্ত্বেও "দুর্বোধ্য ও 'আঙ্গিক'সর্বস্ব কবিতা লেখা"র ফ্যাশন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সাবিত্রীবাবুরও মনোবেদনা পাইবার আশঙ্কা আছে। * *

বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী'র প্রথম প্রবন্ধ "আলীগড় আন্দোলন" পড়িয়া মহাত্মা গান্ধীকে জনাব জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ না করিবার জন্য তারযোগে পরামর্শ দিবার বাসনা হইল। ইতিহাসের নজির দেখাইয়া আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, "এ দেশে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক কোনোদিনই প্রীতিকর ছিল না।" অনেক কাঁচা সত্য কথায় প্রবন্ধটি ভর্তি। হিন্দুদের মতলব যে বরাবরই খারাপ, লেখক তাহা প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন। তিন চার পুরুষ পূর্বে কোনও কোনও হিন্দু যখন ইসলাম বরণ করিয়াছিল, তখনও তাহাদের মতলব নিশ্চয়ই ভাল ছিল না। সেই সকল গোপন ইতিহাসও শামসুদ্দীন সাহেব প্রকাশ করিয়া দিলে ভাল হয়। * * *

সকলেই অবগত আছেন বেদব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বহুবিধ মতানুযায়ী ভাষ্য প্রচলিত আছে। শাঙ্করভাষ্য ও রামানুজের শ্রীভাষ্যে আসমানজমিন ফারাক। ব্রহ্মসূত্র লইয়া যাহা সম্ভব হইয়াছে, দেশের মাটির গুণে লৌকিক ইতিহাস লইয়াও সেরূপ ভাষ্যবিরোধ ঘটিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস লইয়া নানা জনে নানা ভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত

যোগানন্দ দাস ও প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই ইতিহাসের ব্রাহ্মভাষ্য প্রস্তুতির কাজে লাগিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন ও রামমোহন প্রসঙ্গ লইয়া খাঁটি নিরেট ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সহিত তাল না রাখিতে পারিলেও নেক-টু-নেক চলিতেছেন।

কিন্তু ভাষ্যকারদের ভুল হইলে ইতিহাসের রঙ বদলাইয়া যায়, এই কারণে তথ্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিককে অত্যন্ত সজাগ থাকিতে হয়। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মাঝে মাঝে ঝিমাইয়া পড়েন এই তাঁহার দোষ— যেমন দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র ১৩৫০) 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা" প্রবন্ধে তিনি কিছু গল্‌তি করিয়া ফেলিয়া একজনের কৃতিত্ব আর একজনের স্কন্ধে চাপাইবার অপরাধ করিয়া বসিয়াছেন। তিনি নিজে পরের ভুল-ধরণে একজন তৎপর পুরুষ। তাই অতীব সঙ্কোচের সহিত তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিতেছি।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই বৎসর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা ও তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার একশত বৎসর পূর্ণ হইবে।" প্রবন্ধের অন্যত্র (পৃ. ২৯৪) তিনি লিখিয়াছেন, "১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা।" ভাষ্য যে মতেরই হউক, ১৮৩৯-১৯৪৪—একশত বৎসর কোনও গাণিতিক মতেই সিদ্ধ হয় না।

সময়ের হিসাবে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বরাবরই কিঞ্চিৎ গল্‌তি করিয়া ফেলেন। এই ভুল এই প্রবন্ধে আরও ঘটিয়াছে। তিনি "১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রামমোহনের স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা স্থাপিত একটি সভা"র কথা বলিয়াছেন (পৃ. ২৯০)। তাহার পর তিনি "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে একখণ্ড বাঁধানো সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা"র কথা বলিয়া (পৃ. ২৯১) লিখিয়াছেন, "একই বৎসর এই পত্রিকা ও ঐ একই মাসে রামমোহনের স্কুলের ছাত্রগণের একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সভা স্থাপন হইতে মনে হয় যে উভয়ের যোগ আছে।" (পৃ. ২৯২)। এই উক্তিটি অবশ্য ব্রাহ্ম-ভাষ্যের উদ্দীপনার ফল, কিন্তু আসলে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরির নামই শুনিয়াছেন, স্বয়ং গিয়া উক্ত 'সর্ব্বতত্ত্ব-

দীপিকা'খানি দেখেন নাই—দেখিলে উহার প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল দিতেন ও বিষয়বস্তুর সন্ধান রাখিতেন এবং ফলে একটি মারাত্মক লজ্জাকর ভুল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। পুস্তকখানির পুরা নাম—'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ'—ইহার ১ম খণ্ডের প্রকাশকাল "মাহ শ্রাবণ সন ১২৩৬ সাল" অর্থাৎ ইংরেজী জুলাই ১৮২৯। অন্ধকারে অনেক কিছু করা যায় কিন্তু গবেষণা যে করা যায় না, তাহার প্রমাণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্ধদৃষ্টিতে ১৮২৯ ও ১৮৩০-এর পার্থক্য লোপ পাইয়াছে। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্থাপিত সভা ও ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়া বসিয়াছেন—"একই বৎসর এই পত্রিকা ও ঐ একই মাসে রামমোহনের স্কুলের ছাত্রগণের একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সভা"। ভাষ্যভাগ আরও চমৎকার। উক্ত পুস্তকের "অনুষ্ঠানপত্রে" আছে—"...এই দেশীয় লোকেরা অন্য দেশীয় লোকের ব্যবহার যাহা গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে যে দোষ তাহা প্রদর্শন করাইয়া সদাচার এবং সদ্ব্যবহার যাহাতে হয় এমত উপায় লিখা যাইবেক।" প্রগতিশীল রামমোহনকে এই সংস্কারবদ্ধ পুস্তকের সহিত অজ্ঞানে জড়াইয়া প্রভাতবাবু রামমোহনের অসম্মান করেন নাই তো? ব্রাহ্মভাষ্যে ইহা সমীচীন হইয়াছে কি? * *

কাগজ-সমস্যা যতদিন না মিটিতেছে, ততদিন পুস্তক লেখক ও প্রকাশকদের প্রতি আমরা সুবিচার করিতে পারিব না। তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। আনন্দের কথা এই যে, বাঙালী পাঠকসমাজ পুস্তকক্রয়ে সম্প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বিশ্বভারতীর বহু পুস্তক বারংবার পুনর্মুদ্রিত করিয়াও লোকের চাহিদা মিটানো যাইতেছে না। অত্যল্পকালমধ্যে তারাশঙ্করের ধাত্রী দেবতা ও কালিন্দীর ৩য় সংস্করণ, পাষাণপুরী ও চৈতালী-ঘূর্ণির ২য় সংস্করণ গজেন্দ্র মিত্রের মনে ছিল আশার ২য় সংস্করণ ও মনোজ বসুর ভুলি নাই-এর ২য় সংস্করণ বিস্ময়কর না হইলেও, শ্যামাপ্রসাদের পঞ্চাশের মন্বন্তর ও অনাথগোপাল সেনের যুদ্ধের দক্ষিণা ও টাকার কথার সংস্করণান্তর বিস্ময়কর বটে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও নবীনচন্দ্র সেন, এবং বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে জমি ও চাষ ও যুদ্ধোত্তর বাংলার

কৃষিশিল্প নূতন সংযোজন'। দীনবন্ধুর লীলাবতী এবং সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ প্রকাশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নূতন কীর্তি। সিগনেট প্রেস পুস্তক-প্রকাশের কাজে লাগিয়াই তিনখানি অতি সুদৃশ্য মনোরম চিত্র ও মলাট শোভিত পুস্তক বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন—নীলিমা দেবীর কাব্য When the Moon Died, বাংলা দেশের কয়েকজন প্রসিদ্ধ গল্পলেখকের লেখার ইংরেজী তর্জমা Best Stories of Modern Bengal এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্তের অনুবাদ—আধুনিক সোভিয়েট গল্প। বেঙ্গল পাবলিশার্স সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সমাজ ও সাহিত্য, বনফুলের বিন্দুবিসর্গ, মনোজ বসুর দুঃখনিশার শেষে এবং সুবোধ ঘোষের গ্রাম-যমুনা প্রকাশ করিয়াছেন। মিত্র ও ঘোষ ও মিত্রালয় যথাক্রমে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অধ্যাপক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবাগত, তারাশঙ্করের স্থলপদ্ম, মন্মথনাথ ঘোষের ডেভিড্ কপারফিল্ড এবং গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ইউরোপের সেরা সাহিত্যিক, ও 'বহুবিচিত্র' আশ্চর্য তৎপরতার সহিত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। বুকল্যাণ্ড লিমিটেড প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কস্তুরবাঈ গান্ধী, গ্রন্থাগার সুবোধ বসুর রাজধানী, অভিযান পাবলিশার্স অখিল নিয়োগীর নিশি-পট বাহির করিয়াছেন। পুরাতন কয়েকটি অতিশয় মূল্যবান পুস্তক আমাদের দপ্তরে অনুল্লেখিত পড়িয়া ছিল—সেগুলির উল্লেখ না করিলে পাপ হইবে। প্রসিদ্ধ শিল্পী ও 'ভ্রমণকারী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হিমালয় পারে কৈলাস ও মানসসরোবর ও তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ; মনোবৈজ্ঞানিক ও যৌনবৈজ্ঞানিক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার শ্রীরাধারমণ বিশ্বাসের হোমিওপ্যাথিক পকেট মেটিরিয়ামেডিকা এবং বিবাহ বিজ্ঞান ও দাম্পত্যজীবনে যৌনসমস্যা, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া এবং আয়ুর্বেদীয় গোবিন্দসুন্দরী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক ব্যাকরণ-কাব্য-সাংখ্যতীর্থের ভারতবর্ষীয় ষড়্দর্শনসার 'দর্শনসমুচ্চয়ঃ' সকলেরই এক এক খণ্ড সংগ্রহ করা কর্তব্য।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্যক্তির স্বাধিকার-বোধ ও আত্মার স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান এক বস্তু নয়; ঠিক সেই কারণে স্বাধীনতার অভিমানও দুই ক্ষেত্রে দুইরূপ। একটিতে যেমন সর্ব্ববিষয়ে দুর্ব্বলতাকে অস্বীকার করিবার আগ্রহ প্রকাশ পায়, এবং তাহা নিজের ও পরের নিকটে প্রমাণ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া থাকে—এবং সেইজন্য একটা প্রচ্ছন্ন আত্মাভিমান থাকিবেই; অপরটিতে তেমনই, ক্ষুদ্রতা বা দুর্ব্বলতার সংস্কারমাত্র না থাকায়, এবং তাহার স্থলে আত্মার মহত্ত্ববোধ সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে বলিয়া, অধিকার অপেক্ষা একরূপ দায়িত্ব-চেতনাই আত্মচেতনাকে প্রবুদ্ধ করে; সে দায়িত্বও বন্ধন নয়—কারণ, তাহাতে আত্মাতিরিক্ত আর কিছুর বশ্যতা নাই। ব্যক্তিত্বের যে অভিমান, তাহার মূলে আছে একরূপ মমতা বা আত্মপ্রীতি; সেই আত্মপ্রীতি অনেক স্থলে প্রেমের ছদ্মরূপ ধারণ করে, আমরা সাধারণতঃ সেই প্রেমেরই জয়গান করি। সেই প্রেম যে নিতান্তই মমতা-মূলক তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি বটে, তথাপি যে-প্রেম ব্যক্তিসম্পর্কবর্জ্জিত, যাহাতে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অনুভূতি নাই—সেই সুখের তীব্রতা ও দুঃখের হাহাকার নাই—তেমন প্রেম আমাদিগকে তৃপ্ত করে না; মানুষ যখন এই 'আমি'র অভিমানকে অস্বীকার করে, তখন তাহাকে আমরা 'বিরাগী সন্ন্যাসী' বলিয়া থাকি, তাহার সহিত আমাদের কোন আত্মীয়-সম্পর্ক আর থাকে না। এইজন্য ব্যক্তি-'আমি'র প্রেম আমরা যেমন বুঝি, আত্মা-'আমি'র প্রেম তেমন বুঝি না; কোনরূপ স্বার্থ যাহার নাই সে যেন মানুষই নয়। এই প্রেম যেমন ব্যক্তিচেতনাযুক্ত, তেমনই ইহা ব্যক্তির বা বিশেষের প্রতিই জন্মিয়া থাকে, তাই নির্ব্বিশেষের প্রেম যেন সোনার পাথরবাটি। ইহা খুবই সত্য; তাই আমি আত্মার যে স্বাতন্ত্র্যবোধের কথা বলিতেছিলাম, তাহা এইরূপ প্রেমের অন্তরায় বটে। কারণ, আত্মার সেই

বিশালতায় আত্মপর-ভেদ আর থাকে না—সকলই তাহাতে একাত্মীয়তা লাভ করে ; তখন পরের তুলনায় বা পরের সম্পর্কে যত কিছু পীড়া তাহা নিজের বলিয়াই মনে হয়। তথাপি 'দুই'-এর চেতনা তাহাতেও থাকে, না থাকিলে—অর্থাৎ, সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প অবস্থায়—নিজের সেই আত্মার সম্বন্ধেও কোন বোধ থাকে না ; সেই বোধ থাকে বলিয়াই আর এক প্রকার প্রেমের অনুভূতি সম্ভব হয়। আত্মার যে আত্মমর্য্যাদাবোধ তাহাও বিশুদ্ধ অদ্বৈত-জ্ঞানে অসম্ভব, কারণ, সে অবস্থায় আত্মার আবার ভাব-অভাব কি ? অস্তি-ভাতি ছাড়া আর কিছুই তখন থাকে না।

অতএব বিবেকানন্দের সেই ত্যাগ-বৈরাগ্যের সহিত যুক্ত যে প্রেম, তাহাই তাঁহার অদ্বৈত-জ্ঞানের একমাত্র দ্বৈত-সংস্কার, সে সংস্কারের একমাত্র কারণ তাঁহার স্বভাবের সেই অনমনীয় পৌরুষ। তথাপি বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত এইরূপ প্রেমের যোগ যে অসম্ভব নয়, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় ও জীবনে দ্বৈতাদ্বৈতের এক অতি অভিনব সমন্বয় যেন মূর্ত্তি ধরিয়া সকল তর্ক-বিচারকে পরাস্ত করিয়াছিল। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর, তাই আমাকে অন্যরূপ ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। বিবেকানন্দের সেই প্রেম আত্মার আত্মমর্য্যাদাবোধ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই বর্ত্তমান আলোচনায় বিশেষ কাজে লাগিবে। ওই প্রেমে মমতার বন্ধন নাই, বাহিরের প্রতি কোন আসক্তি নাই ; উহার মূলে আছে আত্মাবমাননার গ্লানি হইতে নিজকে মুক্ত রাখিবার আকাঙ্ক্ষা। নিজে মুক্ত বলিয়া পরের বন্ধনদশায় উদাসীন থাকা, নিজে দুঃখকে অবস্তু জানিয়া পরের দুঃখকে অস্বীকার করা—ইহা পরের প্রতি নির্ম্মমতা নয়, নিজেরই আত্মার অবমাননা। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; অতএব জগতের চিন্তা জ্ঞানীর পক্ষে অশুচিত্ত, যাহারা মায়ামুগ্ধ তাহারাই সে চিন্তা করিয়া থাকে—আমাদের দেশের বড় বড় ধার্ম্মিক সাধু ও সাধকগণের উক্তি এইরূপ। কিন্তু এই উক্তির যুক্তি বড়ই অদ্ভুত ; জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে সেই জগতেরই একাংশে অবস্থিত এই ব্যক্তির অস্তিত্বও কি মিথ্যা নয় ? তাহার মুক্তিচিন্তাও কি একটা মোহ নয় ? বিবেকানন্দের

যে অভিমান ছিল তাহা মুক্ত আত্মার অভিমান ; যে অন্তরে মুক্তি পাইয়াছে, তাহার আর সে-বস্তুর প্রতি লোভ থাকিবে কেন ? তাই তাঁহার সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য মুক্তিসাধনার বৈরাগ্য নয়—সে বৈরাগ্য অভয় হইবার জন্ম নয় ; এজন্য বিবেকানন্দকে সাধারণ অর্থে সন্ন্যাসী বলাও যায় না। এ হেন পুরুষের পক্ষে, এক দিকে যেমন নিজের জন্ম কোন ভয়, কোন চিন্তা নাই, তে পরের দুঃখ পরের ভয় দেখিয়া অবিচলিত থাকাও সম্ভব নয়। 'আম মুক্তিতেই জগতের মুক্তি— এমন কথা দেহধারী আত্মার পক্ষে মিথ্যা। দেহের সংস্কার যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ দ্বৈত-সংস্কার থাকিবেই ; ওই দ্বৈত-সংস্কারের মধ্যেই আত্মার যে অদ্বৈত-চেতনা তাহাই সর্ব্বভূতে-প্রীতির রূপ ধারণ করে। ইহাই সেই প্রেম, যাহাতে ব্যক্তির মমত্ববোধ নাই—আত্মার সর্ব্বাত্মীয়তা-বোধ আছে।

৫

তথাপি একটা কথা বাকি থাকিয়া যায়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিবেকানন্দের এই প্রেমে মানব-হৃদয়ের আবেগ ছিল, সে প্রেম খাঁটি মানবীয় প্রেম। মমত্বের বন্ধন না থাকুক, তাহাতে মানুষের সহিত আত্মীয়তাবোধের মনুষ্যত্ব ছিল, কেবল আত্মার পৌরুষই নয়। তাহার কারণ, মানুষের দুঃখই ছিল এই প্রেমের সাক্ষাৎ জন্মহেতু ; ওই দুঃখই দেহের ভূমিতে সেই আত্মাকে টানিয়া আনিয়া মানুষের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা ঘটাইয়াছিল। সকল তত্ত্বের পরম তত্ত্ব এই দুঃখ, প্রেমের তত্ত্বও তাহাই। বিবেকানন্দের সেই আত্মিক পৌরুষ এই দুঃখবোধের সহিত যুক্ত হইয়াছিল ; সেই দুঃখের—সেই দেহচেতনার সমল সলিলে পূর্ণবিকশিত হৃদ্‌পদ্মে, তাঁহার আত্মা যে আসন রচনা করিয়াছিল সে আসনের তলদেশে পঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহা পদ্মের বৃন্তমূলকেই দৃঢ় করিয়াছিল, পদ্মকে স্পর্শ করে নাই। মাটির সহিত আত্মার সংস্পর্শে ইহার অধিক আবশ্যক হয় না ; দেহ-আত্মার ওইটুকু মিলন হইতেই মনুষ্যত্বের মৃণালে সেই প্রাণ-পদ্ম ফুটিয়া উঠে, যাহাকে আমি বিবেকানন্দের মত পুরুষের প্রেম বলিয়াছি। মনুষ্যত্বের যে পূর্ণতম বিকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানে ধরা দিয়াছিল ইহাও সেই প্রেম ; বঙ্কিমচন্দ্র

ইহারই একটা সাধন-পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দীক্ষামন্ত্রের সন্ধান দেন নাই; তিনি যজ্ঞের সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্ন্যাধান করেন নাই। বিবেকানন্দ এই আগুনের সন্ধান পাইয়াছিলেন—অল্প বয়সেই সংসারের প্রবেশ-দ্বারে জীবনের সেই হুতবহকে সাক্ষাৎ-দর্শন করিয়াছিলেন। সকল মানুষই দুঃখ পায়; কেহ নিরুপায়ভাবে সহ্য করে, কেহ ভুলিয়া থাকে বা দমন করে; অনেকে সুখসাধনায় জয়ী হইয়া তাহাকে ঠেকাইয়া রাখে; কিন্তু দুঃখের স্বরূপ কয়জনের চক্ষে ধরা পড়ে? স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাহার মর্মভেদ করিতে পারে কে? যাহারা 'বৈরাগ্যমেবাভয়ং' মনে করিয়া সংসার ত্যাগ করে তাহারা দুঃখের সে-রূপ দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, তাহাদের আত্মা সংকুচিত হইয়াছে—তাহাদের মনুষ্যত্বের মৃত্যু হইয়াছে। এই দুঃখই তাহাদের চক্ষে মৃত্যুর রূপ ধারণ করে—যজ্ঞের হুতবহ হইতে পারে না। দুঃখের সহিত প্রথম পরিচয়ে বিবেকানন্দও তাহার সেই মৃত্যু-রূপ দেখিয়াছিলেন; তখনও তাঁহার হৃদয়ের হবি হোমযোগ্য হইয়া উঠে নাই, তখনও তাহা ঢালিয়া দিবার মত তরলতা প্রাপ্ত হয় নাই; কারণ, তখনও জগতের বিশাল যজ্ঞভূমিতে, তাহার হোমানল-শিখার প্রচণ্ড উত্তাপ সে হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তথাপি নিজেরই গৃহদ্বারে তাহার সেই মৃত্যু-রূপ দেখিয়া তিনি বিমূঢ় হন নাই; তাহার সেই মূর্তি তাঁহার পৌরুষকে ব্যঙ্গ করিয়াছিল—সেই ব্যঙ্গ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাহার শক্তি পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন; এবং শেষে মৃত্যুরূপী দুঃখের মুখ হইতেই, বালক নচিকেতার মত, তিনি জীবনের অগ্নিক্ষেত্রে পূর্ণাহুতির মন্ত্র—সেই এক প্রশ্নের উত্তর—কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

আশ্চর্য এই দুঃখ! কারণ ইহাই যেমন চরম তথ্য, তেমন ইহাই আবার পরম সত্যেরও প্রবেশ-দ্বার। এই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়—ইহারই অগ্নিতাপের পুটপাকে, ভাগ্যবান্ ও শক্তিমান মানুষের বজ্রহৃদয় বিগলিত হয়, সেই বিগলিত হৃদয়ের নামই প্রেম; তাহাই আত্মার ধর্ম—দেহযুক্ত আত্মার। বড় বড় তত্ত্ব বা অতি উচ্চ ও সূক্ষ্ম ভাবরাজি যোগীর যোগসাধনায় সহায় হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে

জগতের সহিত, বাস্তব মানব-জীবনের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। সে সাধনাও 'ব্যক্তি'র সাধনা, 'আত্মা'র সাধনা নয়; কারণ আত্মা প্রসার-ধর্মী—সংকোচধর্মী নয়। আশ্চর্য্য এই যে, ব্যক্তির আত্মসাক্ষাৎকার হয় ওই দুঃখের ভিতর দিয়া; যে যত শক্তিমান, অর্থাৎ যাহার হৃদয় যত বলিষ্ঠ, তাহার দুঃখবোধের শক্তিও তত অপরিমেয়—অভিভূত না হইয়া সেই আগুনের মধ্যেই তাহার চক্ষু স্থির-বিস্ফারিত থাকে, তাই চরম মুহূর্ত্তে দিব্য-দর্শন ঘটে। এই দুঃখ সাক্ষাৎ দেহচেতনা-ঘটিত—মস্তিষ্কজাত ভাবকল্পনার দুঃখ নয়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার সাক্ষাৎ-অনুভূতি না হইলে আত্মায় তাহা পৌঁছে না। এ বিষয়ে একটি পুরাতন কবি-বাক্য মনে পড়িতেছে, যথা—

> Who ne'er in weeping ate his bread,
> Who ne'er throughout the night's sad hours
> Hath sat in tears upon his bed,
> He knows you not, Ye Heavenly Powers!

বিবেকানন্দের জীবনে অতিশয় সুলগ্নে এই দুঃখের দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল। পিতৃবিয়োগের ফলে, সেই অল্প বয়সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরে বৃহৎ সংসারের ভার পড়িয়াছিল; অতিশয় স্বচ্ছল অবস্থার পর হঠাৎ তাঁহারই মুখাপেক্ষী সেই অনাথ পরিবারের অনশন-সঙ্কট বিবেকানন্দের মত যুবকের পক্ষে কি তীব্র বেদনাময় হইয়াছিল, সেকালে তাঁহার আত্মীয়-পরিজনেরাও তাহা জানিতে পারেন নাই; অনেক পরে প্রসঙ্গবিশেষে তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই তাহার একটু ধারণা করা যায়। মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁ (Romain Rolland) বিবেকানন্দের এই আধ্যাত্মিক সঙ্কট বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

One evening when he had eaten nothing, he sank down exhausted and wet through, by the side of the road in front of a house. The delirium of fever raged in his prostrate body. Suddenly it seemed as if the folds enveloping his soul were rent asunder, and there was light. All his past doubts were automatically solved. He could say truly: "I see, I know, I believe, I am undeceived...." In the morning his mind was made up. He had decided to renounce the world.

[একদিন সন্ধ্যাকালে বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ও সারাদিন অনাহারের পর, তিনি পথিপার্শ্বে, একটি বাড়ির সম্মুখে, নিরতিশয় অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার সেই ধূলাবলুণ্ঠিত দেহ যেন একরূপ জ্বরের প্রবাহে সংজ্ঞাহীন। হঠাৎ চেতনা হইল—মনে হইল, যেন তাঁহার আত্মার শত-পাক-বেষ্টনী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে আলোক প্রবেশ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এতদিনের দ্বিধা-সংশয় আপনা আপনি মিটিয়া গেল, তখন তাঁহার আর বলিতে বাধিল না—"আমি দেখিয়াছি, আমি জানিয়াছি, আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আমার নেত্র হইতে মোহজাল অপসারিত হইয়াছে।" পরদিন প্রভাতে তিনি কৃতনিশ্চয় হইলেন।...স্থির করিলেন যে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে।]

উপরের এ আলোক-দর্শন সম্বন্ধে মঃ রোলাঁ একটি মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এই—

Revelation came always by the same mechanical process at the exact moment when the limit of vitality had been reached, and the last reserves of the will to struggle exhausted.

ওই 'mechanical process' কথাটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু ওই নিয়ম কি সাধারণ মানুষের দেহতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সত্য? ওই 'Vitality' এবং ওই 'Will to struggle' যদি দেহ ও মনের ধর্ম্ম হয়, তথাপি সে শক্তি চরম না হইলে তেমন চরম অবসন্নতাও ঘটে না—যাহার ফলে মানুষমাত্রের অন্তশ্চক্ষুতে ঐরূপ আলোক-দর্শন হয়। ঐ অবস্থায় ঐরূপ আলোক-দর্শন বুদ্ধের হইয়াছিল,—কতখানি Vitality এবং কত বড় 'Will to struggle' থাকিলে তবে দেহের অন্তিম অবস্থায় দেহাতীত প্রজ্ঞার এমন অপূর্ব্ব উন্মেষ হয়! ঠিক বুদ্ধের মত, বিবেকানন্দের সত্যদর্শন বা আত্মদর্শন এত শীঘ্র না ঘটিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু দুঃখের সহিত সংগ্রামে তাঁহার যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ শক্তিমান মানুষের পক্ষেও সুলভ নয়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

উপরের ঘটনা হইতে দেখা যাইতেছে, তখনও দুঃখের সহিত যুদ্ধে বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ জয়ী হইতে পারেন নাই—কারণ কেবল অন্তরের বৈরাগ্য বা ত্যাগ নয়, তিনি সংসারও ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তখনও আত্মার আত্মাভিমানই বড়—প্রেম জাগে নাই। তথাপি সে সময়ের সেই সংকল্পের মধ্যে হৃদয়াবেগের লক্ষণই প্রবল;

সেই বৈরাগ্যও অভিমানপ্রসূত, তাহাতে স্পষ্ট বিদ্রোহের ভাব রহিয়াছে। এই সময়ে, ও তাহার পরে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্তায় তাঁহার সেই বিদ্রোহী-ভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আসল কথা, তাঁহার জীবনের এই ঘটনায় জ্ঞান ও প্রেমের একটা অতি কঠিন দ্বন্দ্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার চরিত্রের অপর দিকটি স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন, দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্ম ব্যক্তি-আত্মার উচ্ছেদ একমাত্র উপায় হইলেও, তাহাতে প্রয়োজন কি? বরং ইহারই সংঘাতে আত্মা আত্মস্থ হয়, তাহার স্বরূপ-উপলব্ধি হয়—যদি আত্মার সেই শক্তি থাকে। তখন দুঃখের সেই অতল অকূল অশ্রুহ্রদে, ব্যক্তিত্বের বৃন্তটি মাত্র ধরিয়া আত্মার সহস্রদল সেই বারিরাশির উপরে খুলিয়া ঢলিয়া পড়ে, এবং প্রেমামৃতের মধু-সৌরভে মুক্ত-জীবনের দিগন্ত পর্যান্ত আমোদিত হইয়া উঠে। বিবেকানন্দের জীবনের সেই মহালগ্নে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম-শীতল করস্পর্শ তাঁহার মস্তিষ্কের বহ্নিতাপ প্রশমিত করিল, অপার করুণার গভীর উচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয়-নদী কূল হারাইল—সংসার ত্যাগ করিয়াই তিনি সংসারকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। তখন বেদান্তের সেই নির্গুণ আত্মা-ব্রহ্মকেই তিনি 'কালী'রূপে জগৎময় উদ্ভাসিত হইতে দেখিলেন; ঘোর বৈদান্তিক নির্ব্বিকল্প-সমাধির পিপাসা যাহার কখনো ঘুচে নাই, কোন ঈশ্বরে যে কখনও বিশ্বাস করিবে না—সেও বলিয়া উঠিল;—

The only God in whom I believe, is the sum-total of all souls, and above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races…;

—কিন্তু সে কথা এখন নয়, পরে।

আমি সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের সহিত প্রেমের সম্পর্কের কথা বলিতে-ছিলাম, প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বিবেকানন্দের চরিত-কথা ও তাঁহার বাণী এক—তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অতএব সেই চরিত-প্রসঙ্গে তত্ত্বের কথা আপনি আসিয়া পড়ে;—পরে দেখা যাইবে, আমি গোড়া হইতে মূল তত্ত্বেরই অনুসরণ করিয়াছি। এই দুঃখ যে এক অর্থে অবস্তু নয়, এই দুঃখের যে-জ্ঞান সেই জ্ঞানই প্রেমের জনয়িতা—

তাহা বলিয়াছি; আরও বলিবার আছে, এখানে তাহা প্রাসঙ্গিক হইবে না। এই দুঃখ যাহাদিগকে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী করে তাহারা বিবেকানন্দের মত পুরুষের সগোত্র নয়; আবার যাহারা ভাবযোগে সংসারকে, অর্থাৎ দুঃখকে, একটি পরম রসবস্তুর মত আস্বাদন করিয়া থাকে—সেই স্থূলভোগ-বিমুখ, সূক্ষ্মভোগবিলাসী Epicureএর artistic monasticismও বিবেকানন্দের ধর্ম নয়; ইহারাও আত্মপ্রেমিক Egoist—আত্মত্যাগী প্রেমিক নয়। ইহার পূর্ব্বেও পৃথিবীতে দুই মহাপ্রেমিকের আবির্ভাব হইয়াছিল—বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট; একজন জ্ঞানী-প্রেমিক, আর একজন ভক্ত-প্রেমিক। অতিরিক্ত ভক্তি (ভগবদ্ভক্তি) বাস্তব জগৎ ও জীবনের প্রতি বৈরাগ্যের কারণ হইয়া থাকে; খ্রীষ্ট ও চৈতন্য উভয়েই ভক্তির অবতার—চৈতন্য কিছু বেশি। ইহারা কেহই দুঃখকে বা জীবনের বাস্তবকে স্বীকার করেন নাই; বুদ্ধ করিয়াছিলেন,—এই দুঃখের জ্ঞানই তাঁহার বুদ্ধত্ব-লাভের কারণ; সেই জ্ঞানে তিনি ব্রহ্ম বা ভগবান কিছুই স্বীকার করেন নাই। বুদ্ধ সর্ব্বভূতের দুঃখ-নিবারণকল্পে যে মৈত্রী ও করুণার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন—তাহাতে ব্যক্তি-আত্মাকে লোপ করিয়া, আত্মামাত্রকেই অস্বীকার করিবার আবশ্যকতা ছিল। বুদ্ধের সেই বাণীই পূর্ণতালাভ করিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব ব্রহ্মবাদে—আত্মাকে অস্বীকার করিয়া নয়, আরও পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া। সেইজন্যই জগৎ একেবারে মিথ্যা বা মায়া নয়, দুঃখও 'অসৎ' নয়। শঙ্করের যে মায়াবাদ বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রায় নামান্তর, সেই মায়াই এবার—অবিদ্যা নয়, পরাবিদ্যার জননীরূপে দেখা দিল; কেবল জ্ঞান নয়, কেবল সন্ন্যাস নয়, কেবল প্রেমও নয়—সকলই এক নির্ব্বিরোধ উপলব্ধিতে অন্যোন্যসাপেক্ষ হইয়া উঠিল। বিবেকানন্দের অত্যুগ্র জ্ঞানপিপাসা যে-প্রেমের নিকটে আত্মসমর্পণ করিল—সেও জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা। কিন্তু, পূর্ব্বে বলিয়াছি, ওই প্রেমের বীজ তাঁহার স্বভাবে নিহিত ছিল—নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষের প্রতি একটা জন্মগত আকর্ষণ থাকিলেও, তাঁহার রক্তের বাঙালীত্ব তাঁহাকে সহজে নিষ্কৃতি দেয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতেই এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি নরেন্দ্রের সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তজ্জন্য সেই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা দেখিয়া কিছুমাত্র

চিন্তিত হন নাই, বরং আশান্বিত হইয়া তাহার গতি-পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এবং শেষে নিজেই সেই স্বভাবের পূর্ণ-বিকাশ সাধন করিয়াছিলেন।

৬

বিবেকানন্দ-চরিত্রের যে দিকটি অসাধারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং তাহার প্রসঙ্গে যে প্রশ্নের মীমাংসা এত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সেই প্রশ্নই "বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ" বিষয়ক আলোচনায় সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান; এই প্রশ্নের অন্তরালে ভারতীয় সাধনা ও মানবধর্ম্মের মধ্যে একটা নূতন বোঝাপড়ার ইঙ্গিত রহিয়াছে, এবং ইহারই মীমাংসায় সেই সাধনার ইতিহাসকে নূতন করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে। বিবেকানন্দ যেন প্রাচীনের প্রতি নূতনেরই একটা বড় challenge। যুগে যুগে সেই একই তত্ত্বকে নব নব প্রশ্নের আঘাতে ভাঙিয়া পুনঃস্থাপিত করা হইয়াছে—এমন ভাঙা-গড়ার যুগসন্ধি ভারতের ইতিহাসে আরও কয়েকবার আসিয়াছে ও গিয়াছে। এবারে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ভাবী মন্বন্তরের প্রতীক্ষায় একটা যুগ-বিপ্লব চলিয়াছিল, সেই যুগ-বিপ্লবের প্রায় শেষ তরঙ্গের উপরে এই যে আর এক আবির্ভাব, ইহা যে তদপেক্ষা বৃহত্তর ও গুরুতর মন্বন্তরের পূর্ব্বাভাষ—সে কথা আজিকার দিনে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকেই যেটুকু অস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন, সেই অনুভূতির বলে, ও এক প্রকার দৈবী দৃষ্টির সাহায্যে, যুগ ও সনাতনের—মনুষ্যধর্ম্মের ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মতত্ত্বের—তিনি যে সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাহা যেমন বুদ্ধি-সঙ্গত, তেমনই তত্ত্ববিরোধীও নয়; যুগধর্ম্মকে বুঝিবার ও সার্থক করিয়া তুলিবার পক্ষে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবন-দর্শন এ জাতির উপযোগী করিয়া সে যুগে আর কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া যে গভীরতর সমস্যা, ও তাহার যে সমাধান-চিন্তা দেখা দিল তাহাতে, শুধু বর্ত্তমানের নয়—একটা দূরতর ও বিরাটতর ভবিষ্যতের ভাবনা যেন প্রবিষ্ট রহিয়াছে—সমগ্র মনুষ্যসমাজের আসন্ন মহাসঙ্কট যেন সে দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়াছে। ইহাই মনে রাখিয়া সেই পূর্ব্ব প্রশ্নের আর একটু অনুসরণ করিব।

আত্মার পৌরুষই, একাধারে বৈরাগ্য ও প্রেম—আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক ধর্ম্মসাধনায় সহায়, হিন্দুর অধ্যাত্মবাদ বহু পূর্ব্বে এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিল। ইহার একটা স্পষ্টতর অভিব্যক্তি, বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখা দিয়াছিল। বুদ্ধ তাহার পূর্ব্বে কি পরে—সে বিষয়ে মতভেদ হওয়া সম্ভব; কোন-কিছুর পূর্ণাঙ্গতা যদি কালসাপেক্ষ হয়, তবে গীতাকার বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন, পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। বুদ্ধের জ্ঞানসর্ব্বস্ব ধর্ম্মনীতির উপরে পরবর্ত্তী কালে গীতার জ্ঞানমিশ্র ভক্তির প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়াই মহাযান সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও অভ্যুদয় হইয়াছিল, এরূপ মত প্রমাণসহকারে কেহ কেহ স্থাপন করিয়াছেন—যদিও বুদ্ধের পূর্ব্বগামিত্ব স্বীকার করেন নাই। সে যাহাই হউক, তত্ত্বের দিক দিয়া এই জগৎব্যাপারকে ও মনুষ্যজীবনকে গীতা যতটুকু মূল্য দিয়াছিল তাহার অধিক মূল্য পরে আর কোন শাস্ত্র দেয় নাই। তন্ত্রেও সেই এক তত্ত্বের সাধনায় যে নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে জগৎরূপিণী মহামায়ার উপাসনার্থ সৃষ্টিকে স্বীকার করিলেও—ত্যাগ ও ভোগ দুইয়েরই সমন্বয় থাকিলেও, সে সাধনা মুখ্যত ব্যক্তির সাধনা, তাহা সমষ্টিমুখী নয়। যে প্রেমের তত্ত্ব আধুনিক মানবধর্ম্মে একটা বড় তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ঠিক সেই তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত কোন সাধনপন্থায় প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহা নিশ্চিত। আত্মা একাই সর্ব্ববিধ প্রেমের বিষয় ও আশ্রয়—এই শ্রুতিবাক্য ভারতীয় সাধনাকে আত্মকেন্দ্রিক করিয়াছিল, উহার অর্থ সংকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন তত্ত্ব সহজেই বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, আত্মার দুর্ব্বলতাই জয়যুক্ত হয়, স্বার্থই আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে পরমার্থ হইয়া উঠে; শেষে সমাজ ও লোক-স্থিতি সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ কোন সঙ্কটকালে গীতার আবির্ভাব হইয়াছিল; সেই আত্মার গৌরব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়মূলক এক নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল; ইহা দ্বারাই ব্যক্তির আত্মহিত ও সর্ব্বভূতের হিত, এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হইয়াছিল। তাহার ফল সে যুগে হয়তো ভালই হইয়াছিল—ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য মিলিতে পারে। কিন্তু পরে সেই ধর্ম্ম যে ভারতবর্ষীয় সমাজকে রক্ষা করিতে পারে নাই—

তাহার প্রভাব যে নানা লোকধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে মন্দীভূত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এক দিকে বেদান্তের সেই 'ব্রহ্মপদ' এবং বুদ্ধের 'নির্ব্বাণ' যেমন তাহা দ্বারা নিরস্ত হয় নাই, তেমনই মানুষের স্বভাবধর্ম্মের প্রতিকূল সেই শূন্যবাদ ও অধ্যাত্মবাদের পীড়নে তাহার 'মহাপ্রাণী' অসুস্থ হইয়া পড়িল, এবং আত্মতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব উভয়কেই বিকৃত করিয়া, নানা অনাচার ও কদাচারের পর যখন আত্মার পৌরুষ প্রায় লোপ পাইয়াছে তখন দিকে দিকে ভক্তিরসের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল, ও তাহারই নেশায় কর্ম্মবিমুখতার ছদ্মবৈরাগ্য বড় প্রশ্রয় পাইল; জীবনের সহিত মুখামুখী দাঁড়াইয়া তাহাকে জয় করিবার প্রয়োজন আর রহিল না। সেই উপনিষৎ ও সেই গীতা তখনও টিকিয়া আছে, কিন্তু টীকাভাষ্যের ভস্মলেপন অথবা পুরাণ-উপপুরাণের রসসিঞ্চন তাহাকে আর এক বস্তুতে পরিণত করিল; তাই আমাদের মধ্যযুগের ইতিহাসে জাতিহিসাবে পৌরুষের সাধনা প্রায় লোপ পাইয়াছিল।

উপনিষদ্ বেদান্ত ও গীতার প্রভাব প্রাচীন ভারতের সমাজে ও ধর্ম্মে কোন না কোন রূপে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া আসিয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী যুগে সেই তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভক্তিরস যুক্ত হইয়া আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের পত্তন হইয়াছিল—ইহা স্মরণে রাখিয়াও, আজিকার এই যুগেই হিন্দু-সমাজে একমাত্র গীতারই প্রসার ও প্রতিপত্তি আশ্চর্য্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া মনে হয়, ওই একখানি গ্রন্থেই সর্ব্বযুগের উপযোগী এমন কোন সত্য আছে যাহার জন্য আজিকার এই ভাববিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবের দিনে, উহারই মধ্যে একটা আশ্রয়ের ভরসা, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে প্রায় সকলেই পাইয়া থাকে। ইহাও সত্য যে, এমন কোন তত্ত্ব-বিচার নাই যাহার প্রসঙ্গে গীতার কোন না কোন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পরকে চমৎকৃত ও নিজকে আশ্বস্ত করা না যায়। অতএব গীতার সেই বাণীগুলির মধ্যে একটা চিরন্তনতা আছে—সর্ব্বকালের সর্ব্ববিধ মানবচিত্তের সুপথ্যস্বরূপ বহু মহাবাক্য তাহাতে ছড়াইয়া আছে। কিন্তু ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এমন ধর্ম্মগ্রন্থও ভারতীয় সমাজের জীবন-বেদ হইয়া উঠিতে পারে নাই; ভাষ্যের পর ভাষ্য রচনাই হইয়াছে, এখনও

হইতেছে, কিন্তু তাহা দ্বারা এ দেশের এই বিশাল মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম্মের তথা কর্ম্মের ঐক্য স্থাপন হয় নাই, হইলে ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। ইহার কারণ, গীতায় আত্মতত্ত্বই প্রধান হইয়া আছে—মানুষের জীবন বা খাঁটি মনুষ্যত্ব বলিতে আমরা যাহা বুঝি, আত্মার সম্পর্কে তাহার যে মূল্যই তাহাতে স্বীকৃত হউক না কেন—তাহাতে মানুষের প্রাণ সাড়া দেয় নাই। গীতায় যে কর্ম্মসংন্যাস তাহাতে সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও তাহা সন্ন্যাসই বটে; মায়াবাদ সেখানেও প্রবল। গীতায় পরহিতব্রত বা সর্ব্বভূতে আত্মৌপম্যবোধের যে প্রেম, সে প্রেমও একমুখী, বহুমুখী নয়; তাহাতেও চিত্তকে সেই একের উপরে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। অতএব গীতায় সন্ন্যাস ও মানবপ্রেমের সমন্বয় হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। সেখানে মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধা, তাহা সেই এক 'আত্মা'র প্রতি শ্রদ্ধাই বটে; কিন্তু সেইজন্যই দুঃখও মিথ্যা, তাহা আত্মার দেহাভিমানপ্রসূত—প্রথম হইতেই ইহাও উপলব্ধি করিতে হইবে। আমি ও পর যখন একাত্মা, তখন পরের দুঃখ বলিয়া যেন কোন পৃথক দুঃখ নাই—আমার জ্ঞানে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে, বাহিরেও তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না। ইহা পরম তত্ত্ব বটে, কিন্তু ইহা জগতের বাস্তব তথ্য নহে; সেই বাস্তবকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে থাকে কেবল 'আমার'ই ব্যক্তি-সত্তা। সমস্ত বহির্জগৎ, সংসার, সমাজ আছে এবং নাইও; যেটুকু আছে সে যেন আমারই মোক্ষ-সাধনার যন্ত্ররূপে। নিষ্কামভাবে সর্ব্বভূতের হিতসাধনা করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উহার দ্বারা অদ্বৈত-জ্ঞান আরও দৃঢ় হইবে, নিস্পৃহভাবে মায়ার সেবা করিতে পারিলেই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে। পুরুষ এখানে আসলে একা; রঙ্গমঞ্চে সেই পুরুষ ছাড়া আর কেহই নাই, আর সকলই ছায়ামূর্ত্তি; তাহাদের সহিত অভিনয় করিয়া, অর্থাৎ অকর্ম্ম-জ্ঞানে সকল কর্ম্ম করিয়া, পঞ্চমাঙ্কে যবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরুষের মুক্তিলাভ হইবে। আমি গীতা-তত্ত্বের এই যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাই যে গীতার সমগ্র তত্ত্ব নয়, ইহা বলিবার জন্য গীতাপন্থী মহাজনগণ সকলেই উন্মুখ হইবেন তাহা জানি; তাঁহাদের এক উত্তর

এই যে, গীতায় সকল তত্ত্বই আছে, এবং একটি মূল তত্ত্বে সেগুলি সমন্বিত হইয়াছে। এ কথা হয়তো সত্য যে, সকলের সকল রকমের পিপাসাই গীতায় মিটিতে পারে, কিন্তু ওই সমন্বয় যদি সত্যই হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আজও এত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইত না। গীতা এই সৃষ্টিকে—এই প্রকৃতি বা মায়াকে—স্বীকারও করে, অস্বীকারও করে; সে যেন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'; আসলে তাহার মূলে আছে সেই বৈদান্তিক মায়াবাদ, বহু শ্লোকে তাহার সুস্পষ্ট ঘোষণাও আছে; বরং তাহার সেই সমন্বয়চেষ্টাই অতিশয় সংশয়পূর্ণ।

উপরের কথাগুলি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি গীতার নিন্দা করিতেছি; গীতার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মদর্শনের সমালোচনা করিব, এমন স্পর্দ্ধা আমার নাই; বরং ধর্মগ্রন্থ হিসাবে তাহাকেই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া আমি তাহার নিত্য পূজা করি। কিন্তু মানুষ আমি, মনুষ্যসাধারণের সহিত একযোগে আমি যে সংস্কারের অধীন তাঁহার শেষ কণাটুকু ত্যাগ করিবার মত আত্মজ্ঞান এখনও লাভ করি নাই, যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ—বিশেষত এই ভারতবর্ষের ভাবুক মনীষীগণ দুঃখকে একটা বড় তত্ত্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন; আরও প্রাচীন কালে ব্রহ্মজ্ঞানের যে আনন্দবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, পরবর্তী কালে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অভাবে, সেই ব্রহ্ম ও তাহার তত্ত্ব মন্ত্ররূপে আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইত না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, ক্রমেই জীবনের বাস্তব-অনুভূতি অন্তরের সেই সহজ আনন্দবোধকে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু তখনও সকল তত্ত্বই আত্মানুভূতিমূলক ছিল, আত্মোপলব্ধিই ছিল পরম পুরুষার্থ—জ্ঞানই ছিল একমাত্র প্রস্থান। প্রেমের পথ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই? এদিকে জীবনের সহিত পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ ও বিস্তৃত হইতে লাগিল; অর্থাৎ দুঃখ যত বাড়িয়া উঠিল, এবং তাহাকে উড়াইয়া দিবার মত সেই আদিম প্রাণশক্তি যত কমিয়া আসিতে লাগিল, ততই তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি কামনায় নানা সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতে লাগিল। শেষে এই দুঃখদর্শনে পুরুষের প্রাণের যে গভীর অনুকম্পা, তাহার অবতারস্বরূপ ভগবান

বুদ্ধের আবির্ভাব হইল, সেই অনুকম্পার বশে তিনি দুঃখকে নস্যাৎ করিবার জন্য 'আত্মা'কেই বিনাশ করিতে চাহিলেন। এ পর্য্যন্ত জ্ঞানই ছিল একমাত্র পন্থা; এই পন্থার মধ্যস্থলে মহর্ষি কপিল এমন একটি প্রস্তরস্তম্ভ দৃঢ়প্রোথিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইবার সাধ্য কাহারও হয় নাই; উপনিষদের সেই ব্রহ্মবাদকেও তাহার সহিত বোঝাপড়া করিতে হইয়াছিল, গীতাই তাহার দৃষ্টান্ত—"সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" এ কথা তাহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু গীতাই সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছিল—জ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই ভক্তিকে এমন আসন তৎপূর্ব্বে আর কেহ দিতে পারে নাই। কপিলের নিকট হইতে ভূত-বিজ্ঞান এবং উপনিষদের নিকট হইতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান আহরণ করিয়া, এমন একটি তত্ত্বের দ্বারা সে উভয়ের যোগসাধন করিয়াছে যে, জ্ঞানই তাহাতে সমৃদ্ধ হইয়াছে; সাংখ্যের সেই দ্বৈতবাদ—সেই পুরুষ-প্রকৃতি—এক অদ্বৈতরূপী পুরুষোত্তমের আলিঙ্গন-পাশে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিয়াছে; সেই এক আত্মাই দুই হইয়া এক অপরকে বলিতেছে—"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"! কপিলের সেই দুঃখ-ভয় আর ইহাতে নাই, কারণ সেই 'আমি'ই 'আমাকে' বলিতেছে—"অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"। গীতায় জ্ঞানের যথাযোগ্য স্থান আছে, কিন্তু তাহা ভক্তি-শাসিত; Mind-ও আছে, Heart-ও আছে, কিন্তু সেখানে—"Heart is the Mind's Bible"। এই ভক্তিবাদই ভারতীয় সাধনায় গীতার শ্রেষ্ঠ দান—যদি প্রকৃত সমন্বয় কোথাও কিছু হইয়া থাকে, তবে সে এইখানে; এরূপ সমন্বয়, মানুষের জীবন-সাধনায় নয়—অধ্যাত্ম-সাধনাতেই সম্ভব ও সত্য।

কিন্তু গীতার যাহা অপর শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, যাহার জন্য আমরা গীতাকে একটি খুব practical ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া থাকি—তাহার যে 'কর্ম্মযোগ'-শিক্ষায় জীবনের একটা বড় সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে করি; প্রকৃতপক্ষে তাহার সেই তত্ত্ব মানুষের প্রাকৃত জীবনে সত্য হইতে পারে নাই—জীবন-ধর্ম্মের সহিত তাহার সমন্বয় সম্ভব নয় বলিয়াই তাহা তত্ত্বগত হইয়া আছে, তথ্যগত হয় নাই। গীতার প্রধান তত্ত্বগুলির

দিকে দৃষ্টি করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে; জ্ঞানপন্থী বা ভক্তি-পন্থী কোন আচার্য্যই গীতার ওই কর্ম্মযোগকে স্বীকার করেন নাই—শুধুই কর্ম্মফল-ত্যাগ নয়—কর্ম্মত্যাগেরই ওকালতি করিয়াছেন। ইহার কারণ, জ্ঞান-ভক্তির পথ ও এইরূপ কর্ম্মের পথ যেন কিছুতেই মিলিতে চায় না—একটি যেন অপরের বিপরীত; তাহারও কারণ—দুইয়ের জগৎই স্বতন্ত্র, একটি প্রবৃত্তির, অপরটি নিবৃত্তির। গীতায় একটা অসাধ্যসাধনের চেষ্টা হইয়াছে; গীতাকার যতই তাহা সম্ভব বলিয়া উপদেশ করুন না কেন, জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই যেন আপন আপন পথে ওই কর্ম্মকে একটা বাধা বলিয়াই মনে করে, সাধনার গতিবেগে তাহারা উহাকে এড়াইয়া যাইতে চায়। সত্য বটে, সেই-জন্যই গীতায় বার বার জ্ঞানের উপরে ভক্তিকেই বড় করা হইয়াছে; কারণ, ভগবানে সর্ব্ব-সমর্পণ ব্যতিরেকে এমন 'মৎকর্ম্মপরম' হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা ও আত্মকর্তৃত্ব নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়া, কোন কর্ম্ম করা সম্ভব নয়। কিন্তু এরূপ 'যোগযুক্ত' হইয়া কর্ম্ম করা কি মনুষ্যপ্রকৃতির পক্ষে সম্ভব? কয়জন মানুষ এমন অতি-মানুষ হইতে পারে? কর্ম্ম কেবল ভাব বা জ্ঞানমূলকই নয়, তাহা প্রবৃত্তিমূলক; সেখানে কেবল knowing ও feeling লইয়াই কারবার নয়—willing ও চাই। এই will-এর অপর নাম—কাম। কর্ম্ম করিতে হইবে অথচ কামকে উচ্ছেদ করিতে হইবে, ইহা মনস্তত্ত্বের তথা জীবন-সত্যের বিরোধী—অর্থাৎ দেহাধিষ্ঠিত আত্মার পক্ষে, মনুষ্যনামধারী পুরুষের পক্ষে, ইহা অসম্ভব। জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় যে ক্ষেত্রে সম্ভব, কর্ম্মের ক্ষেত্র তাহা হইতে স্বতন্ত্র; সেখানে, জ্ঞান ও ভক্তির প্রেরণাসত্ত্বেও, 'প্রবৃত্তিহীন' হইয়া কর্ম্মে 'প্রবৃত্ত' হওয়া মানুষের পক্ষে অসাধ্য। ভক্ত বলিবেন, ভগবানের কর্ম্ম করিতেছি, এই জ্ঞানে কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া থাকে, এবং তাহার সহিত যদি জ্ঞান যুক্ত হয় তবে আসক্তিও থাকিবে না। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, ওই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম কোনটাই জগৎ-মুখী নয়, সকলই ভগবৎ-মুখী; ওই ভক্তিও যেমন সংসার-বৈরাগ্যের ভক্তি, ওই জ্ঞানও তেমনই বৈরাগ্যযুক্ত—ইহার কোনটার দ্বারা প্রকৃত কর্ম্ম—প্রকৃত জগৎ-সেবা—হয় না।

কর্ম্মের যে 'কর্ত্তা' সে "'আমি'ই; ভগবানের নামে হইলেও কর্ম্ম 'আমার'ই; মানুষ যখন ভগবানের নামে কোন কর্ম্ম করে, তখনও তাহাতে একটা স্বকীয় প্রবৃত্তি থাকিবেই—এই প্রবৃত্তির যাহা শ্রেষ্ঠ তাহারই নাম প্রেম। শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম নিষ্কাম হইবার প্রয়োজন নাই, তাহার প্রবৃত্তিমূলে প্রেম থাকিলেই হইল—জ্ঞান ও ভক্তি তাহার সাহচর্য্য করিবে মাত্র। কিন্তু দুঃখকে—জগৎ ও জীবনকে—স্বীকার না করিলে ওই প্রেমের জন্ম হয় না, তাই এতকাল পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বে মানব-প্রেমের স্থান অতিশয় সংকীর্ণ ছিল—আত্মার সত্যকে আমার জীবনের সত্যের সহিত ভাল করিয়া মিলাইয়া লইতে পারি নাই। অথচ, সেই অতিপুরাতন তত্ত্বের মধ্যেই যে ইহার বীজ নিহিত ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-মন্ত্রে ও বিবেকানন্দের জীবনে আমরা তাহারই প্রমাণ পাইয়া বিস্মিত হইয়া থাকি। সেই বাণীতেই মানুষের ও আত্মার, জগৎ ও ব্রহ্মের, এক অপূর্ব্ব সমন্বয় মানুষেরই বুদ্ধিগোচর হইয়াছে; তাহা যে এতকাল পরে, ঠিক এই যুগেই ঘটিয়াছে, ইহাও পরমাশ্চর্য্যের বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণের 'কালী' এই সমন্বয়ের প্রতীক,—নরেন্দ্রের সেই জ্ঞানকেই অতিশয় সুলক্ষণযুক্ত দেখিয়া তিনি এই 'কালী'র মন্দিরে তাহাকে বলিরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এবার শুধুই জ্ঞান ও ভক্তি নয়—জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়; তাই কর্ম্মও তাহার এমন অনুকূল হইয়াছে।

৭

বিবেকানন্দের জীবনে যে-প্রেম জ্ঞানের সহিত অবিরোধে বাস করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ এখনও শেষ হয় নাই, সম্ভবত একেবারে শেষ হইবে না; কারণ ইহারই তত্ত্ব বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমি তাঁহার মধ্যে জ্ঞান ও প্রেমের যে সাম্যাবস্থার কথা বলিয়াছি তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ এত বড় প্রেম সত্ত্বেও সে জীবনে জ্ঞানের সহিত তাহার একটা বিরোধ কখনও ঘোচে নাই; সকলেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা অশান্তির অস্থিরতা ছিল, তাঁহার আত্মার সেই অমিত বীর্য্য আপনাতে আপনি সমাহিত হইয়া থাকিতে পারে নাই,—তিনি সারাজীবন একটা প্রবল উত্তেজনা ও কর্ম্মব্যাকুলতা অনুভব

করিয়াছিলেন, তাহারই দাহে তাঁহার দেহ অকালে ভস্মীভূত হইয়াছিল। মঃ রোলাঁ বড় সত্য কথাই বলিয়াছেন—

His super-powerful body and too vast brain were the predestined battlefield for all the shocks of his storm-tossed soul... And his days were numbered. Sixteen years passed between Ramakrishna's death and that of his great disciple—years of conflagration. He was less than forty years of age when the athlete lay stretched upon the pyre.

ইহার কারণ, প্রেম তাঁহার সেই অপর প্রকৃতিকে জয় করিতে পারে নাই, অতিশয় দৃঢ়বলে শাসনে রাখিয়াছিল; তাহার জন্ম নিরন্তর যে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল—নিজের সহিত নিজেই যে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহার প্রচণ্ডতাই সে জীবনকে এমন দীপ্যমান করিয়াছে। তথাপি জ্ঞান ও প্রেম দুই-ই তাঁহার উপরে সমান আধিপত্য করিয়াছিল—একটা ভিতরে, অপরটা বাহিরে; তাই সে দ্বন্দ্ব এমন অন্তর্গূঢ় হইয়াছিল। এই প্রেমও যে সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে শাস্তির মত বোধ হইত, এবং ভিতরের কি একটা শক্তির বশে সে শাস্তি তিনি যেন বহন করিতে বাধ্য,—এমন ভাবও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতাই এক স্থানে লিখিয়াছেন—

It seemed almost as it were by some antagonistic power that he was "bowled along from place to place being broken the while", to use his own graphic phrase. "Oh, I know I have wandered over the whole earth", he cried once, "but in India, I have looked for nothing save the cave in which to meditate !"

কিন্তু সন্ন্যাসী-বিবেকানন্দের এই দীর্ঘশ্বাসে প্রেমিক-বিবেকানন্দের পরিচয় কি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে না? যে শান্তি তাঁহার এত কাম্য, যে জীবন তাঁহার এত প্রিয়, তাহাই তো তিনি ত্যাগ করিয়াছেন! এই ত্যাগের শক্তি আসে কোথা হইতে? প্রেম ও বৈরাগ্য এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তাঁহার জীবন জীর্ণ হইলেও, তিনি ওই প্রেমেরই যজ্ঞানলে সেই জীবনকে আহুতি দিয়াছিলেন।

ক্রমশ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রসঙ্গ কথা

দেউড়ির দারোয়ান

...এক-একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না, যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন। স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আবার ব্যবসাদার বিচারকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বত প্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জনগর্জন, ঘুষ ও ঘুঁষির কারবার করিয়া থাকে—অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়িজুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে। কিন্তু বীণাপাণির অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরল বেশে দীনের মতো মার কাছে যায় এবং তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করেন। তাহারা কখনো কখনো তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছু কিছু ধূলিক্ষেপও করে—তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন। এই সমস্ত ধূলামাটি সত্ত্বেও দেবী যাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লন—দেউড়ির দারোয়ানগুলা তাহাদিগকে চিনিবে কোন্ লক্ষণ দেখিয়া? তাহারা পোষাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই।—রবীন্দ্রনাথ

সরস্বতীর স্বর্ণমন্দিরের পার্শ্বেই একটি অন্তকুণ্ড আছে, প্রাকৃতজনের ভাষায় যাহাকে বলা হয়—আঁস্তাকুড। সারস্বত-মন্দিরের আবর্জনা কালের সম্মার্জনীতে পরিষ্কৃত হইয়া উহাতে নিক্ষিপ্ত হয়। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' রচনার নামে এই আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া ডাঃ সুকুমার সেন কিছুদিন ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে উৎপাত সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত আবর্জনারাশির দ্বিতীয় খণ্ড 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' নামে প্রকাশিত হওয়ায় এই উৎপাত নূতন আকারে দেখা দিয়াছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না করিলে এই মথিত জঞ্জালের কদর্যতা ও পূতিগন্ধে সারস্বত-মন্দিরের শুভ্রশ্রী ও পবিত্রতা বিনষ্ট হইবে। আমরা এই দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, বাংলার শিক্ষিত সমাজ এবং সারস্বত-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ চিরকালই অধিকারী-ভেদ' স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। শক্তি-সামর্থ্যের কথা বিচার করিয়া প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া ভাল যে, সকলের সব-কিছু করিবার অধিকার নাই। ডাঃ সুকুমার সেন ভাষাতত্ত্বের লোক। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে অধিকার বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিলে হয়তো একদিন যোগ্য শিষ্য হিসাবে তিনি তাঁহার পূজনীয় গুরুদেবের গৌরব বর্ধিত করিতে পারিতেন। কিন্তু নিজের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে সেন মহাশয়ের স্পর্দ্ধিত আত্মাভিমান তাঁহাকে সাধনার স্বক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। তিনি স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভয়াবহ পরধর্ম আচরণে লিপ্ত হইয়াছেন। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে প্রাচীন ও আধুনিক পুথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হইয়াছে। ভাষাবিচার করিতে করিতে তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, তিনি সাহিত্যবিচারেরও অধিকারী। অমনই তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় ইস্তফা দিয়া সাহিত্যের গবেষণা ও ইতিহাস-রচনার নামে সাহিত্যবিচারের দুরূহ ক্ষেত্রে নিজেকে প্রলুব্ধ করিয়া আনিয়াছেন, এবং এইসব ক্ষেত্রে যাহা হয়—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—তিনি নিজেই তাঁহার অপকর্মের স্তূপীকৃত জঞ্জালে তাঁহার সাধনার পথ আচ্ছন্ন করিয়া নিজের অপমৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়াছেন।

কোন চিন্তাশীল পাঠক যদি ধৈর্য ধরিয়া সেন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিবার কষ্ট স্বীকার করেন, তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল লইয়াই তাঁহার কারবার, পরখ করিবার শক্তি তাঁহার নাই, সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই; স্বভাবতই যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহাই তাঁহার চোখ ভুলাইয়াছে; আবর্জনা হইতে মণিমুক্তাকে, অসাহিত্য হইতে সাহিত্যকে বাছিয়া লইবার মত সাহিত্যবুদ্ধি বা সাধনা হইতে তিনি বঞ্চিত। সেইজন্যই তিনি 'নাদাপেটা-হাঁদারামে'র 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' কিংবা 'বেশ্যাবিবরণ' জাতীয় সাহিত্যের কঙ্কালকে বিদ্যাসাগর-মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের অমর সাহিত্যরাজির পার্শ্বে স্থান দিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন নাই। শুধু ইহাই নয়, তাঁহার আসল কারবার 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' লইয়াই। পুরাতন লাইব্রেরির

ক্যাটালগ ঘাঁটিয়া হাজার ছুই বাতিল পুথিপত্র লইয়াই তিনি তাঁহার ইতিহাসের পসরা সাজাইয়াছেন। বাতিলকে লইয়াই তাঁহার প্রধান বেসাতি, এবং তিনি ইহার জন্তই গৌরব বোধ করিয়া থাকেন।

—কিন্তু সেন মহাশয়ের জানা উচিত যে, সাহিত্যের আঁস্তাকুড় হইতে জঞ্জাল কুড়াইয়া আনিলেই সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা যায় না। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রধান কথা হইল—ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা। গতিশীলতাই সাহিত্যের লক্ষণ, প্রগতি তাহার ধর্ম। সাহিত্যিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মূল ধারার সহিত নূতন নূতন ধারা সংযোজিত হইয়া প্রতিনিয়ত সাহিত্যকে পুষ্ট করিতেছে। পূর্বের সঙ্গে পরের, পুরাতনের সঙ্গে নূতনের আকার ও প্রকারগত, রূপ ও ভাবগত সম্পর্ক নির্দেশ করিয়া সাহিত্যধারার বাঁকে বাঁকে নবপ্রবাহিত স্রোতের উৎস, তাহার পরিচয় এবং পরবর্তী কালে তাহার প্রভাবের আলোচনাই সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হইল, নূতন নূতন ধারার যাঁহারা প্রবর্তক, অর্থাৎ সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা দিক্‌পালসদৃশ তাঁহাদের কীর্তির সম্যক আলোচনা। তৃতীয় কথা, সাহিত্য-সৃষ্টির বিচার। কালের মাপকাঠিতে যে সমস্ত অমূল্য গ্রন্থ স্থায়ী সাহিত্য-সৃষ্টি বলিয়া ধার্য হইয়াছে, সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাকে সাহিত্য-বিচারে তাহার গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইবে। চতুর্থ কথা, সাহিত্যক্ষেত্রে ঘটনারাজির কালানুক্রমিক বিবরণ; সাল তারিখ ও তালিকা লইয়াই এই দিকের কারবার; তথ্যসন্নিবেশ কতটা সম্পূর্ণাঙ্গ এবং নির্ভুল হইয়াছে তাহার উপরই এই দিকের সাফল্যের বিচার নির্ভর করে।

সাহিত্যের ইতিহাস রচনার এই চতুরঙ্গ কর্তব্য বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাকে একাধারে ঐতিহাসিক, সহৃদয় এবং সাহিত্যের বিচারক হইতে হইবে। সাহিত্যের ইতিহাস জাতির ইতিহাসের সঙ্গে সমতালে পদচারণা করিয়া চলে, কাজেই ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক-বোধ না থাকিলে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা অসম্ভব। সেন মহাশয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাস

লিখিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের একটিমাত্র নমুনা দিলেই যথেষ্ট হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জাতির প্রধান চেতনা হইল তাহার দেশাত্মবোধ, তাহার জাতীয়তা-আন্দোলন। এই দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যগর্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া সেন মহাশয় বলিয়াছেন—

> অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য থাকিলেও বিদেশী রাজপুরুষের কাছে চাকুরী-পরায়ণ শিক্ষিত বাঙ্গালী উপযুক্ত মর্যাদা পাইত না। প্রধানত এই ক্ষোভই বাঙ্গালা দেশে জাতীয়তা-আন্দোলনের প্রথম ঢেউ তুলিয়াছিল।—পৃ. ২২৩

অর্থাৎ বিদেশী রাজপুরুষের কাছে মর্যাদা ও চাকুরিপ্রার্থী বাঙালী মর্যাদা ও চাকুরি না পাইবার ক্ষোভেই দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে! বাঙালী জাতি সম্বন্ধে এই অবমাননাকর ঘৃণিত উক্তির উপর কোনও মন্তব্য করিয়া আমরা বাঙালী জাতিকে আর অপমানিত করিতে চাই না। কুৎসা-কলুষ-কণ্ঠ মেকলের বিজাতীয় উক্তিও বোধ হয় বাঙালীর চরিত্রে এতটা কলঙ্ক লেপন করিতে পারে নাই। সেন মহাশয়ের স্বজাতিদ্রোহের কথা আপাতত উহ্যই থাকুক, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে ইহাই যাঁহার জ্ঞানের স্বরূপ, তাঁহার পক্ষে বাঙালী জাতির এই নবজাগরণ এবং নবজাগরণের সাহিত্য-ইতিহাস রচনার অধিকার কত দূর আছে, তাহার বিচারের ভার আমরা শিক্ষিত সমাজের উপরই ছাড়িয়া দিলাম।

* * *

...ইতিহাসের অথই দরিয়ায় সেন মহাশয়কে নাকানি-চোবানি খাওয়াইয়া আর নাজেহাল করিব না, সাহিত্য-ইতিহাসের সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব। সকলেরই জানা আছে যে, আকারে ও প্রকারে, রূপে ও ভাবে, প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। কি করিয়া এই ব্যবধান সম্ভব হইল, তাহাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়ার কথা। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যের 'আধুনিকতার' স্বরূপ-লক্ষণ কি এবং কখন হইতে ইহার আরম্ভ তাহাও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ না করিয়া আধুনিক সাহিত্যের আলোচনাই আরম্ভ হইতে পারে না। সেন মহাশয় মাত্র আড়াই পৃষ্ঠার মধ্যে 'আধুনিক বাঙ্গালা

সাহিত্যের লক্ষণ' লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের নাম করিয়া তিনি প্রাচীন সাহিত্যের প্রতীক হিসাবে কেবল বৈষ্ণব পদাবলী এবং আধুনিক সাহিত্যের প্রতীক হিসাবে কেবল আধুনিক কাব্য সম্বন্ধেই কয়েকটি চমকপ্রদ উক্তি করিয়া আসর মাত করিতে চাহিয়াছেন। "সমাজসচেতনতা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম লক্ষণ।...দ্বিতীয় লক্ষণ ব্যক্তিসচেতনতা দেখা দিল সর্ব্বপ্রথম মধুসূদনের কাব্যে।...চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাবলীতে এবং অন্যত্র ব্যক্তিসচেতনতার সঙ্গে আত্ম-সচেতনতাও দেখা দিয়াছে।...তৃতীয় লক্ষণ হইতেছে আধুনিক গীতিকাব্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—আত্মকেন্দ্রিকতা। ইহা প্রথমে দেখা দিল বিহারীলালের রচনায়।...চতুর্থ লক্ষণ আত্ম-সম্প্রসারণ।" রবীন্দ্র-নাথের কাব্যসৃষ্টিতে ইহার প্রকাশ।

বলা বাহুল্য, এই কথাগুলি নিতান্তই ধার করা। সেন মহাশয় কাহার নিকট হইতে এই তত্ত্ব-পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন তিনি বলেন নাই। ঋণ স্বীকার করা তাঁহার স্বভাবে নাই। নিন্দার সুযোগ না পাইলে পূর্ব্বাচার্যগণের উল্লেখমাত্র তিনি করেন না, 'গ্রন্থপঞ্জী' তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় না, কাজেই সেন মহাশয় অন্যের জিনিস বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াও অঋণী। অতএব এই অপ্রীতিকর আলোচনা স্থগিত থাকুক। কিন্তু এই ধার-করা বিদ্যা, যে যথাসময়ে কোনও কাজেই আসে নাই, তাহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি। সমাজ কিংবা ব্যক্তি বা আত্মা—যে সম্পর্কেই হউক না কেন, সচেতনতা বলিতে কি বোঝায়, সে সম্বন্ধে সেন মহাশয় নিজে সম্পূর্ণই অচেতন। সেইজন্যই মধুসূদনের সম্বন্ধে [উপরে উদ্ধৃত] ভূমিকায় ব্যক্তি-সচেতনতা ও আত্ম-সচেতনতার কথা বলিয়া তিনি মধুসূদনের কাব্যবিচার যেখানে আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে বলিতেছেন, "মধুসূদনের প্রতিভা ছিল আত্মসচেতন, প্রথম হইতেই। এই আত্ম-সচেতনতার জন্যই তাঁহার কবিবুদ্ধি যথোপযুক্ত শিক্ষা ও সংস্কার গ্রহণ করিতে পারে নাই।" ব্যক্তি ও আত্মসচেতনার অর্থ ও পার্থক্য কি, সে সম্বন্ধে যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলে এই জাতীয় দায়িত্বহীন কথা সেন মহাশয় বলিতেন না। কিন্তু অতটা সূক্ষ্ম বিচারে

প্রবেশ করিয়া লাভ নাই। ধার-করা বুলির কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যের পার্থক্য সম্বন্ধে সেন মহাশয়ের কি ধারণা, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি কথা হইতেই স্পষ্ট হইবে। তিনি বলিতেছেন—

ভাবে ও ভাষায় আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যের সহিত প্রাগাধুনিক বাঙ্গালা-কাব্যের পার্থক্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পার্থক্য উভয়ের মধ্যে সর্বত্র একান্তভাবে সীমা-রেখা টানিয়া দেয় নাই। শুধু পয়ারের বন্ধনমুক্তিই প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট বিদারণ-রেখা টানিয়া দিয়াছে।—পৃ. ১৫০

অর্থাৎ আধুনিক কবি মধুসূদন-বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস-চণ্ডীদাস-মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য রচিত হইয়াছে প্রধানত পয়ারের বন্ধনমুক্তিতে! মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপনির্ণয় সম্বন্ধে এই শেষ-কথা শ্রবণের পর আর এই বিষয়ে আলোচনার আবশ্যকতা নাই।

অথ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কালারম্ভ ও পর্ব-বিচার। আড়াই পৃষ্ঠায় 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের লক্ষণ' বিশ্লেষণ করিয়া সেন মহাশয় এক লাফে উনবিংশ শতাব্দীর ৪২ বৎসর ডিঙাইয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩) হইতেই তাঁহার "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের" কালারম্ভ। শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে সেন মহাশয় আমলই দেন নাই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে সাময়িক পত্রিকা এবং রামমোহনও তলাইয়া গিয়াছেন, এমন কি ঈশ্বর গুপ্তকেও গঙ্গাযাত্রায় প্রাচীনদের সঙ্গী হইতে হইয়াছে। আধুনিক যুগের অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আরম্ভ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে! মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার নির্দেশ-নামায় এই যুগের দুইটি পর্ব—'মধুসূদন-পর্ব' ১৮৪৩ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ, আর 'বঙ্কিম-পর্ব' ১৮৭২ হইতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাকেই বলে রাম না জন্মিতেই রামায়ণ! মধুসূদনের প্রথম-সাহিত্য-সৃষ্টি ১৮৫৮ সালে, অথচ তাহার ১৫ বৎসর পূর্ব হইতে তাঁহার পর্ব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া মধুসূদন আধুনিক কাব্যের স্রষ্টা, নাটকেরও অন্যতম স্রষ্টা বলিতে আপত্তি নাই; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিমপূর্ব যুগের গদ্য-সাহিত্যে মধুসূদনের কোন প্রভাবই থাকিবার কথা নয়। কাজেই

কাব্য, নাটক, গদ্য, উপন্যাস মিলাইয়া যে সাহিত্য তাহার ইতিহাসে মধুসূদন-পর্ব অর্থহীন। তা ছাড়া কাব্যের ইতিহাসে মধুসূদনের পর্ব যেখানেই আরম্ভ হউক না কেন, তাহার সমাপ্তি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কিছুতেই হইতে পারে না। অন্তত হেম-নবীনের আমল পর্যন্ত তাহা অনায়াসেই প্রসারিত হইতে পারে। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, বঙ্কিম-পর্ব কি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে? ১৮৬৫ যেদিন 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল সেই দিন হইতেই কি বঙ্কিম-পর্বের আরম্ভ নয়? মধুসূদনের সাহিত্য-আবির্ভাবের ১৫ বৎসর পূর্বে যদি মধুসূদন-পর্ব আরম্ভ হইতে পারে, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের বেলা এত বিলম্ব কেন? তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকার প্রধানত গদ্যসাহিত্যে। কাব্য ও নাটকে তাঁহার পর্বের কোন অর্থই হয় না। সাহিত্য-সৃষ্টির কথা পরিত্যাগ করিয়া যদি ভাবধারা ও ব্যক্তিত্বের বিচারেই পর্বনির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে অন্তত আরও দুইটি পর্ব, প্রথম দিকে বিদ্যাসাগর-পর্ব এবং শেষের দিকে গিরিশ-পর্ব, স্বীকার করিতেই হইবে। 'তত্ত্ববোধিনী'-প্রকাশের সহিত যে পর্বের সূত্রপাত তাহার সঙ্গে মধুসূদনের কোনই সম্পর্ক নাই, কিন্তু বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কাজেই ইহাকে মধুসূদন-পর্ব না বলিয়া বরং বিদ্যাসাগর-পর্ব বলাই অনেক সঙ্গত। তা ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইলে দ্বিতীয় ভাগের চিন্তানায়ক যদি বঙ্কিমচন্দ্র হন, তবে প্রথম ভাগের চিন্তানায়ক যে বিদ্যাসাগর সে বিষয়েও কি সন্দেহের অবকাশ আছে?

* *

সেন মহাশয় সাহিত্যতত্ত্বের একটি চমৎকার 'মেড-ঈজি' আবিষ্কার করিয়া সাহিত্যবিচার একেবারে জলের মত সহজ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নবাবিষ্কার-মতে সাহিত্যসৃষ্টির অদ্বৈত সত্য হইল 'রোমান্টিকতা'। তাঁহার মুখেই শ্রবণ করুন—

এই প্রসঙ্গে রোমান্টিকতা (Romanticism) কথাটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। মানুষের চিত্তবৃত্তির প্রকাশ হয় তিন রূপে,—ঐতিহাসিক, রোমান্টিক, ও বৈজ্ঞানিক। ঐতিহাসিক বিবেচনা হয় কালানুক্রমিক বিবর্তন ধরিয়া। রোমান্টিক কল্পনা চলে

কালানুক্রম ও বাস্তব-কার্যকারণপরম্পরাকে যেন পাশ কাটাইয়া, আর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটে বাস্তব-কার্যকারণপরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া। ঐতিহাসিক বিবেচনা ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর (sic)। কেন না কালানুক্রমিকতার সঙ্গে কার্যকারণপরম্পরার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রোমান্টিকতা হইতেছে কোন এক অনির্দেশ্য ইষ্ট আদর্শকে ইমোশনের মধ্য দিয়া পাইবার প্রচেষ্টা।...

ইংরেজি সাহিত্যে যেমন বাঙ্গালা সাহিত্যেও তেমনি, রোমান্টিকতা উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য। আধুনিক কালে সাহিত্যে যাহা আমরা realism বা বাস্তবতা বলি তাহা রোমান্টিকতার পরিণাম মাত্র। সাহিত্যে বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিকতার কোন বিরোধ নাই। বিষয়বস্তুর বাস্তব বিচার বা বিশ্লেষণ তখনই সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠে যখন তাহা রসপরিণতি লাভ করে। নতুবা তাহা বিজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকিবে। বিষয়-বস্তুকে রসপরিণতি দিতে পারে একমাত্র কবিকল্পনা অর্থাৎ রোমান্টিক দৃগ্‌ভঙ্গি।—পৃ. ২০৩-৭

রসপরিণতিই সাহিত্যের শেষ কথা। রোমান্টিক দৃগ্‌ভঙ্গিই বিষয়-বস্তুকে রসপরিণতি দিতে পারে। অতএব রসোত্তীর্ণ তাবৎ সাহিত্যই রোমান্টিক। শুধু উপন্যাস কেন, গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প—যাহাই হউক না কেন, সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতে হইলে রোমান্টিক হইতেই হইবে। সেন মহাশয়ের এই রোমান্টিক রসতত্ত্ব পাঠে পুলকিত হইয়া উঠিতেছিলাম, অকস্মাৎ দেখি কাচিৎ কলঙ্কিতা নবীনকালী সেন মহাশয়কে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন—

নবীনকালী দেবীর 'কামিনী কলঙ্ক' (১২৭৭) গদ্যেপদ্যে রচিত...একটি বিশিষ্ট কাব্য। বইটির কাহিনীতে রচয়িত্রীর আত্মকথার ছায়া আছে বলিয়া মনে হয় এবং তাহা হইলে এটিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম বাস্তব উপন্যাসের মর্যাদা দিতে হয়।—পৃ. ১৭

বইটির শেষে পয়ারে যে "গ্রন্থকত্রীর পরিচয়" আছে তাহাতে মনে হয় যে কামিনী-কলঙ্ক আত্মকথামূলক আখ্যায়িকা।—পৃ. ১৮

সেন মহাশয়কে আমরা সংযত পুরুষ বলিয়াই আশা করিয়াছিলাম। একটি কলঙ্কিতা কামিনীকে দেখিয়া তিনি এতটা বেসামাল হইয়া যাইবেন, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই। গদ্যেপদ্যে লেখা একটি কাব্য একেবারে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাস্তব উপন্যাস হইয়া দাঁড়াইল? এই নবাবিষ্কৃত প্রথম বাস্তব উপন্যাসের অন্তত এক যুগ আগে লেখা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে'র বাস্তবতা এবং ঔপন্যাসিকতা সম্পর্কে সেন মহাশয়কে প্রশ্ন করিব ভাবিতেছি

হঠাৎ দেখি 'আলালের ঘরের দুলাল' সেন মহাশয়ের কলমের এক আঁচড়েই উপন্যাসের ক্ষেত্র হইতে একেবারে বাংলা প্রহসনেরও অধম নক্শা শ্রেণীতে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সেন মহাশয় 'গদ্যেপদ্যে অথবা গদ্যে রচিত' যে সব নক্শায় বাঙ্গালা প্রহসনের পূর্বরূপ' পাইয়াছেন, ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', বিশ্বনাথ মিত্রের 'কলিরাজার যাহাত্ম্য', রামধন রায়ের 'কলিচরিত', নারায়ণ নটরাজ গুণনিধির 'কলিকুতূহল' এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' তাহার অন্তর্ভুক্ত। "এই সকল নিবন্ধে বাঙ্গালা প্রহসনের প্রথম খসড়া দেখা দিয়াছিল।" (পৃ. ১২) বেচারা প্যারীচাঁদ! গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট আদালতে তিনি যে রায় পাইয়াছিলেন, তিনি কি ভাবিয়াছিলেন যে পঞ্চাশ ষাট বৎসর যাইতে না যাইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডক্টরের উচ্চ-আদালতে তাঁহার মামলা এই ভাবে ডিসমিস হইয়া যাইবে? কিন্তু প্যারীচাঁদের আফসোস করিবার কারণ নাই, মধুসূদন গিরিশচন্দ্র এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও একই দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। চালাকি চলিবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পুরস্কার, বহু স্বর্ণপদক এবং আশুতোষ-গ্রিফিথ-পি. আর. এস.-পি. এচ. ডি.-উপাধিক সুকুমার সেন! চাট্টিখানি কথা নয়, গিরিশ-মধু-বঙ্কিমকে একেবারে ঘোল খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

* * *

সেন মহাশয় সাহিত্যে একেবারে 'নিরাকুল'-বাদী। মধুসূদন সম্বন্ধে বলিতেছেন—

> মধুসূদন বাঙ্গালা নাটক এবং কাব্য রচনা করিতে যে অন্তরের কোন বিশেষ প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা নহে।...বাঙ্গালা কাব্যে হাত দিয়াছিলেন অনেকটা bravado বা জেদ করিয়া।...এই জেদের ফলে বাঙ্গালা কাব্যে যুগান্তর ঘটিয়া গিয়াছে। —পৃ. ১২৩

অর্থাৎ বড় প্রেরণা ছাড়াও সাহিত্য রচনা চলে, এবং শুধুমাত্র জেদের বশেই 'মেঘনাদবধে'র মত মহাকাব্য অনায়াসে লিখিয়া ফেলা যায়! মধু-প্রতিভার কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি! আধুনিক বাংলা নাটক ও কাব্য-সৃষ্টির জন্মরহস্য সম্বন্ধে কি গূঢ় ঐতিহাসিক তথ্য-আবিষ্কার!

এই বাহ্! তত্ত্ববিচারের নমুনা দেখুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাপণ্ডিতের কাছে সাহিত্যবিচারক্ষেত্রে ভক্তিগদগদ ভাবোচ্ছ্বাস আশা করিবেন না। আপনাদের 'মহাকবি' এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—

গিরিশের নাটকে উঁচুদরের সাহিত্যশিল্পের পরিচয় নাই, এবং তাহা থাকিবারও কথা নয়। গিরিশ যাহাদের জন্য নাটক লিখিতেন তাহাদের রস-বোধের পরিধি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং cheap sentimentality বা sob stuff এবং stage trick তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই, এবং ইহার দ্বারা তিনি নাটকে যেমন আসর জমাইতে পারিয়াছিলেন এমন উপন্যাসে অনুরূপ ক্ষমতাশালী খুব কম লেখকই পারিয়াছিলেন।...পদ্যাংশে মাঝে মাঝে কবিত্বের পরিচয় আছে কিন্তু তাহা একান্তভাবে নাটকীয় বলিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। গদ্য সংলাপের ভাষা প্রায়ই হয় নাটকীয় নয় কলিকাতার slang বা ইতরজনো মিশ্রিত।—পৃ. ৩৭৪

মন্তব্য করিবার সাহস আমাদের নাই। কেবল আর একটি কথা বাকি আছে, "গৈরিশ ছন্দ (sic) গিরিশচন্দ্রের আবিষ্কার নয়, তাঁহার পূর্বে ব্রজমোহন রায় নাটকে এবং রাজকৃষ্ণ রায় কাব্যে ভাঙা পয়ার (মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর) ছন্দের অল্পস্বল্প ব্যবহার করিয়াছিলেন, [পৃ. ৩৬৯]"।

আনি পাঠকগণের ধৈর্যচ্যুতি হইতেছে। কাজেই আমরা আর কাহারও কথা উচ্চারণমাত্র না করিয়া কেবল বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সেন মহাশয়ের নির্দেশনামা উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস মাত্রই রোমান্টিক [মায় 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত] এবং সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেকখানি গ্রন্থই ত্রুটিবিচ্যুতিতে পূর্ণ। তবু ভদ্রলোক সস্তা উপন্যাস লিখিয়া সাধারণ পাঠকসমাজকে তৃপ্তি দিয়াছিলেন বলিয়া সেন মহাশয় তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু গীতা-ফীতার নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া তাঁহার অনধিকারচর্চা সেন মহাশয় কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিতেছেন—

বঙ্কিমের অধ্যাত্ম-দৃষ্টি গভীর ছিল না, তাই ব্রহ্মোপলব্ধিসম্ভূত গভীর অনুভূতি তাঁহার ধর্মতত্ত্বে কোন স্থান পায় নাই। বঙ্কিম ছিলেন জীবনের উপরতল-বিহারী 'নৃত্যবকর্ম-চঞ্চল, তাই ধ্যানগম্য আনন্দময়োপলব্ধির প্রতি তাঁহার আস্থা বা আগ্রহ ছিল না।

গীতোক্ত নৈষ্কর্ম্যবাদের পিছনে যে কতখানি ধ্যানধারণার ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দীর্ঘ ভূমিকা থাকা একান্ত আবশ্যক তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।—পৃ. ২২০

গ্রাজুয়েট এবং হবু-গ্রাজুয়েটদের অর্বাচীন রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেরা অনবরতই পরীক্ষা করিতেছেন এবং এই জাতীয় মন্তব্য তাঁহাদের সর্বদাই জিহ্বাগ্রে প্রস্তুত থাকে। গ্রাজুয়েট বঙ্কিমের উপর ডক্টর সেনের বেপরোয়া মন্তব্যের অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ই সেন মহাশয়কে দিয়াছে। অতএব সহ্য করিতেই হইবে। সেন মহাশয় ২১৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "পাশ্চাত্য দৃগ্‌ভঙ্গি লইয়া সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রপাত" বঙ্কিমচন্দ্রই করিয়াছেন। খুশি হইয়া উঠিলাম, লোকটা শুধু নিন্দাই করে না, প্রশংসা করিতেও জানে। কিন্তু হায় রে, সৈনিক সমালোচনারীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকিলে কি আর এতটা অসতর্ক হইতে পারিতাম! সেন মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে একটি মাত্র আছাড়ে বধ করিবার জন্যই তাঁহাকে মুহূর্তমাত্র আকাশে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। পরপৃষ্ঠায়ই তিনি লিখিতেছেন—

বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যরসবোধ খুব গভীর ছিল না, তাই তাঁহার কাব্যসমালোচনা সাধারণত গতানুগতিক হইয়াছে।—পৃ. ২১৮

যেখানে 'সূত্রপাতে'র কথা আছে, সেখানে 'গতানুগতিকতা' আসে কি করিয়া তাহা সাধারণ যুক্তি বা বুদ্ধির অধিগম্য নয়। কাজেই সে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া লাভ নাই। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, যে-বঙ্কিম উত্তরচরিত, শকুন্তলা মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা, কিংবা বিদ্যাপতি ও জয়দেব লিখিয়া রবীন্দ্রনাথকে 'প্রাচীন সাহিত্য' বিচারের পথ করিয়া দিয়াছিলেন, যে-বঙ্কিম আর কিছু না হউক ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ এবং দীনবন্ধুর সাহিত্য সম্বন্ধে শেষ-কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই বঙ্কিমের কাব্যরসবোধ ছিল না? পাঠকগণ, সত্যই বলিতেছি, বিংশ শতাব্দীর শহরে সভ্য পরিবেশের কথা ভুলিয়া গিয়া উনবিংশ শতাব্দীর গ্রামবৃদ্ধের মত বাদ-জোবানি করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু এই যুগের রসবোধ তাহা ক্ষমা করিবে না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

অধঃপতন

ভোটপর্ব্বের পালা অনেককাল হইতে চলিতেছিল। এবার তাহার সুফলটা বোঝা গেল! বহু যোগ্য এবং যোগ্যতর ব্যক্তিকে ডিঙাইয়া ছোটমামা সাপ্লাইয়ে একজন কর্ণধার হইয়া বসিলেন।

সকালেই খবর পাইয়াছিলাম। দেখা করিতে গেলাম বৈকালে। না গেলে অবশ্য ওপক্ষের বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আমাদের মত অতি অগণ্য নগণ্য মানুষদের ছোটমামা বড় একটা স্মরণে রাখেন না। কিন্তু আমাদের তরফ হইতে সম্বন্ধ বজায় রাখিবার ত্রুটি নাই। আমাদের ক্রমক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যের শেষ গৌরব হিসাবে তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধটুকুকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া রাখিয়াছি। যখন যাহার কাছে আত্মমর্য্যাদা বাড়াইবার প্রয়োজন অনুভূত হয়, তখনই ছোটমামার গৌরবময় পদমর্য্যাদাটাকে সম্মুখে আগাইয়া ধরি।

ছোটমামা অন্যদিন আমাদের বড় একটা গ্রাহ্যই করেন না। আজিকার বহুবাঞ্ছিত পদগৌরববৃদ্ধির উল্লাসেই মনটা বোধ হয় প্রফুল্ল ছিল। প্রসন্নমুখে বলিলেন, খবর শুনেই এসেছিস বুঝি? বেশ বেশ। তোর ছোটমামী আজ ঘরে প্রচুর পাটিসাপটা বানিয়েছে। একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যাস।

ছোটমামীমা পাশের ঘরেই ছিলেন। একঘর জিনিসপত্র ছড়ানো— কমলালেবু, আঙুর, সন্দেশ, মাছ হইতে শুরু করিয়া কাশ্মীরী কার্পেট হইতে সোনার ঘড়ি অবধি। বড় সাহেবকে ডালি পাঠাইবার বিবিধ বিচিত্র উপকরণ। মামীমা ফলের রাশি হইতে দাগী ফলগুলা বাছিয়া আলাদা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া হাসিমুখে বসিতে বলিলেন। মামীমার সর্ব্বাঙ্গ নূতন ঝকঝকে গিনি-সোনার গহনায় মোড়া। দামী ঢাকাই শাড়ির জরির আঁচল অযত্নে মাটিতে পড়িয়া লুটাপুটি খাইতেছে। আগুনের মত উজ্জ্বল সে সোনার রঙের তীব্র দীপ্তিতে চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া যায়। অকারণেই মনে পড়িয়া যায়, মীর কানের ফুলজোড়াটা পাশের বেনেবাড়িতে গত সাত মাস যাবৎ সাড়ে পাঁচ টাকায় বাঁধা দেওয়া আছে। মামীমা ফুল তোলা রুমাল দিয়া থরে থরে সাজানো থালা ঢাকিতেছিলেন। অকারণেই হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, গত তিন মাস যাবৎ মিনু একখানা আস্ত শাড়ি চাহিয়া

কান্নাকাটি করিতেছে। স্নান করিয়া উঠিয়া পরিবার কাপড়সুদ্ধ নাই।

মামীমার থালা গুছানো শেষ হইয়াছিল। দাগী ফলগুলা হইতে দুইটি কমলালেবু বাছিয়া মামীমা আমাকে দিলেন। বাকি আঙুর নাশপাতি লেবু ঝি তুলিয়া লইয়া গেল।

একথালা পাটিসাপটা সাজাইয়া মামীমা আমার সামনে রাখিলেন, বলিলেন, রস যেন বেশি খাস নি, গা জ্বালা করবে। ছুটো মানুষ, এত চিনি আনেন! রোজই ঘরে খাবার করি, তবু ফুরোয় না, কি যে করি! আজ তবু একটা ভাল উপলক্ষ্য পাওয়া গেল।

সবিস্ময়ে বলিলাম, অনেক চিনি পান? কেমন ক'রে পান? সবই তো র‍্যাশান্‌ড।

মামীমা মুখ মচকাইয়া হাসিলেন, বলিলেন, সে তো আছেই সকলের জন্যে, তবু যুদ্ধের কল্যাণে ভাবতে হয় না, সবই ঘরে মজুত থাকে। মামীমা ভাঁড়ার খুলিয়া দেখাইলেন। সরু মিহি সীতাশাল চাল, চিনি, সুজি, কাগজ, কয়লা, কেরোসিন, ফিনাইল আর স্পিরিট—অজস্র, প্রয়োজনের ঢের বেশি! থাকিবে না কেন? পয়সা আছে আর আছে প্রতিপত্তি—অগাধ অজস্র খাতির।

আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তা তোর এমন হাল কেন? চশমাটায় দু রকম ফ্রেম জুড়েছিস! ছেঁড়া জামা জুতো! গাল তোবড়া, চোখের কোল বসা! এই কি সাতাশ বছরের ছেলের চেহারা? চুলগুলোতে যেন ধুলো উড়ছে। ক্যাস্টারঅয়েলিন মাখলেই পারিস। দামেও খুব সস্তা। মোটে সাড়ে তিন টাকা ক'রে শিশি।

চুলের আর দোষ কি! নারিকেল তৈল বাজার হইতে আত্মগোপন করিয়াছে। দেড় টাকা সেরের সরিষার তেলে, টানাটানি করিয়াই রান্না চালাইতে হয়। মাথায় মাখিয়া তেল নষ্ট করা আমাদের ধর্মে পোষায় না। মামীমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব, চেহারার কোন দোষ নাই! ভোরবেলা একখানা বাসী হাতরুটি চিবাইয়া ছেলে পড়াইতে যাই। সেখান হইতে ফিরি বাজার সারিয়া। ফিরিয়াই আজ থলিঝুলি কাঁধে করিয়া র‍্যাশান শপে ছুটিয়াছিলাম। দুই ঘণ্টা

সেখানে পাল্লা গনিবার পর র‍্যাশান মিলিল না। মিলিয়াছে অজস্র গালমন্দ। হিসাবের একটি পয়সা কম পড়িয়া গিয়াছিল। আতপ-চালের ক্ষুদ আর আটার ভুষি আর সহ্য হয় না। দেড় বছর যাবৎ ক্রনিক আমাশয়ে ভুগিতেছি।

কিন্তু এসব কথা মামীমাকে বুঝাইয়া কোন ফল নাই।

দুই-চার টাকার ফল দাগী হইলে ইহারা অনায়াসে ঝি-চাকরকে বিলাইয়া দেয়। মানসম্ভ্রম, অর্থ, প্রতিপত্তি আর যুদ্ধের কল্যাণে, ইহারা প্রতিদিন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। তাই ম্লান বিশীর্ণ হাসি হাসিয়া বলিলাম, চেহারার এসব যা বলছ, এও তো যুদ্ধের কল্যাণে।

* * * *

চারটি মুড়ি আর এক কাপ চা সামনে রাখিয়া মা বলিলেন, আজ বিনা চিনিতেই চা খাও বাবা। মিনুটার সাত দিন জ্বর। চারবার ক'রে সাগো খাচ্ছে; ওকে দিতেই সব চিনি শেষ হয়ে গেল। অনু নন্তু তো চায়ে চিনি নেই দেখে কাঁদতে বসেছে। রোগা মেয়েটাকে যে ওবেলা পথ্য দেব কি ক'রে জানি না। র‍্যাশানেও তো গোলমাল হ'ল, পেলি না। তবু ফের এবেলা একবার নন্তুকে পাঠালাম।

মামীমার হাতের ঘন চিনির রসে তখনও পেট গুলাইতেছে। কি মনে পড়িতেই পকেটে হাত ঢুকাইয়া দুইটা রসসিক্ত পাটিসাপটা আর আধখানা লেবু বাহির করিয়া মার হাতে দিয়া বলিলাম, অনু আর নন্তুকে দিও, মিনুকে লেবুটা। ওরা তো কিছুই ভালমন্দ খেতে পায় না। মামীমার ওখানে অনেক দিয়েছিল, ওইটুকু লুকিয়ে নিয়ে এলাম। কত যে নষ্ট হ'ল, ফেলা গেল—আঙুর, বেদানা; লজ্জায় চাইতে পারলাম না।

পকেটটা অনুভব করিয়া বলিলাম, এঃ, রসে একেবারে ভিজে গেছে, কাল কি প'রে যাব আপিসে?

মা লুব্ধনেত্রে পকেটটার পানে চাহিয়াছিলেন। সাগ্রহে বলিলেন, থাক থাক, আলগোছে খুলে দে ওটা। আস্তে জলে চুবিয়ে রসটা ছেঁকে নিয়ে ওটা কেচে দেব 'খন। এবেলা মিনুর পথ্যিটা চুকে যাবে।

* * * *

মামীমার মেজাজটা আজ ভালই ছিল। আমার পেটের অসুখ

শুনিয়া এক পোয়া সরু পুরানো চাল দিয়াছিলেন। সেটাকে সযত্নে তাকের এক কোণে তুলিয়া রাখিতেছিলাম। বউদি ঘরে আসিলেন, বলিলেন, ওটা কি রাখলে ভাই ঠাকুরপো? বউদির পেটরোগা ছেলেটার কথা মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি বলিলাম, ও কিছু নয়। সময়ে মুষ্টিভিক্ষে দিতে হয় কিনা, তাই চাট্টি চাল সরিয়ে রাখলাম।

মেঝেতে দুই-চারিটা চাল পড়িয়া গেল। বউদি কুড়াইয়া হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন।

বাঃ, খুব মিহি চাল তো, পুরনো নিশ্চয়, ভাল চাল, না ঠাকুরপো?

আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, না, তা খুব খারাপ নয় বোধ হয়।

* * * *

কলিকাতার বুকে সন্ধ্যা নামিয়াছে। ব্ল্যাকআউটের সন্ধ্যা। পাশের বড় লাল বাড়িটা হইতে লুচিভাজার শব্দ উঠিতেছে।

ছোট ভাই নন্তু বিকালের ভাঙা বাজার হইতে ছয় পয়সায় একটা আধপচা কাঁঠাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। উঠানের এক কোণে সেটাকে ভাঙিয়া সকলে মিলিয়া বিচিত্র আনন্দ-কলরবে ঘিরিয়া বসিয়াছে। লাল বাড়ির মেয়ে দুইটি দামী সাবানে গা ধুইয়া রঙিন শাড়ি পরিয়াছে। খোঁপায় চমৎকার বেলফুলের মালা জড়াইয়া জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক দেখিতেছে। রসা কাঁঠাল, লুচির পোড়া ঘি আর বেলফুলের মিশ্রিত গন্ধে বাতাস বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তারের বাড়ি হইতে ফিরিতেছিলাম। ডাক্তারবাবু বার বার তাগাদা দিয়াছেন। অনুর ঔষধের সাত টাকা বিল ছয় মাস বাকি পড়িয়া আছে।

স্বল্পালোকিত ঘরে ঢুকিতেই মনে হইল, কে যেন ছায়ার মত সরিয়া যাইতেছে! আমার সম্মুখে পড়িতেই সে মৃদু করুণকণ্ঠে কহিল, নান্টুর তিন মাস ধরে পেট ধরছে না, তাই ভাবলাম এমন সরু পুরনো চাল—দুটো ভাত রেঁধে দিই ছেলেটাকে।

লজ্জারুণ অপ্রস্তুত মুখে বউদি একরকম ছুটিয়াই চলিয়া গেলেন।

* * * *

বউদির আঁচল হইতে কয়েকটা চাল মাটিতে ছড়াইয়া গিয়াছিল। সে কটাকে সযত্নে খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া রাখিলাম।

"বহ্নি"

বাদী

সন্ধ্যার পর বারান্দার কোণটিতে চুপচাপ করিয়া একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া আছি। একটি ঘনপল্লবিত জামরুলগাছের নীচে এইখানটায় অন্ধকার বেশ জমাট হইয়া নামে। আজকাল এই সময় মনটা তেমন ভাল থাকে না। সমস্ত দিন কলিকাতার রাস্তাঘাটে মৃত-বুভুক্ষিতের অসহ্য দৃশ্য, কোথাও একটু গল্প করিতে বসিলেই ওই আলোচনা, খবরের কাগজের পাতা খুলিলেই ওই কথা—যতই দিনের অবসান হইতে থাকে মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া আসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আর চলাফেরা করিবার উৎসাহ থাকে না, এইখানটিতে আসিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকি। এই যে অন্ধকার গাঢ় হইয়া অভিশপ্ত পৃথিবীটা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কাছে-পিঠে কোথাও একটা প্রদীপের শিখা পর্যন্ত নাই যে, সে-অন্ধকারকে খণ্ডিত করিয়া সেই পৃথিবীর খানিকটা ব্যক্ত করিয়া ধরে—এইটি বেশ লাগে। ইচ্ছা করিয়া কিছু ভাবি না, অথবা আরও যথাযথভাবে বলিতে গেলে—কিছু না ভাবিবারই ইচ্ছা লইয়া বসিয়া থাকি। কিন্তু তবু আসিয়াই পড়ে ভাবনা—নানান রকম, বিশৃঙ্খল। কি অদ্ভুতভাবে মরা! মৃত্যুকে কি অদ্ভুত ব্যঙ্গ! যাহারা মারে তাহারাই আশ্বাসের কথা বলে, বাঁচাইবার অভিনয় করে, দানছত্র খোলে!...হইবে না?—কত বড় জাতির উত্তরাধিকারী! ইহাদেরই পূর্বপুরুষরা তো বিশ্বমাতার মূর্তি কল্পনা করিয়াছিল—এক হাতে ছিন্নমুণ্ড, এক হাতে বরাভয়! আপনি চটিলেন? বলিতেছেন, ওটা তত্ত্বের দিক? হয়তো ঠিক; বুঝি না। আমি শুধু ভাবি, তত্ত্বটা কি ফল ফলাইল, অথবা—আপনারই কথা ধরিয়া বলি—তত্ত্বই যদি তো সেটি এই বিষবৃক্ষের গোড়াতেই কুঠার হানিতে পারিল না কেন?

অন্তরের সঙ্গে বাহিরের অন্ধকারও গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, একটি মাঝবয়সী লোক শ্রান্ত গতিতে আসিয়া বারান্দার নীচেটিতে বসিল। অন্ধকারে যতটা বুঝিলাম, মনে হইল, এতই শ্রান্ত যে পা-ঠিক রাখিতে পারিতেছে না। ছেঁড়া ময়লা কাপড়, গায়ে আধ-ফরসা একটা ছেঁড়া জামা ঝলঝল করিতেছে; অন্ধকারে মুখের যতটুকু দেখা গেল, মনে হইল, ক্ষৌরকার্যের সঙ্গে অনেকদিনই কোন সম্পর্ক নাই। লোকটার কোলে

একটা বছর ছয়েকের রোগা মেয়ে, পায়ে একটা নূতন ছিটের পেনি—নিতান্ত হীন বলিয়া মনে হয় না, কোন গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা করিয়া পাইয়া থাকিবে।

লোকটা মেয়েটাকে কোলে লইয়াই উবু হইয়া বসিল এবং বসিয়াই নিজের হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া ডান হাতে কপালের অবিন্যস্ত চুলগুলা খামচাইয়া ধরিয়া মাথাটা গুঁজড়াইয়া দিল।

লুকাইব না, মনে মনে বেশ একটু বিরক্ত হইলাম। সমস্ত দিন তো এই দেখিয়াই কাটাইলাম; বাড়িতে প্রবেশ করিব, এই চর্চাই হইবে। এক মুঠা অন্ন মুখে তুলিতে যাইব, চারিদিকে ইহাদেরই হাহাকারে বিষ হইয়া উঠিবে। মাঝখানের এই একটু অবসরের চেষ্টা, ইহার উপরও যদি ইহারা এমনভাবে সশরীরে আসিয়া হানা দেয় তো লোকে বাঁচে কি করিয়া? একটু নিশ্বাস ফেলিবারও সময় দিবে তো?

ঠিক কঠোর না হইলেও একটু রুক্ষ কণ্ঠেই বলিলাম, বাপু, একটু ক্ষ্যামা দাও দিকিন, লোকে একটু নিরিবিলি দেখে বসবে তা···তুমি না হয় ওই সদরের দিকে যাও; যদি কিছু দিতে পারে···দাঁর দেবেই বা কোথা থেকে বল মানুষে?···তবুও যাও, দেখ; আমায় একটু ছাড়।

শুধু গোঁজড়ানো মুখে উক করিয়া একটা শব্দ হইল, নড়নচড়নের কোন লক্ষণ নাই। মেয়েটা আমার পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া ছিল, মনে হইল, তাহার ঠোঁট দুইটি যেন একটু থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চোখ দুইটিও দুই বিন্দু জলে চকচক করিয়া উঠিল।

না, অব্যাহতি নাই; প্রশ্ন করিলাম, খাবি কিছু?

মেয়েটি কিছু বলিবার আগেই লোকটা মুখটা অল্প একটু আমার পানে ফিরাইয়া কতকটা রুক্ষ কণ্ঠেই বলিল, না, ওর খাবার কষ্ট থাকতে দিই নি বাপু, ওর যা কষ্ট তা—

শেষ না করিয়াই মেয়েটাকে বুকে আরও চাপিয়া ধরিল, তাহার পর তাহার মাথার উপর নিজের মুখটা চাপিয়া একটু দুলিয়া দুলিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া ভাঙা ভাঙা ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল, তোকে আমি তো দোব না খাবার কষ্ট বেটী; দিই? বল্ বল্—বল্ না, সোনা আমার, মানিক আমার, খাবার কষ্টও দোব না, পরবার কষ্টও দোব না; তার জন্যে

আমায় ভিক্ষে করতে হয়, চুরি করতে হয়, গাঁটকাটা সাজতে হয় সেও স্বীকার ; না খেয়ে তোকে মরতে দোব না।...বল্ না বাবুকে, আমি নিজে সমস্ত দিন খেয়েছি কিছু ? খেয়েছি ? তোর মুখে তুলে দিই নি সবটুকু ? বল্ না বাবুকে ; আমি না দিলে তোকে দেবে কে ? আর আছে কে ?

দুই হাতে আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া দুলিয়া দুলিয়া আদর করিতে লাগিল, মা আমার, সোনা আমার, হীরে আমার—

দৃশ্যটা ক্রমেই মর্মন্তুদ হইয়া উঠিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষেরই একটা দিক,—সবাই গিয়াছে, বাপ বুকে করিয়া লইয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া ফিরিতেছে, নিজেকে বঞ্চিত করিয়া মুখের অন্ন তুলিয়া দিতেছে ; একাধারে মা, বাপ, ভাই, বোন—সব।

প্রশ্ন করিলাম, তা হ'লে তুমি কিছু খাবে ? দেখি, দাঁড়াও, যদি কিছু পাই। আর বাপু, গেরস্থই বা করে কি বল ?

উঠিতেই লোকটা কতকটা সেই ভাবে মাথা গুঁজিয়াই ডান হাতটা বাড়াইয়া আমার একটা পা চাপিয়া ধরিল, প্রায় পড়পড় হইয়া গিয়াছিল, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া একটু সেই ভাবেই থাকিয়া বলিল, না বাবু, আপনি বসুন ; আগে সবটা একটু শুনুন। খাব আর কোন্ মুখে ? এ প্রাণ রেখেই বা আর কি হবে ? রাখতুম, ভেবেছেন বাবু ? রেখেছি শুধু এইটের জন্যে। মা আমার, সোনা আমার, কি যে তোর নামটি বল্ তো ? শুনিয়ে দে তো বাবুকে একবার।

মেয়েটিকে একটি চুম্বন করিয়া তাঁহার মুখের খুব কাছে মুখ রাখিয়া চাহিয়া রহিল। মেয়েটি কেমন বিহ্বল এবং হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে, হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত আর ভীতিজনক অবস্থায় পড়িলে শিশুরা যেমনটা হইয়া পড়ে। লোকটার মুখের পানে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল, নক্ষী।

লোকটা আবার মেয়েটাকে চাপিয়া ধরিল, কয়েকটা উচ্ছ্বসিত চুম্বন দিয়া বলিল, নক্ষী ! নক্ষী ! নক্ষী, না হাতী...সে তো ওদের দেওয়া নাম, আমি কি নাম দিয়েছি তাই বল্ না।

মেয়েটি কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, আবাগী।

লোকটা আবার মুখটা গোঁজড়াইয়া সামনের কেশগুচ্ছটা খামচাইয়া ধরিল, তাহারই মধ্যে অল্প একটু মুখ ঘুরাইয়া আমার পানে চাহিয়া গাঢ়

স্বরে বলিল, রাখব না 'আবাগী' নাম বাবু? কম দুঃখে রেখেছি? যার বাপ…ওফ!

আবার মুখটা গুঁজিয়া নীরব হইয়া রহিল।

মেয়েটি কেন এত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, এতক্ষণে যেন কতকটা আন্দাজ হইল। প্রশ্ন করিলাম, তোমার মেয়ে নয়?

লোকটা একেবারেই মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল, একটা কিসের আঘাতে, কি যেন কে কাড়িয়া লইতেছে—এইভাবে যেন একটা হঠাৎ ভয়ে নাড়া খাইয়া উঠিল; মেয়েটাকে আরও নিবিড় বন্ধনে বুকে চাপিয়া আরও গাঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল, অমন কথা বলবেন না বাবু, তা হ'লে আমি বাঁচব না। তুই আমার মেয়ে নয়? তুই আমায় ছেড়ে চ'লে যাবি? 'আবাগী' বলি ব'লে তুই রাগ করলি? হবি না আর আমার মেয়ে? বল্ না বাবুকে, সোনা আমার, মানিক আমার, বল্ না, বাবুকে, তুই কার মেয়ে?…

একটু কেমন কেমন বোধ হইতেছে। শোকে অভাবে লোকটার কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? এমন মর্মন্তুদ ঘটনাও তো হইতেছে আজকাল।

ক্ষুধার চোটে বসিয়াও শরীর ঠিক রাখিতে পারিতেছে না, যেন টলিয়া পড়িবে, তবু আহারে প্রবৃত্তি নাই, কথায় তেমন বাঁধুনি নাই,—সব হারাইয়া সব চেতনা এই শেষ সম্বলটুকুর উপর জড়ো হইয়া উঠিয়াছে ভয়ে আতঙ্কে মস্তিষ্কের বিকৃতিতে…

বল্ না, বল্ বাবুকে, নয় তুই আমার মেয়ে? বল্ না বাবুকে, কার মেয়ে তুই?

সেই রকম বিহ্বল দৃষ্টিতেই চাহিয়া মেয়েটা যেন ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, তোমার—

ওই শুনুন বাবু, আমারই আবাগী, আমারই সোনা। বলব না আবাগী বাবু? এই হাহাকার, চারিদিকে লোক কিউয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়ে ম'রে যাচ্ছে, বাড়িকে বাড়ি ম'রে সাফ হয়ে গেল, আর তুই বাপ হয়ে কিনা মদ গিলে এই দুধের বাছাটাকে—

আবার রহস্যাবৃত হইয়া পড়িতেছে; বাপ নয় তাহা হইলে।

তোমার ভাইঝি নাকি?—বলিয়া প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, লোকটা একটু বিরক্তি দিয়াই যেন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, গাল দিই সাধে বাবু? আরও দোব। একশবার দোব, ম'রে উরকুর উঠে যাচ্ছে চারিদিকে, আর তুই শালা কিনা মদ গিলে এই দুধের বাছাটাকে ফুটপাথের ওপর ফেলে রেখে···হ্যাঁ বাবু, আপনি বোধ হয় পেত্যয় যাবেন না—ফুটপাথের ওপরে, একপাল ভিখিরীদের কাচ্চাবাচ্চাদের মধ্যে ব'সে হাপুস নয়নে কাঁদছে, বাবা গো, ওগো বাবা গো! বুক ফেটে যায় বাবু শুনলে···মদের দোকানের সামনে বাবু, মদের দোকানের সামনে! হাজার ন্যাকড়া পরা হোক, না খেতে পেয়ে হাজার মর মর হয়ে পড়ুক, তবু ভিখিরীদের কাচ্চাবাচ্চাগুনো ওর চেয়ে ঢের সুখী—তাদের মা আছে, বাপ আছে···যার নেই তার নেই, আলাদা কথা; কিন্তু এ আবাগীর যে থেকেও নেই বাবু। মদের দোকানের সামনে ব'সে হাপুস নয়নে কাঁদছে, কে হাতে একটা প্যাঁজের বড়া দিয়ে গেছে, হাতেই আছে, ওই এক বুলি—বাবা গো, ওগো বাবা গো! বললাম, কোথায় তোর বাবা? মুখের পানে সে যে কি ফ্যালফ্যাল চাওয়া—পাষাণও গ'লে যায় দেখলে। ওর তো মুখে রা নেই, একটা ভিখিরীর মেয়ে এঁটো খুঁটে খাচ্ছিল, বললে, বলছে, ওর বাপ ওই মদের দোকানটায় সেঁধেচে গো। বলনু, খা এসে, তা···কি যে হ'ল মনে বাবু!···ইচ্ছে করল, সে আঁটকুড়ীর সন্তানের কাঁচা মাথাটা যদি—

লোকটা একদমে অনেকগুলা কথা বলিয়া যেন ক্লান্ত হইয়া একটু চুপ করিল, কপালের উপরের চুলগুলা খামচাইয়া অল্প অল্প ধুঁকিতে লাগিল।

বলিলাম, ওর বাপ তোমার যেন কেউ হয় ব'লে—

লোকটা ঝাঁকড়া চুলগুলা নাড়িয়া একটু উগ্রভাবেই আমার পানে ঘোলাটে চোখে চাহিয়া বলিল, ওর বাপ নেই বাবু, দয়া ক'রে তার নামটা আর করবেন না আমার সামনে। ওকে তো তাই বলনু, নেই তোর বাপ, মরেছে, নইলে তোকে এক শহর থেকে এই ভিখিরীর দলে ফেলে রাখে? আর থাকলেই কি উবগার হবে তোর সে বাপ দিয়ে? সে শালা মরুক, মরুক, মরুক সে শালা—

মেয়েটা হঠাৎ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। লোকটার

ভাব সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া গেল, তাড়াতাড়ি মাথাটা বুকে চাপিয়া বসিয়া বসিয়া দোলা দিতে দিতে অসীম দরদভরে বলিতে লাগিল, না না, আছে তোর বাপ—সোনা আমার, মানিক আমার, বাবা আছে রে—এই তো আমি রয়েছি, নয় আমি তোর বাপ?' বলবি নি বাপ আমায়?

রহস্যটা বাড়িয়াই যাইতেছে। মেয়েটি ভাইঝি সম্বন্ধের নয়, কেন না, তাহা হইলে উহার বাপকে 'শালা' বলিয়া গাল পাড়িত না; নাতনী-জাতীয়ও নয়, তাহা হইলে আর বাপ হইতে যাইবে কি করিয়া। ভাবিবারও অবসর দিতেছে না। ইহা ঠিক যে, মেয়েটার বাপ লোকটার পরিচিত, খুবই সম্ভব প্রতিবেশী—কোন মাতাল প্রতিবেশী। দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও হইতে পারে, যে স্তরের লোক বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে ভাই সম্পর্কের লোককে রাগ বা আক্রোশের মাথায় শালা বলা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু হউক নিম্নস্তরের, লোকটার প্রাণ আছে—নিজের পেটে অন্ন নাই, নিজের মুখের গ্রাস মেয়েটির মুখে তুলিয়া দিয়াছে। মেয়েটার গায়ে যে নূতন জামাটা, রাস্তার ধার হইতে কেনা হইলেও টাকা দেড়েকের কম নয় এই বাজারে। নিজের গায়ে ন্যাকড়া, তবুও—

চিন্তার মধ্যেই আমি হঠাৎ যেন ধাক্কা খাইয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম, মেয়েটা সত্যই বদ্ধ এক পাগলের হাতে পড়ে নাই তো? গোড়ায় একটু লাগিয়াছিল ধোঁকা, আবার সেটা কাটিয়া গিয়াছিল, এবার কিন্তু ধারণাটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা যেন পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল। কথার বেশ বাঁধুনি নাই, বেশ বলিয়া যাইতেছে, হঠাৎ মাঝখানে এক-একটা কথা অসংলগ্ন বেখাপ্পা; বলার ভঙ্গীও সেই রকম, কতকটা স্পষ্ট, কতকটা অর্দ্ধস্পষ্ট, কতকটা একেবারেই যেন জিবে জড়াইয়া যাইতেছে। হয়তো অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা; কিন্তু সেখানেও যে পাগলামিরই লক্ষণ—সমস্ত দিন খায় নাই, অথচ আহার্য দিতে গেলে পা জড়াইয়া বারণ করে। যতই ভাবিতে লাগিলাম, আন্দাজটা ততই যেন পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। পাগলই, এখন যে ভাবেই হউক, আর যে কারণেই হউক, এই মেয়েটার উপর ঝোঁক গিয়া পড়িয়াছে, ওকে বাঁচাইতে হইবে—শুধু বাঁচানো নয়,

ভাল পরাইয়া, ভাল খাওয়াইয়া বাঁচানো। যে করিয়াই হউক একটা জাম্ম সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে, সমস্ত দিনে আহার্য যেটুকু যোগাড় হইয়াছিল উহারই মুখে তুলিয়া দিয়াছে। এ ঝোঁকের কারণ অনেক রকমই হইতে পারে, এ মহামারীর বাজারে তো অপ্রতুল নাই, হয়তো প্রাণের চেয়ে প্রিয়তম নিজের সন্তানটিকেই হারাইয়াছে,—বস্ত্র নাই, অন্ন নাই, অসহায়-ভাবে চাহিয়া দেখিয়াছে, জঠরের অগ্নি তাহারই চোখে নীচে তাহাকে তিল তিল করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিল। পাগল করিয়া দেওয়ার দৃশ্য নয়? যদি নিজের নাই হারাইয়া থাকে তো রাস্তার দুই ধারে প্রতিদিনের প্রতি-মুহূর্তের দৃশ্যও কি যথেষ্ট নয়? মনে পড়িয়া গেল, আজ হাওড়ার পুলের সামনে একটি দৃশ্য—একটি ভদ্রলোক, প্রকৃতই শিক্ষিত ভদ্রলোক ট্রামের প্যাভিলিয়নের নীচে দাঁড়াইয়া ভগবান হইতে আরম্ভ করিয়া বড়লাট, মন্ত্রী, পেয়াদা, হিটলার, রুজভেল্ট, টোজো—একধার হইতে সকলকে গাল পাড়িয়া যাইতেছে—ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, যখন যে ভাষায় জোর পাইতেছে। সোজা গালাগাল নয়, গালাগালের লেকচার, রীতিমত বাগ্মিতা। লোক জড়ো হইয়া গিয়াছে, গলার কপালের শির ফুলাইয়া গালাগাল দিয়া যাইতেছে। দুইজন পুলিস লইয়া একটা সার্জেণ্ট ভিড় ঠেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রলোকের চেহারাটা একেবারে বদলাইয়া গেল—রাগের ভাবটা আছে, তবে তাহার সঙ্গে গুরুগাম্ভীর্য। সার্জেণ্ট কিছু বলিবার পূর্বেই তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিল, You are late, mind you! (দেরি ক'রে ফেলেছ, মনে থাকে যেন!) সঙ্গে সঙ্গেই বিচারকের ব্যাণ্ড অর্থাৎ গলাবন্ধের মত করিয়া রুমালটা গলায় ঝুলাইয়া বিচারকেরই দৃপ্ত ভঙ্গীতে একজন মাড়োয়ারী দর্শকের পানে দেখাইয়া বলিল, Swear him—the profiteer first; I hold my court here (আমি এখানে আদালত করছি, আগে এই মুনাফা-রাক্ষসকে শপথ করাও।)

ততক্ষণে পুলিস দুইটার সম্বিৎ হইয়াছে, কিছু না বুঝিলেও বেটন তুলিয়া অগ্রসর হইল। সার্জেণ্ট বলিল, মারো মট্‌, পাগলা হ্যায়, ঘর চালান দেও।

শুধু তো দেহের বিনাশ নয়, উৎকট অমানুষিক দৃশ্যে কত মস্তিষ্কও

যে এ রকম বিকৃত হইয়া যাইতেছে, কে তাহার হিসাব রাখে! এ শিক্ষিত নয়, বিচারের কথা বোঝে না, আত্মলোপের বিকারে মাতিয়া উঠিয়াছে।

বোঝা গেল।

কিন্তু একটা কথা, পাগলের হাতে এ রকম একটা কচি মেয়েকে তো ছাড়িয়া দেওয়া নিরাপদ নয়; এখন ঝোঁক ধরিয়াছে বাঁচাইবার, যে-কোন মুহূর্তেই কিন্তু সেটা যে আছাড় মারিবার ঝোঁকে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। রহস্যের চিন্তা ছিল, রহস্যটা কাটিয়া গিয়া একটা দুশ্চিন্তা আসিয়া জুটিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, শেষে ঠিক করিলাম, কোন প্রকারে মেয়েটিকে উদ্ধার করা যাক আপাতত, তাহার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা ব্যবস্থা করা যাইবে, থানায় দাখিল করিয়াই দিই, বা অনাথ-আশ্রমেই ভর্তি করিয়া দিই, কিছু একটা ব্যবস্থা হইবেই।

বলিলাম, তোমার মনটা যে কত দরাজ, কর্তা, যতই ভাবছি যেন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমাদের ভদ্দরলোকদের মধ্যেও এতটা দয়া-মমতা চোখে পড়ে না আজকাল, কে কাকে দেখছে বল? বেশ বেশ, এই রকম আমরা যদি পরস্পরকে না দেখি তো বাঙালী জাতটা টেঁকবে কি ক'রে এ দুর্দিনে? বাইরের লোকদের দরদ তো দেখতেই পাচ্ছি; বড় আনন্দ হ'ল; নিজে না খেয়ে, না প'রে—

গোঁজড়ানো মুখ দিয়া 'উহু' করিয়া একটা আওয়াজ হইল, মুঠাটা চুলের ঝুঁটিটাকে আরও একটু জোরে যেন খামচাইয়া ধরিল। মনে হইল, ওষুধ যেন লাগিতেছে।

বলিলাম, ভগবান তোমার ভাল করবেন বাপু; নিশ্চয় করবেন, তাঁর কাছে তো আর ইতর-ভদ্র নেই। কিন্তু আমি একটা কথা বলছি, মেয়েটিকে তুমি এ রকম ভাবে কাঁহাতক নিয়ে ঘুরবে বেড়াবে ঘাড়ে ক'রে? আমি বলি কি, আমার এখানে না হয় রেখে দাও, ছেলেমানুষ এক মুঠো খাবে, থাকবে, তোমার যখন খুশি এক-একবার ক'রে দেখে যাবে। একটা কচি মেয়ে, চোখে পড়ল, আমাদেরও তো একটা-দেখা উচিত।

'উফ' করিয়া আবার একটা শব্দ, বেশি টানা, সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা ঝাঁকানি, যেন নিজের মাথাটাকেই নিজে একটা নাড়া দিল। আশা হইল, প্রস্তাবটা উহার পক্ষে কষ্টকর হইলেও বোধ হয় রাজি হইবে। হঠাৎ খেয়াল হইল, এই সময় যদি পেটে কিছু পড়ে তো বোধ হয় মাথাটা একটু ঠাণ্ডাও হইতে পারে, উহারই মধ্যে একটু ভাবিয়া দেখিবার শক্তি আসিতে পারে। বলিলাম, আর এক কাজ কর, তুমিও এক মুঠো কিছু খেয়ে নাও, বামুনের বাড়িতে এসে পড়েছ, খালি পেটে ফিরে যাবে? নিজের পেট কেটেও তো লোকেদের দিতে হচ্ছে যা হয় কিছু, তুমি একটা ভাল লোক, অভুক্ত গেলে—

ছেলেটাকে ডাকিয়া বলিলাম, ওরে, এক মুঠো ভাত, একটু ডাল, আর যা হয়েছে একটু নিয়ে আয় তো একটা কিছুতে ক'রে শীগগির; আর এক ঘটি জল।

লোকটা হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া জামরুল গাছের নীচে দুইটা নেবুর ঝাড়ে অন্ধকারটা যেখানে আরও গাঢ় হইয়া গিয়াছে সেই দিকটায় দুই-তিন পা আগাইয়া গেল—মেয়েটাকে ছাড়িয়াই। সঙ্গে সঙ্গে আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া মেয়েটাকে বাঁ কোলে তুলিয়া লইল, যেন হঠাৎ বেহাত করিয়া ফেলিতেছিল; তাহার পর গটগট করিয়া ঝোঁপের দিকে চলিয়া গেল—মনে হইল, পকেটে একটা ভারী গোছের কিছু ছিল, যেন বেশ ভাল করিয়া মুঠাইয়া ধরিয়াছে। ঘরের একটু কোণ পড়ে, তাহার ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিরতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার। ইচ্ছা হইল, যাই পিছনে পিছনে; কিন্তু গাটা ছমছম করিয়া উঠিল। পকেটে কি? ছুঁড়িয়া মারিবে না তো, আরও সাংঘাতিক কিছুও হইতে পারে—পাগলের কাণ্ড। বোধ হয় মিনিট দুই-তিন আমি একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াই বসিয়া রহিলাম। লোকটা যায় নাই, খড়খড় করিয়া একবার শব্দ হইল, তাহার পরই মেয়েটা 'ও বাবা গো' বলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ছেলেটা আমার একটা লণ্ঠন হাতে ভাত লইয়া আসিতেছিল, বলিলাম, 'শীগগির এস, আলো চালিয়ে।

ছেলেটার হাত থেকে লণ্ঠন লইয়া অগ্রসর হইব, দেখি, ঘরের

কোণ ঘুরিয়া লোকটা চলিয়া আসিতেছে, কোলে মেয়েটা, সেই রকম বিহ্বল স্তম্ভিত দৃষ্টি, বোধ হয় আরও বেশি।

পা দুইটা এবার আরও টলিতেছে, পকেটে ইট-পাটকেলও নয়, রিভলভারও নয়, লণ্ঠনের আলোয় নিজের উপরার্ধটা নিঃসংশয়ভাবে প্রকাশ করিয়া একটি বোতল। মদের গন্ধেও হাওয়াটা হঠাৎ বোঝাই হইয়া গেছে।

বাঁ কোলে মেয়েটাকে ভাল করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝড়ে-টলানো তালগাছের মত খানিকটা টলিয়া লইয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর রক্তাভ চক্ষু দুইটা আমার মুখে ন্যস্ত করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, ভদ্দলোক! আর আমরা হলুম ইতোর! কেয়া মেরা ভদ্দলোক রে! মদ টেনে নিজের পেটের মেয়েকে পথে বশ'স্তে রেখেসি—ভদ্দলোকের কাশে বিচার চাইতে এলুম—দু ঘা দে উত্তমমধ্যম ক'রে, তা না, কুটুম-আদরে এককাঁশি ভাতের ব্যবস্থা—বড়া আমার ভদ্দলোক—ছোঃ ছোঃ! চল্ বেটী—

একটা ঝাঁকানি দিয়া ঘুরিয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পরেও কিছু বলিবার আছে, তবে সেটা শুনিতে কি রকম হইবে জানি না।

দুঃখিত হই নাই মোটেই, বরং সেদিন যতক্ষণ জাগিয়া ছিলাম, মনটা খুবই প্রফুল্ল ছিল। একটু আশ্চর্য, কিন্তু কথাটা সত্য। আজ কয় মাস ধরিয়া 'ফেন দাও মা'-র একঘেয়ে শব্দের মধ্যে একটা অভিনবত্ব অন্তত একটা লোকের ভিতর চোখে পড়িল, যাহার ভিক্ষা চাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই, নেশা করিবার মত মনের অবস্থা আছে, নেশা করিবার মত ফালতু পয়সাও আছে, মৃতের গাদার মধ্য দিয়া যে নিজের খেয়াল লইয়া নিজের পথ ধরিয়া যাইতে পারিতেছে। আপনাদের খারাপ লাগিতেছে নিশ্চয়, জানি লাগিবেই। একটা মাতাল যে আমার মনে সে রাত্রে কতবড় একটা স্বস্তি আনিয়া দিয়াছিল, আমার মনকে অষ্টপ্রহরব্যাপী একটা উৎকট চিন্তা হইতে কি অদ্ভুতভাবেই না কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্তি দিয়াছিল, সে কথা আমি কি করিয়া বুঝাইব আপনাদের?

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাংলা প্রবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাঁচ

অনেকগুলি সংস্কৃত বাক্যাংশ এত প্রচলিত যে সেগুলি প্রায় বাংলা প্রবাদ হইয়া গিয়াছে; যেমন—'শুভস্য শীঘ্রম্', 'মধুরেণ সমাপয়েৎ', 'গতস্য শোচনা নাস্তি', 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ', 'নারাণাং মাতুলক্রমঃ', 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী', 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি বাক্য আবার সংস্কৃত হইতে বাংলায় আসিবার সময় কিঞ্চিৎ বেশ-পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে; যেমন 'কা কস্য পরিদেবনা' বাক্যটি 'কা কস্য পরিবেদনা' হইয়া অধিকতর সুবোধ্য ও সচল হইয়াছে। আরও কৌতুককর পরিবর্তনের উদাহরণ হইতেছে—'একেন পাপ, শতেন পাপ', 'আপ্তচ্ছিদ্র ন জানাতি পরচ্ছিদ্র পদে পদে', 'মুখেন মারিতং জগৎ', 'ন চাষা সজ্জনায়তে', 'গয়ংগচ্ছরূপে চলা', 'মূর্খস্য নাস্ত্যোষধম্' স্থলে 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্', 'কতরং বা ভাবষ্যাতি' স্থলে 'কত রম্ভা ভাবিষ্যতি, আরো কিবা আছে গতি' প্রভৃতি আধা-সংস্কৃতের টুকরা, অথবা সংস্কৃত ও বাংলার অপূর্ব ও সরস খিচুড়ি। আবার কতকগুলি বাংলা প্রবাদ স্পষ্টই সংস্কৃতের অনুবাদ, যেমন—

মাথা নেই তার মাথাব্যথা,—শিরো নাস্তি শিরোব্যথা ॥

দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল,—

দুর্ভিক্ষমল্পং স্মরণং চিরায় ॥

আশা আশা পরম সুখ, নিরাশাই পরম দুখ,—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরম সুখম্ ॥

বৃহন্নলা সারথি যার, পরাজয় কোথা তার,—

বৃহন্নলা রথী যস্য কুতস্তস্য পরাভবঃ ॥

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা,—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ ॥

কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো নয়,—

কুপুত্রাঃ কুত্রচিৎ সন্তি ন কদাপি কুমাতরঃ ॥

এক চাঁদে জগৎ আলো,—একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ॥

এক চাকায় রথ চলে না,—যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ ॥

দুধ দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম ছাড়ে না আপন জাত,—

পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে ॥

এই ধরণের কতকগুলি প্রবাদ, ঠিক অনুবাদ না হইলেও, প্রাচীন ভাবের প্রতিধ্বনি করে। যেমন—

জামাইয়ের জন্যে মারে হাঁস, গুষ্টি শুদ্ধ খায় মাস॥

এই প্রবাদ-বাক্যে 'জামাত্রর্থং শ্রপিতস্য সূপাদেরতিথ্যুপকারকত্বং' এই লৌকিক ন্যায়ের ২৪ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। কিন্তু মনে হয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে পণ্ডিতেরাও যেমন কতকগুলি সংস্কৃত বাক্যকে বাংলা করিয়াছেন, তেমনই কতকগুলি বাংলা বাক্যকেও চলিত সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছেন। যেমন—

চালে ফলে কুষ্মাণ্ড, হরির মায়ের গলগণ্ড॥

এই প্রবাদ-বাক্যকে বেবাক্ পণ্ডিতী সংস্কৃতে করা হইয়াছে—

চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং হরিমাতুর্গলে ব্যথা॥

এইরূপ হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষা হইতেও অনেক প্রবাদ-বাক্য হয়ত বাংলায় গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কতদূর বা কিভাবে হইয়াছে, তাহার আলোচনা হয় নাই। তবুও মনে হয়, এমন অনেক বাংলা প্রবচন আছে, যাহা ভাষান্তর হইতে আপন বেশে বা ছদ্মবেশে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বাংলা প্রবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যাইতে পারে। পরিচিত পৌরাণিক ঘটনা, বস্তু বা ব্যক্তি উপলক্ষ্য করিয়া বাংলার বহুসংখ্যক প্রবাদ-বাক্য বা বাক্যাংশ প্রচলিত আছে, যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবাদের মধ্যে আমরা পাই—রামায়ণ-বিষয়ক—

একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব তার দোসর॥
আজ মরে লক্ষণ, ওষুধ দেয় কখন॥
রাম মারলেও মারবে, রাবণ মারলেও মারবে॥
রাম না হতে রামায়ণ॥
এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যা॥
কালনেমির লঙ্কাভাগ॥
কোথায় রাম রাজা হবে, কোথায় রাম বনবাসে যাবে॥

---

২৪ সংস্কৃত লৌকিক ন্যায় ঠিক প্রবাদ নয়। যেমন, আধুনিক Hobbesian রাজনীতি war of every man against every man in a state of nature প্রতিফলিত হইয়াছে 'মাৎস্য ন্যায়ে'—এক মাছ অন্য মাছকে খাইয়া ফেলে,—কিন্তু ইহা প্রবাদ নয়।

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট।
লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট॥
সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই॥
যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ॥
রাবণের দোষে সমুদ্র-বন্ধন॥
রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই॥
রামের বাণে মরি সেও ভাল, বাঁদরের দাঁতখিঁচুনি সয় না॥
রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি॥
ঘরের শত্রু বিভীষণ॥
লঙ্কায় সোণা সস্তা॥
লঙ্কায় গেলেন দারিদ্রা, নিয়ে এলেন হরিদ্রা॥
আমার ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পনখা।
ধরামাঝে এমন জোড়া পারিস যদি দেখা॥
লঙ্কা বহুদূর॥
লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হলো॥
লঙ্কায় বাণিজ্য ক্ষেতের কোনা॥
কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা॥
রাবণের পুরী ছারখার॥
ঘরসন্ধানে রাবণ নষ্ট॥
যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরবে সীতা ঘুচবে দুঃখ॥
রাজ্য পেল রামচন্দর, কলা খেল যত বান্দর॥
এই যদি তোর ছিল মনে তবে সাগর বাঁধলি কেনে॥

তেমনই মহাভারত ও পুরাণ অবলম্বনে—

যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে॥
মহাভারত অশুদ্ধ হবে না॥
সখা যার জনার্দন, তার সঙ্গে সাজে রণ?
বৃহন্নলা সারথি যার, পরাজয় কোথা তার॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল, শল্য হ'ল রথী।
চন্দ্র-সূর্য্য অস্ত গেল জোনাকি ধরে বাতি॥
এক পালি ধানে মহাভারত॥
তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে॥
কানু ছাড়া গীত নেই॥
মা বিইয়ে কানাইয়ের মা॥

কত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিণী॥
রাজার নন্দিনী প্যারী, যা করে তা শোভা পায়॥
নিজের ধন পরকে দিয়ে, দৈবকী বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে॥
যশোদা কি ভাগ্যবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী॥
নাম কিনলেন যশোদারাণী, কুঁতিয়ে মল দৈবকী॥
সবে মিলে খাবে ননী, ধরা পড়বে নীলমণি॥
সবাই সতী কবলায় ধরা পড়েছে রাধা॥
দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা॥
শিবের ষাঁড়কে কি বাঘে ধরে না॥
শিব গড়তে বাঁদর॥
সাপ মারলে শিবকে লাগে॥
শনির দৃষ্টি নাহি নড়ে, গণেশের মাথা খসে পড়ে॥
শবের দুঃখে শিব কাঁদে॥
থাকে যদি চূড়ো বাঁশী, রাধা হেন মিলবে দাসী॥
কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একজন॥
যেমন দেবা, তেমনি দেবী॥
লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মীছাড়া, শঙ্কর ভিখারী॥
কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন॥
লক্ষ্মীর ঘরে কালপেঁচা॥
যেমন দেবী, তেমনি বাহন॥
শালগ্রামের ওঠা-বসা॥
তুলসীগাছে কুকুর মুতে, তবু পূজা হয় জগতে॥
রাখালসভাতে যা, রাজসভাতেও তা॥
লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা পায় না॥
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী॥

প্রবাদ-বাক্যাংশ হিসাবে কয়েকটি উদাহরণ—

অগস্ত্যযাত্রা। হরিহর-আত্মা। কংসমামার আদর। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। লঙ্কাকাণ্ড। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা। কুব্জার মন্ত্রণা। খাণ্ডবদাহন করা। গরবিণী রাই। সবেধন নীলমণি। গোকুলের ষাঁড়। চতুর্ভুজ হওয়া। জড়ভরত। জরাসন্ধ বধ। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ। দক্ষযজ্ঞ। ত্রিভঙ্গ মুরারি। দর্পহারী মধুসূদন। লক্ষ্মীর পেঁচা। গোবর-গণেশ। ময়ূর-ছাড়া কার্ত্তিক। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। দাতা কর্ণ। শকুনি মামা। দেবর লক্ষ্মণ। দুর্যোধনের মত জলস্তম্ভ করে থাকা।

লক্ষ্মণের ফল-ধরা। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। বক-ধার্মিক। ধনুক-ভাঙা পণ। পিতামহ ভীষ্ম। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। পূতনা রাক্ষসী। শিবরায়ের সলতে। বিদুরের ক্ষুদ। বিন্দে দূতী। বিশ্বকর্মার ছাঁচ গড়া। বিশকর্মার বেটা বেয়াল্লিশকর্মা। ব্যাস-কাশী। ভূশণ্ডির কাক। নারদের ঢেঁকি। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। মুষল পর্ব্ব। যজ্ঞের ঘোড়া। রামের হনুমান। উদ্যোগ পর্ব্ব। রাবণের চিতা। সদাশিব। রাবণের বোন শূর্পণখা। ব্রজের দুলাল। নাড়ুগোপাল। ঠুঁটো জগন্নাথ। রামরাজ্য। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ। ইন্দ্রের ভুবন। কুরুক্ষেত্র। পরশুরামের কুঠার। কীচক বধ। গন্ধমাদন আনা। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। কানায়ে ভাগনে। জটায়ু পক্ষীর রথগেলা। মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়ে রাখা। গজকচ্ছপের যুদ্ধ।

অনেকগুলি প্রবাদে জাতীয় ইতিহাসের টুকরা রহিয়া গিয়াছে, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। যেমন—

হুসেন শাহের আমল॥
ধান ভানতে মহীপালের গীত॥
কানু ছাড়া গীত নেই॥
পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর (=পাণ্ডুয়ার) খবর॥
মগের মুল্লুক॥
হিল্লী দিয়ে দিল্লী যাওয়া॥
ঘোষের শিং ভেড়ার শিং, তারে বলি কি শিং।
সিংএর মধ্যে সিং ছিল এক গঙ্গাগোবিন্দ সিং॥
দিনে ডাকাতি॥
রাজা নবকৃষ্ণ আর কি॥
ঘোড়ার ক্ষুরে উড়ে গেল পলাশী পরগণা॥
নবাব খাঞ্জা খাঁ॥

তেমনই স্থানীয় ঘটনা, প্রথা বা ব্যক্তিবিশেষের কথা অনেক প্রবাদে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—

হরি ঘোষের গোয়াল॥
গোপাল সিংহের বেগার॥
আগে টাকা দেবে গৌরী সেন॥
রমানাথের এঁড়ে, বইবে না বইতে দেবেও না॥
দেড়বুড়ির ভাড়ানী, চাটগাঁয়ে বরাত॥
একে রামানন্দ, তায় ধুনোর গন্ধ॥

কালে কাণ্ডও পণ্ডিত হ'ল॥
ভুঁইশুন্যে রাজা ক্ষেত্রমোহন॥
কুকুরের বিয়ের লাখ টাকা খরচ॥
উঠল বাই ত কটক যাই॥
নুনের ভাঁড়, তেলের ভাঁড়, তাকে কি বলি ভাঁড়।
ভাঁড়ের মধ্যে ছিল এক নদের গোপাল ভাঁড়॥
উদুখলে ক্ষুদ নেই, চাটগাঁয়ে বরাত॥
কালীঘাটের কাঙালী॥
কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ॥
কুড়ের বাথান বৈদ্যনাথ॥
জগন্নাথের আটকে বাঁধা॥
কালো হাঁড়ি, কেয়াপাত, তবে যাবি জগন্নাথ॥
হাতে কড়ি, পায়ে বল, তবে চলি নীলাচল॥
গৌরচন্দ্রিকা॥

সামাজিক ইতিহাস, স্থানীয় গাল-গল্প বা রসিকতা—যাহাকে ফরাসী ভাষায় বলে blasons populaires,—অথবা প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের কৌতুককর বর্ণনা বা বিদ্রূপ অনেক প্রবাদে স্পষ্ট পাওয়া যায়—

সাজা, বাজা, বেশ, বাংলা দেশে বেশ॥
হনুরে চীন, হুজুতে বাঙ্গাল॥
বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু॥
উত্তুরের মেয়ে, পুবের নেয়ে॥
পশ্চিমে সাধু, পুবে বাবু, মাঝে মাঝে আছে কেবল কতকগুলি হাবু॥
হিঁদুর বাড়ী, মোছলমানের হাঁড়ি॥
মুখুটি কুটিল বর, বন্দ্যঘটি সাদা।
এদের মাঝে বসে আছেন চট্ট হারামজাদা॥
ঘোষ, বোস, মিত্র, এরা কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যান গড়াগড়ি॥
উলোর মেয়ে কুঁদুলী, অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা॥
আমড়া, কুমড়া, ধান, এই তিন নিয়ে বর্দ্ধমান॥
লম্বা কোঁচা, কাছা টান, তবে জানিবে বর্দ্ধমান॥
কলাপাতা, কাঠের আঁটি, এই নিয়ে বৈদ্যবাটি॥
বেটী, মাটি, মিথ্যাকথা, এই তিন নিয়ে কলকাত্তা॥

কলকাতার ছিষ্টি, গড়ে নেই মিষ্টি, তেঁতুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ॥
আঁকুড়া বাঁকুড়াবাসী, মুড়ি খায় রাশি রাশি॥
পোস্ত, টক, কলাইয়ের ডাল, এই তিন বীরভূমের চাল॥
ধান, খুন, খাল, তিন নিয়ে বরিশাল॥
চাল, চিঁড়ে, গুড়ে, তিন নিয়ে দিনাজপুর॥
কুমড়া, কাওরানী, নুর, এ তিন নিয়ে মেদিনীপুর॥
মুখে পান, হাতে চুণ, তবে জানবে মানভূম॥
তরকারিতে দেয় না নুন, বাড়ি কোথা না আমারুণ॥
কালো কাপড়, মাথায় চুল, বাড়ি কোথা না ভাটাকুল॥
দাঁতে মিশি, কাপড় বাসি, বাড়ি কোথা না কুড়মন পলাসী॥
বাঁকা সিঁথে, লম্বা ছোট, তবে জানবে পঞ্চকোট॥
তেল থাকতে রুখু গা, খরসান খাবি ত সামন্তভূম যা॥
রাঁড়, ষাঁড়, সন্ন্যাসী, তিন নিয়ে বারাণসী॥

কতকগুলি এমন প্রবাদ আছে যাহা সাময়িক আচার-ব্যবহার, লোকপ্রথা বা বিশ্বাস না জানিলে বোঝা যাইবে না। যেমন—'কুড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে'—এই বাক্যটি অমাবস্যার হলচালনের নিষেধ হইতে প্রচলিত হইয়াছে।

আষাঢ়ে না হ'লে সুত, হা সুত জো সুত।
ঝোলতে না হলে পুত, হা পুত জো পুত॥

কারণ, আষাঢ়ান্ত বেলা দীর্ঘকালস্থায়ী, তাই সুতা কাটিবার উপযুক্ত ও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। অতিশয় অলস ব্যক্তিকে বুঝাইতে 'গোঁফ-খেজুরে', বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দশজনে ষড়যন্ত্র করিলে 'দশচক্রে ভগবান্ ভূত', নির্বুদ্ধিতার উদাহরণস্বরূপ 'খইয়ে বন্ধনে পড়া' প্রভৃতি প্রবাদ কোন কৌতুককর কাহিনী বা কিম্বদন্তী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পেটভাতায় বেগার দেওয়ার রেওয়াজ হইতে

বেকারের চেয়ে বেগার ভাল॥
বেগার-ঠেলা কাজ॥
অরাজ্যে বামুন বেগার॥
বেগারের দৌলতে গঙ্গা স্নান॥
দিল্লী ও-পার, তু নেই বেগার॥

প্রভৃতি বহু প্রবাদ রচিত হইয়াছে। মুসলমান আমলের কাজী ও কাজীর বিচার সম্বন্ধে প্রবাদগুলি সুপরিচিত। 'চাষা না জানে মদের সোয়াদ'—এই প্রবচন হইতে মনে হয় যে, তখনও ধান্যোশ্বরীর খোলা ভাটির আস্বাদ

গ্রামের মধ্যেও বিস্তৃত হয় নাই। সতীদাহ প্রথা উপলক্ষ্য করিয়াও দুই-একটি প্রবাদ আছে। যেমন, মরণে দৃঢ়সঙ্কল্প মেয়ের সম্বন্ধে—

মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে॥

এই প্রবাদটির উৎপত্তি হইয়াছে, সতীদাহে দৃঢ়সঙ্কল্প গতভর্ত্তৃকার একটি আমের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইবার প্রথা হইতে। ভুল করিয়া কোন কলু বউকে অন্যের চিতায় দাহ করিবার উপলক্ষ্যে, বলপূর্ব্বক সতী-দাহের নিষ্ঠুর প্রথার নিদর্শন রহিয়াছে একটি প্রবাদে—

কার আগুনে কে বা মরে, আমি জাতে কলু॥
মা আমার কি পুণ্যবতী, বলছে—দে' উলু॥

চারিটি প্রধান একাদশী (শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও ভীম) এবং শিবচতুর্দ্দশী ও দুর্গাষ্টমী পালন সম্বন্ধে প্রবাদ রহিয়াছে—

শয়ন উত্থান পাশমোড়া, তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া।
ক্ষেপার চোদ্দ, ক্ষেপীর আট, এই ধ'রে বছর কাট॥

এইরূপ বহু প্রবাদে পুরাতন স্মৃতির বা লোকাচারের চূর্ণ অংশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

বাংলা প্রবাদের বিশেষ রূপ ও রসের কিঞ্চিৎ আভাস উল্লিখিত আলোচনা ও দৃষ্টান্ত হইতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু বাংলা প্রবাদের এত বিভিন্ন দিক আছে যে, সামান্য বিবরণও এখানে সম্ভবপর নয়। জাতির আভ্যন্তরীণ বাস্তব বিবরণ, তাহার ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও রসিকতা, তাহার জীবন্ত ভাষা ও বিচিত্র ভূয়োদর্শন, তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম, বিদ্যাশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষবাস, আচার-ব্যবহার, শাসন-শিক্ষা, সমাজের সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের বৈশিষ্ট্যের যথেচ্ছ চিত্র প্রবাদগুলিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে—যাহা কল্পনার রঙে রঞ্জিত বা ভাব-মাধুর্য্যে অতীন্দ্রিয় নয়, নিতান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তব-বুদ্ধির ঈক্ষণে সরস ও সজীব।

শ্রীসুশীলকুমার দে

ছেলে সাজো

"ছুঁচো বাজে সুই, বোতলটা কই, কেষ্ট যাবে তোরা বাজিবে ওলো"—
কোথা এ যুগের ছাঁটুকুমল, আবতাওয়ায় খোল হে খোল।
এই পঞ্চাশী মন্বন্তরে বাংলা দেশের দুখীদের ঘরে
হারানো প্রবাদ বরবাদ হায়, হারানো প্রবাদ আবাদ হলো।
তখন বলেতে কাঁকর বেছিতে রেশন কথাটা ছিল কি আগে,
নিজের ক্ষেতের ধান খেতে হলে জান কত টাকা সেলামী লাগে?
ঘুষ ও ঘুসকি ভাল অভিধানে চালু হয়ে গেল কে তা বল জানে,
খাজা নাজিমের আমলে এবার শায়েস্তা খাঁ আজেই মান।

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আজ আশ্বিনের বুকে আষাঢ়ের নবঘন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। ছাতের ঘরে জানলার ধারে ব'সে আছি, সামনে আমার জাতকের খাতা খোলা। খেয়ালী প্রকৃতির দাপাদাপি চলেছে আমাকে ঘিরে—আমার মনকে ঘিরে। আমার উদাসীন মন ফিরে চলেছে স্মৃতির সরণী বেয়ে সুদূর অতীতে। গাঢ় বিস্মৃতির যবনিকা ভেদ ক'রে চ'লে গেছি একেবারে অতীতের অন্তস্তলে, যেখানে আমার মানসরচিত রাজ্য প'ড়ে আছে সুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে। সেখানে কত বিরাট প্রাসাদ, জ্যোতির্ম্ময় হর্ম্ম্য, বজ্রমণির দেওয়াল, মরকতের ছাদ। উপবনে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল মূর্চ্ছিত হয়ে নুয়ে পড়েছে মাটির দিকে। ঘরে ঘরে কত নরনারী—বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—আমার নর্ম্ম সহচর, আমার আত্মার সহধর্ম্মিণী তারা, সকলেই ঘোরতর সুপ্তিতে আচ্ছন্ন। স্মৃতির সোনার কাঠির পরশ পেয়ে কত বন্ধু বান্ধবী জেগে উঠতে লাগল, তারই মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল আমার গোষ্ঠদিদির বিষণ্ণ মুখখানি—আমার দুঃখিনী গোষ্ঠদিদি।

আমারা তখন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে গলির মধ্যে একটা নতুন বাড়িতে উঠে গিয়েছি। গলির মধ্যে বাড়িগুলো প্রায় সবই গায়ে-গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি, মধ্যে এক আঙুল পরিমিতও জায়গা নেই। আমাদের বাড়ির ছাতে উঠলে পাশাপাশি প্রায় পাঁচ-ছটা বাড়ির ছাতে যাওয়া যেত। বাড়ি সব পাশাপাশি থাকায় এবাড়ি ওবাড়ির মেয়েদের মধ্যে আলাপচারীও চলত। আমরা তখন নবে গিয়েছি, আশপাশের প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে মায়ের তখনও পরিচয় ভাল ক'রে জমে নি। কৌতূহলসূচক চাহনি ও মাঝে মাঝে উভয় পক্ষ থেকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত দু-চারটে প্রশ্নোত্তর চলছে মাত্র।

মনে পড়ছে, তখন আশ্বিন মাস, পুজোর ছুটি চলছে। নিস্তব্ধ দুপুর-বেলা দুই ভাই ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে ছাতে উঠেছি। পাশের বাড়ির মস্ত

ছাত দেখে লোভ হ'ল; অতি সন্তর্পণে সেখানে গিয়ে ঘুড়ি চড়ানো গেল।

দুপদাপ শব্দ হয়ে পাছে নীচের লোকেরা টের পেয়ে যায়—এই ভয়ে খুব সাবধানেই চলাফেরা করছিলুম; কিন্তু কিছু দূরেই আর একখানা ঘুড়ি উড়ছে দেখে আত্মহারা হয়ে গেলুম। অস্থির চেঁচিয়ে উঠল, ছু—য়ো লাল বুলুক্—কো—ও—ও—ও—, সুতো ছাড়ে না, জুতো খায় এক্—কো—ও—ও—ও—; সুবরে, নীচে পড়, নীচে পড়, মার টান, মার টান—ভো কাট্টা—হো-হো-হো—

জয়ের আনন্দে উল্লসিত হয়ে অস্থিরের মুখের দিকে চেয়েছি মাত্র, এমন সময় সে লাটাইটা ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবা, পাহারাওয়ালা রে! তারপরে এক দৌড় ও তিন লাফে এ ছাত পেরিয়ে নিজেদের ছাতে পালিয়ে গেল।

সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেলুম একজন মেয়ে, ইয়া লম্বা-চওড়া, রংটি ময়লা, মাথার ওপরে চূড়ো ক'রে বাঁধা একরাশ চুল—কোমরে একখানা হাত, দুটি টানা টানা বিশাল চোখে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমার হাতে ঘুড়ি, পালাতে পারি না। অপ্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঘুড়ি নামাতে লাগলুম। মিনিট দুয়েক পরে সে আমার কাছে এসে বললে, তুমি কাদের বাড়ির ছেলে?

পাশের বাড়ির।

ও, তোমরা নতুন ভাড়াটে এসেছ বুঝি?

হ্যাঁ।

যে পালাল, সে তোমার কে হয়?

আমার ভাই।

দেখ, দুপুরবেলায় ওই উঁচু ছাতটায় উঠো না, বুঝলে?

পরের ছাতে উঠে ধরা প'ড়ে এত সহজে পরিত্রাণ পাবার আশা করি নি। আশা করেছিলুম, ধমকধামক—অন্তত কিছু বিরক্তিও সে প্রকাশ করবে। কিন্তু কিছুই না ক'রে বেশ প্রসন্ন মুখেই সে বললে, ওই ছাতের নীচে যে ঘর সেখানে আমার শ্বশুর থাকেন।

দুপুরবেলা তিনি ঘুমোন কিনা, ছাতের ওপরে দুপদাপ শব্দ হ'লে তিনি ঘুমুতে পারবেন না।

সেদিন আর কোন কথা না ব'লে সে নীচে নেমে গেল। এরই দু-তিন মাস পরে এক শীতের দ্বিপ্রহরে মাতে আর গোষ্ঠদিদিতে কথা হচ্ছিল—

গোষ্ঠদিদি বলছিল, দুপুরবেলাটা আর কাটতে চায় না মা। গড়িয়ে গড়িয়ে কিছুক্ষণ কাটাই, তারপরে এঘর-ওঘর ঘুরি, খানিকক্ষণ ছাতে বেড়াই, আবার এসে গড়াই—

মা বললেন, দুপুরে পড় না কেন, গল্পের বই-টই? বেশ কেটে যাবে।

কোথায় পাব মা গল্পের বই? শ্বশুরের লাইব্রেরির আলমারিতে গাদা গাদা সব ইংরিজী বই ঠাসা, একখানিও বাংলা বই নেই। মধ্যে মধ্যে বাংলা বই আনিয়ে পড়ি, রোজ তো আর পাই না।

আচ্ছা, তোমার স্বামী কখনও আসেন?

আসেন বইকি মা। ব্রহ্মচর্য্যটা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন আসেন।—ব'লেই সে হাসতে লাগল। হাসি থামতে বললে, স্বামীর কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না, রাম-লক্ষ্মণ রয়েছে, ওদের সামনে আর—

গোষ্ঠদিদি আমাদের দুই ভাইয়ের নাম রেখেছিল রাম-লক্ষ্মণ। আমি রাম, অস্থির লক্ষ্মণ।

গোষ্ঠদিদির জীবন বিচিত্র। বাংলা দেশের কোন এক অখ্যাত গ্রামে অতি দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। জ্ঞান হবার আগেই তার বাপ মা মারা যায়। মাতুল ছিল, সেও অতি দরিদ্র। তবুও সে অনাথিনী ভাগ্নীকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের পরিবারে পালন করতে লাগল। দু-তিন বছর যেতে না যেতে মামাও মারা গেল। মামী নিজের তিন-চারটে অপোগণ্ড শিশু ও গোষ্ঠদিদিকে নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠল। তাদের অবস্থাও এদের চাইতে খুব উন্নত ছিল না। বরাতে নেহাত অনাহারে মৃত্যু নেই ব'লে মরণ হয় নি। তবু কিন্তু এতদিন চলছিল মন্দ নয়। কারণ নিজের বাড়ি থেকে মামার বাড়ি ও মামার বাড়ি থেকে মামার শ্বশুরবাড়ির মধ্যে পথের দূরত্ব থাকলেও অবস্থার

বৈষম্য বিশেষ কিছু ছিল না। কাজেই স্থানভেদে ব্যবস্থার কিছু ইতর-বিশেষ ঘটলেও তার মধ্যে বৈচিত্র্য কিছু ছিল না। বৈচিত্র্য এল বিয়ের পর।

গোষ্ঠদিদির শ্বশুরঘর ছিল বিচিত্র। ব্রাহ্মণ ছিল তারা। শ্বশুর কোন সরকারী আপিসে বড় চাকরি করতেন, দুশো টাকা পেন্সন পেতেন। আমরা যখন তাঁকে দেখেছি, তখন তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়ে গিয়েছে। ধপধপে সাদা বাবরি চুল ঘাড়ের ওপর লতিয়ে পড়েছে, সেই অনুপাতে লম্বা সাদা দাড়ি। ধুতি ও আলখাল্লা গেরুয়া রঙে ছোপানো। জুতো পায়ে দিতেন না, খড়ম পায়ে দিয়েই পেন্সন আনতে যেতেন।

আমি আর অস্থির এঁর নাম দিয়েছিলুম—পাগলা সন্ন্যেসী।

পাগলা সন্ন্যেসীর দুই ছেলে। বড়কে তিনি বিলেত পাঠিয়েছিলেন লেখাপড়া শেখবার জন্তে। সেখানে সে বছর পাঁচেক রহস্যজনকভাবে কাটিয়ে নামের পেছনে গুটিকয়েক রহস্যজনক অক্ষর জুড়ে ফিরে এসে বর্মায় কি এক রহস্যজনক ব্যবসা করত ও প্রতি মাসে দশ তারিখের মধ্যে বাপকে দুশো টাকা নিয়মিতরূপে পাঠাত। একদিন আমি তাঁকে বড় ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, সে কোথায় থাকে, কি করে, কিছুই জানি না। চিঠিপত্র সেও লেখে না, আমিও লিখি না। গরু আমার বটে, কিন্তু কাদের মাঠে ঘাস খায়, তা জানি না; তবে দুধ নিয়মিত পাচ্ছি, তাতেই খুশি আছি।

পাগলা সন্ন্যেসীর ছোট ছেলে যিনি, তিনিই আমাদের গোষ্ঠদিদির দেবতা। ছেলেবেলাতেই ইস্কুল-টিস্কুল ছেড়ে দিয়ে নেশা করতে শেখে। মা-মরা ছেলে, বাপ কোনদিনই কিছু বলতেন না তাকে। পাগলা সন্ন্যেসী ছিলেন সেই পুরনো দিনের ইংরেজীওয়ালা, তার ওপরে মাসে পাঁচশো টাকা মাইনেওয়ালা সরকারী চাকরে। কলকাতায় প্রায় পনেরো কাঠা জমির ওপর পৈত্রিক ভিটে—লোকে তাঁকে বড় লোক ব'লেই জানত। তাই ষোলো-সতরো বছর বয়েস হতে না হতে ছেলের চরিত্র সংশোধন করবার জন্তে একটি প্রায় সমবয়সী সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ধুমধাম ক'রে ছোট ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

আদিমযুগে মানুষ ছিল যাযাবর। পশু পাখী কীট পতঙ্গ যাবতীয়

প্রাণী যখন নিজেদের বাসা বেঁধে বাস করতে শিখেছে, মানুষ তখনও নিজের নীড়ও বাঁধতে শেখে নি। নেহাত প্রয়োজন ও বিপদ মানুষকে বাসা বাঁধতে শেখালেও অনেকের মনেই এই যাযাবর-প্রবৃত্তির বীজ সুপ্ত থাকে। অনুকূল অবস্থা পেলেই তা জেগে ওঠে। তাই মানুষের ইতিহাসের গোড়া থেকেই দেখা যায়, ঘরের বউ পালাচ্ছে, ঝি পালাচ্ছে, ছেলেপিলে পালাচ্ছে। এর মধ্যে বিস্মিত হবার কিছু নেই, বৈচিত্র্যও কিছু নেই।

একদিন সকালবেলা শয্যাত্যাগ ক'রে পাগলা সন্ন্যেসী দেখলেন, তাঁর ছোট ছেলে সপরিবারে হাওয়া হয়েছে।

এ রকম একটা ব্যাপার বাড়িতে ঘটলে পাড়ার লোকে আইনত আশা করে যে, খুব একটা হৈ-চৈ হবে। কিন্তু পাগলা সন্ন্যেসী এ নিয়ে কোনও অনুসন্ধান, এমন কি কোনও উদ্বেগও প্রকাশ করলেন না। তাঁর একটানা জীবনযাত্রা যেমন চলছিল, তেমনিই চলতে লাগল। তাঁর পুত্রবধূর বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল, তারা পুলিসে খবর দিলে। কিন্তু তাতেও তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষকালে তারা রটাতে লাগল যে, বুড়ো বাড়িখানা বড় ছেলেকে দেবার মতলবে ছোট ছেলে ও তার বউকে কোথায় উড়িয়ে দিয়েছে।

পাড়ার লোকদের তিনি অত্যন্ত তুচ্ছ করতেন ব'লে তারাও তাঁর ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। এই ব্যাপারের পর তারা খোলাখুলি-ভাবেই ব'লে বেড়াতে লাগল,—লোকটা অতি বদমাইশ।

বছর পাঁচ-ছয় এই ভাবে কাটবার পর একদিন সকালবেলায় পাগলা সন্ন্যেসীর নির্জ্জন গৃহকুঞ্জ 'হর হর বোম্ বোম্' শব্দে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

ব্যাপার কি! তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দেখলেন, পুত্র ও পুত্রবধূ ফিরে এসেছে। পুত্র একেবারে মহাদেব, পুত্রবধূ সাক্ষাৎ পার্ব্বতী। পুত্রের কোমরে ন্যাঙট, সর্ব্বাঙ্গ বিভূতিলিপ্ত, হাতে মাথা-সমান উঁচু ত্রিশূল। পুত্রবধূর অঙ্গ গৈরিক শাড়িতে আবৃত, মাথার চূড়া ক'রে চুল বাঁধা, হাতে ত্রিশূল। উভয়ের চক্ষুই রক্তবর্ণ।

পাগলা সন্ন্যেসী তো এই দৃশ্য দেখে পরম পুলকিত হয়ে উঠলেন। বাইবেলের উদার পিতা ছেলের গৃহ-প্রত্যাগমনে উল্লসিত হয়ে সর্ব্বাপেক্ষা

স্থূল মেষশাবকটি বধ করেছিলেন, কিন্তু মেষপালনের কারবার এঁর ঘরে ছিল না, তাই তিনি ছেলের অভিনন্দনে মুরগী বধ করলেন গোটা পাঁচ-সাত। তাঁর এক মুসলমান চাকর ছিল, তাঁর নিজের যা কিছু কাজ সেই করত। সকালবেলা তিনি বউমার হেঁসেলে খেতেন আর রাত্রের রান্না করত এই চাকর—একটি বড় মুরগীর রোস্ট, গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেলের চারপয়সাওয়ালা একখানা রুটি দিয়ে তিনি নিত্য এই রোস্টের সদ্ব্যবহার করতেন।

ছেলে ও বউমা ফিরে আসায় দু-বেলা মুরগী বধ হতে লাগল। বাড়িতে মহোৎসব শুরু হ'ল। ছোট ছেলে যে এমন 'তালেবর' হবে, এ কথা তিনি কোনদিন কল্পনা করতে পারেন নি। গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থের এমন Synthesis ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যেরও সাধ্যের অতীত ছিল।

পাড়ার অধিকাংশ লোকই তাঁকে অপছন্দ করলেও অনেকে কৌতূহল পরবশ হয়ে ছেলে ও ছেলের বউকে দেখতে আসতে লাগল। ছেলে বাবার সামনেই গাঁজা ও চরস ফুঁকতে লাগল সারাদিন, রাত্রে কারণ উড়তে লাগল বোতল বোতল।

এতদূর অবধি চলছিল মন্দ নয়, কিন্তু পুত্রবধূও যখন শ্বশুরের শ্মশ্রু গাঁজার ধোঁয়ায় ধূমায়িত করতে আরম্ভ করলেন, তখন পাড়ার লোকে গালাগালি দিতে লাগল। আমাদের পাগলা সন্ন্যাসী কিন্তু এসব ভ্রূক্ষেপ করতেন না। বেলেল্লাপনা, করুক, কিন্তু ছেলে-বউ যাতে বাড়িতেই থাকে, সে বিষয়ে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি; কিন্তু গৃহাশ্রমে ব'সেই সাধনমার্গে চলবার সর্ব্বরকম সুবিধা পাওয়া সত্বেও একদিন তারা আবার চ'লে গেল।

বছর দুয়েক পরে একদিন পুত্র বাড়ি ফিরে এল, সঙ্গে স্ত্রী নেই। বছর খানেক ধ'রে পেটের নানা রকম অসুখে ভুগে হরিদ্বারে তিনি দেহ-রক্ষা করেছেন। গৃহস্থ ভদ্রলোকের মেয়ে গাঁজা, চরস ও কারণ এই সব দেবভোগ্য জিনিস বেশি দিন সহ্য করতে পারলেন না।

ছেলে বাড়িতে ফিরে সন্ন্যাসীর বহির্ব্বাস অর্থাৎ ল্যাঙট ছেড়ে আবার ধুতি পরাশুরু ক'রে দিলে। স্ত্রীর শোকে অনেকে গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, কিন্তু এ ব্যক্তি স্ত্রীর শোকে সন্ন্যাস ত্যাগ ক'রে গৃহী হবার

দিকে মন দিলে। পাগলা সন্ন্যেসী বছরখানেক ছেলের হালচাল দেখে আবার তার বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

পছন্দ-অপছন্দের বালাই যদি না থাকে, তবে কোনো দেশে কোনো কালে কোনো ছেলেমেয়েরই বিয়ে আটকায় না। পাগলা সন্ন্যেসীর ছেলের বিয়েও আটকাল না। আমাদের গোষ্ঠদিদি শিশুকাল থেকে মনে মনে শিবপূজো করত, তাই প্রজাপতি তাকে শিব জুটিয়ে দিলেন।

গোষ্ঠদিদির যখন বিয়ে হ'ল, তখন তার পনরো-ষোলো বছর বয়স। বাড়ন্ত গড়ন ব'লে তাকে বয়সের চেয়ে অনেক বড় দেখাত। সে সময়ে বারো বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিতে না পেরে কত বাঙালী বাপ-মা যে নরকস্থ হ'ত, একমাত্র চিত্রগুপ্তই তার হিসাব দিতে পারেন। কিশোর বয়সে এই সুন্দরী ধরণী রঙিন স্বপ্নের মতন যখন মেয়েদের মনে অতি সন্তর্পণে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, মেঘমণ্ডিত বর্ষার প্রভাতে ক্ষীণ রবিকরের মত স্তিমিত যৌনচেতনা যখন তার অবজ্ঞাত মানসলোকে ঈষৎ চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে, অজানিত সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎজীবন অনভিজ্ঞ সংসারবুদ্ধির প্রতিফলকে যখন রঙিন হতে থাকে, জীবনের সেই পরম সন্ধিক্ষণে অভিভাবকদের আর্তনাদ—গেল রাজ্য, গেল কূল, চোদ্দ পুরুষ বুঝি নরকস্থ হ'ল রে—অন্তর ও বাহিরের এই বিষম হট্টগোলের মধ্যে গোষ্ঠদিদির জীবনে একদিন সানাইয়ের সাহানা বেজে উঠল।

বিয়ে দিয়ে ঘরে এনেই পাগলা সন্ন্যেসী বউমাকে ছেলের গুণের কথা সব খুলে বললেন। অতীতকালে যিনি তাঁর পুত্রবধূরূপে ঘরে এসেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে তিনি কি নির্বুদ্ধিতা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কয়েকদিন ধ'রে তাকে বিধিমতে তালিম দিলেন।

এদিকে ছেলে নতুন খেলনা পেয়ে দিনকতক খুব খুশি রইল। গৃহাশ্রমে ফিরে এলেও সন্ন্যাসাশ্রমের নেশাপত্র কখনও সে ছাড়ে নি। একলা ঘরে ব'সে নেশা করায় কোন মজা নেই। কিছুদিন যেতে না যেতে সে বউকেও গাঁজা ও মদ খাবার জন্যে জেদ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কিন্তু গোষ্ঠদিদি কিছুতেই নেশা করতে রাজি নয়। শেষকালে

অবাধ্য স্ত্রীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে আবার একদিন সে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেল।

পাগলা সন্ন্যেসী শুনে বললেন, গেছে যাক, আবার ফিরে আসবে, তুমি কিছু ভেবো না বউমা।

এই ইতিহাস আমরা কিছু পাগলা সন্ন্যেসীর মুখে ও কিছু গোঠ-দিদির মুখে শুনেছি।

এই পাগলা সন্ন্যেসী ও তাঁর পুত্রবধূ ছিল আমার ও অস্থিরের প্রাণের বন্ধু। গোঠদিদি আমাকে রাম-ভাই আর অস্থিরকে লক্ষ্মণ-ভাই ব'লে ডাকত। পাগলা সন্ন্যেসী আমাদের রামবাবু আর লক্ষ্মণবাবু ব'লে ডাকতেন। আমরা তাঁকে ডাকতুম পাগলা সন্ন্যেসী ব'লে। তিনি বলতেন, আমার বাপ-মা, ছেলেপুলে, বন্ধু-বান্ধব কেউ আমার আসল নাম ধ'রে ডাকে নি। তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, এই আমার আসল নাম, এই আমার স্বরূপ, এই আমার সারা জীবনের পরিচয়।

একদিন বিকেলে আমরা গোঠদিদির সঙ্গে ব'সে গল্প করছি, এমন সময়ে পাগলা সন্ন্যেসী সেখানে এসে আমাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, আট-দশটা দরজাওয়ালা মস্ত বড় হলঘর। একটি কি দুটি মাত্র দরজা খোলা, সমস্ত ঘরখানাই প্রায় অন্ধকার। দেওয়ালের গায়ে ঘেঁষানো বড় বড় সারবন্দী আলমারিতে বই ঠাসা। এক ধারে একখানা সরু খাট, তাতে বিছানাপাতা। বিছানার চাদর, বালিশের খোল সব গেরুয়া রঙের। খাটের ওপরে বালিশের চারিপাশে অগোছাল-ভাবে একরাশ বই ছড়ানো।

পাগলা সন্ন্যেসী খাটের ওপরে বসলেন। সামনেই মান্ধাতার আমলের পুরনো গোটা দুই সোফা, তারই ওপরে আমাদের বসিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন। ডফ সায়েবের ইস্কুলে পড়ি শুনে ডফ সায়েব সম্বন্ধে, ক্রীশ্চান ইস্কুল ও তাঁদের আমলের ইংরেজ অধ্যাপকদের হালচাল ইত্যাদি অনেক মজার গল্প শোনালেন। ওঠবার সময়ে বললেন, দেখ, তোমাদের সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব হ'ল, তখন রোজ আসবে, বুঝলে ?

পাগলা সন্ন্যেসীর মত সর্ব্ববিষয়ে এমন উদার ও অদ্ভুত লোক আমি

জীবনে ছুটি দেখি নি। আমাদের বয়েস তখন দশ-বারো বৎসর ও তাঁর বয়স সত্তর-বাহাত্তর, অথচ আমাদের সঙ্গে কোথাও কোন বিষয়েই তাঁর বাধত না। আমাদের লাট্টু ঘোরানো, ঘুঁড়ি ওড়ানো, জানোয়ার পোষা প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ আমাদের চাইতে কিছু কম ছিল না। পাড়ার লোকেরা কেন যে তাঁকে বদমাইশ বলত, তা আমরা ভেবে ঠিক করতে পারতুম না। এঁরই বাড়ির ভেতর দিয়ে বিকেলে আমরা লতুদের বাড়ি পালিয়ে যেতুম। তাঁর কাছে আমাদের গোপন কিছুই ছিল না। আমরা কোথায় যাই আর কেমন ক'রে যাই, কি ক'রে ঘাসওয়ালাকে ফাঁকি দিয়ে লতুদের বাড়িতে যাবার ব্যবস্থা করেছি, সেসব শুনে তিনি খুব উপভোগ করতেন আর হো-হো ক'রে হাসতে থাকতেন।

সে সময়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকলেই কথায়-বার্তায় ব্রাহ্মদের খোঁচা দিতেন, কিন্তু পাগলা সন্ন্যেসীর মুখে কখনও ব্রাহ্মদের নিন্দা শুনি নি। ব্রাহ্মসমাজের কথা উঠলে তিনি হেসে বলতেন, ওদের খেয়াল হয়েছে, সমাজ সংস্কার করবে, তা করুক না।

একদিন, বোধ হয় সেদিন শনিবার, বেলা তিনটে হবে, আমরা পাগলা সন্ন্যেসীর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি খাটে আধ-শোওয়া হয়ে কি একখানা বই পড়ছেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি বই রেখে উঠে ব'সে বললেন, এস এস, রামবাবু, লক্ষ্মণবাবু, ব'স, মন আমার তোমাদেরই খুঁজছিল, ঠিক সময়ে এসে পড়েছ।

জিজ্ঞাসা করলুম, কি পড়ছিলেন ?

আরে, সেইজন্যেই তো তোমাদের খুঁজছিলুম। পড়ছি শেলী একলা প'ড়ে মজা নেই ব্রাদার, বড় সুসময়ে এসেছ।

এই ব'লে বই রেখে তিনি উঠে পড়লেন। একটা বেঁটে আলমারি খুলে একটা সজারু-কাঁটার বাক্স বের ক'রে নিয়ে আবার খাটে এসে বসলেন। আমাদের উদগ্রীব দু-জোড়া চোখ বাক্সর ওপর গিয়ে পড়ল। তিনি বাক্স থেকে বার করলেন এক-হাত-টাক লম্বা টকটকে লাল একটা তামার কলকে। কলকে একটা অতি সাধারণ জিনিস, কিন্তু তার এমন সুন্দর রূপ হতে পারে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। সেটাকে হাতে

নিয়ে দেখবার ইচ্ছা হতে লাগল, কিন্তু সাহস ক'রে কিছু বলতে পারলুম না। তারপরে বেরুল একটা মোটা ছোট্ট চন্দনকাঠের চাকতি, একটা সুন্দর ঝিনুকের বাঁটওয়ালা চকচকে ছুরি। তারপরে রুপোর পানের ডিবে থেকে কি কতকগুলো জড়িবুটি বের ক'রে বেছে নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা গোলাপজল দিয়ে টিপতে টিপতে শেলী সম্বন্ধে গল্প বলতে লাগলেন। কি ক'রে তিনি বাড়ির লোকদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বিয়ে করলেন, স্ত্রীর সঙ্গে বনল না, আবার জীবনে নতুন সঙ্গিনী এল। বাড়িঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন কোন্ বিদেশে, তারপরে জলে ডুবে মৃত্যু—উপন্যাসের কাহিনীর চেয়ে চিত্তাকর্ষক কবির সেই জীবন-কথা শুনতে শুনতে আমাদের বালক-মন ব্যথিত হয়ে উঠতে লাগল।

কথার সঙ্গে সঙ্গে হাত সমানভাবেই চলছিল। বেশ ক'রে গাঁজায় কয়েকটি দম লাগিয়ে ঘরের মধ্যে দস্তুরমতন একটি মেঘলোক সৃষ্টি ক'রে পাগলা সন্ন্যেসী আগের বইখানা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলতে লাগলেন, তোমাদের কাছে শেলীর কবিতা পড়ব। ভয় পেও না, আমি বুঝিয়ে দোব, কোন কষ্ট হবে না বুঝতে।

এই ব'লে একটা পাতা বের ক'রে বললেন, এ কবিতাটার নাম Alastor।

প্রথমে তিনি Alastor কবিতাটার ভাবার্থ ব'লে গেলেন, তারপরে সমস্ত কবিতাটি আবৃত্তি ক'রে পড়লেন। এ রকম অসামান্য আবৃত্তি এর আগে আমরা শুনি নি। মেঘগর্জ্জনের মতন সেই কণ্ঠস্বর প্রকাণ্ড হলঘরের প্রতিধ্বনিকে জড়িয়ে নিয়ে গমগম ক'রে আমাদের কানের মধ্যে দিয়ে সমস্ত দেহটাকে ঝঙ্কার দিতে লাগল। কবিতার ভাষা বোঝবার মতন বিদ্যে আমাদের ছিল না, তার ভাবার্থ একটু আগেই শুনেছি মাত্র। শুধু ধ্বনি ও সুর মনের মধ্যে একটার পর একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে লাগল। চোখের সামনে যেন দেখতে লাগলুম, Alastor-এর কবি চলেছে দূরে, সুদূরে—তার অন্তরে যে চেতনা জেগেছে তারই সন্ধানে। চলেছে, চলেছে—কত দেশ, কত মেয়ে এল তার জীবনে, তবুও সে চলেছে বিরামবিহীন। চলতে চলতে জরায় তার দেহ শুকিয়ে গেল। অমন যে সুন্দর কিশোর, তাকে দেখলে তখন

ভয় হয়, চেনা যায় না। তার বুকের মধ্যে যে অতৃপ্তি, দুর্লভকে লাভ করবার যে পিপাসা, তারই আগুন শুধু দুই চোখে ধকধক ক'রে জ্বলছে। গ্রীষ্মের লোকেরা দয়া ক'রে তাকে দুটি খেতে দেয়, সে আবার চলা শুরু করে। পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় সে ঘোরে, লোকেরা মনে করে, সে বুঝি ঝড়ের অন্তরাত্মা, মানুষের রূপ ধরেছে। শিশুরা তাকে দেখে সভয়ে জননীর বুকে মুখ লুকোয়। দুনিয়ার কেউ তার মনের কথা বোঝে না। সকলেই সভয়ে, সবিস্ময়ে বা শ্রদ্ধায় তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে থাকে। শুধু—

Youthful maidens, taught
By nature, would interpret half the woe
That wasted him, would call him with false names
Brother and friend, would press his pallid hand
At parting, and watch him through tears, the path
Of his departure from their father's door.

কত অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য ! সুন্দরে ভয়ালে কি আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ—তারই মধ্যে দিয়ে আমাদের কবি চলল মৃত্যুর দিকে। মুখে তার এক মন্ত্র—

— 'Vision and love'

—I have beheld
The path of thy departure, Sleep and death
Shall not divide us long !

তারপরে একদিন অতি দূর দুর্গম শান্ত সুন্দরী প্রকৃতির ক্রোড়ে তার শ্রান্ত দেহ বিছিয়ে দিলে—শান্তিময়ী মৃত্যু এসে তাকে নিয়ে চ'লে গেল।

পড়া শেষ ক'রে পাগলা সন্ন্যাসী বই বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তার পরে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, তবুও তো Alastor-এর কবির বরাতে—

One silent nook
Was there. Even on the edge of that vast mountain
...that seemed to smile
Even in the lap of horror.

ছিল হে রামবাবু! আমাদের বরাতে যে তাও জোটে না, কি বল?

ব'লেই তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। অন্ধকার হয়ে এলেও স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাঁর চোখ থেকে একসঙ্গে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝর-ঝর ক'রে ঝ'রে পড়ল। আমার চোখও জলে ভ'রে উঠেছিল, অস্থিরের দিকে ফিরে দেখলুম, তার চোখও অশ্রুতে পরিপূর্ণ।

সেদিন থেকে পাগলা সন্ন্যেসীর সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা খুবই বেড়ে গেল। তাঁর কাছে গিয়ে কবিতার আলোচনা হতে লাগল। আলোচনা মানে, তিনি শেলীর কবিতা প'ড়ে আমাদের শোনাতেন আর ব্যাখ্যা করতেন, আর আমরা তার মধ্যে থেকে চটকদার কথা বেছে নিয়ে মুখস্থ করতুম।

একদিন পাগলা সন্ন্যেসী বলেন, আজ রামবাবু, তুমি একটা কবিতা আবৃত্তি কর।

নিজেদের কোন একটা কেরামতি দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে একটু প্রশংসা পাবার ইচ্ছা সর্ব্বদাই মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল। জ্যেঠদিদি আমাদের মুখের সামনে ও আমাদের আড়ালে যার কাছে নিয়ত আমাদের প্রশংসা করত আর বাহাদুরি দিতে থাকত। সে কথায় কথায় বলত, আমার রাম-লক্ষ্মণ ভাই আছে, আমার ভাবনা কিসের? কিন্তু পাগলা সন্ন্যেসী আমাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোন প্রতিসুখকর মন্তব্য করতেন না ব'লে ক্ষুণ্ণ না হ'লেও সে সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেদিন আবৃত্তি করার প্রস্তাব করা মাত্র মনে হ'ল, আজ একটু কায়দা দেখিয়ে দেওয়া যাক তা হ'লে।

ইস্কুলে প্রাইজ-টাইজ না পেলেও প্রাইজের জলসায় আমার খাতির ছিল। প্রায় প্রতি বছরেই প্রাইজের সময় আমাকে একটা ইংরিজী ও

একটা বাংলা কবিতা আবৃত্তি করতে হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে হাততালিও পেতুম, যদিও সে হাততালির অর্থ তখন সম্যক বুঝতে পারি নি।

সে সময়ে বাংলা দেশের সর্বত্রই হেমচন্দ্রের 'বাজ রে শিঙা বাজ ঐ রবে' কবিতাটির খুব আদর ছিল। সভা-সমিতি জমাবার ঐটি ছিল একটি অব্যর্থ বাণ। দু-তিন বার কবিতাটি আমিও আবৃত্তি করেছিলুম। পাগলা সন্ন্যেসী বলামাত্র আমি তড়াক ক'রে উঠে বুক চিতিয়ে এমন চীৎকার ক'রে আবৃত্তি শুরু ক'রে দিলুম যে, বাড়ির ভেতর থেকে গোষ্ঠ-দিদি দৌড়তে দৌড়তে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেল।

আবৃত্তির পর ঘরখানা গমগম করতে লাগল। গোষ্ঠদিদির সঙ্গে চোখোচোখি হতে দেখলুম, তার মুখে চোখে প্রশংসা উপচে পড়ছে।

গোষ্ঠদিদি বাড়ির ভেতরে চ'লে গেল, আমিও কোচে ব'সে পড়লুম। বোধ হয় মিনিট খানেক চোখ বুজে চুপ ক'রে ব'সে থেকে পাগলা সন্ন্যেসী বললেন, কি শিঙে ফোঁকার কবিতা আবৃত্তি করলে হে রামবাবু! ছিঃ, তোমার কাছ থেকে এ আশা করি নি।

ইস! একেবারে দ'মে গেলুম।

এক মুহূর্ত পরে পাগলা সন্ন্যেসী বললেন, আচ্ছা লক্ষ্মণবাবু, এবার তুমি একটা আবৃত্তি কর।

অস্থির উঠে বিনিয়ে বিনিয়ে আবৃত্তি করলে—

"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে
হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে"।

অস্থিরের আবৃত্তি শেষ হতে না হতে পাগলা সন্ন্যেসী ব'লে উঠলেন, বা বা লক্ষ্মণবাবু, তুমি ফুল মার্কস পেলে। ছি ছি রামবাবু, তোমার কাছ থেকে এ আশা করি নি। শেষে কিনা ঐ শিঙে ফোঁকার কবিতা আবৃত্তি করলে!

সজারু-কাঁটার বাক্স বেরুল। গাঁজা টিপতে টিপতে বললেন, এ বিদ্যেটা আমায় ছোট ছেলে শিখিয়েছে। তা না হ'লে আমরা ছেলেবেলা থেকে সরাব-টরাব খাই। গাঁজা খেতে শেখালে আমার ছোট ছেলে আর বউমা—তোমাদের গোষ্ঠদিদির সতীন।

তিন চারটি দম লাগিয়ে কলকেটি উল্টে রেখে পাগলা বয়োসী জিজ্ঞাসা করলেন, লক্ষ্মণবাবু, যে কবিতাটি আবৃত্তি করলে, সেটি কার লেখা ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

ঠাকুর! কোথাকার ঠাকুর ? পাথুরেঘাটার, না জোড়াসাঁকোর ?

জোড়াসাঁকোর।

ও, তা হ'লে দেবেন ঠাকুরের ছেলে হবে। হ্যাঁ, দেবেন ঠাকুরের ছেলেরা খুব তালেবর বটে। বেশ লিখেছে হে ছোকরা—"মাতৃহারা মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব"! ছি ছি রামবাবু, তোমার ওটা কি কবিতা! লক্ষ্মণবাবু তুমি আজ ফুল মার্কস পেয়েছ।

আমাদের বাড়িতে পূজো কিংবা বড়দিনের ছুটির সময় এক ভদ্রলোক এসে দিনকয়েক ক'রে থাকতেন। এঁর নাম ছিল বিপিন চক্রবর্তী। ইনি মফস্বলে সরকারী চাকরি করতেন। বিপিনবাবু ছিলেন কবি এবং সে সময় একখানা কবিতার বইও ছাপিয়েছিলেন, নাম তার বুদ্বুদ।

কবিতা লেখবার ক্ষমতা চক্রবর্তী মহাশয়ের কতখানি ছিল তা বলতে পারি না, তবে তাঁর দূরদৃষ্টি যে খুবই ছিল তা বইয়ের নামকরণ দেখেই বোঝা যায়।

কিন্তু কাব্যপ্রতিভা থাক আর নাই থাক, বিপিনবাবুর প্রকৃতিটি ছিল একেবারে কবির মতন—যা কবিদের মধ্যে-ও দুর্লভ। এক কথায় বলতে গেলে তিনি অতি 'মহাশয় ব্যক্তি' ছিলেন। আমার আর অস্থিরের একটা আলাদা ঘর ছিল। বিপিনবাবু আমাদের বাড়িতে এলে আমাদের ঘরেই তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হ'তে, আর তাঁর সমস্ত কিছু তদারকের ভার আমাদের দুই ভাইয়ের ওপরে পড়ত।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় এবং রবীন্দ্রনাথের একজন মহাভক্ত ছিলেন। সে সময়ে সাহিত্যচর্চা অতি অল্প লোকই করতেন, যাঁরা করতেন তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের রসগ্রাহী লোক খুব কমই ছিল। ব্রাহ্মসমাজের কেউ কেউ এবং ব্রাহ্মসমাজের বাইরে গোনাগুনতি কয়েকজন ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা উপভোগ করা তো দূরের কথা, সকলে তাঁকে গালাগালিই দিত। এমন লোকও আমরা দেখেছি,

যারা অন্ধ সাহিত্যিকদের যে সব দোষগুলোকে গুণ ব'লে কীর্তন করত, সেই সব দোষ রবীন্দ্রনাথের ওপর আরোপ ক'রে তাঁকে গালাগালি দিতে থাকত। এই সব ব্যক্তিগত আক্রমণের সঙ্গে কবিতা সমালোচনার কোন যোগ না থাকলেও রবীন্দ্র-কাব্যের রস গ্রহণ তারা ঐ মাপকাঠি দিয়ে করত। এখন মনে হয়, দেশশুদ্ধ লোক রবীন্দ্রনাথের এমন ভক্ত কি ক'রে হয়ে উঠল!

যাই হউক, রাত্রে ঘুমোবার আগে বিপিনবাবুর সঙ্গে আমাদের কাব্য আলোচনা হ'ত। আলোচনা শুরু হতেই আমরা কায়দা ক'রে শেলীকে এনে ফেলতুম। তারপরে এতদিন ধ'রে পাগলা সন্ন্যেসীর যে সব চটকদার বাক্য আমরা মুখস্থ করেছিলুম, গড়গড় ক'রে বিপিনবাবুর কাছে তা ওগরাতে আরম্ভ ক'রে দিতুম।

আমাদের বয়েসী ছেলেদের মুখে সেই সব বিজ্ঞজনোচিত বাক্য শুনে বিপিনবাবুর চক্ষু একেবারে চড়কগাছে উঠে গেল। আমরা তাঁকে দম নেবার সময় না দিয়ে Episychidion, Prince Alhanase, Ode to Intelectual Beauty, The Revolt of Islam-এর Dedication থেকে ছাকা ছাকা লাইন, যা সব এই রকম সুযোগে ছাড়বার জন্যে মুখস্থ ক'রে রেখেছিলুম, তাই পাগলা সন্ন্যেসীর অনুকরণে আমি আবৃত্তি করতে লাগলুম, আর অস্থির চোখ বুঁজে বুড়ো মানুষের মতন ধরা ধরা গলায় বলতে লাগল, আহা-হা, এর কি তুলনা আছে!

বিপিনবাবু তো খুব খুশি। এমন কি আমাদের হালচাল দেখে ভদ্রলোক দস্তুরমতন ভড়কেই গেলেন। একদিন তিনি মাকে ডেকে বললেন, ঠাকরুন, আপনার এই স্থবির ও অস্থির এরা মহাপুরুষ।

মা বললেন, হ্যাঁ, আমাদের ছলনা করতে এসেছেন!

তিনি হেসে বললেন, দেখে নেবেন আপনি, এদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তখনও জ'মে ওঠে নি। ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে সব গান ছিল তার সুর, বাঁধুনি ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা বুঝতে পারতুম মাত্র। 'কথা ও কাহিনী'র দু-একটা কবিতার সঙ্গে যা পরিচয় হয়েছিল, তা খুব ভাল লাগত; কিন্তু কেন যে ভাল লাগত তা প্রকাশ

করতে পারতুম না। যদিও অন্য বাংলা কবিতার সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে তা অনুভব করতুম মাত্র। আমাদের কাব্যালোচনার মজলিসে বাংলা কবিতার কথা উল্লেখ করবার জো ছিল না। তখনকার দিনে বাঙালীরা হেম, নবীন, মধুসূদনকে—অধিকাংশ স্থলে না প'ড়েই, দেবতা জ্ঞান করত। পাগলা সন্ন্যেসী যখন তাঁদেরই নস্যাৎ ক'রে দিতেন, তখন আর সেখানে রবীন্দ্রনাথের কথা তুলতেই সাহস হ'ত না, রসভঙ্গ হবার ভয়ে।

বিপিনবাবুর সঙ্গে আমাদের ভাব খুব জ'মে ওঠবার পর আমরা তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর কাব্য সম্বন্ধে যে সব কথা শুনতে লাগলুম, তাঁর ছন্দ, তাঁর প্রকাশভঙ্গী, কবিতার বিষয়নির্ব্বাচন ও ব্যঞ্জনা—এই সব কথা পাগলা সন্ন্যেসীর কাছে অতি সন্তর্পণে ছাড়তে আরম্ভ ক'রে দেওয়া গেল, আর পাগলা সন্ন্যেসীর বাক্যাবলী বিপিনবাবুকে গিয়ে বলতে লাগলুম। ফলে উভয় স্থানেই দিনে দিনে আমাদের খাতির বেড়ে যেতে লাগল।

এমনই দিন চলেছে, এরই ফাঁকে ফাঁকে লভুদের বাড়িও যাওয়া-আসা ঠিক চলেছে, এমন সময় একদিন রাত্রে বিপিনবাবু আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'অসময়ে' ও 'দুঃসময়' এই কবিতা দুটি শোনালেন। রবীন্দ্রনাথ যে খুব বড় কবি মনে মনে সে কথা নিশ্চিত স্বীকার করলেও স্রেফ মুরুব্বীয়ানা ক'রে পাগলা সন্ন্যেসীর বুকনিগুলো শোনাবার লোভে বিপিনবাবুর কাছে আমরা সে কথা স্বীকার করতুম না। কিন্তু এই কবিতা দুটি আমাদের মুখ থেকে পাণ্ডিত্যের মুখোস একেবারে উড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল। 'অসময়' ও 'দুসময়' আমাদের এত ভাল লাগল যে, তখুনি দুই ভাই কবিতা দুটি মুখস্থ ক'রে ফেললুম।

কয়েক দিন পরে পাগলা সন্ন্যেসীর কাছে কোন ছুতোয় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলে দুজনে সেই দুটো কবিতা তাঁকে আবৃত্তি ক'রে শুনিয়ে দিলুম।

কবিতা দুটো শুনে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে হক-চকিয়ে চেয়ে থেকে একেবারে উছলে উঠলেন। আহা, অদ্ভুত, অদ্ভুত!

খুব কবিতা লিখেছে হে তোমাদের রবীন্দ্রনাথ। কোনো বাঙালী এর আগে এমন কবিতা লিখতে পারে নি।

চটপট উঠে সাজারকাটার বাক্স নিয়ে এসে গাঁজা তৈরি করতে করতে বলতে লাগলেন, রবীন্দ্রনাথের বই কোথায় পাওয়া যায় আমায় বল তো। ওরা নাটক লিখে বাড়িতে অভিনয় করে শুনেছি, কিন্তু এমন কবিতা লেখে তা জানতুম না।

গাঁজা-টাজা টেনে পাগলা সন্ন্যেসী ভোম হয়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইলেন। তারপর হঠাৎ একবার উছলে উঠে বললেন, আহা হা, কি কথাই বলেছে হে—

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে—

বল না রামবাবু, আমার কি ছাই জানা আছে, তুমি বল, তোমার সঙ্গে আমিও বলি।

কিশোর কণ্ঠের সঙ্গে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর গর্জ্জে উঠল—

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে,
দীর্ঘ ভ্রমণ একদিন হবে অন্ত রে
শান্তি সমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে—

রামবাবু, লক্ষ্মণবাবু এই শেষ বয়সে তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল। তোমাদের এখনও অনেক দূর চলতে হবে। দেখবে জীবনে কত দুঃখ কত ব্যর্থতা, কত অশান্তি আসবে। কারুর মুখেই শুনবে না যে, সে বেশ ভাল আছে। এই জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কে এমন ক'রে বুক ঠুকে আশ্বাস দিতে পারে—

"তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে?"

ভাগ্যে তোমাদের সঙ্গে ভাব হয়েছিল।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

ক্ষণিকা

ভোজ

শিল্পীর শিরে শিল্‌শিল্‌ করে আইডিয়া ;
লেখেন যখন পুস্তক তিনি তাই দিয়া—
উইপোকা কয়, চল এইবার খাই গিয়া।

শরবত

পর্ব্বত বলে, শরবত খেতে চাই,
দারুণ গ্রীষ্মে প্রাণ করে আই ঢাই।
সারা দেহ দিয়া বাহিরায় তার ঘাম
ঝরঝর ধারে ঝ'রে যায় অবিরাম।
সে ধারা নামিয়া এসে
লবণাম্বুতে মেশে—
সমুদ্র বলে, ধন্য পাহাড় ভাই,
তোমারি কৃপায় শরবত খেতে পাই।

মেঘদূত

পয়লা আষাঢ় মেঘ এল অম্বরে !
মনে ভাবি, এরে কোথায় পাঠাই দূত ?
প্রিয়া তো কাছেই আছেন—রান্নাঘরে
পেঁয়াজ-খিচুড়ি করিছেন প্রস্তুত।
কহিলাম মেঘে, চ'লে যাও তুমি ফ্রণ্টে,
দেখে এস সব নিজে ;
ফিরে এসে ব'লো কানে কানে মৃদুকণ্ঠে
সত্য কথাটা কি যে !

"চন্দ্রহাস"

সংবাদ-সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ—মাত্র এই বাইশ বৎসরের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া বঙ্গমাতার যে কয়জন সুসন্তান রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের চিন্তা ও সাধনাকে স্থায়ী ও কার্যকরী রূপ দিয়া বিশ্বের দরবারে স্বদেশ ও স্বজাতিকে চিরসম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা সংখ্যায় খুব নগণ্য ছিলেন না ; আচার্য জগদীশচন্দ্র (১৮৫৮) হইতে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯)—মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ প্রভৃতি নামের সমারোহ! পৃথিবীর যে কোনও দেশে যে কোনও জাতির মধ্যে এতগুলি কৃতীপুরুষ এত অল্পকালের ব্যবধানে অর্থাৎ প্রায় একসঙ্গে কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রায় সব কয়টিই একে একে নির্বাপিত হইয়াছেন। বাঙালী জাতির সাম্প্রতিক মনীষা-দৈন্য ভয়াবহরূপে প্রকট করিয়া শুধু চারিজন চারিদিকপালের মত স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে স্ব স্ব মহিমায় শেষপর্যন্ত বিরাজমান ছিলেন ; ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অরবিন্দ, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্র, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ এবং পলিটিক্স ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সরোজিনী নাইডু। গত ২রা আষাঢ় (১৬ জুন) তারিখে চিত্তরঞ্জনের ঠিক তিরোধান-দিবসে কর্মী ও মনীষী প্রফুল্লচন্দ্র বিদায় লইলেন। বাকি যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের সহিত বাঙালী জাতির কর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ যোগ নাই—অর্থাৎ প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যুতে বাংলা দেশের হৃদয়বরেণ্য সর্বজনমান্য শেষ মহদাশয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিল, বাঙালী সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হারাইল।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন চমকপ্রদ হইলেও শিক্ষাপ্রদ, তাঁহার জীবন আদর্শ জীবন। বিদ্যাসাগরের পর এত বড় আদর্শ গৃহীজীবন আর দেখিতে পাই না। সৌভাগ্যের বিষয়, নিজের জীবনী তিনি স্বয়ং বিস্তৃতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন ; তাহার জন্য আমাদিগকে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা এবং কর্তাভজা ব্যক্তিদের অলৌকিক গালগল্প হাতড়াইয়া ফিরিতে হইবে না। প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর পূর্বে তদানীন্তন 'প্রদীপ'-সম্পাদক

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রফুল্লচন্দ্রের একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করিয়া নিজের পত্রিকায় প্রকাশ করেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। মহাপুরুষের সেই প্রথম জীবনীটিও *Acharyya Ray Commemoration Volume* (Calcutta, 1932)-এ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। আচার্য রায়ের সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে যে জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়, তাহারই উদ্যোক্তাগণ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্নের সভাপতিত্বে এই চমৎকার পুস্তকটি প্রকাশ করেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য জগদীশচন্দ্র, হীরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, Dr. F. G. Donnan, Dr. M. O. Forster, Dr. Gilbert, J. Fowler, রায় বাহাদুর হীরালাল, ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র, Dr. A. R. Normand, Dr. J. L. Simonsen প্রভৃতি সংক্ষেপে প্রফুল্লচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার ও কীর্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র যে কত বৃহৎ ও মহৎ ছিলেন, এই একটি মাত্র স্মৃতি-গ্রন্থে তাহার সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রের রসায়ন-বিজ্ঞানঘটিত দান পৃথিবীর সর্বদেশের বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার লিখিত হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের দ্বারা প্রাচীন ভারতের মহতী কীর্তি পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত ও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, তিনি এই বিভাগে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন শুধু নিজের দানের দ্বারাই নয়; শিষ্যপ্রশিষ্য সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-চর্চার যে আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, বিজ্ঞানানুশীলনকে যে স্থায়ী মর্যাদা দিয়াছেন, তাহাই তাঁহার চরম কীর্তি হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষের আর কোনও বৈজ্ঞানিক নিজেকে এভাবে বিলুপ্ত করিয়া শিষ্যসম্প্রদায়ের কীর্তির মধ্যে বাঁচিতে চেষ্টা করেন নাই। প্রাচীন ভারতে ঋষি-গুরুর গোত্রে গৌরবান্বিত শিষ্যেরা যে ভাবে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, আচার্য রায়-গোত্রীয় বৈজ্ঞানিকেরা তেমনই আজ সারা ভারতবর্ষে খ্যাতি ও মহিমা অর্জনের দ্বারা গুরুকেই জয়যুক্ত করিতেছেন; ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা পৃথিবীর দরবারে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্যবসায়ে বাঙালীকে প্রতিষ্ঠাদান করিবার জন্ম প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনা ও উত্তম তাঁহার অন্ত স্মরণীয় কীর্তি। বাঙালী আজ ঔষধের কারবার, বস্ত্রের কারবার, তৈল-ঘৃত-দুগ্ধের কারবার করিয়া জাতীয় সম্পদ যতটুকু বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে, আচার্য রায়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনা তাহার প্রায় সবটুকুরই মূলে। একমাত্র-চাকুরিজীবী পরান্নভোজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীকে ব্যবসায়ের পথ দেখাইয়া প্রফুল্লচন্দ্র একরূপ নবজীবন দান করিয়াছেন। আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালী যদি কোনও দিন স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, প্রফুল্লচন্দ্রকে সেদিন তাহারা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতে বাধ্য হইবে। তাঁহার একার চেষ্টায় বাঙালী জাতির জীবন ও কর্মের আদর্শ যে অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়াছে, ইতিহাস একদিন তাহার সাক্ষ্য দিবে।

আর্ত ও পীড়িতের সেবাকার্যে তাঁহার নিজের অক্লান্ত চেষ্টা ও অযাচিত দান যদিও বা কোনদিন আমরা বিস্মৃত হই, এই কাজে বাঙালী তরুণ সম্প্রদায়ের সংগঠন-শক্তিকে উদ্রিক্ত করিয়া তিনি যেভাবে বারংবার নানা বিপদের মধ্যে দেশকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইতিহাসের পাতা হইতে তাঁহার সে কীর্তি কোনও দিনই মুছিবে না। একমাত্র তাঁহারই আদর্শে ও চেষ্টায় আর্তসেবার কাজ একটা জাতীয় কাজে পরিণত হইয়াছে। বাঙালীর সেবাধর্মের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র চিরজীবিত থাকিবেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশবাৎসল্য ও স্বজাতিপ্রীতি তাঁহাকে চিরকাল সর্বসাধারণের বরণীয় ও আদরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি যখন বিজ্ঞানের ছাত্রহিসাবে এডিনবরায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই *India before and after the Mutiny* পুস্তকে দেশের পরাধীনতা ও দুরবস্থার জন্ম তাঁহার অন্তরজ্বালা প্রকট হইয়া উঠে। দেশকে স্বাধীন করিবার জন্ম মহাত্মা গান্ধীর ব্রতে সায় দিয়া তিনি খদ্দরবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বদেশী ও খদ্দর প্রচারে বিরত থাকেন নাই। বাঙালী জাতির মস্তিষ্কের অপব্যবহার দেখিয়া তিনি যৌবনকাল হইতেই মর্মাহত ছিলেন এবং ভারতবর্ষে বাঙালীকে প্রতিষ্ঠা দিবার জন্ম পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার

সরল জীবন, অমায়িক ব্যবহার এবং অশনে বসনে অনাড়ম্বরতা তাঁহাকে উচ্চ নীচ সকলেরই আপনার করিয়াছিল। তাঁহার দেশহিতৈষিতা সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র বাঙালী জাতি আত্মীয়-বিয়োগের বেদনা অনুভব করিতেছে। সেই বেদনা আরও মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার অনুরূপ আর কেহ আশে-পাশে নাই বলিয়া। বাঙালী যদি কোনও দিন মানুষ হইয়া উঠে, সেদিন প্রফুল্লচন্দ্রের নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ রাখিয়াই তাঁহারা তাঁহাকে অন্তরের পূজা নিবেদন করিবে—

বাঙালী আজিও সচেতন হইল না। বার বার একই কথা বলিতে বলিতে আমার জিহ্বার জড়তা আসিল, দুঃখ-দুর্দ্দশার একই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইল, আমার যৌবনের শক্তি বার্দ্ধক্যের জড়তায় বিলীন হইতে বসিল—বাঙালী কিন্তু জাগিল না। আমার মুখে একঘেয়ে নিন্দাবাক্য শুনিতে শুনিতে লোকে আমার প্রতি বীতরাগ হইয়াছে, বাঙালী-নিন্দুক বলিয়া আমার অখ্যাতি রটিয়াছে, নানা জনে নানা উপহাস-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমি সঙ্কীর্ণমনা এমন কথাও যে দুই একজন না বলিয়াছে তাহা নয় তবু আমি দুর্ম্মুখের মত কথা বলিতে ছাড়ি নাই। সে কি বাঙালীকে ঘৃণা করি বলিয়া? আমি বাঙালী, সুজলা সুফলা বাংলা দেশকে আমি ভালবাসি। বাঙালী সবল হউক, সুস্থ হউক, আপনার পায়ে আপনি নির্ভর করিয়া দাঁড়াক, ইহাই আমি নিরন্তর কামনা করি। আমার এই আন্তরিক কামনাই আমাকে কটুভাষী করিয়াছে।

—

আমরা গতবারে বাংলা সাহিত্যে রুশ-আতিশয্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাকে কম্যুনিজ্‌ম-বিরোধী আক্রমণ মনে করিয়া সাম্যবাদী নামে সাধারণ্যে পরিচিত একদল ঝানু সুবিধাবাদী আমাদিগকে বুর্জোয়াসম্মত নানা গালিগালাজ করিয়াছেন। সুবিধা-বাদীদের সুবিধাই এই যে, তাঁহাদের উক্তিতে যুক্তির বালাই না থাকিলেও চলে; গোটাকয়েক উপমা এবং খানকয়েক অনুপ্রাস প্রয়োগ করিয়া ইহাঁরা সে-যুগের হাফ-আখড়াই-কবিদের মত জনসাধারণের চিত্ত জয় করিতে চান। বদজোবানের সঙ্গে ঢাকের বাদ্যির চাটি মিশাইয়া already-মাতালদের মত্ততা আনিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। বিলাতী কোম্পানির মারফৎ সাম্রাজ্যবাদীদের মাসিক ঘুষ খাইয়া যাহাদিগকে জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, সাম্যবাদের মন্ত্র যে

তাহাদের মুখে মানায় না, একদিন সত্যকারের সাম্যবাদীরা তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। দেশের লাখো লাখো দরিদ্র যখন অন্নাভাবে মৃত্যু বরণ করে তখন প্রত্যহ সন্ধ্যায় হোটেলে মদের পাত্র হাতে মত্ততা-বিলাস করিতে যাহারা লজ্জিত হয় না, তাহারা যতই কার্লমার্ক্স আওড়াক আর যতই স্টালিনের জীবনী লিখুক, আসলে তাহারা যে সেই পুরাতন মা-কালীর সেবাইৎই আছে তাহাতে সংশয় করিবার মত দুর্বুদ্ধি যেন সাম্যবাদীদের না হয়। কপালের সিঁদুরের ফোঁটাটা লাঙ্গল-কাস্তের রূপ লইলেই কিছু দোষহীন হইয়া যায় না।

* * *

আমাদের গত বারের একটি উক্তিতে সত্যকারের কম্যুনিস্ট বন্ধুরাও বিরক্ত হইয়াছেন। কিছুকাল হইতেই একটা ব্যাপার তাঁহাদের সম্বন্ধে ইহাই লক্ষ্য করিতেছি যে, তাঁহারা প্রতিবাদে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, যুক্তি, দিয়া যুক্তি খণ্ডন করিবার ধৈর্য তাঁহারা ধরিতে চান না। পৃথিবীর একজন প্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক যে বলিয়াছেন, "Bolshevism combines the characteristic of the French Revolution with those of the rise of Islam"—বাংলা দেশের বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে তাহা খুব বেশি করিয়াই খাটে দেখিতেছি। তিনি বলিতেছেন—

But the method by which they aim at establishing Communism is a pioneer method, rough and dangerous, too heroic to count the cost of the opposition it arouses. I do not believe that by this method a stable or desirable form of Communism can be established. Three issues seem to me possible from the present situation. The first is the ultimate defeat of Bolshevism by the forces of capitalism. The second is the victory of the Bolshevists accompanied by a complete loss of their ideals and a regime of Napoleonic imperialism. The third is a prolonged world-war, in which civilization will go under, and all its manifestations (including Communism) will be forgotten....

There is another aspect of Bolshevism from which I differ more fundamentally. Bolshevism is not merely a political doctrine; it is also a religion, with elaborate dogmas and inspired scriptures. When Lenin wishes to prove some proposition, he does so, if possible, by quoting texts from Marx and Engels. A full-fledged Communist is not merely a man who believes that land and capital should be held in common, and their produce distributed as nearly equally as possible. He is a man who entertains a number of elaborate and dogmatic beliefs—such as philosophic materialism, for example—which may be

true, but are not, to a scientific temper, capable of being known to be true with any certainty. This habit, of militant certainty about objectively doubtful matters, is one from which, since the Renaissance, the world has been gradually emerging, into that temper of constructive and fruitful scepticism which constitutes the scientific outlook. I believe the scientific outlook to be immeasurably important to the human race. If a more just economic system were only attainable by closing men's minds against free inquiry, and plunging them back into the intellectual prison of the middle ages, I should consider the price too high. It cannot be denied that, over any short period of time, dogmatic belief is a help in fighting. If all Communists become religious fanatics, while supporters of capitalism retain a sceptical temper, it may be assumed that the Communists will win, while in the contrary case the capitalists would win.

—

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে "সত্যেন্দ্র-স্মৃতি" প্রসঙ্গে শ্রীমমতা ঘোষ লিখিয়াছেন—

আষাঢ় মাস হ'ল। কবি সত্যেন্দ্রনাথকে মনে পড়ে যায় বৃষ্টির আওয়াজে।

এত বড় মর্মান্তিক মিথ্যা এ বাজারে আর কেহই লেখেন নাই। আকাশে এখন পর্যন্ত (আজ ৬ই আষাঢ়) মেঘের ঘনঘটা নাই, এক ফোঁটা বৃষ্টির নামগন্ধ নাই, বাংলা দেশের মাটি 'গুড আর্থের মত চড় চড় করিয়া ফাটিতেছে। এই অবস্থায় কল্পিত বৃষ্টির আওয়াজে সত্যেন্দ্রনাথকে যিনি মনে করিতে পারেন, তিনি কবি সন্দেহ নাই, কিন্তু সত্যবাদী নহেন। আমাদের তো ভয়ই হইতেছে কর্তৃপক্ষ যেভাবে ওয়েদার-রিপোর্ট কণ্ট্রোল করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে কণ্ট্রোলিত ঔষধাদির মূল্যের মত তাপমানযন্ত্রে উত্তাপ হুহু করিয়া চড়িতেছে এবং হরলিক্সের মত বৃষ্টি একদম উধাও হইয়াছে। এখন এই সম্পর্কে একজন অফিসার বসানোর অপেক্ষা মাত্র।

—

'ভারতবর্ষ' আষাঢ়ের প্রথম প্রবন্ধ এস-ওয়াজেদ আলির "বাঙালী না মুসলমান" সকল বাঙালীকে পড়িয়া দেখিতে বলি। ধর্মের দাবির তুলনায় মাটির দাবিও যে তুচ্ছ নয়, ইসলাম-ধর্মশাস্ত্রের নজিরেই ওয়াজেদ আলি সাহেব তাহা বলিতে পারিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

বাংলা সাহিত্যে যে মুসলিম কৃষ্টির সম্যক বিকাশ হয়নি তার জন্য দায়ী হিন্দুরা নন, তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী হচ্ছেন মুসলমানেরা। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে সাহিত্য-বোধ এখনও সম্যক ভাবে জাগেনি। বাঙালী মুসলমান বই কেনেন না, বই

পড়েন না। উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা বাঙলা লেখেন না। এরূপ অবস্থায় মুসলমানের কৃষ্টি, মুসলমানের প্রকাশ-ভঙ্গী সাহিত্যে কি করে প্রবেশ করবে? বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের প্রভাবের অভাবের প্রধান কারণ হচ্ছে—বাঙালী মুসলমানের অবহেলা এবং ঔদাসীন্য। তা ছাড়া গোঁড়ামিও আছে। রাজনীতিতে জোর করে একজন প্রতিভাহীন লোককে ভোটের সাহায্যে মন্ত্রীর পদে কিম্বা অন্য কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা চলে। সাহিত্যে কিন্তু বঙ্কিম কিম্বা রবীন্দ্রনাথের স্থান পেতে হলে, তাঁদের মত দেশের সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করতে হলে, স্বভাবদত্ত প্রতিভার দরকার, অমানুষিক সাধনার দরকার। হুজুক করে আর দল পাকিয়ে এ গৌরব লাভ করা যায় না।

রুশ-সাহিত্যের বর্ণনায় বাঙালী লেখকেরা যে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রশস্তিটুকুতেই প্রমাণিত হইবে। লেখক বাক্যের লাভাস্রোত উদ্গার করিয়াছেন, তবু যেন আসল কথাটি বলা হয় নাই।—

বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে গোর্কির লেখায় অমন সূক্ষ্ম অলংকারিক পারিপাট্য, অমন মাখনের মতো নরম, আবার বজ্র ভংগি,—ঘন সঙ্ঘমসে [?] যেন স্বপ্নি [?] তুলি বীর-ভংগিতে সমুন্নত,—কোনো বাধা গ্রাহ্য সে করে না, কারুর বিধি-নিষেধে কর্ণপাত করবার মতো অবসর তার নেই, সে ঝড়ের মতো উদ্দাম, প্রপাতের মতো দুর্বার, দুর্দান্ত, আবার একই সাথে নির্ঝরিণীর মতো কোমল, স্বচ্ছ।

রাস্তা নোংরা করিলে পাঁচ আইন আছে, অথচ কাগজের এই নিদারুণ অভাবের দিনে বেপরোয়া সাদা কাগজ নোংরা করিয়া একদল ব্যক্তি যে পার পাইয়া যাইতেছে, ইহাতে সরকার বাহাদুরকে কি বলিব?

—

কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস জ্যৈষ্ঠের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে "জাতীয় সাহিত্যের কথা" বলিতে গিয়া একটা বজ্জাতীয় উক্তি করিয়া ফেলিয়াছেন—

হিন্দুসাহিত্যে দেবর-বৌদির চিত্রে দেবর শব্দের প্রথমার্দ্ধের [দে] চাইতে দ্বিতীয়ার্দ্ধের [বর] লীলা বেশী প্রকট বলে মুসলিম সাহিত্যিকের লেখায় অনুরূপ লীলা চিত্রিত হলে হিন্দু সুধীসমাজ তাকে সাহিত্যের মর্যাদা হয়তো দেবেন। কিন্তু হিন্দু-সমাজে দেবর-বৌদির সম্পর্কে লোভনীয় রসের প্রেরণার যতই উৎস থাক না কেন, মুসলিম সমাজে ওদের সম্পর্কে অনুরূপ রসের কোনই অবকাশ নাই।

এই অশোভন উক্তির উপর মন্তব্য করিতে গেলে অনেক পবিত্র সম্পর্ক ধরিয়াই টানাটানি করিতে হইবে, তাহার প্রয়োজন নাই। লেখককে শুধু এই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, জাতীয় সাহিত্যের কথা ইহা নয়।

—

বুদ্ধদেব বসুর মৌলিকতার ক্ষেত্রে কোনও দুষ্টগ্রহের বক্রী দৃষ্টি বরাবরই পড়িয়া আছে; তিনি কবিতা-উপন্যাস লেখেন তাহা অনুবাদ বলিয়া প্রমাণিত হয়, কাব্য-উপন্যাস-গল্পের নামকরণ করেন সেগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তিবিশেষ বলিয়া ধরা পড়ে। তিনি রাগ করিয়া একেবারে চানাচুর-বাদামভাজা সিরিজের "এক পয়সায় একটি" কবিতা বাহির করিলেন। এখন দেখিতেছি, মৃত জেম্‌স জয়েস তাঁহার *Poems Penny Each*-এ সে মৌলিকতাও আগে হইতে মারিয়া বসিয়া আছেন। আমরা দুঃখিত।

—

বীর সাভারকর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে মহাবীর সাভারকর হইয়া বসিয়াছেন, সব ব্যাপারেই দাঁতমুখ খিঁচাইতেছেন। কস্তুরীবাঈ গান্ধীর স্মৃতি-ভাণ্ডারে সকলকে চাঁদা দিতে নিষেধ করাটা এই অকারণ মুখ খিঁচানির একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

—

পাঞ্জাব ধর্মের উপরে জাতীয়তাকে স্থান দিয়া ভারতবর্ষের বৃহত্তম সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করিতেছেন। মুসলিম লীগের সহিত সংঘর্ষে পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীর দৃঢ়তা এবং মুসলমান সদস্যদের সমর্থন লাভ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। অনুরূপ ঘটনা হইতেছে হিন্দু জাঠ মন্ত্রী (লোকাল সেল্‌ফ্‌ গবর্মেণ্ট) সার্‌ ছোটুরামকে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে জাঠসম্প্রদায় কর্তৃক "রহবরে আজম" উপাধি দান। "রহবরে আজম" ও "কায়েদে আজম" একই কথা, অর্থ—যিনি পথ দেখাইয়া লইয়া যান-অর্থাৎ নেতা।

গত ১লা চৈত্র 'তত্ত্ব-কৌমুদী' পত্রিকার ১৮৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস লিখিয়াছেন—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের একবালীন সম্পাদক ('সেক্রেটারি') পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হইলে আপত্তির কোনই কারণ ছিল না, কিন্তু সত্যের খাতিরে প্রতিবাদ করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন না। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ছিলেন। ১৭৮১ শকের বৈশাখ মাস পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন, তাহার পর সভা উঠিয়া যায়। রাজনারায়ণ বসু এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

...এই সময়ে অর্থাভাবে তত্ত্ববোধিনী সভাও অনেক ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছিল। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রবাবুর পরামর্শক্রমে অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে ১৭৮১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে তত্ত্ববোধিনী সভার অবলম্বিত কার্য্য ও তাহার সমুদয় সম্পত্তি ব্রাহ্ম সমাজে অর্পণ করিয়া তাহার শরীরে তত্ত্ববোধিনী সভাকে লীন করিয়া দিলেন।

এই সমাজের প্রথম সম্পাদক হন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন।

সকল বাধা সকল অসুবিধা সত্ত্বেও পুস্তক-প্রকাশের কাজ অদম্য গতিতে চলিয়াছে, মসীজীবী বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ এক্ষেত্রে কিছুতেই হার মানিবে না বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প। এই বাজারে এ এক অভাবনীয় ব্যাপার! গুড্, ব্যাড্, ইণ্ডিফারেণ্ট সকল জাতীয় পুস্তকই প্রত্যহ প্রকাশিত হইয়া প্রমাণ করিতেছে যে, আঁটন বজ্রাদপি দৃঢ় হইলেও গেরো ফস্কাইতে পারে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ৪২নং সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 'গোবিন্দচন্দ্র রায় দীনেশচরণ বসু' বাহির হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবু অনেক যত্নে পূর্ববঙ্গের এই দুই বিস্মৃত কবিকে সকলের গোচরে আনিয়াছেন। "কতকাল পরে বল ভারতরে" গানের লেখকের পরিচয় পাইয়া অনেকে আনন্দিত হইবেন। দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলীর কাজ দ্রুত সমাপ্তির দিকে চলিয়াছে, এই মাসে 'দ্বাদশ কবিতা' ও 'বিবিধ' খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী-সম্পাদিত 'কালিকামঙ্গলে'র ২য় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে 'সঞ্চয়িতা' দুই খণ্ড রবীন্দ্রনাথের কৈশোর হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর পরেও প্রকাশিত যাবতীয় কবিতা ও কাব্য হইতে প্রথম সম্পূর্ণ সঙ্কলন। উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, "আফ্রিকা" পর্যন্ত নির্বাচন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কৃত। সর্বশেষে সংযোজিত "গ্রন্থ-পরিচয়" অংশ অতিশয় মূল্যবান। ইহাতে এমন অনেক সংবাদ আছে, যাহা কৌতূহলী পাঠকের কাজে লাগিবে। শ্রীরাণী চন্দ লিখিত 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথে'র দ্বিতীয় সংস্করণও প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, বইটি এবারে সত্যসত্যই সুসম্পাদিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালায় মাসাধিক কালের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'জমির মালিক', শান্তিপ্রিয় বসুর 'বাংলার চাষী', শচীন সেনের 'বাংলার রায়ত ও জমিদার' এবং অনাথনাথ বসুর 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা' প্রকাশকদের নিষ্ঠা ও তৎপরতার পরিচায়ক।

সুশীল গুপ্ত কর্তৃক ইংরেজী ফরাসী (ইংরেজী অনুবাদে) প্রভৃতি ভাষার বহু প্রসিদ্ধ বিশ্ববিশ্রুত পুস্তকের সচিত্র মনোরম প্রকাশ বর্তমান-কালে বিস্ময়কর। অধিকাংশ পুস্তকের বিষয়বস্তু কিঞ্চিৎ আদিরসপ্রধান হইলেও এই সকল পুস্তকের গল্প বলার ভঙ্গী অপরূপ। অবশ্য *Pastime Tales of a French Cavalier* ও *Three Don Juans*-এর সঙ্গে *Frankenstein* ও ফিট্জেরাল্ডের *Rubaiyat of Omar Khayyam*-ও আছে। Sex Psychology সম্বন্ধে যাঁহাদের ঔৎসুক্য আছে, তাঁহারা *Kama-Sutra of Vatsyayana, Urban Morals in Ancient India* ও *The Art of Love in the Orient* প্রভৃতি পুস্তক হইতে যথেষ্ট রসদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

জেনারাল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড পরিমল গোস্বামী লিখিত নাটিকা-সংগ্রহ 'ঘুঘু' এবং তাঁহারই সম্পাদিত মন্বন্তরী গল্পসংগ্রহ 'মহামন্বন্তর' প্রকাশ করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় আমাদের মনকে একসঙ্গে লঘুহাস্তে এবং গভীর বেদনায় ভরিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া যুগোপযোগী সাম্যবাদের মর্যাদা রাখিয়াছেন।

বেঙ্গল পাবলিশার্স বিনয় ঘোষের 'শ্রীবৎসের নানাপ্রসঙ্গ'

ছাপিয়াছেন। 'বইখানি সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি পলিটিক্স নানাপ্রসঙ্গে লেখা, খুব জোরালো লেখা। নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথে' মুরুব্বিয়ানা একটু অধিক থাকিলেও সুখপাঠ্য। পরিমল গোস্বামীর 'আষাঢ়ে দেশে' এবং নীহার গুপ্তের 'অদৃশ্য শত্রু' ছেলে-মেয়েদের আনন্দের খোরাক জোগাইবে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস 'উপনিবেশে'র প্রথম পর্ব এবং দিলীপকুমার রায়ের নাটক 'শাদা-কালো' প্রকাশ করিয়াছেন। 'উপনিবেশ' ইতিমধ্যেই লেখকের ক্ষমতা সম্বন্ধে পাঠককে নিঃসংশয় ও আশান্বিত করিয়াছে। দিলীপবাবুর নাটকটিতে অনেক গভীর অনুভূতির কথা আছে, অথচ পরিবেশ বাস্তবতাবর্জিত নয়। কথা অত্যন্ত বেশি, সুতরাং অভিনয়ের সম্ভাবনা কম।

দি বুক এম্পোরিয়াম লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত প্রিয়রঞ্জন সেনের 'বাংলা সাহিত্যের খসড়ায়' সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যের কথা গোড়া হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত চমৎকার ভঙ্গীতে বলা হইয়াছে। খসড়া নামটি সার্থক।

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে শুভব্রত রায় চৌধুরীর দ্বিতীয় নাটক 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হইয়াছে। এই নাটকটিতে যে আদর্শের জয় ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা অনুসৃত হইলে বাংলা দেশে নবযুগের উদ্বোধন হইবে সন্দেহ নাই। ভাবাবেগ অধিক, তথাপি নাটকীয়ত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

অভিযান সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ অখিল নিয়োগীর 'গ্রহে-উপগ্রহে' বাংলা দেশের কিশোর-কিশোরীদের যথেষ্ট আনন্দ দিবে।

আরতি এজেন্সি গজেন্দ্রকুমার মিত্রের দাম্পত্যপ্রেমমূলক মিঠা গল্প-সংগ্রহ 'নববধূ'কে চমৎকার বহির্বাস পরাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মিত্রালয় হইতে প্রকাশিত ভূপেন্দ্রনাথ বসু-অনূদিত টুর্গেনিভের 'স্মোক' অনুবাদ-সাহিত্যে নূতন সংযোজন।

আনন্দময়ী বুক ডিপোর রেজাউল করীম লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' পুস্তকখানি কৃতজ্ঞতার সহিত পাঠ করিলাম। লেখকের সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে দুঃসাহসী করিয়াছে। ভবিষ্যতে যদি বাংলা দেশে কখনও হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিন

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এই পুস্তকখানির জন্য রেজাউল করীম সাহেবকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে। সার্ যদুনাথ সরকারের দীর্ঘ ভূমিকা বইটির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (জে. এন. গুপ্ত, আই. সি. এস) প্রণীত 'স্মৃতি ও চিন্তা' পুস্তকখানি এ যুগের সকল বাঙালীকে পড়িয়া দেখিতে বলি। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গ তাঁহার আদর্শবোধ ও সহৃদয়তাগুণে সর্বসাধারণের আদরের জিনিস হইয়া উঠিয়াছে। পড়িয়া নিজের সম্বন্ধেও চিন্তা জাগে।

গুরুপদ হালদারের 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' আমাদের আয়ত্তের অতীত হইলেও গ্রন্থটির বিরাটত্বে মুগ্ধ হইয়াছি।

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের নাটিকাসংগ্রহ 'মীরপুরের মেলা' ও 'বিচিত্র ভাদু' সুলিখিত।

ধীরেন্দ্রনাথ মল্লিকের কবিতাগ্রন্থ 'দূরবীক্ষণ' ও 'নাগরী'তে তরুণ লেখকের শক্তির পরিচয় স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে।

আবুবকরের 'ভোরের আজানে'র বিষয়বস্তু প্রধানত ইসলামীয় হইলেও প্রাণের প্রাচুর্যে সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিবে।

"ছোটদের আসর"-গ্রন্থমালার প্রথম বই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'জীবনের জয়গান'। এই আসরে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ যাদুকর। 'জীবনের জয়গানে' যাদু অক্ষুণ্ণ আছে।

সাহিত্য-গ্রন্থিকা বাংলা সাহিত্যে নূতন উদ্যম। প্রথম গ্রন্থ 'বাংলার কবিগান'—বিস্মৃত লোকসাহিত্যের পরিচয়।

অসিতকুমার হালদারের 'মেঘদূত' কাব্যানুবাদ—আসল সচিত্র পুস্তকের খসড়া মাত্র। কবি-শিল্পীকে একত্র দেখিবার জন্য আমাদের আগ্রহ জাগিতেছে।

আমেরিকান রেড ক্রস কর্তৃক প্রকাশিত কলিকাতা, আগ্রা, দিল্লী, করাচী ও বোম্বাইয়ের গাইড-বইটি পরিব্রাজকদের বহু প্রয়োজন সাধন করিবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

৭

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে দীক্ষালাভ করিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার স্বভাবের ভিতরকার এই বিরোধকে স্বীকার করিতে না চাহিলেও অস্বীকার করিতেও পারেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম হইতেই তাঁহার চরিত্রের এই অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন—সে অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার সেই পৌরুষ-বীর্য্যে; তাঁহার অন্তরের সিংহমূর্ত্তির সেই স্ফুরিত কেশরদাম গুরুকে চমকিত ও চমৎকৃত করিয়াছিল। যে-আত্মার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ", ইহা সেই আত্মার সেই পৌরুষ, তাই ইহা মৃত্যুঞ্জয় মায়াজয়ীও বটে। কিন্তু মায়াকে জয় করিতে হইলে তাহাকে হনন করিতে হয় না—সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া আত্মার ইষ্টসাধন করা যায়। যে-প্রেম সেই মায়ার—সেই ছলনাময়ী প্রকৃতির—বন্ধনপাশ, তাহাই দুর্ব্বলতা, তাহাই মোহ; সে-প্রেম দুঃখকে জয় না করিয়া তাহার অধীন হয় বলিয়াই দুর্ব্বল আত্মার পক্ষে পলায়ন অথবা আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। এই দুঃখকে—কপিল-বুদ্ধের মত—কোন অর্থেই 'অসৎ' বলা যাইবে না; এই দুঃখচেতনা হইতেই অস্তিত্বের চেতনা—জীবন-চেতনা; এই দুঃখ হইতেই নর-জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই প্রেমের জন্ম হয়। জীবন ও জগৎ যদি দুঃখহেতু বলিয়া 'অসৎ' হয়—সেও দুর্ব্বল আত্মার মোহ, একরূপ অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি; সেরূপ অদ্বৈত-জ্ঞানের অভিমান আত্মার আত্ম-প্রবঞ্চনামাত্র। বরং ওই জগৎকে—ওই দুঃখকে সেই এক 'সৎ'-বস্তুর অনুগত করিয়া দেখিতে পারিলেই প্রকৃত অদ্বৈত-সিদ্ধি সম্ভব। বিষ যদি কোথাও থাকে, তবে তাহার সঙ্গে বিষঘ্ন ঔষধও রহিয়াছে; শুধু তাহাই নয়, যে প্রেমের শক্তি দুঃখকে নির্ব্বিষ করিয়া তোলে তাহারও জন্ম হয় ওই দুঃখ হইতে; ওই প্রেম পূর্ণজ্ঞানেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, অতএব উহাও 'সৎ'—অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হইতে পারে না। দুঃখকে

আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি—সে সম্বন্ধে আমাদের যে সংস্কার—আমাদের অজ্ঞান ও অশক্তিই তাহার কারণ।

গীতা বলিয়াছেন—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ", আত্মার দ্বারাই আত্মাকে তুলিয়া ধরিবে, আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না; "আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈবরিপুরাত্মনঃ"—আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই আত্মার শত্রু। ইহার অর্থ, আত্মার মোহই সকল ভয় ও সকল অশক্তির মূল—মোহমুক্ত আত্মার ভয় কি? তাহার মত শক্তিমান কে? সে অবস্থায়, পারমার্থিক হিসাবে জগৎ যাহাই হউক—ব্যবহারিক হিসাবে তাহা সত্য হইলেও ক্ষতি কি? তখন 'আমি'ই একমাত্র সত্য বলিয়া আর সকলই মিথ্যা নয়; বরং সেই 'আমাতে'ই সকলে অবস্থান করিতেছে—ওই 'বহু'ও আমরই 'আমি', এই জ্ঞান দৃঢ় হইয়া থাকে। সেই আত্মজ্ঞানে যখন বুঝি, আমি কে—আমিই বিরাট ও বিশ্বম্ভর, তখন আমার যে আত্মস্ফূর্তি হয়, তাহা ক্ষুদ্র-আমির আত্মম্ভরিতা নয়—আত্মবিস্ফারের আনন্দ; এই আনন্দময় আত্মবিস্ফারের অনুভূতিই জগৎ-অনুভূতি। আমি 'এক'ও বটে, আমি 'অনেক'ও বটে—আমার বিভূতির কি সীমা আছে? দ্বৈত ও অদ্বৈত—দুই তত্ত্বই এক; যেখানে বিরোধ-বোধ আছে সেখানে আত্মারই আত্মজ্ঞানের অভাব—তাহাই মোহ, তাহাই অবিদ্যা। অতএব জগৎকে অস্বীকার করিবার যে জ্ঞান-বিজৃম্ভিত মনোভাব তাহাও অজ্ঞান আত্মার আত্ম-সঙ্কোচ। অদ্বৈত হইতে দ্বৈতে—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগতে, আত্মার এই গতায়াত আত্মারই "যোগমৈশ্বরম্"। ইহা যদি দুঃখপ্রসূ হয়, তবে দুঃখও এই হিসাবে সত্য যে, তাহা আত্মার সেই অনন্ত শক্তিকে প্রেমরূপে আস্বাদন করিবার একটি সহায়। আমারই এতগুলি 'আমি' দুঃখ পাইতেছে—নিজের প্রতি নিজেরই এই অনুকম্পা—ইহাই সেই 'রস' যাহা অভিনয়ের দ্বারা আস্বাদন করিবার জন্য আত্মা এই জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। এ অভিনয় অনন্তকাল চলিয়াছে ও চলিবে। এ দুঃখ আমারই দুঃখ—সর্ব্ব-শক্তিমান, নিত্যমুক্ত স্বাধীন যে-'আমি' সেই 'আমি'র দুঃখ, তাই সে দুঃখ পাপীর দুঃখ নয়—সেই দুঃখীও দয়ার পাত্র নয়। এই দুঃখকে অস্বীকার করিয়াও স্বীকার করিতে হয়—নতুবা, যে নিত্যমুক্ত তাহার

আবার দুঃখ কি? ওই প্রেমের কারণেই 'আমি'গুলির দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠে, সেই দুঃখশৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য যে অধীর আবেগ, তাহার মূলে আছে যেমন আত্মপ্রেম, তেমনই তাহা মানব-প্রেমও বটে। আত্মার এই শক্তি, তথা আনন্দ ও প্রেমের তত্ত্ব অতি প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বই বটে—গীতার তত্ত্বও মূলত ইহাই; কেবল এই ভাষ্য নূতন,—শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে ও বিবেকানন্দের জীবনে, সেই ব্রহ্মসূত্রের—সেই আদ্যোপনিষদের—এক অভিনব মানব-ভাষ্য প্রণীত হইয়াছে; নবযুগের নবধর্মের অন্তর্গত সেই পাশ্চাত্য Humanism-কে একটি অতি গভীর তত্ত্বের আলোকে উজ্জ্বল ও পরিশুদ্ধ করা হইয়াছে।

ত্যাগী সন্ন্যাসীও যে কি কারণে কিরূপ প্রেমিক হইতে পারে আমার সাধ্যমত তাহার আলোচনা একটু বিস্তৃতভাবেই করিলাম। এই প্রেম যে জ্ঞানের অন্তরায় নয়; আত্মার আত্মজ্ঞানের পৌরুষ ও এই প্রেম যে এক বস্তু; এই সন্ন্যাসও যে প্রাচীন বা মধ্যযুগের সেই সন্ন্যাস নয়—ইহাতে জগৎ-সত্যকে অস্বীকার করিবার প্রয়োজনও যেমন নাই, তেমনই আত্মার বন্ধন-ভয়ও নাই;—বিবেকানন্দের চরিত্র ও জীবন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেই অদ্বৈতজ্ঞানী, আত্মৈকবিশ্বাসী, কর্ম-বীর্য্যাবতার সন্ন্যাসী আপন মনুষ্যহৃদয়যোগে যে বন্ধনকে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাণের পূর্ণস্ফূর্ত্তি ছিল, মনের মোহ ছিল না। কিন্তু জ্ঞানের সহিত প্রেমের এই যোগ-সাধন, অথবা জ্ঞানের অন্তস্তলে এই প্রেম-বীজের আবিষ্কার যে দৃষ্টির দ্বারা হইয়াছিল, তাহাকে সেই দৃষ্টির সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে না—কখনও করিত কি না সন্দেহ, সে সহসা এমন এক প্রেমকে শরীরীরূপে প্রত্যক্ষ করিল—যাহা জ্ঞানেরই যেন বিগলিত রূপ! সে-রূপ দেখিয়া তাহার চিত্তে ব্রহ্ম ও মানবের ভেদজ্ঞান আর রহিল না, জ্ঞান ও প্রেমের এই অদ্বৈত-সিদ্ধি তাহাকে চিরজীবনের মত জয় করিয়া লইল। এমনই করিয়া বাংলার এক অখ্যাত পল্লীর নিভৃত মন্দির-প্রাঙ্গণে, ভারতবর্ষের সেই চিরাগত সাধনাই—এখনও যাহা অনাগত, তাহাকে বরণ করিয়া লইল; সেই এক গঙ্গোত্তরী-ধারায় জাহ্নবী-তীরে সমগ্র মানব-জগতের জন্য এক নূতন বারাণসীর প্রতিষ্ঠা হইল।

৮

বিবেকানন্দের সেই দীক্ষালাভ ঠিক কোন্ ক্ষণে কি উপায়ে হইয়াছিল সে রহস্য চিরদিন আমাদের অজ্ঞাত হইয়াই থাকিবে। তিনি গুরুর অপর কোন্ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন যাহার ফলে তাঁহার সারাজীবন শান্তিময় ধ্যানের পরিবর্ত্তে একটা অশান্ত কর্ম্ম-ব্যাকুলতায় নিঃশেষ হইয়াছিল,—সে কথা তিনি নিজেও প্রকাশ করেন নাই, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "It is a secret, that will die with me" অর্থাৎ "সে কথা আমি ভিন্ন আর কেহ জানিবে না।" সেই ধীর, শান্ত, সহাস্য, ক্ষণে-ক্ষণে সমাধিস্থ, ভাববিহ্বল, আত্মানন্দী পুরুষের সেই যে পরমহংস-রূপ আর সকলে প্রত্যক্ষ করিত, তাহার অন্তরালে কোন্ অপর মূর্ত্তি কূটস্থভাবে বিদ্যমান ছিল? সেই বাহ্যিক প্রশান্তি ও পূর্ণ স্থিরতার মধ্যেই কি প্রচণ্ড গতিবেগ লুক্কায়িত ছিল, যাহার একটুকু স্পর্শে বিবেকানন্দের সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব পরাস্ত হইয়াছিল—অন্তরের শান্তিপিপাসার উপরে বাহিরের সংগ্রাম-বাসনা জয়ী হইয়াছিল? তাঁহার জীবনে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা যে সেই গুরুদীক্ষার ফল, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই; গুরুর যে দিকটি লোকচক্ষুর অগোচর ছিল, সেই দিকটি তাঁহার মধ্য দিয়াই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সেই দিক যে কিরূপ, তাহা বিবেকানন্দ হইতেই আমরা জানি; কেবল এই সংশয় কিছুতেই ঘোচে না যে—সেই দিক কি সত্যই দক্ষিণেশ্বরের সেই কোমল-দেহ ও কোমলপ্রাণ, সংসারভীরু, বিবিক্তসেবী, জগৎব্যাপারে অনভিজ্ঞ, উদাসীন, নির্লিপ্ত, ভাবনিমগ্ন পুরুষেরই অপর দিক? তাঁহার যে মূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা সেই 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'; আর এ মূর্ত্তি শক্তির প্রকট মূর্ত্তি, এ মূর্ত্তি আর কেহ দেখে নাই, বিবেকানন্দই দেখিয়াছিলেন। তিনি যে-শিবের আদর্শকে বিশুদ্ধ অদ্বৈত-তত্ত্বরূপে বরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, পরমহংস-দেবের মধ্যে তিনি সেই শিবেরই অপর রূপ দেখিয়া—দ্বৈতাদ্বৈতের অভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া—সর্ব্বসংশয়মুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তত্ত্বের মূর্ত্ত বিগ্রহ, সেই তত্ত্বই জগৎকে—সৃষ্টিকে—একটি নূতন অর্থে যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, মানবজীবনকে একটা নূতন মহিমা

দান করিয়াছে। সেই তত্ত্বের দার্শনিক সমস্যা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। তথাপি আমার নিজের মত করিয়া ওই তত্ত্বের একটু ব্যাখ্যা করিব।

জীবনকে তথা সৃষ্টিকে 'সৎ' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, সৎ-অসৎ, নিত্য ও অনিত্য, এক ও অনেক, স্থিতি ও গতি, ধ্রুব ও অধ্রুব প্রভৃতি 'দ্বন্দ্ব' বা 'বিপরীত' তত্ত্বের সম্মুখীন হইতে হয়; এই দ্বৈতজ্ঞান যেমন অনিবার্য্য—দুইয়ের কোনটাকেই বর্জ্জন করা যায় না, তেমনই অবিকারী, স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্পূর্ণ একটা কিছুর জন্য মানবাত্মার গভীরতর আকূতি নিবারণ করাও অসম্ভব। এক দিকে এই আত্যন্তিক প্রয়োজন, অপর দিকে সৃষ্টি ও সেই পরম তত্ত্ব এতই বিপরীত যে, ওই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বেদান্ত এই দুইয়ের নানা সম্বন্ধ নানা দিক দিয়া স্বীকার করিয়াছে, তাহাতে যেমন 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—অর্থাৎ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের 'ঘোষণা' আছে—তেমনই, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি নানা তত্ত্ববাদের দ্বারা সেই পরম তত্ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই অপর-তত্ত্বকে কোনরূপে কিঞ্চিৎ স্বীকার করার বা অস্বীকার-না-করার উপায়ও আছে—সে যেন স্বীকার-অস্বীকারের একরূপ লুকাচুরি। আমি এই সব সূক্ষ্ম তত্ত্ববাদের মধ্যে প্রবেশ করিব না, কেবল এই সকলের মধ্যগত একটা প্রশ্নকে অবলম্বন করিয়া আমার এই ব্যাখ্যার সৌকর্য্য-বিধান করিব—তাহাতে পাঠকগণের ত্রস্ত হইবার কারণ নাই, বরং তাঁহাদের কৌতূহল জাগ্রত ও চরিতার্থ হইবে, এমন আশা করি। ধরা যাক—এই 'সৃষ্টি'র ঠিক বিপরীত যাহা তাহার নাম 'লয়'; এটুকু আমরা ধারণা করিতে পারি। যদি সৃষ্টিকে মিথ্যা বা অসৎ বলিয়া ধারণা করিতে হয় তাহা হইলে সহজ বুদ্ধির সহজ বিচারে লয়কেই সত্য বলিতে হয়—এই লয়ই তাহা হইলে সৎ-বস্তু? আবার, সৃষ্টি যদি হয় একটা কিছুর নিরন্তর গতিক্রিয়া, তবে ওই লয়কে একটা চিরন্তন স্থিতির অবস্থা বলিতে হইবে; ওই গতিক্রিয়াকেই যদি শক্তিরূপা বলিয়া ধারণা হয় এবং 'শক্তি' অর্থে ওই 'গতি'—ওই নিরন্তরপ্রবাহী ক্ষণবুদ্‌বুদময়ী সৃষ্টিধারা বুঝায়, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় গতিহীন, অর্থাৎ শক্তিবিক্ষোভহীন ধ্রুব-শাশ্বত একটা কিছুকে 'লয়ে'র অবস্থা বলিতে হইবে। এই দুই তত্ত্ব

এমনই পরস্পরবিরোধী যে এই দুইয়ের একটাকেই মানিতে হয়, দুইয়ের সমন্বয় করা বড়ই দুরূহ। বেদান্ত এমন একটা তত্ত্বের সন্ধান করিয়াছে, যাহা মূলে দ্বৈতাদ্বৈত, সদসৎ প্রভৃতি সর্ব্ববিশেষণবর্জ্জিত। এই বস্তু ধ্যানগম্য—অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়; ইহা বুদ্ধি বা বাক্যের গোচর নয়। বুদ্ধ ইহাকে গঞ্জিকা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, তিনি মানবীয় সহজ বুদ্ধির বীর্য্যবলে কার্য্যকারণের শেষতম গ্রন্থি মোচন করিয়া সৃষ্টির অসারত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন, এবং তাহার বিপরীত তত্ত্ব সেই লয়-তত্ত্বকে সহজ অর্থেই গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ সৎ বা কোনরূপ অস্তিত্বকেই স্বীকার করিলেন না—সৃষ্টি যেমন মিথ্যা, তেমনই সেই মিথ্যার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোন সত্তা নাই—যাহা আছে তাহা শূন্য। তাঁহার মতে লয় অর্থে শূন্যই বটে। তন্ত্র বেদান্তকেই অনুসরণ করিয়া ওই দুই বিপরীত তত্ত্বের মধ্যে একটা রফা করিল। বেদান্তমতে সকল দ্বৈতই মিথ্যা—সৃষ্টিও নাই, প্রলয়ও নাই; অতএব লয়তত্ত্বও অ-তত্ত্ব; তথাপি সৃষ্টিকে 'মায়া' বলিয়াও স্বীকার করিয়াছে—তন্ত্রের পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট। ইহার পর, যদি স্থিতিতত্ত্ব ও গতিতত্ত্বকে—লয় ও সৃষ্টিকে—একই শক্তির অবস্থাভেদ, অর্থাৎ 'স্বগতভেদ' (অতএব, সেই অদ্বৈতের অবিরোধী) বলিয়া উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টি আর মিথ্যা হয় না—তাহার মূল ধাতুটা যে 'সৎ' তাহা স্বীকার করিতে হয়। তথাপি তন্ত্রমতে, বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মের মত, একটা নিষ্কল শিবের তত্ত্বও আছে, সকল গতি সেই পরম স্থিতিতে অবসানপ্রাপ্ত হয়। এই স্থিতি হইতেই গতির উৎপত্তি—এই শিবই শক্তিরূপে সৃষ্টিতে গতিমান বা অনন্ত রূপস্রোতে প্রবহমান। তন্ত্রমতে এই দুই অবস্থার দুই সত্তা একই—এক হইতে অপরে এই যে উদ্ভবন—ইহা সেই পরম তত্ত্বের বিকৃতি নয়—ইহাই তাহার স্বভাব।

তন্ত্রের এই তত্ত্ব সৃষ্টিকে, যে অর্থেই হউক, পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বিশেষ-রূপে স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু তাহাতেও স্থিতি ও গতি—শিব ও শক্তি—ব্রহ্ম ও জগৎ—এই দুইয়ের একটা পারমার্থিক ভেদ রহিয়া গিয়াছে। তথাপি তন্ত্র একটা খুব বড় সমস্যার কতকটা মীমাংসা করিয়াছে। কারণ এই সৃষ্টিকে উড়াইয়া দেওয়া—একেবারে একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি বলিয়া অগ্রাহ্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়; ইহার সকল বাহ্য আবরণ

নিঃশেষে মোচন করিলেও শেষ পর্য্যন্ত একটা এমন-কিছু থাকিয়া যায়, যাহাকে তত্ত্বরূপে স্বীকার না করিলেও একটা অনির্দ্দেশ্য, দুর্ব্বোধ্য কিছুরূপে স্বীকার করিতেই হয়, এবং সেই কিছুকে 'মায়া' নাম দিলেও সে নস্যাৎ হইয়া যায় না। তন্ত্র ইহাকে স্বীকার করিয়া—সেই মায়াকেও পরমতত্ত্বের অঙ্গীভূত করিয়াছে বটে, শক্তিকে শিব-শক্তিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি এই সৃষ্টিকে—আমাদের 'জগৎ ও জীবন'কে —একটা আপেক্ষিক সত্তা মাত্র দান করিয়াছে; কারণ, এই সৃষ্টিরও একটা লয়ক্রম আছে—শিব-শক্তিও নিষ্কল শিবে লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টিক্রমে যাহা জগৎ, লয়ক্রমে তাহা আর থাকে না, থাকিলেও বিকৃত-নামরূপের পরিবর্ত্তে স্বরূপ-নামরূপের অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় বিরাজ করে। অতএব সৃষ্টি হয় কালে—এবং কালেই 'লয়'-প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রমতে এই লয়-যোগের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা—জীবদেহে কুণ্ডলিনীরূপা এই শক্তিকে—এই সৃষ্টি-বাসনাকে—উর্দ্ধগামিনী করিয়া পরমশিবে লয় করিতে হয়। তাহা হইলে ইহাতে একটা উর্দ্ধ ও নিম্ন আছে—একটা হইতে আর একটাতে আরোহণ, একটার পরিণামে আর একটায় পৌছানো আছে—অর্থাৎ, সৃষ্টির যে মূল্য তাহাও আপেক্ষিক; জীবন ও জগৎ এই অর্থে সত্য যে, তাহার সেই গতি-ক্রিয়া শিব-শক্তিরই ক্রিয়া। শিব ও শক্তির যে ঐক্য-তত্ত্ব তাহাতে একটা প্রবর্ত্তন ও নিবর্ত্তনের—উদয়-বিলয়ের ক্রমাবস্থা রহিয়াছে। অতএব, এই শিব-শক্তিবাদের দ্বারাও সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ বা নিরপেক্ষ 'সৎ' বলিয়া মানিয়া লওয়া গেল না।

একটা উপমার সাহায্যে ব্যাপারটা আর একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। 'সৎ' বা সেই পরম তত্ত্ব, সেই শিব—যেন একটি অক্ষয় অব্যয় অশ্বত্থবীজ; এই বীজের মধ্যে তাহার উদ্ভেদ-শক্তি সংহৃত বা সমাহিত হইয়া আছে—তখন সেই বীজ ও তাহার শক্তিতে কোন ভেদ নাই। বরং সেই শক্তিরই যেন সমাহিত অবস্থার রূপ ওই বীজ; অতএব শক্তি অর্থে স্থিতি ও গতি দুই-ই। তথাপি ওই বীজের অবস্থা বা স্থিতির অবস্থাই মূল অবস্থা। ইহাই সেই নিষ্কল শিবের অবস্থা। শক্তি যখন হইতে গতির উন্মুখী হয়, তখনই সেই শিব একটু বিশেষিত হইয়া শিব-শক্তি অবস্থা পাইয়া থাকেন। সেই বীজই যেন অঙ্কুরিত বিকশিত হইয়া

বিশাল শাখাপল্লবময় সৃষ্টিরূপ ধারণ করে; কিন্তু তখনও বীজ তেমনই থাকে, অর্থাৎ বীজ ও বৃক্ষ আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে—স্থিতি স্থিরই থাকে, তাহা হইতেই শক্তির উদ্ভব ও ক্রমবিস্তার হয়। এই গাছটাই সেই গতির রূপ—সেই রূপ পূর্ণ পরিণতির পরে আবার ওই বীজে ফিরিয়া যায়—শক্তি শিবে লীন হয়। উপমাটিতে হয়তো তত্ত্বের সূক্ষ্মতা ধরা পড়িল না; ততখানি সূক্ষ্মতার প্রয়োজনও এখানে নাই; কেবল ইহাই লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শক্তির এই বিকাশের মুখে স্থিতি ও গতি পৃথক হইয়া রহিল—বীজ বৃক্ষে লয় পাইল না। বরং, যেন ওই বীজের উপরেই ভর করিয়া বৃক্ষ তাহার শাখাপ্রশাখা-বিকাশের গতিবেগ সঞ্চয় করিতেছে। আবার ওই গতি-শক্তি আপনাকে সংহরণ করিয়া—সৃষ্টিকে সংহার করিয়া—ওই স্থিতি-বীজে লয় পাইবে। ইহাকেই বলে সৃষ্টি-ক্রম ও লয়-ক্রম—দুই-ই একই শক্তির দ্বিবিধ গতিলীলা। তথাপি, একটি অপরের সমধর্ম্মীও নয়, সমকালিকও নয়, তাই এই গতির বিকাশ-রূপ যে সৃষ্টি তাহার মধ্যে যেমন স্থিতি নাই, তেমনই তাহা স্বপ্রতিষ্ঠও নয়। অতএব শিব-শক্তিবাদের দ্বারা সৃষ্টিকে যতখানি শোধন করিয়া লওয়া যাক না কেন—উহার সত্তা স্বয়ংসিদ্ধ নয়; স্থিতির তুলনায় গতি কালাতীত নয়, বরং কালসাপেক্ষ; ওই গতির মূলে যে স্থিতি—শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে পৌঁছিতে না পারিলে মহাকালের শাসন-মুক্ত হওয়া যায় না। এইজন্যই সেই দুইয়ের, সেই নিত্য ও অনিত্যের, স্থিতি ও গতির দ্বন্দ্ব ইহাতেও নিরস্ত হইল না; সৃষ্টিকে—জগৎ ও জীবনকে—একটা নিরপেক্ষ সত্যের শামিল করা গেল না।

ভারতীয় দর্শন ও সাধন-তত্ত্ব ওই দুইয়ের দ্বন্দ্ব-নিরসনে যতগুলি পন্থা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তন্ত্রের পন্থাই প্রশস্ততম, সৃষ্টিকে ইহার অধিক মর্য্যাদা দেওয়া ইতিপূর্ব্বে আর সম্ভব হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম একটা অতিশয় নূতন দিকে সেই পুরাতনকে ফিরাইলেন। তিনিই গতি ও স্থিতিকে, জগৎ ও ব্রহ্মকে—একই দেশে ও কালে অভেদরূপে বিদ্যমান দেখিলেন; শিব ও শিবশক্তি, স্থিতি ও গতি, লয় ও সৃষ্টি একই তত্ত্বের এ-পিঠ ও ও-পিঠ; গতির সঙ্গে স্থিতি, স্থিতির সঙ্গেই গতি অভিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে; এক দিক হইতে দেখিলে যাহা

ব্রহ্ম, অপর দিক হইতে দেখিলে তাহাই জগৎ। একটাকে পার হইয়া অপরটায় পৌছিতে হয় না; কেবল, সেই দৃষ্টি লাভ করা চাই—সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর উঠিতে পারিলে, ছাদ, সিঁড়ি ও নিম্নতল সবই একই বস্তু বলিয়া নিমেষে অস্তরগোচর হইবে। জড়বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যাইতে পারে static ও dynamic—দুই-ই এক শক্তির এককালীন স্ফূর্তি; যে মুহূর্তে সৃষ্টি হইতেছে, লয়ও সেই মুহূর্তে হইতেছে; স্থিতির উপরেই ভর করিয়া গতির ক্রিয়া চলিতেছে; নিশ্চল শিবের বুকের উপরে আমরা যে নৃত্যোন্মত্তা শক্তিমূর্তি দেখিয়া থাকি তাহার গূঢ় অর্থ এইরূপ কিছু একটা হইবে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ভাষায় ব্রহ্ম ও জগৎ তত্ত্বত অভেদ—এই জগৎ-ব্রহ্ম-অভেদ তত্ত্বের প্রতীক—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনবিগ্রহ, তাঁহার সেই ইষ্টদেবতা 'কালী'।

৯

এই তত্ত্বই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সাক্ষাৎ বাণীরূপ ধারণ করিয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ এই বাণীরই অবতার। তত্ত্বটা নূতন নয়; কিন্তু জীবন সম্পর্কে তাহার এমন অর্থ ইতিপূর্বে প্রকাশ পায় নাই; নূতন যে নয়, তাহার প্রমাণ, একজন তন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত তন্ত্রের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

Its purpose is to give liberation to the Jiva (জীব) by a method according to which monistic truth is reached through the dualistic world; immersing its Sadhakas (সাধক) in the current of Divine Bliss by changing duality into unity, and then evolving from the latter a dualistic play, thus proclaiming the wonderful glory of the spouse of Paramashiva (পরমশিব) in the loves embrace of matter and spirit (জড় ও চৈতন্য)।

এই প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়িল—যতই অদ্ভুত বা অবিশ্বাস্য হউক, তাহাতে এমন কয়েকটি লক্ষণ আছে, যাহার জন্য সেই ঘটনাটিকে বড়ই অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কথিত আছে, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক ও প্রতিপালক মথুরবাবু আপনার কক্ষ হইতে বাহিরের অদূরস্থ ঠাকুরবাড়ির দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া ছিলেন; সেই সময়ে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল ঘরের বারান্দায় পায়চারিরত শ্রীরামকৃষ্ণের উপর, এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার ভয় ও বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। পরমহংসদেব সেই বারান্দাটিতে পায়চারি করিবার সময় যখন এদিকে ফিরিতেছেন তখন তাঁহার মুখ কালীর মুখ,

যখন আবার অপর দিকে ফিরিতেছেন তখন সেই মুখই মহাদেবের মুখ! এই যে দর্শন, ইহাকে 'psychic' একটা কিছু বলা যাইতে পারে; কিন্তু সে যাহাই হউক, যদি ইহা স্বপ্নও হয়, তাহা হইলেও যে তত্ত্বটি উহাতে প্রতীকরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, সে তত্ত্ব মথুরবাবুর মত একজন অজ্ঞানী-ভক্ত স্বপ্নেও কল্পনা করিল কেমন করিয়া? কিন্তু সে প্রশ্ন আমার নয়, আমি এই স্বপ্নের ঘটনাকেও বাস্তব ঘটনা অপেক্ষা সত্য মনে করি, এবং এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই যে, এক মথুরবাবু ছাড়া আর কোন শিষ্য বা ভক্ত ওই শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্বকে এমন চাক্ষুষ করে নাই! মথুরবাবু করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই; মর্ম্ম কি আর কেহ বুঝিয়াছে! আমার মনে হয়, এই তত্ত্বকেই বিবেকানন্দও, পৌরাণিক প্রতীকের ভাষায় নয়—তাঁহার গুরুর মধ্যে অপরোক্ষ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি প্রকাশ্য কথায় ও বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার উপদেশ ও আদেশের মধ্যে ইহার কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণও আছে। একবার অর্দ্ধ-আবিষ্ট অবস্থায় তিনি জীবকে 'দয়া' নয়—'শিব'জ্ঞানে পূজা করিতে হইবে—এই কথা একটি সত্য-মন্ত্রের মত ঘোষণা করিয়াছিলেন। সিঁড়ি দিয়া বাড়ির ছাদে উঠিয়া যে সত্যদর্শন হয়—রূপকের ছলে সেই তত্ত্বকথা তিনি প্রায় বলিতেন, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি; আবার, বিবেকানন্দকে তাঁহার সেই ভর্ৎসনা—"তোর মন এত ছোট যে তুই জগতের ভাবনা না ভাবিয়া নিজের মুক্তির জন্যই এমন অস্থির!"—তাহাও স্মরণীয়। এই সকল হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, পরমহংসদেবের বাণী সেই পুরাতন সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের বাণী নয়—এ বাণী একেবারে নূতন না হইলেও, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ তত্ত্ব ইহাতে উঁকি দিতেছে। সে তত্ত্ব কি তাহা পূর্ব্বে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ওই যে একই মুখ শিব ও শক্তির মুখ, কেবল দিকপরিবর্ত্তন মাত্র; ওই যে জীব—কেবল তত্ত্বের দিক দিয়াই শিব নয়, তথ্যের দিক দিয়াও শিব; এ সকলের অর্থ অতিশয় স্পষ্ট—যে সত্য ব্রহ্মের সত্য, জগতের সত্যও তাহাই; সিঁড়ি ও ছাদ ভিন্ন বটে—সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিতে হয়, কিন্তু ছাদে উঠিলে ছাদ ও সিঁড়ি, উপরতল ও নিম্নতল, ভিত্তি ও শিখর, সবই সমান ও সর্ব্বাঙ্গীণ একরূপ বলিয়া উপলব্ধি হয়।

আমি উপরে এই তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি কেহ যেন তাহার দার্শনিক মূল্য যাচাই না করেন—দার্শনিক পরিভাষা বা দার্শনিক যুক্তিপ্রণালী—কোনটাই আমার অভ্যস্ত বা আয়ত্ত নহে; আমি নানা উপায়ে পরিচিত শব্দ ও উপমার সাহায্যে প্রাণপণে একটা তত্ত্বের আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র—আমি নিজে যে ভাবে বুঝিয়াছি সেই ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি; পাঠকগণকে কেবল সেই ইঙ্গিতমাত্র সহায় করিয়া নিজ নিজ বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বটির ব্যাখ্যা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। আধুনিক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ভাষায় যে তত্ত্বটিকে গতিতত্ত্ব ও স্থিতিতত্ত্বের সমন্বয় বলা যাইতে পারে তাহাই ভারতীয় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ভাষায় ব্রহ্ম ও জগৎ—শিব ও শক্তির অদ্বৈত-তত্ত্ব। ওই স্থিতি ও গতিকেই লয় ও সৃষ্টি বলা যাইতে পারে; এবং লয় যদি নিরপেক্ষ এবং সৃষ্টি আপেক্ষিক হয়, তবে একটির গৌরব অপরের তুলনায় অধিক হয়, এবং দুইয়ের মধ্যে একটা অবস্থাগত প্রভেদ ও কালগত ব্যবধানও থাকে; লয়ের অবস্থা সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া থাকে, এজন্য সৃষ্টিকে পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু যদি এমন হয় যে, এই দুই সর্ব্বত্র অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান রহিয়াছে—সৃষ্টি-স্রোতের প্রতি তরঙ্গে, প্রতি মুহূর্ত্তে, ওই স্থিতি ও গতি সমভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে, তবে সৃষ্টিকে ব্রহ্ম হইতে একটা পৃথক কিছু মনে করিবার কারণ থাকে না। এই প্রসঙ্গে, আমাদের কালের এক চিন্তাশীল বাঙালী পণ্ডিতের এই মূল্যবান উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি, তিনি লিখিয়াছেন—

Shakti being either static or dynamic, every dynamic form must have a static background. A purely dynamic activity (which is motion in its physical aspect) is impossible without a static support or ground (আধার)। Hence the philosophical doctrine of absolute motion or change, as taught by old Heraclitus, and the Buddhist, and by modern Bergson, is wrong; it is based neither upon correct logic, nor upon clear intuition. The constitution of an atom reveals the static-dynamic polarisation of Shakti; other and more complex forms of existence also do the same.

এক্ষণে আবার বিবেকানন্দের কথাই বলি। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার এই 'জগৎ-সত্য' মন্ত্রে দীক্ষালাভ হইয়াছিল যে, জীবই শিব—উপনিষদের সেই 'আত্মা'ই মানুষরূপে এই জগতের সুখদুঃখের ভোক্তা হইয়া—শুধু সাক্ষী হইয়া নয়—তাহাকে বীর্য্য-গৌরব দান করিয়াছে।

মন্ত্র সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি; শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সেই মন্ত্রস্বরূপ হইয়া যেন একটি উপযুক্ত আধার খুঁজিতেছিলেন—নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। বালক যেমন তাহার ঈপ্সিত খেলনা দেখিয়া তাহা পাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠে, তিনিও তেমনই অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের মধ্যে তিনি কি দেখিয়াছিলেন তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি,—এক দিকে মুক্ত শুদ্ধ আত্মার অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানধাতু, অপর দিকে ব্যক্তি-আত্মার বা মানুষ-সত্তার যাহা শ্রেষ্ঠ উপাদান—সেই পৌরুষ; উভয়ের এমন মিলন কচিৎ হইয়া থাকে। নরেন্দ্রের এই পৌরুষই তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল—তাহার সেই স্বাতন্ত্র্যাভিমান, উদ্ধত আত্মপ্রত্যয়, ও ভক্তি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ চিত্ত-দৌর্ব্বল্যের প্রতি যেন একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা তাঁহাকে বড়ই আশান্বিত করিয়াছিল। তিনি জানিতেন, কোন্ শক্তি কোন্ তেজ তাহাকে এমন অশান্ত করিয়াছে; আত্মার সকল রহস্য অবগত ছিলেন বলিয়া তিনি এই পৌরুষের মধ্যেই প্রেমের সুপ্ত বীর্য্য দর্শন করিয়া পরম কৌতুক অনুভব করিতেন। নরেন্দ্রের দেহাবয়বেও তিনি তাহার অন্তর-পুরুষের পরিচয় পাইয়াছিলেন; মুখমণ্ডলের নিম্নার্দ্ধে সেই প্রশস্ত গণ্ড, সুগঠিত চিবুক ও সুমিলিত ওষ্ঠাধর যেমন ইস্পাতস্বরূপ দৃঢ়তার—অতি কঠিন সঙ্কল্পনিষ্ঠার পরিচায়ক, তেমনই, তাহার সেই পল্লবভারাকুল দীর্ঘায়ত দুই চক্ষু! সেই চক্ষু দুইটির গবাক্ষপথে তিনি নরেন্দ্রের আত্মার যে রশ্মিচ্ছটা দেখিতে পাইতেন, তাহাতে তাঁহার আর কোন সংশয় থাকিত না; তাই বড় স্নেহে তিনি তাহাকে 'কমলাক্ষ' বলিয়া ডাকিতেন। এই দুষ্ট বালকের দুষ্টামি তিনি যেমন পরম স্নেহে উপভোগ করিতেন, তেমনই কেমন করিয়া তাহাকে অতি সহজে বশ করিবেন তাহাও জানিতেন বলিয়া, তিনি সে বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যস্ততা বোধ করেন নাই। আরও কিছুদিন যাক, আরও কিছুদিন দুরন্তপনা করুক; কল ঘুরাইবার চাবিটি যে তাঁহার হাতেই আছে। এমন জ্ঞানের সহিত যখন এমন পৌরুষ রহিয়াছে, তখন ভাবনা কি? ওই অভিমান যে আত্মারই অভিমান, উহাতে যে এতটুকু ব্যক্তি-স্বার্থের বা ক্ষুদ্রতার কলঙ্কচিহ্ন নাই! অবোধ বালক, তোমার ওই অভিমান দিয়াই তোমাকে জব্দ করিতেছি। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের

'নীতি'-জ্ঞান কর্ম ছিল না—পরম-জ্ঞানীর অবস্থা বালকের মত অবস্থাই ঘটে, কিন্তু সে বালকোচিত অজ্ঞতার অবস্থা নয়। তাই শেষে একটি মাত্র কৌশলে তিনি নরেন্দ্রকে জয় করিয়া লইলেন। নরেন্দ্র কেবলই নির্বিকল্প সমাধির—'সুখং আত্যন্তিকং' আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিত—স্পষ্টই বলিত যে, তাহাই পরম পুরুষার্থ। নরেন্দ্রের বিশ্বাস, পরমহংসদেবের মত ব্রহ্মপরায়ণ মহাপুরুষ তাহার এই কামনাকে প্রশ্রয় দিবেন—ইহাতে তিনি তাহার প্রতি আরও খুশি হইয়া উঠিবেন। কিন্তু একদিন সহসা সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও তাহার ওই কথা শুনিয়া কঠিন ভৎ'সনা ও ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই বুঝি তোমার পৌরুষ, এই বুঝি তোমার আত্মগৌরব—এই বুঝি তোমার বীরত্ব! তুমি জগতের আর সকলকে ফেলিয়া নিজের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছ!" এই গ্লানিবোধ নরেন্দ্রের চিত্তে পূর্ব্ব হইতে যে ছিল, সাংসারিক সংকটে তাহার সেই দারুণ অন্তরসংগ্রামেই সে পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি; কিন্তু সংগ্রামশেষে নরেন্দ্র সংসার ত্যাগ করিতেই চাহিয়াছিল, তখনও তাহার জীবনে ওই স্পর্শমণির স্পর্শলাভ ঘটে নাই, তখনও সেই অপূর্ব্ব তত্ত্বকে সে 'দর্শন' করে নাই। আজ তাহার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল—যে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া, ব্রহ্মভূত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহারও মুখে এ কি কথা! মানুষের সেবাকে সেও মুক্তি-সন্ধানের তুল্যই, অথবা তাহারও অধিক মূল্যবান মনে করে! অথবা তাহার মতে, সে-ই যথার্থ মুক্তি ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে—যে জগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করে না; এ বড় অপূর্ব্ব কথা! কিন্তু নরেন্দ্র সে কথা, এবং কথার তত্ত্বকেও দূরে ঠেলিয়া, তাহার মস্তিষ্কে নয়—প্রাণের মধ্যে এক প্রবল প্লাবন অনুভব করিল, এবং এতদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আপনাকে সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া দিল। ইহার পর, সেই মহাপুরুষের সম্বন্ধে কেবল একটা কথাই তাঁহার মুখে বার বার শোনা যাইত—'I felt his wonderful love'। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আর কি দেখিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে আর কি দিয়াছিলেন—সে সকল কথা তিনি জগৎকে জানানো আবশ্যক মনে করেন নাই।

১০

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেম যে কত বড়—বিবেকানন্দ তাঁহার মধ্যে কোন্ প্রেমের রূপ দেখিয়াছিলেন, বিবেকানন্দকে পাইয়া তাঁহার এত আনন্দ কেন, তাহার সম্পর্কে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। মঃ রোলাঁ তাঁহার 'বিবেকানন্দ-চরিত' নামক গ্রন্থে স্বামীজীর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন; উক্তিটি এই—

The day when Naren comes in contact with suffering and misery the pride of his character will melt into a mood of infinite compassion. His strong faith in himself will be an instrument to re-establish in discouraged souls the confidence and faith they have lost. And the freedom of his conduct, based on mighty self-mastery, will shine brightly in the eyes of others, as a manifestation of the true liberty of the Ego.

শিষ্যের সম্বন্ধে গুরুর এই ভবিষ্যৎবাণী যে সত্য হইয়াছিল তাহা আমরা জানি, এবং ইহাতে, বিবেকানন্দের অন্তরতম অন্তরের পরিচয় যে তিনি কিরূপ নিঃসংশয়রূপে অবগত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিটিতে কেবল তাহাই নয়, কেবল শিষ্যের নয়—গুরুরও যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, সে দিকটি কেহ অনুধাবন করেন নাই। পরমহংসদেবের ওই বাণীর মধ্যে তাঁহার নিজেরই প্রাণের আকৃতি ধরা পড়িয়াছে—এমন আর কোথায়ও পড়ে নাই; ইহা সেই আকৃতি যাহার বশে এক মহাপ্রেম যুগে যুগে অতি ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে যে দুঃখের উল্লেখ করিতেছেন তাহার ব্যাপ্তি ও পরিমাণ তিনি বুঝিলেন কেমন করিয়া? বিবেকানন্দের জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণে যাহা সত্যই ঘটিয়াছিল, মঃ রোলাঁ তাহারও এইরূপ ব্যাখ্যা ও বিবৃতি করিয়াছেন—

This meeting with suffering and human misery—not only vague and general—but definite misery, misery close at hand, the misery of his people, the misery of India—was to be the flint upon the steel, whence a spark would fly to set the whole soul on fire. And with this as its foundation stone, pride, ambition and love, faith, science and action, all his powers and all his desires were thrown into the mission of human service and united into one single flame.

—ইহাই যদি শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং শিষ্যের সম্বন্ধে সেই আশাই করিতেন, তবে তাহারই বা অর্থ কি? তিনি

তাঁহার সেই পল্লীপ্রান্তের ঘরখানিতে বসিয়া—গান, কীর্ত্তন, পুরাণ-প্রসঙ্গ, ভক্তিবিহ্বলতা ও ঘন ঘন সমাধি-অবস্থায় মগ্ন থাকিয়া—দুঃখের সে মূর্ত্তিকে দেখিলেন কি উপায়ে? তাঁহার প্রাণাধিক শিষ্যকে দুঃখের সে রূপ দেখাইবার জন্য তিনি এত অধীর কেন? আর সকলকে তিনি ত্যাগ, ভক্তি ও আত্মশুদ্ধির উপদেশ দিতেন, তাঁহার অন্তরের এই মানবপ্রেম ও জগৎ-হিতচিন্তার সম্যক পরিচয় তো আর কেহ পায় নাই! তাই, পারমার্থিক কল্যাণ বা ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনার সেই প্রাচীন ধর্ম্ম-মনোভাব লইয়াই আর সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত। কিন্তু নরেন্দ্রের উপরেই তাঁহার এই যে ভরসা—এবং তাহার বিবেকানন্দ-জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা হইতে, শ্রীরামকৃষ্ণ যে কোন্ প্রয়োজনে এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—জগতে যে মহামন্বন্তর আজ আরম্ভ হইয়াছে সেই মন্বন্তরের মুখেই তাঁহার সেই আবির্ভাব যে কত সময়োচিত হইয়াছিল—তাহা অনুমান করা দুরূহ হইবে না। তথাপি জগতের এই আসন্ন মহাদুঃখ-দিনের সংবাদ তাঁহাকে কে দিয়াছিল? সেই কালেই জগৎময় অধর্ম্ম ও অন্যায়ের যে বিষবাষ্প মানুষের সংসারে ছড়াইয়া পড়িতেছিল সে সংবাদই বা ওই বিদ্যাহীন সংসারজ্ঞানহীন গ্রামবাসী সরল ব্রাহ্মণ জানিলেন কোথা হইতে? কবির ভাষায় আমাদেরও কি বলিতে ইচ্ছা হয় না—

> Oh closed about by narrowing nunnery walls
> What knowest thou of the world, and all its lights
> And shadows, all the wealth and all the woe?

কিন্তু ইহাই তো পরমাশ্চর্য্য! এইজন্যই, বিবেকানন্দের সেই শৈব-শক্তির মূলে যে এক গভীরতর বৈষ্ণবীশক্তির প্রেরণা ছিল, একথা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 'স্থিতি'রূপের মধ্যেই যে কি প্রচণ্ড 'গতি'-বেগ ছিল, এবং তাঁহাতে ওই দুইয়ের যে কি সমন্বয় হইয়াছিল, সে তত্ত্ব আজিও আমাদের জ্ঞানগোচর হয় নাই। ভগিনী নিবেদিতাও যে তাঁহার গুরুর অন্তরালে এই মহাগুরুকে সর্ব্বদা দেখিতে পান নাই তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার দুইটি উক্তি এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

Sri Ramkrishna had been, as the Swami himself said once of him, "like a flower" living apart in the garden of a temple, simple, halfnaked,

orthodox, the ideal of the old time in India, suddenly burst into bloom, in a world that had thought to dismiss its very memory. It was at once the greatness and the tragedy of my own master's life that he was not of this type. His was the modern mind in all its completeness. In his consciousness, the ancient light of the mood in which man comes face to face with God might shine, but it shone on all those questions and all those puzzles which are present to the thinkers and workers of the modern world.

—এ কথা অস্বীকার করিবে কে? সহজ দৃষ্টিতে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণে ইহাই তো সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মূর্ত্তির বহির্মুখ ওইরূপই বটে, কিন্তু বিবেকানন্দের অন্তর্মুখ? ভগিনী নিবেদিতা বলিতেছেন, "the ancient light...might shine, but it shone···"—এই 'might shine'টাই শ্রীরামকৃষ্ণ নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং ওই "but it shone"—উহার জন্যই সেই মহাপুরুষ এই বালককে দেখিবামাত্র—শুধু বুকে নয়, মাথায় করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ইহার দ্বারাই তাঁহার প্রাণগত কামনা সিদ্ধ হইবে, সে যেন সকল সিদ্ধিলাভের অধিক; পূর্ব্বোদ্ধৃত ওই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে তাঁহার প্রাণের সেই আশ্বাস ব্যক্ত হইয়াছে। তাই যখন ভগিনী নিবেদিতার মুখেই আবার শুনি—

The sudden revelation of the misery and struggle of humanity as a whole, which has been the first result of the limelight irradiation of facts by the organisation of knowledge, had been made to him also as to the European mind. We know the verdict that Europe has passed on it all. Our art, our science, our poetry, for the past sixty years or more, are filled with the voices of our despair. A world summed up into the growing satisfaction and vulgarity of privilege, and the growing sadness and pain of the dispossessed; and a will of man too noble and high to condone the evil, yet too feeble to avert or arrest it; this is the spectacle of which our greatest minds are aware. Reluctant, wringing her hands, it is true, yet seeing no other way, the culture of the West can but stand and cry, "To him that hath shall be given, and from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Vae Victis! Woe to the vanquished!"...Is this also the verdict of the Eastern wisdom? If so, what hope is there for humanity? I find in my master's life an answer to this question.

—যখন বর্ত্তমান মানব-সংসারের দুঃখ-দুর্গতির চিত্র ওই অতি-গভীর কথাগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে দেখি, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ে—এবং যে পুরুষ-বীরের ললাটে তিনি স্বহস্তে গৌরবের মুকুটচূড়া ও শুভাশিসের মাল্যচন্দন পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখেও যেমন মাথা আপনি নত হইয়া পড়ে, তেমনই, ইহাও

ভাবিয়া বিস্মিত হই যে, বিবেকানন্দ যাহা সমক্ষে দেখিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা বহুপূর্ব্বেই অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। একজন চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিবে না, এবং দেখিলেও হয়তো তাহাকে আর এক রূপে দেখিত—কারণ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের দৃষ্টিতে জাগতিক ব্যাপারের মূল্যই অন্যরূপ; অপর পুরুষ যেন জ্ঞানের উপরে প্রেমের দৃষ্টিকে জয়ী করিয়া সাক্ষাৎ-দর্শন ব্যতিরেকেই তাহাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; এবং আর একজনের জ্ঞান-চক্ষুতে সেই প্রেমের অঞ্জন কবে কেমন করিয়া লাগিবে তাহা জানিতেন বলিয়াই, জ্ঞান ও পৌরুষের বজ্রবিদ্যুৎরূপী সেই মহাশক্তিমান শিশুকে এমন একটি শ্যামল সজল মেঘখণ্ডে বাঁধিয়া দিলেন যাহা অচিরে গগনব্যাপী হইয়া উঠিবে; এবং শেষে সেই অন্তর্গূঢ় বিদ্যুতের অসীম বেদনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া সেই মেঘ গলিয়া যাইবে—তাহারই অপর্য্যাপ্ত ধারাবর্ষণে তপ্তধরণী শীতল হইবে। ওই 'Eastern wisdom'-এর পূর্ণ ঘনীভূত বিগ্রহ যিনি—বিবেকানন্দ যাহার স্রোতোবেগোচ্ছ্বসিত নির্ঝর-রূপ, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার প্রতীচ্য-সংস্কারবশে তাহার সেই স্থিরতাকে, গতির তুলনায় সমান প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিবেকানন্দের অন্তরতর যোগের কথা এই পর্য্যন্ত। অতঃপর আমি, বিবেকানন্দের চরিত-কথায় আরও কিছুদূর অগ্রসর হইব। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী হইতেই আমরা জানিয়াছি, নরেন্দ্র কবে কেমন করিয়া বিবেকানন্দরূপে দ্বিজত্ব লাভ করিবেন—তাঁহার জীবনের ব্রত নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে মঃ রোলাঁর একটি উক্তি যেমন যথার্থ, তেমনই সংক্ষিপ্ত-সুন্দর; আমি তাহারই সূত্র ধরিয়া কাহিনীর এই অংশ সমাপ্ত করিব। তাঁহার সেই উক্তিটি এই—

> But this consciousness of his mission only came and took possession of him after years of direct experience, wherein he saw with his own eyes and touched with his own hands the miserable and glorious body of humanity—his mother India in all her tragic nakedness.

আমি এইবার ওই "miserable and glorious body of humanity" এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে নরেন্দ্রনাথের সেই নবজন্মের কথা বলিব।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ভালবাসা

সেদিন সকালে সখী, বড় মিঠে লেগেছিল
মুখখানি ঢাকা যেন বালিশে—
যদিও আগের রাতে নিশি ভোর করেছিলে
অবিরল অভিযোগ ও নালিশে।
সেদিন দুপুরে সখী, বড় মিঠে লেগেছিল
রেঁধেছিলে আলু আর ওলেতে,
যদিও মসলা দিতে ভুল হয়েছিল তাতে
দুনো নুন ঢেলেছিলে ঝোলেতে।
বেলা প'ড়ে এলে পরে বড় মিঠে লেগেছিল
গেলে যবে হাতে লয়ে তোয়ালে—
যদিও খাবার কালে তীব্র শাসন ক'রে
খোকাকে আমার কোলে শোয়ালে।
সন্ধ্যার অবসাদে বড় মিঠে লেগেছিল
কবরীতে জড়ানো সেফালাটি,
যদিও সকল দোষ মোর 'পরে আরোপিলে
ভুল চাবি দিয়ে ভেঙে তালাটি।
রজনীর ঘন ঘোরে বড় মিঠে লেগেছিল
ক্লান্ত হাসিটি তোর সই লো,
যদিও জগৎব্যাপী যত পাপ দোষ ত্রুটি
কারো নয় শুধু আমা বই লো।

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

প্রসঙ্গ কথা

(পূর্বানুবৃত্তি)

ক্ষেউড়ির চারোয়ার্ন

সেন মহাশয় জাঁদরেল ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি সাহিত্য-সমালোচনায় যে নূতন পরিভাষা রচনা করিয়াছেন, তাহারও সামান্য পরিচয় পণ্ডিত-সমাজে সবিনয়ে উপস্থাপিত করিতেছি। প্রথমেই উপসর্গ-সৌকুমার্যের বহু নিদর্শনের মধ্যে মাত্র একটি উদ্ধৃত করিলাম।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

ইংরেজি উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ দ্রুতগতি এবং রোমান্টিক কল্পনা তিনি "একশ্রেণীর লোকের উপাখ্যানে" সঞ্চারিত করিয়া দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যবৃক্ষকে এক নূতন কাণ্ড প্ররূঢ় ও পল্লবিত করিয়া দিলেন।—পৃ. ১৯

এই প্রশংসাপত্র পাঠ করিয়া স্বর্গ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই লেখককে অজস্র আশীর্বাদ করিতেছেন, কারণ 'সাহিত্যবৃক্ষে এক নূতন কাণ্ড প্ররূঢ় ও পল্লবিত' করিয়া দিবার মত ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা যে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, তাহা ইতিপূর্বে কেহই বলিতে পারেন নাই। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। সেন মহাশয়ের সাহিত্য-সমালোচনায় পরিভাষা-সৃষ্টির কৃতিত্ব অতুলনীয়। স্থানাভাববশত সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া গেল না, পাঠকগণ গ্রন্থখানি লইয়া পর পর পাতা উল্টাইয়া গেলেই দেখিতে পাইবেন—

ভদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত হইয়াও যাহারা down and out; মধুসূদনের representative কাব্য; smutty উপন্যাস, sensational ইংরেজি নভেল; নায়ক-নায়িকার understanding-এ উপন্যাসের সমাপ্তি, আয়েষা চরিত্র stately, জগৎসিংহ নববিবাহিত বাঙ্গালী যুবক-প্রেমিকের মত colourless; বিবেকানন্দের বক্তৃতা impassioned নয়, intellectual; grandiloquent বক্রোক্তি; দধীচির humanistic মনোভাব, রবীন্দ্রনাথের adolescent কবিচিত্ত; বিরহের frustration; এই motif রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, এবার বিশেষত্ব হইতেছে personal note।

অলং বিস্তরেণ। সেন মহাশয়ের বুকের পাটা আছে—এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত কোন লেখকই এইরূপ অকুতোভয়ে ইংরেজী শব্দ এতটা বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করিতে সাহস করেন নাই। বাংলা শব্দভাণ্ডারে বিদেশী উপাদান বর্ধিত হইল দেখিয়া সেন মহাশয়ের গুরুদেব নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, ভাষা-ব্যবহারে এই-জাতীয় অসংযত বর্বরতা ক্ষমার্হ, কি না? যিনি কথায় কথায় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার না করিলে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন, কোন্ স্পর্ধায় তিনি বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন? সাহিত্য-বুদ্ধি এবং সাহিত্য-বিচার-ক্ষমতা তো পরের কথা,

ব্যুৎপত্তিও যাহার হয় নাই, তাঁহার সাহিত্যের ইতিহাস রচনার দুরাকাঙ্ক্ষা পণ্ডিত-সমাজে প্রশ্রয় লাভ করে কেন?

সেন মহাশয়ের ছন্দ-জ্ঞানেরও একটিমাত্র নমুনা দেওয়া ভাল। মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে'র একটি গান সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,—"দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে এই গানটি আর কিছু না হউক অন্তত ছন্দের খাতিরে সেকালের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব

হায়, কুহু, কুহু, কুহু কোকিলের নায়!
বসন্ত এল সহ অনঙ্গ উন্মাদ!
[হায়] যৌবন-মুকুল তব, শুনি ওই কুহুরব,
বিকশিলে ঘটিবে প্রমাদ?
[হায়] জ্ঞানহীন মধুকর, ভ্রমে দেশ দেশান্তর,
কে তুষিবে মদন-প্রসাদ?
হায় তুমি রতিসমা, অতি[শয়] নিরুপমা,—
এ বয়েসে হরিবে বিষাদ?"

ছন্দ-সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও চক্ষু বুজিয়া বলিয়া দিতে পারিবেন যে, ইহা ৮+৮+১০ অক্ষরের দীর্ঘ ত্রিপদী মাত্র। প্রথম দুই চরণ ৮+৬ [=১৪] অক্ষরের; বসন্ত শব্দের যুক্তাক্ষর সংগীতের খাতিরে দুই মাত্রা এবং শেষ চরণের দ্বিতীয় পর্বের 'শয়'-পাপড়ি যে-কারণেই হউক লুপ্ত হইয়াছে। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়িয়া সীতা কার বাপের মতই সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মন্থন করিয়া অতি প্রাচীন ত্রিপদীছন্দকে 'সেকালের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব' আখ্যা প্রদান করা বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন।

* * *

সাহিত্য-ঐতিহাসিকের চতুরঙ্গ কৃত্যের কথা আমরা বলিয়াছিলাম। তিনটি অঙ্গের আলোচনা শেষ হইয়াছে, এইবার চতুর্থ অঙ্গের কথা। অর্থাৎ ঐতিহাসিক মালমসলার বিচার। কেবল সাল তারিখ ও তালিকা-রচনা লইয়াই ইহার আলোচনা। বলা বাহুল্য, এই চতুর্থ কৃত্য সম্পাদনে বিদ্যা-বুদ্ধি বা গভীর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় কেবল অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠার। সেন মহাশয় সগর্বে স্বীকার করিয়াছেন

যে, এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব। তিনি "বহু অজ্ঞাত ও বিস্মৃত রচনার প্রতি সাহিত্যরসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ" করিয়া গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, ইহাই সেন মহাশয়ের স্বাধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। সুতরাং এতক্ষণ আমরা মিথ্যাই বাগাড়ম্বর করিয়াছি। স্বাধিষ্ঠান ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করিলেই আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত হইতে পারিত।

গ্রন্থের শেষে সেন মহাশয় 'গ্রন্থ ও গ্রন্থকার নির্ঘণ্ট' দিয়াছেন। উক্ত নির্ঘণ্ট ৪৯ পৃষ্ঠা স্থান দখল করিয়াছে। প্রতি পৃষ্ঠায় দুই স্তম্ভে তালিকা সজ্জিত। প্রতি স্তম্ভে সাতাশটি হইতে ত্রিশটি নাম আছে। সুতরাং খুব উদারভাবে ধরিলেও এই গ্রন্থে তিনি ৫০×৩০×২=৩০০০ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই পুঁজি লইয়াই সেন মহাশয়ের এত আস্ফালন! সেন মহাশয় হয়তো কল্পনাও করিতে পারিবেন না যে, যে সময়ের মাত্র তিনহাজারী তালিকা প্রস্তুত করিয়াই তিনি আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছেন, সেই সময়ে অন্তত ত্রিশ হাজার গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছিল। কাজেই সংখ্যার কথা তুলিয়া সুবিধা হইবে না।

প্রথমেই সেন মহাশয়ের দুই-একটি আপ্তবাক্যের কথা বলি। তিনি 'শর্মিষ্ঠা' [১৮৫৯] নাটক হইতে আট ছত্র পয়ার উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন, "ইহাই বোধ হয় মধুসূদনের বাঙ্গালা কবিতা রচনার প্রথম প্রচেষ্টা"। মধুসূদনের জীবনেতিহাস বোধ করি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সর্বাধিক আলোচিত হইয়াছে। যোগীন্দ্রনাথ বসুর [গ্রন্থের নাম উল্লেখেরও আবশ্যক হয় না] গ্রন্থ খুলিলেই ১০০-১০১ পৃষ্ঠায় মধুসূদনের 'শিক্ষাবস্থা—কবিতা রচনার আভাস' প্রসঙ্গে 'বর্ষাকাল' ও 'হিমঋতু' দুই দুইটি পয়ারবন্ধে রচিত আট ছত্র ও বারো ছত্রের কবিতা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্ভবত সেন মহাশয়ের স্পৃশ্য নয়।

পৃ. ৫৩৭, অক্ষয়কুমার বড়াল সম্বন্ধে সৈনিক আপ্তবাক্য—"নারীপ্রেম অক্ষয়কুমারের কাব্যের একমাত্র উপজীব্য"। সেন মহাশয়কে অধিক পরিশ্রম করিতে বলিব না, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইণ্টারমিডিয়েট বাংলা সিলেকৃশনে' উদ্ধৃত অক্ষয়কুমারের 'মানব-বন্দনা' কবিতাটি পড়িয়া দেখিতে বলিব।

পৃ. ৫৪৪, কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' [১৮৮৯] কাব্যগ্রন্থের 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' কবিতা আলোচনায় ঋষি-বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, "সংস্কৃত সাহিত্যের চরিত্র অবলম্বনে কাব্য রচনা ইহাই প্রথম"। এখানেও আমরা সেন মহাশয়কে অধিক দূর যাইতে বলিব না। আধুনিক বাংলা কাব্যের স্রষ্টা মধুসূদনেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে। তিনি অনুগ্রহ করিয়া 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র [১৮৬৬] পৃষ্ঠা উল্টাইয়া সীতা দেবী, সুভদ্রা, উর্ব্বশী, দুঃশাসন, হিড়িম্বা, পুরূরবা, শকুন্তলা প্রভৃতি কবিতা একবার পড়িয়া দেখিবেন কি ?

সৈনিক গবেষণার আর এক দিকের একটু নমুনা দিতেছি। 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাইতে বোধ করি তাঁহার জুড়ি নাই। বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর স্থান কোথায়, তাহা নূতন করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। তাঁহার সমগ্র গ্রন্থরাজিও লোকলোচনের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখেই রহিয়াছে। স্বর্ণকুমারী বহু গ্রন্থই লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেন মহাশয়ের আদেশে তাঁহাকে আর একখানি নূতন গ্রন্থ লিখিয়া দিতে হইয়াছে। সেন মহাশয় লিখিতেছেন, "স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কোরকে কীট' (১৮৭৭)।" একেবারে সন-তারিখ-যুক্ত নাম দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। এতদিন কেহই জানিত না যে, স্বর্ণকুমারী 'কোরকে কীট' নামেও একখানা উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও গ্রন্থাবলী বা গ্রন্থশেষের পরিচয়পত্রে বা সাময়িক-পত্রের সমালোচনায় দ্বিতীয় উপন্যাস হিসাবে 'কোরকে কীট'এর নামমাত্র নাই, বরং স্পষ্টাক্ষরে দ্বিতীয় উপন্যাস হিসাবে 'ছিন্নমুকুলে'রই নাম আছে। কিন্তু সৈনিক গবেষণার প্রতি শ্রদ্ধাবশত সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ঘাঁটিয়া দেখিলাম যে, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-রচিত 'কোরকে কীট' নামে একটি 'সামাজিক চিত্র' মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৮৪ সালের ফাল্গুনের 'ভারতী'তে তাহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই যোগেন্দ্রনাথই সেন মহাশয়ের যোগপ্রভাবে স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে অভিন্নসত্ত্ব হইয়া উঠিয়াছেন।

যেখানে একজন সম্পর্কহীন পুরুষের কীর্ত্তি এক প্রখ্যাতনাম্নী মহিলার স্কন্ধে আরোপিত হইতে পারে, সেখানে নাম-সাদৃশ্য থাকিলে তো

আর কথাই নাই ! 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা'র নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। কিন্তু সেন মহাশয় 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা'-রচয়িতার 'সমাজসংস্করণ' নামে একখানি নূতন গ্রন্থের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার জানা নাই যে, 'সমাজসংস্করণে'র নবীনচন্দ্র পৃথক ব্যক্তি। লাইব্রেরির ক্যাটালগ-সর্বস্ব বিদ্যায় ইহা জানিবার অবশ্য উপায় নাই। কিন্তু 'সমাজসংস্করণ'খানি একবার উল্টাইয়া দেখিলেই তিনি জানিতে পারিতেন যে, এই গ্রন্থের লেখক 'বোড়াল বঙ্গবিদ্যালয়ে'র শিক্ষক ছিলেন ; আর 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা'-রচয়িতা নবীনচন্দ্র "বর্ধমান বলগোনা পোস্টের অধীন বুড়ার গ্রাম নিবাসী ছিলেন"। ১৩০১ সালে প্রকাশিত আর্যসঙ্গীত, ২য় ভাগের শেষে কবি নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর যে তালিকা দেওয়া আছে, তাহা দেখিলেও সেন মহাশয় এরূপ ভুল করিতেন না। 'সমাজসংস্করণ' কতকগুলি ছাত্রপাঠ্য নিবন্ধের সমষ্টি মাত্র।

গবেষণার ঐন্দ্রজালিক শক্তির আর একটি পরিচয় দিলে ভাল হইবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষ মৌলিক নাটক 'স্বপ্নময়ী' [১২৮৮] যখন প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র বিশ বৎসর। কিন্তু সেন মহাশয় প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কনিষ্ঠের পরবর্তী সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে এই নাটকটি চুরি করিয়াছেন। ভাষাটি শুনুন,—

> নাটকটির পরিকল্পনায় ও রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। শুভঙ্করের মধ্যে ঘরে-বাইরের সন্দীপের পূর্বাভাস নিতান্ত ক্ষীণ হইলেও লক্ষ্য করা যায়। কুকরামের ভূমিকায় ছায়া রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনায় পরিলক্ষিত হয়। রাজা পণ্ডিতবর্গ এবং রহিম খাঁ ভূমিকার দ্বারা নাটকটিতে যে কৌতুকরসের যোগান দেওয়া হইয়াছে তাহাও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পদ্ধতি। নাটকের গদ্যাংশ সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া অনুমান করি। পৃ. ৩১১-১২

তবেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এতদিন কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের লেখা চুরি করিয়া মৌলিক নাটক বলিয়া চালাইয়া আসিতেছিলেন, দৈনিক গবেষণায় সব বেফাঁস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই চৌর্যবৃত্তিতে অলৌকিকত্ব আছে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'ঘরে বাইরে'র চরিত্রকেও

তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন !! কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রলাপোক্তি সহ্য করিবারও একটি সীমা আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-পুষ্ট এই 'নারাপেটা হাঁদারামে'র 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' অসহায় ছাত্রদিগকে ঘুরাইতেই হইবে !

গবেষণার কথা আর কত বলিব ! সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ঘাঁটিয়া তিনি মাত্র সাড়ে সাতজন মুসলমান লেখকের সন্ধান পাইয়াছেন। সব কথা বলিবার সময় নাই। ইঁহাদের সম্বন্ধে সেন মহাশয়ের জ্ঞান ও গবেষণার পরিধির কথা একটু মাত্র বলি। মীর মশাররফ হোসেন উনবিংশ শতাব্দীর বরণীয় বাংলা সাহিত্যিকগণের অন্যতম। তিনি অন্তত পঁচিশখানি ছোট বড় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেন মহাশয় তন্মধ্যে মাত্র দুইটি নাটক, একটি প্রহসন, একটি আখ্যায়িকা-উপন্যাস এবং একখানি গদ্যগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বিষাদ-সিন্ধু' সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা মাত্র ৮টি শব্দে সমাপ্ত হইয়াছে, "মীর মশাররফ (sic) হোসেনের তিন পর্ব্ব 'বিষাদ-সিন্ধু' (১২৯১-৯৭) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ"। সেন মহাশয়ের বিচার-বুদ্ধির উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কলঙ্কিতা কামিনী সম্বন্ধেই তিনি তাঁহার সমগ্র উচ্ছ্বাস অস্থানে নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছেন, কাজেই 'বিষাদ-সিন্ধু'র জন্য এক বিন্দু অশ্রুও অবশিষ্ট না থাকিলে আফসোস করিয়া লাভ নাই। অন্যে পরে কা কথা, সেন মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি 'কায়কোবাদে'র নাম পর্যন্তও কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া জানা গেল না। বয়সে রবীন্দ্রনাথের দুই বৎসরের বড়, এই কবি হেম-নবীনের আদর্শে 'মহাশ্মশান', 'বিরহ-বিলাপ', 'কুসুম-কানন', 'অশ্রুমালা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

সাল-তারিখ এবং গ্রন্থাদির নামোল্লেখ সম্বন্ধে সেন মহাশয় নিরঙ্কুশ। সাল-তারিখের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিকই বোধ হয় ইতিপূর্বে এতটা নির্লজ্জ এবং বেপরোয়া হইতে পারেন নাই। গ্রন্থ প্রকাশের তারিখনির্ণয়ে যে একটা দায়িত্ব থাকিতে পারে এবং ঐতিহাসিক আলোচনায় যে তাহার বিশেষ মূল্য আছে, এই চেতনা লেখকের থাকিলে

তিনি পাতার পাতায় অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। লেখকগণের সম্পর্কে রায়দান প্রসঙ্গে যেমন তিনি মুক্তকণ্ঠ, গ্রন্থের উল্লেখ-অনুল্লেখ এবং প্রকাশকাল প্রভৃতি নির্ধারণেও তেমনই কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। বিভিন্ন লাইব্রেরির ক্যাটালগ হইতে যে সব গ্রন্থের নাম তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, পাঠ্য-অপাঠ্য, সাহিত্য-অসাহিত্য বিচারের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি সেগুলিকে গ্রন্থে স্থান দিয়া ইতিহাসের কলেবর বৃদ্ধির আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্য কাহাকে বলে, এই জ্ঞান সেন মহাশয়ের থাকিলে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের জঞ্জালকে এই ভাবে একত্র স্তূপীকৃত করিয়া সাহিত্যের ইতিহাস নাম দিয়া তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। কোনও ভাষায় মুদ্রিত যে-কোনও বিষয়ের গ্রন্থই যে সাহিত্য নয়, এবং সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় মুদ্রিত গ্রন্থমাত্রই যে স্থান লাভের অধিকারী নয়, এই কথা সেন মহাশয়কে বুঝাইবে কে ?

কিন্তু তাহাও পরের কথা। গ্রন্থ-প্রকাশের তারিখ তিনি নির্ভুল-ভাবে সংগ্রহ করিবেন এতটা উচ্চাশা তাঁহার সম্বন্ধে আমরা পোষণ করি না। সবচেয়ে বিস্মিত হইতে হয় এই কথা ভাবিয়া যে, উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে যিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ওই শতাব্দীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের জন্মসাল পর্যন্ত নির্ভুল-ভাবে জানিবার ধৈর্য এবং ঔচিত্যবোধ তাঁহার জন্মে নাই। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দীনেশচরণ বসু, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকগণের জন্মসাল তাঁহার জানা নাই। ভূদেবের জন্ম তাঁহার মতে ১৮২৫ খ্রীঃ। কিন্তু ভূদেব প্রকৃতপক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তার দুই বৎসর পরে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি। ৪২০ পৃষ্ঠায় নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম-বৎসর তিনি ১৮৪৬ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নবীনচন্দ্রের জন্ম তাহার পরের বৎসর হইয়াছিল। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' সেন মহাশয় পড়েন নাই, 'আমার জীবনে'র পাতা উল্টাইলেই তিনি নবীনচন্দ্রের জন্মবৎসর জানিতে পারিতেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর জন্মবৎসর তিনি নির্দেশ করিয়াছেন ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু বিহারীলালের জন্ম

হইয়াছিল ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২, ২১ মে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। ত্রৈলোক্যনাথের জন্মবৎসর তাঁহার জানা নাই। তিনি সেখানে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করিয়াই নিজের দায়িত্ব সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থ পড়িলেই ত্রৈলোক্যনাথের জীবনী হইতে তিনি জানিতে পারিতেন যে, ১২৫৪ সালে ৬ই শ্রাবণ বুধবার, অর্থাৎ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দীনেশচরণ বসুর মৃত্যুবৎসর সেন মহাশয়ের মতে ১৮৯৯, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অবশ্যই তাহার পূর্ববৎসর লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। আনন্দচন্দ্র মিত্রের জন্মবৎসরও সেন মহাশয়ের অজ্ঞাত। জানিবার আগ্রহ থাকিলে তিনি অবশ্যই জানিতে পারিতেন, আনন্দচন্দ্র তাঁহার 'মিত্রকাব্যে'র (৩য় সং) ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "গ্রন্থকারের বয়ঃক্রম যখন বিংশতি খর্ব, ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত হইয়াও, মিত্রকাব্য তখনই সাহিত্য সমাজের যথেষ্ট স্নেহলাভ করিয়াছিল।" 'মিত্রকাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসে। চুয়াত্তর হইতে বিশ বৎসর বাদ দিলেই আনন্দচন্দ্রের জন্মবৎসর পাওয়া যাইত।

আশা করি, পাঠকগণ ইতিমধ্যেই সেন মহাশয়ের ঐতিহাসিক তথ্য-প্রকাশ সম্বন্ধে নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের যথার্থ পরিচয় পাইয়াছেন। গ্রন্থখানির পাতায় পাতায় এত অসংখ্য ভুল আছে যে, সেন মহাশয়ের কোন কথাকেই কোন ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে ভরসা পাইবেন না। এই অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদের মাত্র কয়েকটি আমরা নমুনা হিসাবে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

পৃ. ৭—অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'-এর প্রথম ভাগের প্রথম প্রকাশকাল দেওয়া আছে ১৮৫২, উহা হইবে ১৮৫১। 'চারুপাঠ' প্রথম ভাগের প্রকাশকাল ১৮৫২ স্থলে হইবে ১৮৫৩। পৃ. ১৪১—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরীর সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্তন'-এর প্রকাশকাল দেওয়া আছে ১৮৬৯। উহা প্রকৃতপক্ষে এই তারিখের নয় বৎসর পূর্বে ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। ২০ আগস্ট ১৮৬০ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১১৬ পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র মিত্রের গ্রন্থাদির নাম করিতে গিয়া তিনি লিখিতেছেন, 'ভক্ত (ভক্ত হইবে) মীরং' এবং 'ঘর থাকতে

বাবুই ভেজে' সম্ভবত ইহারই রচনা। 'সম্ভবত' কেন? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে, তৃতীয় সংস্করণের 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজে' পুস্তকের এক খণ্ড আছে এবং উহার আখ্যাপত্রে গ্রন্থকার হিসাবে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের নাম স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত আছে। ওই পুস্তকেরই মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র মিত্রের গ্রন্থাবলীর যে তালিকা আছে তাহাতে 'শুভস্য শীঘ্রং' পুস্তকেরও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। পৃ. ১৮৫—হরিনাথ মজুমদারের 'পদ্ম পুণ্ডরীক'-এর তারিখ দেওয়া আছে ১৮৬৬, প্রকৃতপক্ষে উহা হইবে ১৮৩২। পৃ. ২৬৪—সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'ক্ষুদিরাম' (১৩০৮)।" প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'পাঁচু-ঠাকুর'। 'ক্ষুদিরামে'র প্রথম প্রকাশকাল ১৩০৮ নহে; ইহা চৈত্র ১২৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পৃ. ২৬৫—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'কালাচাঁদে'র প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে ১৮৮৯। কিন্তু ইহার বিভিন্ন খণ্ড (১-৫ পর্ব) ২ ডিসেম্বর ১৮৮৯ হইতে ১৭ মে ১৮৯০ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। 'চিনিবাস-চরিতামৃত' ১৮৯০ নয়, ইহা ২৭ জুন ১৮৮৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'মহীরাবণের আত্মকথা' ১৩১৩ সালে নয়, তার ১৮ বৎসর পূর্বে ১২৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' ১৩০৩-০৯ সালে নয়, উহার তৃতীয় ভাগের দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত 'জন্মভূমি'তে (পৌষ ১৩০২—জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথমে খণ্ডে খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম তিন ভাগ একত্রে (পৃ. ৫২৮) প্রকাশিত হয় ১৫ জুন ১৯০২ তারিখে। ইহার আরও তিনটি ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃ. ২৭১—ত্রৈলোক্যনাথের 'মুক্তমালা'র প্রকাশকাল সেন মহাশয় দিয়াছেন ১৩২৬। প্রশ্নবোধক চিহ্নের ঢং অবশ্য যুক্ত আছে, কিন্তু সংশয়ের কোনই অবকাশ ছিল না, ইহা প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে।[*] তেমনই 'পাপের পরিণাম'-এর প্রকাশকাল ১৩২০ নহে, উহা পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৩১৫ সালেই প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃ. ৩৩৩—'অপূর্ব সতী নাটক'-এর প্রকাশকাল ১২৮১ নহে, উহা হইবে ৩রা শ্রাবণ ১২৮২। আনন্দচন্দ্র মিত্রের অনেকগুলি পুস্তকেরই উল্লেখ সেন মহাশয় করিয়াছেন। এমন কি, বিত্যালয়-পাঠ্য কয়েকখানি পুস্তকও তিনি বাদ দেন নাই।' কিন্তু

'কবিতাকুসুম', 'মিত্রপাঠ', ও 'ব্যবহার দর্শন' এই তিনখানির সন্ধান পান নাই বলিয়াই উল্লেখ করেন নাই। আনন্দচন্দ্রের একখানি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থেরও সংবাদ সেন মহাশয়ের জানা নাই। তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভজন-কাব্য 'মাতৃমঙ্গল'ই সেন মহাশয়ের তালিকা হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তারিখের গোলমাল থাকিবেই। 'হেলেনা কাব্য' দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল দেওয়া আছে ১৮৭৪, প্রকৃতপক্ষে উহা হইবে ১৮৭৭। পৃ. ৪৭৮—সেন মহাশয়ের মতে "বিহারীলালের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক হইতেছে 'সঙ্গীত শতক'।" বলা বাহুল্য, ইহা ভুল। বিহারীলালের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক হইল 'স্বপ্নদর্শন', প্রকাশকাল ১৮৫৮। সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "বিহারীলাল 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা পরিচালনা করেন (১২৭৩-৭৬)"। এই তারিখও ভুল। বিহারীলালের 'অবোধবন্ধু' পরিচালনার সময় হইল পৌষ ১২৭৫-১২৭৬। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'র দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল তিনি দিয়াছেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আবার ওই পৃষ্ঠারই পাদটীকায় উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য উদ্ধার করা হইয়াছে—"..অদ্য ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ হইল। ৪ঠা ফাল্গুন বসন্তপঞ্চমী সরস্বতীপূজা, ১২৬৮ সাল।" সাল-তারিখ সম্বন্ধে সেন মহাশয়ের কাণ্ডজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ থাকিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, পাদটীকায় উদ্ধৃত ১২৬৮ সাল কখনই ইংরেজী ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ হয় না। প্রকৃতপক্ষে উভয় সালই ভুল। 'বঙ্গসুন্দরী'র দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল হইবে ১৮৮০। পৃ. ৪৯৭—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রসঙ্গে আছে,—"'সবিতা-সুদর্শন' ও 'ফুলরা' নামক গাথা কবিতা দুইটি ১২৭৫ সালে রচিত হইয়া ১২৭৭ সালে পুস্তিকাকারে বাহির হইয়াছিল"। 'ফুলরা' কখনও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা কবির মৃত্যুর পর ১৩০০ সালে ৪র্থ ও ৫ম এবং ১৩০১ সালে ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায় 'চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান এবং সমীরণে' প্রথম প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের 'রাজস্থান' এবং 'বিশ্বরহস্য' প্রকাশের তারিখও ভুল আছে। 'রাজস্থানে'র প্রথম প্রকাশকাল ১২৮০-৮৫ স্থলে ১২৭৯-৮০ হইবে এবং 'বিশ্বরহস্য' ১৮৭৭-৭৮ না হইয়া ১৮৭৭ (১ কার্ত্তিক ১৯৩৪ সংবৎ) হইবে'।

ভুলের ফসল আর কুড়াইতে ইচ্ছা হইতেছে না। অখ্যাতনামা লেখকগণের প্রসঙ্গ আমরা উত্থাপনই করিতে চাহি নাই। অক্ষয়কুমার দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট লেখকগণেরও রচনা প্রকাশের সাল-তারিখ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন না করিয়াই যিনি সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সম্বন্ধে এত কথা বলারই কোন প্রয়োজন ছিল না। গ্রন্থের শেষে সেন মহাশয় তাঁহার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিয়া এবং নূতন তথ্যাদি সন্নিবেশ করিয়া একটি "সংযোজন" অংশ যোজনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ভ্রম-সংশোধক এই সংযোজন অংশও ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি। পৃ. ৫৩২—বলদেব পালিত প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "বঙ্গদর্শনে বলদেবের 'কাব্যমঞ্জরী'র ও 'ভর্তৃহরি কাব্য'এর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। সেই সঙ্গে 'কাব্যমালা'-প্রণেতা অজ্ঞাতনামা কবির 'ললিতকবিতাবলী'ও (১৮৭০) সমালোচিত হইয়াছিল। 'ললিতকবিতাবলী'র কবিতাগুলি সংস্কৃত ছন্দে লেখা। 'কাব্যমালা' (১৮৭১) বৃহত্তর গ্রন্থ। অনেকে এই কাব্য দুইটিও বলদেব পালিতের রচনা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু…"। সেন মহাশয় 'কাব্যমালা' ও 'ললিতকবিতাবলী' স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। 'ললিত-কবিতাবলী' 'কাব্যমালা'র পরে প্রকাশিত হয়। 'ললিতকবিতাবলী' 'কাব্যমালা'-প্রণেতা অজ্ঞাতনামা কবির রচিত—এই কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ তিনি 'ললিতকবিতাবলী'র প্রকাশকাল ১৮৭০ এবং 'কাব্যমালা'র প্রকাশকাল ১৮৭১ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে 'কাব্যমালা' এবং তৎপরে 'ললিতকবিতাবলী' একই বৎসরে—১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সেন মহাশয় 'কাব্যমালা' ও 'ললিতকবিতাবলী' যে বলদেব পালিতের রচনা, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই পুস্তক দুইখানি আদিরস-ঘটিত বলিয়াই সম্ভবত বলদেব পালিত নাম প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তবে ৩০ ডিসেম্বর ১৮৭০ তারিখের বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় 'ললিতকবিতাবলী'র প্রকাশকরূপে

Buldeb Palit of Bankipur'এর উল্লেখ আছে। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে উক্ত গ্রন্থ, এবং 'একই লোকের লেখা' বলিয়া 'কাব্যমালা'ও, বলদেব পালিতেরই রচনা।

পাঠকগণ মনে করিবেন না, এই কয়েকটিমাত্র ভুলই সেন মহাশয় করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, পাতায় পাতায় অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ এইখানে করা হইয়াছে। স্থান থাকিলে এই ভুলের তালিকা অন্তত দশগুণ বর্ধিত করা যাইত। অথচ সেন মহাশয় ইচ্ছা করিলে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' হইতে প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র সাহায্যে অতি অনায়াসেই এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বিশ্ব-পাণ্ডিত্যে ঘা লাগিবে বলিয়াই কি তিনি সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার সুযোগ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন? এই আত্মম্ভরিতাই তাঁহার সর্বনাশের মূলে রহিয়াছে।

সেন মহাশয়ের জন্ম সত্যই আমাদের দুঃখ হয়। কিন্তু পৃথিবীতে এই জাতীয় লোকেরও অভাব নাই। ছাত্রজীবনে সেন মহাশয় যদি টডের 'স্টুডেন্টস ম্যানুয়েল' বইখানিও একবার পড়িতেন, তাহা হইলেও তাঁহার কিছু শিক্ষা হইতে পারিত। এখন অবশ্য অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু উক্ত গ্রন্থ হইতে তাঁহার মত লোকের জন্ম লিখিত অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। টড লিখিতেছেন—

Some of the most laborious men and diligent authors pass through life without accomplishing anything desirable, for the want of what may be called a well-balanced judgment. The last theory which they hear is the true one, however deficient as to proof from facts; the last book they read is the most wonderful, though it may be worthless; the last acquaintance is the most valuable, because least is known about him. Hence multitudes of objects are pursued, which have no use in practical life; and there is a laborious trifling—operose nihil agendo—which unfits the mind for anything valuable. It leads to a wide field, which is barren and waste.

ইহার প্রত্যেকটি কথা সেন মহাশয় সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু আফসোস করিয়া লাভ নাই, অভিভাবকেরাই সেন মহাশয়ের স্ব-বুদ্ধি-বিচারের শক্তি মারিয়া দিয়াছেন।

বন্দনা

দাও দাও আরো দাও, যত পার দিয়ে যাও, আমি আজ বুভুক্ষু ভিখারী,
একদা গায়ের জোরে নিয়েছি আদায় ক'রে, তখন ছিলাম ক্রুর শিকারী ;
শিকারের পিছে পিছে ঘুরিয়া মরেছি মিছে,
ধরা দেয় নাই কেউ ; যারা পায়ের নীচে
মিটায়েছে ক্ষুধা হায়, আজ সেই লজ্জায়, করুণায় কণা ভিখি যাচিয়া—
মরিয়া গিয়েছে ঢের, ইতিহাস অতীতের—আজ যারা পার দাও বাঁচিয়া।

তোমাদের ছাড়া আজ বিফল সকল কাজ, তোমরা ভরসা-আশা জীবনে,
ছিন্ন কাঁথাটি মোর দিয়ে প্রেম-স্নেহ-ডোর বাঁচায়েছ প্রত্যহ সীবনে।
ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার তবু আমি বার বার
করেছি আদায় তাই, নাই যাতে অধিকার,
তোমাদের করুণায় মৃতজনে প্রাণ পায় রও ধরে পাথরেরও বক্ষে,
তোমাদের জয় হোক জল-ভরা দুটি চোখ পড়ে যেন অনাদৃত লক্ষ্যে।

তোমরা শতেক রূপে হাঁকে ডাকে চুপে চুপে সুন্দর কর মোর ধরণী,
আসলে তো একজন, বহু দেহ এক মন, এক ছবি, বিচিত্রবরণী।
দেখিয়া অবাক হই, ভালবাসি বুকে লই,
ডুবে যাই গভীরেতে তবু নাহি পাই থই,
তোমরা জান না নিজে কি বা আছে দাও কি যে মণি দিয়ে কাচ নাও খুশিতে
পারি না বুঝিতে আজো তাহাদের রণসাজ-ও এত সোজা মন যায় ভুলিতে।

জীবনের রূঢ় পথে এত দূর কোনমতে আসিয়াছি তোমাদের দয়াতে,
যদি মরণেরো পরে ক্ষুধা রয় এ অধরে, তোমরা পিণ্ড দিও গয়াতে।
দাও দাও দাও আরো যতখানি দিতে পারো,
তোমরাই হও খুশি পরিণামে যদি হারো,
মোদের বন্ধ্যাপনা তোমাদের কৃপাকণা পারিত কি সংগ্রহ করিতে,
তোমরা বাঁধিয়া তাল যদি না করিতে আগো, কে পারিত এ আঁধার তরিতে।

কাগজ-নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার সম্প্রতি কাগজ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে রূঢ় কঠিন এবং প্রাণঘাতী অধ্যাদেশ জারি করিয়াছেন, তাঁহার সমর্থনে কি না বলিতে পারি না, 'দি স্টেটসম্যান' একটি গল্প প্রচার করিতেছেন: চীনা পণ্ডিতের নিকট হইতে ভারতীয় লেখকেরা স্বভাবতই কিছু শিক্ষালাভ করিবেন—এই বিশ্বাসে হয়তো গল্পটি প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সেই গল্প ছাপার কাগজে চীনাদের লজ্জা নিবারণ হয়, আর এপারে। তাতেও আমাদের এদিকে ঢাকিতে ওদিকে উদাস হইয়া পড়ে। যাহা হউক, চীনা পণ্ডিতের গল্পটি শুনুন।—

একজন চীনা পণ্ডিত চুয়ানব্বই বৎসর বয়সে হঠাৎ মারা গেলেন, ছাপাখানার জন্যে তাঁর পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হবার আগেই এই দুর্ঘটনা ঘটল। বইটি আকারে অবিশ্যি খুবই ছোট হ'ত—উক্ত মনীষীর জীবনব্যাপী চিন্তার সার-সংগ্রহ। লেখকের যখন মাত্র পঁচাত্তর বছর বয়স তখনই বইটির প্রথম খসড়া সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু তিনি পাকা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার আগে আর একবার অবসর মত সমস্ত বিষয়টা বিচার ক'রে দেখতে মনস্থ করলেন। এই চৈনিক ঋষি পাশ্চাত্ত্য লেখকদের সামনে এক মহৎ আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন। যদি তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ভবিষ্যৎ-বংশধরদের ঋণজালে বদ্ধ করবার জন্যে তাঁর জীবনের দর্শন লিপিবদ্ধ করতে একান্ত অনুরোধ না করতেন, তা হ'লে তিনি কখনই বইখানি লিখতেন না। বিশেষ অনিচ্ছার সঙ্গে তিনি এই কাজে সম্মত হয়েছিলেন, কারণ সময়টা তিনি অন্য অনেক মূল্যবান কাজে ব্যয় করতে পারতেন। তা ছাড়া তাঁর বরাবরই সন্দেহ ছিল বই লেখবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল কিনা।

নিউইয়র্ক টাইম্‌স ম্যাগাজিনে এল. এইচ. আর. লিখিয়াছেন:

শনিবার রাত্রে সপ্তাহের গুরুতর পরিশ্রমের পর যখন ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরি, তখন স্বভাবতই খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রের ষ্টলের সামনে শিলিং থানেকের "খুন" কেনবার জন্যে দাঁড়াই। খুনগুলি সারবন্দী সাজানো থাকে—লাল মলাটে 'সূর্যোদয়ে খুন'; সবুজ মলাটে 'মধ্যাহ্নে খুন' এবং নীল মলাটে 'সূর্যাস্তে খুন'। চোখের আরামদায়ক কমলা রঙে 'বেলা চারটের খুনে'র থাক প্রায় সিলিং পর্যন্ত ঠেকে আছে দেখি। আমি জানি আসছে শনিবার পর্যন্ত এর একখানিও অবশিষ্ট থাকবে না—হলুদরঙা 'প্রাতরাশের সময় খুন' ওই জায়গা দখল করবে। খুন-জুট উপন্যাসের প্রকাশে বারংবার বিলম্বের জন্যে এদিকে প্রকাশকেরা কাগজ-ঘাটতির দোহাই দিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, কিন্তু "খুনে" উপন্যাসের বহর দেখে মনে হয় নিয়ন্ত্রণ-আদেশ এগুলির জন্যে নয়। দোকানদার বলে, যুদ্ধের ব্যাপার বুঝতেই পারছেন, লোকের উত্তেজনা নিবৃত্তির জন্যে কিছু তো দিতে হবে।

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুজাতার মৃত্যুর পরদিন অতি প্রত্যূষে বাবা দরজা ধাক্কা দিয়ে আমাদের দুই ভাইকে ঘুম থেকে তুলে হেদোয় বেড়াতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পাক পাঁচেক চক্কর দিয়ে বাড়িতে এসেই বললেন, জামা-টামা ছেড়ে বই নিয়ে এসে পড়তে ব'স।

তিনি হয়তো মনে করেছিলেন, সব দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টির অভাব ঘটাতেই আমাদের পক্ষে এমন বেয়াড়া হয়ে পড়া সম্ভব হয়েছে। পড়তে বসামাত্র আমার ইতিহাসের বইখানা হাতে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, কুতবউদ্দিন কে ছিল ?

আমার মন তখন কুতবউদ্দিনের চেয়ে অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তি—Mary Godwin, Emily Vivianaর চিন্তায় মশগুল। কুতব-উদ্দিনের মতন লোক সেখান থেকে চিরদিনের জন্যে নির্ব্বাসিত হয়েছে। বাবার মুখে সে নাম শুনে কুতবমিনারের চিন্তায় কড়িকাঠের দিয়ে চেয়ে আছি, এমন সময় খটখট শব্দ শুনে সামনে চেয়ে দেখি যে, ধীর পদক্ষেপে পাগলা সন্ন্যেসী আসছেন আমাদের পড়বার ঘরের দিকে।

খড়ম পায়ে খটখট শব্দ করতে করতে তিনি আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরের মধ্যে একখানা তক্তাপোশ আর তার ধারে খানকয়েক চেয়ার সাজানো থাকত। আমরা বসতুম তক্তাপোশে আর বাবা বসতেন চেয়ারে। ঘরের মধ্যে কোনও গুরুজন থাকলে চেয়ারে বসা আমাদের বারণ ছিল। যাই হোক, পাগলা সন্ন্যেসী ঘরের মধ্যে আসতেই বাবা তাঁকে নমস্কার ক'রে বললেন, বসুন।

পাগলা সন্ন্যেসী মিনিটখানেক চুপ ক'রে ব'সে থেকে আমাদের দেখিয়ে বললেন, আমি এই রামবাবু আর লক্ষ্মণবাবুর বন্ধু।

আমরা প্রমাদ গুনতে লাগলুম। মনে হ'ল, ফাঁড়া এখনও কাটে নি বোধ হয়, নইলে পাগলা সন্ন্যেসীর মতন লোক এমন কাঁচা কাজ করবে কেন ?

বাবা তো একেবারে অবাক! আমাদের দিকে একবার চেয়ে তাঁর দিকে মুখ করতেই তিনি বললেন, আমরা এদের রাম-লক্ষ্মণ ব'লে ডাকি। স্থবির-অস্থির আবার কোন্ দেশের নাম মশায়?

বাবা একটু হাসবার চেষ্টা করলেন মাত্র।

পাগলা সন্ন্যেসী আমাদের দেখিয়ে বললেন, এ দুটি কি আপনার ছেলে?

হ্যাঁ।

এদের মা বেঁচে আছেন?

হ্যাঁ।

মা বেঁচে থাকতেই এই!

বাবা মনে করলেন, তিনি বোধ হয় আমাদের নামে কোন গুরুতর অভিযোগ করতে এসেছেন। একটু সঙ্কুচিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসব প্রশ্ন করছেন বলুন তো?

একটু কারণ আছে। দেখুন, রামবাবু আর লক্ষ্মণবাবু আমার বন্ধু—বিশেষ বন্ধু। আপনি কাল রাতে এদের ওপর যখন অমানুষিক অত্যাচার করছিলেন, তখন আমার উচিত ছিল আপনার হাত থেকে এদের রক্ষা করা। কিন্তু আমি বৃদ্ধ, হয়তো সামর্থ্যে আপনার সঙ্গে আমি পারব না, তাই ভেবে তখন আসি নি। কিন্তু আপনি এদের যত মেরেছেন, তার প্রত্যেকটি আঘাত আমায় লেগেছে। বারদিগর এমন হ'লে আমাকে আসতে হবে।

এমন সব কথা বাবার মুখের সামনে কেউ বলতে পারে, তা আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। বাবা সব শুনে একটু আমতা আমতা ক'রে বললেন, বড় অবাধ্য ছেলে মশাই, কিছুতেই কথা শুনতে চায় না। বড় বদ ছেলে, আপনি চেনেন না এদের।

আমি চিনি না এদের!

পাগলা সন্ন্যেসীর হাসি শুনে বাবা চমকে উঠলেন।

আমি চিনি না এদের! আপনি চেনেন না এদের। আমার তো মনে হয়, এরা মহাপুরুষ। আপনার ভাগ্য যে, এমন সব ছেলে আপনার

ঘরে জন্মেছে।' কিন্তু এদের মানুষ করতে পারবেন না আপনি, আমি দিব্যচক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি।

বেশ বোঝা গেল, আমাদের প্রশংসা শুনে বাবা খুশি হয়েছেন। তিনি বললেন, দেখুন, কথা না শুনলে আমার বড় রাগ হয়, আর একবার রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না। এদের বিকেলে বাড়ি থেকে বেরুতে বারণ করি, কিন্তু কিছুতেই ওরা সে কথা গ্রাহ্য করে না। কি করি বলুন তো?

কেন বাড়ি থেকে বেরুতে বারণ করেন?

বাইরে বদ সঙ্গী জুটতে পারে।

আচ্ছা, আপনি আর ক'বছর এদের বাড়িতে বন্ধ রাখবেন, জিজ্ঞেস করি? ওরা ইস্কুলে যায়, সেখানে তো বদ সঙ্গী জুটতে পারে। তা হ'লে ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়ে ছেলেদের সিন্দুকে তুলে রেখে দিন।

বাবা একটু হাসলেন মাত্র।

পাগলা সন্ন্যেসী আবার শুরু করলেন, আপনি তো এদের বাইরে যেতে বারণ ক'রে দিয়েই নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর, বাইরে এদের বন্ধুবান্ধব রয়েছে, খেলা রয়েছে, কত রকম উত্তেজনা রয়েছে, তার বদলে বাড়িতে কি ব্যবস্থা করেছেন শুনি? মশাই, এই দাড়ি পাকতে সত্তর বছর লেগেছে আমার, ছেলে-বয়েস আপনারও একদিন ছিল, ছেলেদের মনটা সেই বয়েস দিয়ে একবার বুঝতে চেষ্টা করবেন।

বাবা আমাদের বললেন, যাও, তোমরা বাড়ির ভেতরে যাও।

আজ্ঞা পাওয়ামাত্র আমরা বই গুটিয়ে নিয়ে উঠে গেলুম।

তারপর পাগলা সন্ন্যেসীর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধ'রে বাবার আলাপ-আলোচনা চলল।

সেদিন খেতে ব'সে বাবা ঘোষণা করলেন, আচ্ছা, তোমরা বিকেলে ঘণ্টাখানেক ক'রে বেড়িয়ে আসবে। সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরতে হবে, বুঝলে?

গোঠদিদির সঙ্গে আমাদের বাড়ির সবারই খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ ক'রে আমার ও অস্থিরের ছিল সে প্রাণের বন্ধু। সেই মিষ্টভাষী, স্বামীপরিত্যক্তা অসহায়ার চরিত্রে এমন একটা মাধুর্য্য ছিল যে, দুদিনেই

সে অপরিচিতকে আপনার ক'রে নিতে পারত। অথচ সবার চেয়ে আপনার করার যাকে প্রয়োজন, সেই স্বামীকে সে কোনও আকর্ষণেই বাঁধতে পারে নি।

গোষ্ঠদিদির শ্বশুর তাঁর পেন্‌সনের টাকা ও বড়ছেলে যে টাকা পাঠাত সে টাকা তার কাছেই রেখে দিতেন খরচের জন্যে। ভদ্রলোক কখনও তার কাছে কোনও হিসাব চাইতেন না। এজন্যে গোষ্ঠদিদির তহবিল সর্ব্বদা পূর্ণ থাকত। আমরা তার জন্য লুকিয়ে সেকরা ডেকে আনতুম, সে গয়না গড়াত। খাওয়া-দাওয়া তো প্রায় নিত্যই হ'ত। শুক্ল-পক্ষের সময় আগে থাকতে সে পয়সা দিয়ে রাখত আর আমরা লতুদের বাড়ি থেকে ফেরবার মুখে এক চ্যাঙারি খাবার কিনে এনে তার কাছে জমা রেখে বাড়িতে আসতুম। অনেক রাত্রে আমাদের বাড়ি ও পাড়া নিঝুম হয়ে পড়লেও আমরা দু ভাই বাতি নিবিয়ে জেগে প'ড়ে থাকতুম, তারপরে গোষ্ঠদিদির সঙ্কেতধ্বনি শোনামাত্র নিঃশব্দে তাদের ছাতে চ'লে যেতুম। গোষ্ঠদিদি আগে থাকতেই মাদুর বালিশ, কুঁজো গেলাস নিয়ে এসে রাখত। আমরা আগে ভরপেট খেয়ে নিয়ে তারপরে গল্প করতুম। সেই তার ছেলেবেলাকার জীবন; অত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও কদিনের জন্য কার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল, কে তাকে কোন দিন কি মিষ্টি কথা বলেছিল,—কত লোকের কথা, তার স্বামীর কথা, তার অদ্ভুত শ্বশুরের কথা।

আমরাও বলতুম, আমাদের ইস্কুলের কথা, লতুদের কথা, দিদিদের কথা।

গোষ্ঠদিদির সঙ্গে আমাদের সব কথা হ'ত। তার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করলে বলত, ও আমার মাছ খাওয়ার টিকিট।

শ্বশুর মারা গেলে যে তার কি হবে, তাই নিয়ে আমরা তিনজনে যে কত চিন্তা করেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ ক'রে ছাতে ব'সে ভেবেছি, তার ঠিকানা নেই। গোষ্ঠদিদি থেকে থেকে বলত, তোরা আমার রাম-লক্ষ্মণ ভাই রয়েছিস, আমার ভাবনা কি?

মাঝে মাঝে সে আমাদের গল্পের বই নিয়ে আসবার জন্যে তাগাদা দিত। আমরা মধ্যে মধ্যে লতুদের বাড়ি ও দিদিদের ওখান থেকে বই এনে দিতুম। কিন্তু তার ছিল বিপুল অবসর, আর আমাদের যোগান ছিল

অল্প, কাজেই তার বইয়ের পিপাসা কিছুতেই মেটাতে পারতুম না। আমাদের পাড়ায় একটা কনসার্টের আখড়া ছিল, সেখানে তিন-চারটে আলমারি থাকত বইয়ে ভরা। পাড়ার ছেলেরা এটাকে লাইব্রেরি বলত। একদিন আমি সাহস ক'রে এই ক্লাবের একজনের কাছে বই চাইলুম। ক্লাব-ঘরে তখন আর কেউ ছিল না।

আমি বই চাইতেই লোকটা একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি, খোকা, এই বয়সেই নভেল পড়তে শুরু করেছ ?

খোকা যে স্রেফ দয়া ক'রে নভেল লেখা শুরু করে নি, সে কথা তো আর সে জানত না। যা হোক, সে অমর্য্যাদা উপেক্ষা ক'রে বললুম, আমি পড়ব না, গোষ্ঠদিদির জন্যে চাইছি।

লোকটা আমার কথাগুলো ভাল ক'রে শুনতে পায় নি। সে একেবারে খেঁকিয়ে উঠে বললে, গোষ্ঠদা ! কে তোমার গোষ্ঠদা ? সে কি লাইব্রেরির মেম্বার ?

বললুম, গোষ্ঠদা নয়, গোষ্ঠদি।

আহা ! মুহূর্ত্তের মধ্যেই কি অপূর্ব্ব রূপান্তর ! তবু দুর্জ্জনেরা বলে, বাঙালী নারীর সম্মান জানে না।

গোষ্ঠদির নাম শুনেই সে আমায় খাতির ক'রে বসিয়ে ঠারে-ঠুরে তার চেহারাটা কি রকম, তা জানবার চেষ্টা করতে লাগল।

সন্ন্যেসীর ছোট ছেলের বউ বললে না ?

হ্যাঁ।

ও, ওদের বাড়ির ছাতে সন্ধ্যেবেলায় দেখেছি বটে। রংটা খুব ফরসা, না ?

হ্যাঁ, একেবারে দুধে আলতায়।

মুখখানা তো তেমন ভাল নয়।

কেন, গোষ্ঠদির চমৎকার মুখ, যেমন চোখ তেমনই নাক, যেন তুলি দিয়ে আঁকা। আপনি তা হ'লে অন্য কারুকে দেখেছেন।

হ্যাঁ, আমি দুজনকে দেখেছি, তার মধ্যে কোন্‌টি তোমার গোষ্ঠদি, তা তো জানি না।

বলা বাহুল্য, গোষ্ঠদিদের বাড়ি দ্বিতীয় স্ত্রীলোক কেউ ছিল না।

লোকটা কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে আবার বললে, তা গোষ্ঠদি বুঝি তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে ?

হ্যাঁ।

তা দেখ, বিকেলবেলা এস। এখন চাবি নেই, তখন বই বের ক'রে দোব, খুব ভাল বই দোব।

বিকেলে লোকটার কাছে যেতেই সে একখানা চটি বই দিয়ে বললে, এর পরে মোটা বই দোব।

তখন তাড়াতাড়ি নতুনের বাড়ি যেতে হবে, তাড়াতাড়ি বইখানা গোষ্ঠদিকে দিয়েই মারলুম দৌড়, তবু বইখানার নাম মনে আছে,—গয়ার ভূত, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

পরের দিন গোষ্ঠদির সঙ্গে দেখা হতেই সে বললে, হ্যাঁ রে, কার কাছ থেকে বই এনেছিলি ?

কেন ?

কেন কি রে! তার মধ্যে চিঠি দিয়েছে।

সত্যি! দেখি।

প'ড়ে দেখি, লোকটা গোষ্ঠদিকে একখানা দু-পৃষ্ঠাব্যাপী প্রেমপত্র ছেড়েছে। কোন একখানা বটতলার নভেলের সর্ব্বনাশ ক'রে চোখা চোখা প্রেমবাণ ছেড়েছে গোষ্ঠদির উদ্দেশে।

গোষ্ঠদি বললে, বইখানা ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

আমরা বললুম, তুমি বেশ ক'রে গালাগালি দিয়ে একখানা চিঠি লেখ।

আমি গালাগালি জানি না।

তাতে কি হয়েছে, আমরা শিখিয়ে দিচ্ছি।

না না; কি হতে কি হবে, বইটা ফেরত দিগে যা।

বইখানা নিয়ে বাড়িতে রেখে দেওয়া গেল। রাত্রে পড়াশুনো সেরে নিজেদের ঘরে এসে দুই ভাইয়ে মিলে লোকটাকে গালাগালি দিয়ে একখানি চিঠির খসড়া করা গেল। খিস্তিবিদ্যার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা তখন আমরা পার হয়েছি, কাজেই ভাষার অভাব হ'ল না। গোষ্ঠদিদিই

যেন লিখছে, এই ভাবে শুরু করা গেল। তাতে লোকটার পিতৃ ও মাতৃ-পুরুষের সমস্ত গুরুস্থানীয়ার সঙ্গে তার অসম্ভব, অসঙ্গত ও অনৈসর্গিক সম্বন্ধ আরোপ ক'রে শেষে লেখা হ'ল, এমন চিঠি আর যদি আসে, তবে তার মুণ্ডপাত অনিবার্য্য।

পরের দিন 'গয়ার ভূতে'র মধ্যে চিঠি ভ'রে লোকটাকে ফিরিয়ে দিয়ে এলুম। তারপরে অনেকদিন পর্য্যন্ত লোকটা আমাদের দেখলেই মুখ তুলে চেয়ে থাকত। তার মুখ দেখে মনে হ'ত, যেন সে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায়, কিন্তু কোনদিন কিছু জিজ্ঞাসা করে নি।

গোষ্ঠদিদি সব সময়েই বেশ হাসিখুশিই থাকত, কিন্তু মাঝে মাঝে তার কি হ'ত জানি না, সে দিনের পর দিন বিষণ্ণ হয়ে থাকত।

একদিন মনে পড়ে, অনেক রাতে ছাতের ওপরে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই উঠে বসলুম। দেখি, এক পাশে অস্থির প'ড়ে ঘুম লাগাচ্ছে, আর এক দিকে গোষ্ঠদি দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে ব'সে আছে। কৃষ্ণপক্ষের রহস্যময় জ্যোৎস্নার সঙ্গে শরৎশেষের হিমানীর জাল বোনা চলেছে—ঘুমন্ত নগরীর ওপরে কে যেন আবরোঁয়ার মশারি ঢেকে দিয়েছে। দূরে ও কাছের বাড়িগুলো যেন একটা অদ্ভুত আকারের জীব, গাছের মতন তাদেরও প্রাণ আছে, কিন্তু চলবার শক্তি নেই। চারিদিকে দেখতে দেখতে আমার মনটা কেমন ঔদাস্যে ভ'রে উঠতে লাগল। পাশে অস্থির ঘুমিয়ে আছে; গোষ্ঠদিদি তখনও সেই ভাবে দূরে চেয়ে। আমার মনে হতে লাগল, আমরা তিনজন যেন কোন দূর নক্ষত্রের দেশ থেকে এইমাত্র এখানে এসে পড়েছি। আমরা এখানকার কারুর নয়, এখানে আমাদেরও কেউ নেই। এ জগতে এইমাত্র যেন আমার চেতনা আরম্ভ হ'ল। তিনজনে কতদিন একসঙ্গে চলব? সেই মুহূর্ত্তেই মনের মধ্যে কে যেন বললে, তুমি একা। কেন জানি না, আমার মনে হতে লাগল, এদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, দীর্ঘ জীবন-পথ এদের ছাড়াই চলতে হবে। তারপরে কোনদিন কোন লোকে দেখা হতেও পারে, নাও হতে পারে। বুকের মধ্যে সহস্র নিষেধ হাহাকার ক'রে উঠল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ডেকে উঠলুম, গোষ্ঠদি!

কি ভাই?

তুমি কদিন থেকে অমন মনমরা হয়ে রয়েছ কেন? তোমার কি দুঃখ, আমাকে বলবে না ভাই?

গোষ্ঠদি ঘুরে দু হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে আমার গালে মুখ রেখে কাঁদতে লাগল। কয়েক মিনিট সেই ভাবে থেকে মুখ তুলে বলতে লাগল, আমার দুঃখ তো তোরা জানিস। মনে কর, ছেলেবেলায় কবে বাপ-মা হারিয়েছি মনে নেই। মামার ছেলেমেয়ের সঙ্গে মানুষ হচ্ছিলুম, তারা যাকে মা বলে আমিও তাকে মা ব'লে জানি, হঠাৎ একদিন জানতে পারলুম আমার মা নেই, সেদিনকার সে দুঃখ তোরা কল্পনা করতে পারবি না। পুজোর সময় একখানা নতুন কাপড় কখনও পাই নি। তারপরে অন্নকষ্ট। ভগবান শত্রুকেও যেন তা না দেন।

তা বিয়ে হওয়ার পর তোমার সে কষ্ট তো আর নেই।

না, তা নেই বটে, কিন্তু অন্নকষ্ট মিটলেই কি সব কষ্ট মিটে যায়?

ছেলেবেলা থেকে পথে-ঘাটে ভিখিরীর আকূতি শুনে, চাকর-বাকরদের দারিদ্র্য ও অতি সামান্য আহার্য্য দেখে কি জানি মনের মধ্যে ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, অন্নকষ্টই মানুষের জীবনের একমাত্র কষ্ট। এটি কোন রকমে এড়াতে পারলে জীবন সুখময় হয়। অন্নকষ্ট পরমসুখে নিবৃত্তি হওয়ার অনিবার্য্য পরিণামরূপে যে আরও নানা রকম কষ্ট আসতে আরম্ভ করে, তার স্পষ্ট ধারণা তখনও হয় নি।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে গোষ্ঠদিদি আবার বলতে আরম্ভ করলে, এই নির্জ্জন প্রেতপুরী'র মধ্যে একলা জীবন কাটে, একটা লোক নেই যে, মনের কথা দুটো বলি। স্বামী থেকেও নেই, এ কি কম দুঃখ রামিভাই!

গোষ্ঠদিদিকে বললুম, তোমার স্বামী যখন তোমাকে ভালবাসে না, তখন তুমিও অন্য কারুকে ভালবাসতে আরম্ভ কর না কেন?

তাতে লাভ কি?

তার সঙ্গে চ'লে যাবে, সে তোমায় যেখানে নিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে তাই ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাবা রে!

কেন?

যার সঙ্গে যাব, সে যদি কোনদিন ফেলে পালায়! সারাজীবন ভাত-কাপড়ের কষ্ট পেয়েছি, আবার যদি সেই কষ্ট পাই, এখানে দুটি খেতে পাচ্ছি তো!

ভাত-কাপড়ের পাছে অভাব হয়, সেই ভয়ে গোষ্ঠদি পালায় নি; কিন্তু ভবিষ্যতে অনেক মেয়ের মুখে শুনেছি ও নিজেও দেখেছি, যারা ভাত-কাপড়ের অভাব ঘোচাবার জন্যে বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েছে।

শচীনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমাদের সন্ন্যাসব্রত তখনকার মত ভেঙে গিয়েছিল বটে, কিন্তু বছর খানেক যেতে না যেতে আবার আমাদের যুক্তি শুরু হয়ে গেল। প্রমথ গোড়াতেই সাবধান ক'রে দিলে, এবার আর শচেটাকে ভিড়তে দেওয়া নয়।

খুব গোপনে ও সাবধানেই আয়োজন ও পরামর্শ চলছিল, কিন্তু তবুও শচীন একদিন টের পেয়ে গেল। সে অনুতপ্ত হয়ে বললে যে, তখন সে সংসারকে ভাল ক'রে চিনতে পারে নি, এখন সংসারের প্রতি সত্যিই তার আর কোন মায়া নেই, জগৎকে ভাল ক'রেই সে চিনে নিয়েছে।

তিনজনে মিলে আবার পরামর্শ শুরু হ'ল। সেদিন থেকে এ দিনের এক বছরের তফাত। বয়সে মাত্র এক বছর বাড়লেও এরই মধ্যে দশ বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। গাধার পিঠে মাল চাপিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লেই যে শান্তি ও তপস্যামার্গে বিচরণ করতে পারা যায় না, সে বুদ্ধি টনটনে হয়েছে। তাই প্রথমেই আমরা হিংস্র জানোয়ারদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র সংগ্রহ করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

অস্ত্র-আইন থাকলেও তখন বাজারে ভাল ভাল দিশী ও বিলিতী ছোরা কিনতে পাওয়া যেত। আমরা পয়সা জমিয়ে প্রথমেই তিনটি ভাল ছোরা কিনে ফেললুম। তারপরে তিনটি পাকা বাঁশের লাঠি। কামারের দোকানে ইস্পাত দিয়ে তিনটে চমৎকার ধারালো বর্শাফলক বানানো হ'ল। এ ছাড়া প্রমথর গুরুদত্ত সেই মারাত্মক বাণগুলো তো আছেই।

অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া ধান, কাঁচামুগ ইত্যাদি কেনা হ'ল চাষ করবার জন্যে। দেশলাই নেওয়া হ'ল বারো ডজনের একটি বড় বাণ্ডিল। দেশলাই

ফুরিয়ে গেলে শুকনো পাতা সংগ্রহ ক'রে তাতে আগুন ধরাবার জন্তে একটি বড় আতস-কাঁচ ইত্যাদি সব প্রমথদের বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে জমা হ'তে লাগল। এসব ছাড়া ইস্ক্রুপ, পেরেক ও ছুতোর-মিস্ত্রির যন্ত্রপাতিও যোগাড় হ'ল, জঙ্গলে থাকবার মতন অন্তত একখানা ঘরও তৈরি করতে হবে তো!

আবার এক শনিবারে ইস্কুলের ছুটির পর সেই বিরাট বোঝা তিন ভাগে ভাগ ক'রে নিয়ে একটা খাবারের দোকানে ব'সে ভরপেট খেয়ে আমরা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অভিমুখে যাত্রা করলুম। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড আমার চেনা ছিল, অনেকদিন আগে দাদার সঙ্গে এসে দেখে গিয়েছিলুম।

হাওড়ার পোল পেরিয়ে, মাঠের ধার দিয়ে গিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের কাছে এসে কি রকম সন্দেহ হ'ল, এই রাস্তাটা সেই রাস্তা কি না! বোঝার ভারে তখন আমাদের তিনজনেরই অবস্থা কাহিল। পথের ধারে বোঝা নামিয়ে পরামর্শ করতে লাগলুম, অতঃপর কি করা যায়।

কিছুক্ষণ বাদে স্থির হ'ল, আগে কোন লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে নেওয়া যাক, আসলে এটাই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কি না। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা হবে, হাওড়ার মাঠে বোধ হয় কোন খেলা-টেলা ছিল, দলে দলে লোক মাঠের দিকে যাচ্ছিল। দুটি নিরীহগোছের ভদ্রলোক সেই দিকেই যাচ্ছিল, আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ মশায়, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটা কোন্ দিকে?

তাদের মধ্যে একজন, মিনিট খানেক আমার মুখের দিকে কটমট ক'রে চেয়ে থেকে আমাকে বললে, কোথায় যাবে? গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড?

হ্যাঁ।

তোমার বাড়ি কোথায়?

আমার বাড়ি ওক্তোরপাড়া, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারেই।

লোকটা এবার টপ ক'রে আমার একখানা হাত ধ'রে তার সঙ্গীকে বললে, দেখ, আমার মনে হচ্ছে, এ ছোকরা বাড়ি থেকে পালিয়েছে।

আমি কাঁধ থেকে পুঁটলিটা নামিয়ে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলুম। ততক্ষণ প্রমথ ও শচীন কাছে এসে তাদের জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে মশায়, ওকে ধ'রে টানাটানি করছেন কেন?

তোমরা কে ?

শচীন বললে, আমরা এর বন্ধু।

তোমাদের বাড়ি কোথায় ?

শচীন বললে, অত হাঁড়ির খবরে তোমাদের দরকার কি হে ? যাও না, যেখানে যাচ্ছ সেদিকে এগিয়ে পড়।

ব্যাপারটা হয়তো সহজেই মিটে যেত, কিন্তু আমাদের মুখে ওই রকম চোটপাট জবাব তারা বরদাস্ত করতে পারলে না, তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। একজন বললে, ধর এদের। ছোঁড়াগুলো নিশ্চয় বাড়ি থেকে ভেগেছে।

একজন প্রমথর হাত চেপে ধ'রে বললে, চল, তোমাকে থানায় যেতে হবে।

প্রমথ ছিল রোগা, তার গায়েও মোটে জোর ছিল না। সে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু পারলে না। আমি গিয়ে লোকটার হাত ছাড়িয়ে দিলুম। ইতিমধ্যে তাদেরই আরও দু-তিনজন বন্ধু মাঠের দিকে যাচ্ছিল, তারা ওই রকম হুটোপাটি দেখে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে হে ?

একজন বললে, এই ছোঁড়াগুলো বাড়ি থেকে পালাচ্ছে, চল, এদের ধ'রে থানায় নিয়ে যাওয়া যাক।

তারাও আগের লোক দুটোর সঙ্গে জুটে গিয়ে আমাদের টানাটানি আরম্ভ ক'রে দিলে। আমরা ছেলেমানুষ হলেও নেহাত দুর্ব্বল ছিলুম না। ব্যায়াম করে না এমন দু-তিনজন যুবকে মিলেও চট ক'রে আমাদের কাবু করতে তো পারতই না, বরং বিপদে পড়ত। তার ওপরে মারামারির প্রতি আমার ও শচীনের এমন একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল যে, যেখানে সামান্য দু-চারটে কথা-কাটাকাটি হয়ে মিটে যেতে পারে, সেখানে হাঙ্গামা না বাধিয়ে আমরা পারতুম না। এই যে চার-পাঁচজন লোক, তাদের প্রত্যেকেরই বয়স বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশের কম হবে না, তবুও মারামারির গন্ধ পেয়ে আমি আর শচীন একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলুম, শুধু ভয় হচ্ছিল, কখন তারা পোঁটলা খুলে দেখে ফেলে।

মিনিট দু-তিনের মধ্যে হৈ-হৈ ব্যাপার লেগে গেল। একজন আমাকে কোল-পাঁজা ক'রে তুলে ধরামাত্র তার থুঁতনিতে জুতো সমেত এমন একটি লাথি লাগালুম যে, তার দাড়ি কেটে দরদর ক'রে রক্ত ঝরতে লাগল। আমাদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল, সর্ব্বাঙ্গ কেটে রক্ত পড়তে লাগল।

আমরা এদিকে যখন আক্রমণে ও আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, সেই অবকাশে একটা লোক প্রমথ বেচারীকে ধ'রে খুব ঠেঙাতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মারের চোটে প্রমথ ক্ষিপ্ত হয়ে শেষকালে পুঁটলি থেকে বর্শা বের ক'রে নিয়ে আততায়ীর উরুতে ঘ্যাচ ক'রে বসিয়ে দিলে।

ব্যাপারটি যে এতদূর গড়াবে, ওরা তা কল্পনাও করতে পারে নি। বর্শার আঘাত পেয়েই সে লোকটা—ওরে বাবা, ছুরি মেরেছে রে! ব'লেই রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। প্রমথ তার পোঁটলা তুলে নিয়ে মারলে দৌড়।

লোকটা শুয়ে পড়তেই আমাদের আততায়ীরা ও যে যে সব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ মজা দেখছিল, তারা আমাদের ছেড়ে সেদিকে ছুটল। সে সময় রাস্তার ওপর দিয়েই মার্টিন কোম্পানির ছোট রেল চলত, ভাগ্যক্রমে একটা ট্রেন এসে পড়ায় যে যার চারদিকে ছিটকে পড়ামাত্র আমি আর শচীন পোঁটলা তুলে নিয়ে মারলুম দৌড়। দূর থেকে এক-আধটা চীৎকার—পাকড়ো, পাকড়ো, পুলিস ইত্যাদি শোনা যেতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে হাওড়া টাউন হলের কাছে এসে দেখি, প্রমথ সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। আমরা আর বাক্যবিনিময় না ক'রে দৌড়ে হাওড়া স্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। আধ ঘণ্টাটাক স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বুক-ধড়ফড়ানি ক'মে গেলে পোল পেরিয়ে বড়বাজারে এসে পড়লুম। সেখানে একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান কেনা হ'ল। দোকানে একটা বড় আয়না ছিল, তাতে আমাদের চেহারা দেখে একেবারে আঁতকে উঠলুম। মুখময় কালশিরে, জামা ছিঁড়ে কুটিকুটি, চুল উস্কখুস্ক, শচীনের মাথার খানিকটা চুলই নেই, প্রমথর বাঁ কানটা ছিঁড়ে গেছে, রক্ত গড়িয়ে গলা অবধি নেমেছে—সে এক বীভৎস দৃশ্য!

পরামর্শ ক'রে বাড়ি ফেরাই সাব্যস্ত হ'ল, এত বড় বাধা যে ওপরওয়ালারই ইঙ্গিত তা মেনে নিয়ে আমরা ক্ষুণ্ণমনেই বাড়িমুখো হলুম। প্রমথকে পৌঁছে দিয়ে আমি যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সেই অল্প আলো অল্প অন্ধকারে কাঁধের বোঝা এক জায়গায় লুকিয়ে চুপিচুপি নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময়—যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়—

ইস্কুল থেকে আমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে মা ছটফট করছিলেন। তিনি বোধ হয় কিছু সন্দেহ ক'রে আমাদের ঘরে এসে জিনিসপত্র ওটকাচ্ছিলেন। এমন সময় আমার সেই মূর্ত্তি দেখে একেবারে শিউরে উঠলেন।

বললুম, টেরিটিবাজারে গিয়েছিলুম এক বন্ধুর জন্যে খরগোশ কিনতে। পথে তিন-চারটে ফিরিঙ্গী ছেলে খরগোশ কেড়ে নেবার চেষ্টা করায় ভয়ানক মারপিট হয়ে গিয়েছে।

মা আর দ্বিরুক্তি না ক'রে আমার পিঠে গদাগম পাঁচ-সাতটি কিল চাপিয়ে বললেন, পোড়ারমুখো ছেলে ডনকুস্তি ক'রে আর বাদাম-বাটা খেয়ে গুণ্ডা হয়েছ, না! সন্ধ্যেবেলা গুণ্ডামি ক'রে বাড়ি ফেরা হ'ল।

তারপরে টানতে টানতে কলতলায় নিয়ে গিয়ে গা থেকে কাদা তুলতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। শরীরের কত জায়গায় যে কেটে ছিঁড়ে গিয়েছিল তার আর ঠিকানা নেই, যেখানেই জল লাগে সেখানটাই জ্বালা করতে থাকে।

স্নান ক'রে উঠে সর্ব্বাঙ্গে তাপ্পি মেরে পাগলা সন্ন্যেসীর কাছে যাওয়া গেল। তিনি বাড়িতে বউমা ও ঝি-চাকরদের ওপরে হোমিওপ্যাথির হাত পাকাতেন। সেখানে গিয়ে এক ফোঁটা ওষুধ খেয়ে টেরিটিবাজারে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মারপিটের এক লোমহর্ষণ বর্ণনা করা গেল তাঁর কাছে। আর এক প্রস্থ বর্ণনা গোষ্ঠদিদির কাছেও করতে হ'ল। সেখান থেকে ফিরে বাবার কাছে আরও বাড়িয়ে বলা গেল। বাবা সব শুনে বললেন, বাড়িতে কিছু না জানিয়ে টেরিটিবাজারে যাওয়াটা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু তোমরা যে মার খেয়ে পালিয়ে আস নি, তাদেরও মেরেছ, এতে আমি খুবই খুশি হয়েছি।

সত্যি কথা বলতে কি, বার কয়েক সেই কাল্পনিক ফিরিঙ্গী-নন্দনদের সঙ্গে মারামারির বর্ণনা ক'রে হাওড়ার মাঠের ধারের ব্যাপারটা মন থেকে এক রকম মুছে যেতে লাগল, আর সেই জায়গায় টেরিটিবাজারের মারামারির একটা ছবি সমুজ্জ্বল হতে আরম্ভ হ'ল।

সন্ধ্যেবেলা লতুদের ওখান থেকে অস্থির ফিরে এসে আমার সর্ব্বাঙ্গে ওই রকম তাপ্পি আর পটি মারা দেখে অবাক হয়ে গেল। আমাদের পলায়নের সমস্ত খুঁটিনাটিই অস্থির জানত। এও ঠিক ছিল যে, সন্ন্যেসী-লাইনে কিছু উন্নতি করতে পারলেই তাকে খবর দোব, আর সেও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু সে লাইনে পা দিতে না দিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার চেহারার ওই বিষম পরিবর্ত্তন দেখে সে বেচারী শঙ্কিত হয়ে পড়ল।

রাত্রে শোবার সময় আসল ঘটনাটি অস্থিরকে খুলে বলা গেল। তার পরে গুপ্তস্থান থেকে পোঁটলাটি বের ক'রে বর্শা, ছোরা, করাত, র‍্যাঁদা প্রভৃতি যন্ত্রগুলিকে লুকিয়ে ফেলা হ'ল।

পরের দিন বিকেল হতে না হতে লতুদের ওখানে যাত্রা করা গেল। টেরিটিবাজারে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মারামারির কাহিনীটি সেখানে বেশ সমারোহ ক'রে ব'লে বাহাদুরি নেবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে চাকরের কাছে শুনলুম, বাবা, মা, ললিত ও তার ছোট বোন কোথায় গিয়েছে, শুধু বড় দিদিমণি অর্থাৎ লতু বাড়িতে আছে।

খবরটা শুনে নিরুৎসাহ হয়ে পড়া গেল। তবুও লতুকেই গল্পটা শোনানো যাবে স্থির ক'রে তিন লাফে ওপরে উঠে গিয়ে এঘর ওঘর খুঁজে দেখলুম, লতু নেই। শেষকালে ছাতের ঘরে তাকে আবিষ্কার করা গেল, সে জানলার ধারে বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে আছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই লতু আমার দিকে ফিরে এক অদ্ভুতভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে চাইলে। আমার ওপরে অভিমান হ'লে সে ওই রকম করত। আমি তার পাশে ব'সে জিজ্ঞাসা করলুম, অসুখ করেছে লতু?

লতু আমার দিকে ফিরে চাইলে, চোখে তার অশ্রু। লতু বললে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সত্যি বলবি?

লতুকে এতখানি গম্ভীর হতে কখনও দেখি নি। বললুম, বলব।

তুই নাকি কাল বাড়ি থেকে চ'লে গিয়েছিলি সন্ন্যেসী হবার জন্যে?

আমি একেবারে স্তম্ভিত, বাক্যহীন।

বল্।

কে বললে?

অস্থির।

চুপ ক'রে ব'সে অস্থিরের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভাবছি, লতু আমায় ঠেলা দিয়ে বললে, কেন গিয়েছিলি বল্—কোন্ দুঃখে?

লতুর কথার মধ্যে কি শক্তি ছিল বলতে পারি না, আমার মনে হতে লাগল, যেন ঘোরতর দুঃখ আমাকে ঘিরে ফেলেছে। নইলে আমার বয়সী ছেলে কোথায় হেসে খেলে দিন কাটাবে, তা না ক'রে সে বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চ'লে যেতে যাবে কেন? তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল এসে গেল। ধরা গলায় বললুম, তুমি জান না লতু। আমার যা দুঃখ, তা কেউ বুঝতে পারবে না। আমাকে কেউ ভালবাসে না, কার জন্যে থাকব?

লতুর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গালের ওপরে গড়িয়ে পড়ল। সে আবার বললে, একটা কথা সত্যি বলবি?

বলব।

তুই কারুকে ভালবাসিস?

ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ।

কাকে ভালবাসিস, বলতে হবে।

সে তুই জেনে কি করবি? কোনও লাভ নেই তোর।

হ্যাঁ, আমার লাভ আছে, বলতেই হবে।

লতুর মুখের দিকে চাইলুম। তার চোখে অপূর্ব্ব আলো, অশ্রুতে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ঠোঁট দুটো থরথর ক'রে কাঁপছে। আমার বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা কষ্টদায়ক অনুভূতি হতে লাগল।

বুক ঠুকে ব'লে ফেললুম, আমি তোকে ভালবাসি।

বলামাত্র লতু ঝাঁপিয়ে আমার বুকের ওপরে পড়ল। তারপরে চুম্বনে অশ্রুতে কোলাকুলি।

স্তব্ধ বনস্থলীতে হঠাৎ ঝড় উঠলে প্রথমে যেমন দূর—বহুদূরাগত জয়-ধ্বনির মত শব্দ হতে থাকে, তারপরে সেই অখণ্ড আওয়াজ বাড়তে বাড়তে সমস্ত অরণ্যব্যাপী উল্লাস জাগে, এসেছে, এসেছে, ওরে এসেছে রে! বিশাল বনস্পতি থেকে আরম্ভ ক'রে শিশু বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যে জননী ধরণী নিয়ত স্তন্যদানে তাদের পোষণ করেছে, তার বুক ছিঁড়ে এই নবচেতনার উন্মাদনায় ভেসে যেতে চায়, কামদেবের ফুলধনুর স্পর্শমাত্র সেই কৈশোরেই আমার মনের অবস্থা সেই রকম হয়ে পড়ল। মনের সমস্ত বৃত্তি, জীবনের সমস্ত কামনা লতুকে ঘিরে—সে যেন আমার চোখের সেই অঞ্জন, যা লাগলে পৃথিবীর সব কিছুই সুন্দর ঠেকে। ধরণী আমার কাছে সুন্দরতর হয়ে উঠল।

একদিন পাগলা সন্ন্যেসী বললেন,'রামবাবু, তোমাকে ব্রাদার কিছুদিন থেকে যেন কেমন-কেমন দেখছি! লভে-টভে পড়েছ নাকি?

গোষ্ঠদিদিকে আগেই লতুর সব কথা বলেছিলুম, সেদিন তাঁকেও বললুম।

আমার কথা শুনে পাগলা সন্ন্যেসী বললেন, সাবাস ব্রাদার! কাল থেকে বায়রন পড়া যাবে, কি বল?

জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা পাগলা সন্ন্যেসী, আপনি কখনও প্রেমে পড়েছিলেন?

তিনি হেসে উঠলেন, কিন্তু সে কাষ্ঠহাসি তখুনি থেমে গেল। অশ্রু-রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, সে কথা কি আর মনে আছে! আমাদের জীবন বৃথাই কেটেছে ব্রাদার, বৃথাই কেটেছে—

Like the ghost of a dear friend dead
Is Time long past
A tone which is now forever fled,
A hope which is now forever past
A love so sweet it could not last
Was Time long past.

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

বিজয়িনী

অশ্রুধারায় চোখে পড়িয়াছে ছানি
আব্ছা হয়েছে ধরার মূরতিখানি
এখন কেবল কানে শুনি তার বাণী
বিচিত্র ধ্বনিজাল   কাঁসর ঘণ্টা ঝাল !
তার মাঝে কলকুহরণ শুনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

গর্জিয়া ধায় বিমান ট্যাক্সি জিপ
ছুটে চলে ট্যাঙ্ক্ মত্ত সরীসৃপ
শঙ্কায় ঢাকা নগর অপ্রদীপ !
সে সময় ফুটপাথে   চটুল চরণ-পাতে
লঘু চঞ্চল পদধ্বনি শুনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

রেডিওযন্ত্রে হুঙ্কারে ওস্তাদ !
বিলাতী ঐক্যবাদন সিংহনাদ !
প্রোপাগাণ্ডার উগ্র বিসম্বাদ !
সহসা মধূচ্ছ্বাসে   উর্মিল কলভাষে
উচ্ছলি বহে সুর-সুরধুনী কার—
তরুণী আধুনিকার !

চারিদিকে ওঠে ঘন কান্নার রোল্
চীৎকার হানাহানির গণ্ডগোল্
কামানের মুখে বল্ হরি হরি বোল !
এ সবার মাঝখানে   নির্ভয় কেবা আনে ?
হাসির মুক্তা সযতনে চুনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

দুর্য্যোগ নিশা ; অন্তরে ব্যাকুলতা—
অভ্র গরজে কুলিশ-কঠোর কথা—
জলদের বুকে শিহরে তড়িল্লতা !
মত্ত ঝঞ্ঝাবাতে শ্রাবণ-গহীন রাতে
চরণছন্দে বাজে রুনুঝুনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

মুখর ধরার বিপ্লব মাঝে, অয়ি
বিজয়িনী, তুমি যুদ্ধে হয়েছ জয়ী
কণ্ঠে নূপুরে কঙ্কণে বাঙ্ময়ী !
অশ্রু-নদীর তীরে তুহিন-কঠিন নীরে
প্রাণের আগুনে জলজল ধ্বনি কার—
তরুণী আধুনিকার !

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পিঞ্জর

চরের ওপরে বনঝাউয়ের দল দুলছে সারি সারি। মহানন্দা স'রে গেছে, এখানে ওখানে সমুন্নত বালুচরের মধ্য দিয়ে তিন-চারটি জলরেখা। ছোট বড় নানা জাতের বক সেই চরের আনাচে-কানাচে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে উদ্‌গ্রীব চোখে জলের দিকে তাকিয়ে আছে, মাছের ঠিকানা পেলেই জলে ছোঁ মারবে। ভাঙা পাড়ের গায়ে গাং-শালিকের গর্ত—কোন-কোনটায় মেছো-আলাদ সাপের আস্তানা। আধডুবো নৌকোর জীর্ণ মাস্তুলের গায় নীলরঙের মাছরাঙা ধ্যানস্থ।

হাতে যখন কোনও কাজ থাকে না আর পড়তে পড়তে যখন মাথাটার ভিতর ধ'রে ওঠে, তখন চশমা খুলে বই বন্ধ ক'রে সুবোধ সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকায়। মহানন্দার বুকে দিনান্ত। বাঁ দিকে অনেক দূরে

নিমাসরাই স্তম্ভের উঁচু মাথাটা কালো হয়ে আসছে রাত্রির রঙে। ওপারে আমের বনগুলো ক্রমেই একাকার হয়ে যাচ্ছে, ভাঙা পাড়ের গায়ে গৃহপ্রত্যাশী গাং-শালিকেরা কোলাহল করছে। একটির পর একটি বক মহানন্দার চর ছেড়ে উঠছে আকাশে, তীক্ষ্ণ কর্কশ চীৎকার ক'রে পাখা মেলে ম্লানায়মান দিগন্তের দিকে উড়ে যাচ্ছে। মহানন্দার জল-রেখাগুলো সূর্য্যের শেষ আলো নিয়ে ঝলমল করছে এখনও।

ওই নিমাসরাই স্তম্ভটার নীরব গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে সুবোধ নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে। ওটা কিসের প্রতীক, কে জানে! জনশ্রুতি ওটা নিয়ে নানা কাহিনী রচনা করে। কেউ বলে, ওটা কারও বিজয়-স্তম্ভ; কেউ বলে, যখন দূরে শত্রু আসবার সংবাদ পাওয়া যেত, তখন ওই স্তম্ভের গায়ে অজস্র মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে গৌড়ের অধিবাসীদের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে দেওয়া হ'ত। কোন্‌টা যে সত্যি, কেউ বলতে পারে না। গৌড়ের রণ-গর্জ্জিত কলমুখর ইতিহাসের যেদিন অবসান হয়ে গেছে, সেদিন থেকেই ওই স্তম্ভটাও চির-নীরবতায় ডুব দিয়েছে।

চাকর আলো নিয়ে এসে রাখলে ঈজি-চেয়ারের হাতলে। আর খবরের কাগজ। মুখ তুলে সুবোধ বললে, ডাক এসেছে?

এই তো এল।

চিঠিপত্র?

কিছু নেই বাবু।

চিঠি আসে নি। সুবোধ নিরাশ হ'ল না। চিঠি কে লিখবে তাকে! রাজবন্দীর নিঃসঙ্গ নির্জ্জন জীবন—বাংলা দেশের এক প্রান্তে সে অন্তরীণ হয়ে আছে। আত্মীয়স্বজনের গণ্ডি তার প্রসারিত নয়, বাপ-মাকে ভাল ক'রে মনে করতে পারে না। খুড়োর সংসারে মানুষ। খুড়ো আগে খোঁজখবর নিতেন, কিন্তু সম্প্রতি সরকারী উকিলের পদপ্রাপ্তি ঘটায় তিনি কিছুটা নীরব হয়ে গেছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি স্নেহপ্রবণ হয়ে উপজীবিকাকে বিপন্ন করবার কোনও অর্থ হয় না।

একটা নিশ্বাস ফেলে সুবোধ খবরের কাগজ খুললে। বাংলা দেশে

অশান্তি। রাজনৈতিক বিক্ষোভ। পার্লামেণ্টে হোম সেক্রেটারির অপভাষণ। ব্যবস্থাপক সভায় বিভিন্ন দলীয় সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি। মোহনবাগান দলের অপ্রত্যাশিত পরাজয়। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের নীতারে সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা। কচুরিপানা সম্পর্কে নির্বোধ গবেষণা। কাটোয়া লাইনের কোন্ এক স্টেশনে আলোর সুবন্দোবস্ত না থাকায় যাত্রীদের ধন প্রাণ বিপন্ন হচ্ছে—পত্রপ্রেরকের সোচ্ছ্বাস ক্রন্দন।

চোখ বুলিয়ে সুবোধ খবরের কাগজ নামিয়ে রাখলে। মন ভরে না। এ কি বাংলা দেশের খবর? এ কোন্ বাংলা দেশ? ব্যবস্থাপক সভায় যে বাংলা দেশের মন্ত্রিত্ব-সংকট উদ্দাম হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে এর যোগসূত্র কোথায়? এই থানায় আজ দেড় বছর সুবোধ অবতীর্ণ হয়ে আছে। ওই তো মহানন্দার ওপারে জেলেদের গ্রাম। এই দেড় বছরেই ওই গ্রামটার কি সুস্পষ্ট রূপান্তর সুবোধের চোখে পড়ল! বছর বছর নদী ম'রে যাচ্ছে, উত্তর-বাংলার প্রধান প্রাণপথ এই মহানন্দার অপমৃত্যু দুপাশেও শ্মশান রচনা ক'রে চলেছে। নদীতে মাছ পড়ে না। ম্যালেরিয়া নিচ্ছে মহামারীর রূপ। জেলেদের ওই গ্রামটির অতীত সমৃদ্ধি এখনও বোঝা যায় ওর মাটকোঠা আর টিনের চালা দেখে। কিন্তু যে মাটকোঠা একবার ভেঙে পড়েছে, সে কোঠা আর গ'ড়ে ওঠে না, যে খড়ের চালা একবার ঝড়ে পড়েছে, সে চালা আর মাথা তোলে না। চৈত্র মাসে গম্ভীরা গানের সমারোহ গত বারের চাইতে এবারে অনেক কম। সন্ধ্যাপ্রদীপের শিখাগুলো দিনের পর দিন ম্লান হয়ে আসছে। শুধু আশ্বিন-কার্তিকে বাঁ দিকের শ্মশান-ঘাটটায় গেল বছরের চাইতে এবারে চিতা জ্বলেছে অনেক বেশি।

এই বাংলা দেশ। মন্ত্রীসভায় এর সত্যিকার সংকট প্রকাশ পায় না। কচুরিপানার সমস্যাও হয়তো এর চূড়ান্ত সমস্যা নয়। বন্যার মত নিঃশব্দ আর অনিবার্য মৃত্যু এর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। বিদ্যুতের আলোর মাইনাস পাওয়ার চশমা চোখে এঁটে এ. পি.র সংবাদকে আশ্রয় ক'রে যারা বাংলা দেশের অবস্থা নিয়ে নিবন্ধ লিখছে,

এই মৃত্যু-জর্জর গণদেবতা তাঁদের কাছ থেকে পাচ্ছে কোন্ সঞ্জীবনীর মন্ত্র, অভাবুগকে কতটুকু সান্ত্বনার বাণী!

সমস্ত শরীর জ্বালা করছে, টিপটিপ করছে মাথাটা। মস্তিষ্কের মধ্যে কে যেন পেরেক ঠুকে চলেছে ক্রমাগত। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে কয়েকটা অ্যাস্‌পিরিন আনাতে হবে আবার। কিন্তু বাংলা দেশ। ওপারে আমবাগানে ডেকে উঠছে শেয়াল—শবযাত্রার পথে যেন উল্লসিত হরিধ্বনি। আজ যদি সে বাইরে থাকত, কত কাজ করবার ছিল তার! নিরুদ্ধ কর্মপ্রেরণা বুকের মধ্যে নিষ্ফল আক্রোশে আঘাত করছে।

পড়লেন কাগজ?

থানার দারোগা এসে দাঁড়ালেন। মুসলমান ভদ্রলোক, অমায়িক, স্বল্পভাষী। সুবোধের এই বন্দিত্বের জন্যে যেন তিনিই অপরাধী, এই জাতীয় একটা সংকোচ সব সময় তাঁকে কুণ্ঠিত ক'রে রাখে।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে সুবোধ বললে, বসুন।

দারোগা বসলেন। ধড়াচূড়া ছেড়ে একখানা লুঙ্গি আর একটা সিল্কের শার্ট প'রে এসেছেন। আরাম ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন, আর একটা এগিয়ে দিলেন সুবোধকে। বললেন, তারপর, আজকের খবর কি বলুন?

নতুন খবর আর কি থাকবে! সেই পুরনো কপচানি।

তা ঠিক। আরামের একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন দারোগা। খবরের কাগজে কিছুই পড়বার থাকে না আজকাল।

দারোগার মনের ভাব সুবোধ বোঝে। খবরের কাগজে বিশেষ কিছু না থাকলেই খুশি হন তিনি। এত খবর, এত কোলাহল, মানুষের মস্তিষ্ক আর স্মৃতির ওপর অহেতুক অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। কি হবে এত খবর দিয়ে! দৈনন্দিন জীবনে কোলাহলের অন্ত নেই, অভাব নেই সমস্যার। চুরির এজাহার লিখতে হয়, ফেরারীর খবর রাখতে হয়, দাগীদের ওপর মেলে রাখতে হয় সজাগ দৃষ্টি; ডাকাতির সংবাদ এলেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে হয় হন্তদন্ত হয়ে; তার ওপর জাতীয় আর আন্তর্জাতীয় সমস্যা এসে ভিড় করলে জীবনধারণ দুঃসহ হয়ে ওঠে। খবরের কাগজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা দৈনিক আলাপের মুখবন্ধ মাত্র।

আপনার থানায় নিশ্চয় খবরের অভাব নেই ?

নিশ্চয় নেই। দারোগা এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে বসলেন। থানার খবরের ভাবনা কি ! এই তো সকালে কাশিমপুর ছুটতে হয়েছিল। আল ভেঙে লাঙল দিয়েছিল, তাইতে মস্ত হাঙ্গামা হয়ে গেল। তিনটের মাথা ভেঙেছে, একটা বোধ হয় বাঁচবে না।

ধরলেন আসামী ?

একটা হাই তুলে উদাসকণ্ঠে দারোগা বললেন, হ্যাঁ, দু পক্ষের গোটা দশ-বারোকে ধ'রে চালান দিয়ে দিলাম। আর বলেন কেন মশায়, যত ঝকমারির কাজ। সাতজন্মের পাপ না থাকলে পুলিসের দারোগা হয় না কেউ।

বাঃ, ইংরেজ রাজত্বে আপনারাই তো লাট সাহেব। এমন সম্মান আর প্রাপ্তিযোগ—

সম্মান আর প্রাপ্তিযোগ ! দারোগা ভ্রূকুটি করলেন : সে সব লাস্ট সেঞ্চুরির মিথ মশায়। সম্মান তো দিনরাত 'শালা' বলছে। আর প্রাপ্তিযোগ ! দারোগা বুদ্ধজুটি আন্দোলিত করলেন : লোকে আজকাল চালাক হয়ে গেছে। ঘুস দূরে থাক, পাঁচটি টাকা সেলামির লোভ করলে টানাটানি !

তা হ'লে খুব দুঃসময় যাচ্ছে আপনাদের।

দুঃসময় ছাড়া আর কি ! মাথার মত পাটান আর ইন্সপেক্টার থেকে এস. পি. পর্যন্ত তিন শো তেত্রিশ দেবতার পুজো। জান-প্রাণ বেরিয়ে গেল।

এদিকে আমবাগানের জংলা গলিপথে লণ্ঠনের আলো পড়ল। চ্যারিটেব্‌ল ডিসপেন্সারির সরকারী ডাক্তারবাবুর বাসা ওখানে। পাশা খেলায় ডাক্তারবাবুর দুর্দান্ত নেশা। যেদিন সন্ধ্যায় কল থাকে না, সেদিন পাশার ছক আর গুটি নিয়ে ডাক্তার এসে বসবেনই। সেইজন্যে সবাই ডাক্তারের নাম দিয়েছে শকুনি। তাই ব'লে ভদ্রলোক শকুনির মত মারাত্মক মোটেই নন—প্রবীণ এবং সদানন্দ।

দারোগা বললেন, শকুনি আসছে।

কিন্তু যে এল, সে ডাক্তার নয়। আগে আগে লণ্ঠন হাতে

ডাক্তারখানার মুইপার মধু, পেছনে একটি যোড়শী—ডাক্তারবাবুর বড় মেয়ে সীতা। একখানা থালার ওপরে তিন-চারটে বাটি সাজানো। বললে, মা পাঠিয়ে দিলেন।

সুবোধ হাসলে। যে রকম দেখছি, তাতে আমার রান্নাবান্নার পাট তুলে দিয়ে তোমাদের ওখানে পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে নিলেই পারি।

সীতা সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলে, বেশ তো।

ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর খাবারটা ঢেকে রাখলে সীতা। একটা কাচের গেলাসে জল ভ'রে রাখলে তার পাশে। তারপর তাকিয়ে দেখলে বিছানাটার দিকে। ভদ্রলোক কি অসম্ভব অগোছালো! বেড-কভারটা অর্দ্ধেক লুটিয়ে আছে মাটিতে, বিছানার ওপর স্তূপাকারে বই ছড়ানো। ফাউন্টেনপেনটা প'ড়ে আছে খোলা অবস্থায়, বালিশের ওপরে খানিকটা কালি ছিটানো। সুটকেসের পাল্লাটা আধ হাত ফাঁক হয়ে আছে, যা ইঁদুর এখানে, ভেতরে ঢুকে কেটে কুটে সব শেষ ক'রে দেবে। এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত করলে সীতা। তারপর যত্ন ক'রে ঝেড়ে দিলে বিছানাটা, বই আর কলম তুলে রাখলে, সুটকেসের কল দুটোকে আটকে দিলে। শান্ত সুন্দর মুখখানার ওপর আকস্মিক লজ্জার একটা অরুণিমা ছায়া ফেলে গেল, মৃদু নিশ্বাস পড়ল নিজের অজ্ঞাতেই।

যাওয়ার সময় সীতা বললে, একটু লক্ষ্য রাখবেন, বেরালে খেয়ে না যায়।

সুবোধ মাথা নেড়ে জানালে, আচ্ছা।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলে, তোর বাবা কোথায় রে সীতু?

বাবা? সীতা হেসে দাঁড়াল। আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললে, টাউনে গেছেন। ফিরতে রাত হবে।

আমবাগানের অন্ধকারে লণ্ঠনের আলোটা মিলিয়ে গেল।

ওঃ, তা হ'লে আজ আর পাশা জমবে'না। ওঠা যাক, কি বলেন?

আসুন।

তিন পা এগিয়ে দারোগা ফিরে তাকালেন একবার।—ভাল কথা, অসুবিধে হচ্ছে না তো কোনও রকম? কোনও কম্‌প্লেন—

না, কিছু না।

আচ্ছা। দারোগা চ'লে গেলেন।

আবার একা। মহানন্দার বুক থেকে আসছে ভিজে বাতাস, লণ্ঠনের শিখাটা একটু একটু শিউরে উঠছে। নিমাসরাই স্তম্ভটা অন্ধকারে নিমগ্ন। বালুচর আর জলধারাগুলো যেন তামায় তৈরি—অস্পষ্ট আর অনুজ্জ্বল, তারার আলোয় লালাভ। গাং-শালিকের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওপারে জেলেপাড়ায় একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে, বোধ হয় গাবের রস জ্বাল দিচ্ছে ওরা।

কি আশ্চর্য্য জীবন! কর্ম্মহীন, ঔৎসুক্যহীন—একটা চূড়ান্ত নির্ব্বেদ সমস্ত স্নায়ুগুলোকে সমাচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে। কবে একদিন বুকের মধ্যে আগুন জ্ব'লে উঠেছিল, দ্বীপান্তরের পার থেকে একদিন কার কাতর কান্না এসে স্বপ্নাতুর নিশ্চিন্ত ছাত্রজীবনকে জোয়ারের তরঙ্গে দুলিয়ে দিয়েছিল। এই মৃত্যুকে ছেদন করতে হবে—দূর করতে হবে এই ভয় আর অন্যায়ের শাসনকে। ওরে ভীরু, ওরে দূত, তোমার নিঃসংকোচ মস্তক তোল আকাশে; মনে রেখো, দেবতার দীপ হাতে রুদ্রদূতরূপে আবির্ভূত হয়েছ তুমি, যত শৃঙ্খল, যত বন্ধন তোমার চরণ বন্দনা ক'রে নমস্কার জানাচ্ছে। সত্যের মৃত্যু নেই!

সেই সব উন্মত্ত চঞ্চল দিন। অগ্নি-দীক্ষা। আদর্শের পায়ে নির্ব্বিচার প্রাণবলি। আজ মহানন্দার পারে এই শান্ত সন্ধ্যায়, তারায় সমুজ্জ্বল এই বিবর্ণ আকাশের নীচে সে চঞ্চলতা কোথায়! কোনও কিছুতে আসক্তি নেই, বন্ধন নেই, আদর্শের সেই আগ্নেয় প্রেরণাও কি নিবে গেছে? মরে-যাওয়া নদীর মত মন্থর গতিহীন সময়। তাড়া নেই, তাগিদ নেই কিছু। বৃহৎ বাংলা, বৃহত্তর ভারত—কারও রূপই মনের সামনে বিশ্বরূপ হয়ে দেখা দেয় না। এখানে বাংলা দেশ বলতে ওই জেলেদের গ্রাম, ওদের নির্ব্বিরোধ অপ্রসর জীবন—চিন্তাভাবনা যা কিছু সব যেন ওর সঙ্গেই একাকার হয়ে গেছে। বিপ্লবের বহ্নিময় প্রেরণা নয়, খানিকটা গভীর বেদনা আর সহানুভূতি।

চাকর এসে বললে, বাবু, খেয়ে নিলে হ'ত না? রাত হয়ে গেছে।

সুবোধ চমকে উঠল। সোজা হয়ে উঠে ব'সে বললে, আজ তোর ভাত নষ্ট হ'ল কৈলাস। ডাক্তারবাবুর বাসা থেকে খাবার দিয়ে গেছে।

কৈলাস এক গাল হাসলে। সে আমি আগেই জানতুম বাবু, রান্না তো করি নি।

হাত-মুখ ধুয়ে সুবোধ খেতে বসল। মাছ, মাংস, ডিমভাজা, ঘি-ভাত, এক বাটি পায়েস। এসব সীতার নিজের হাতের রান্না। সীতার মা কিছুদিন থেকে হার্ট-ডিজিজে শয্যাগত—ওইটুকু মেয়ের ওপর সংসারের সমস্ত ভার পড়েছে। বাপ-মা-ভাই-বোন সকলের পরিচর্য্যা ছাড়াও এত রান্নাবান্না সে করে কখন, করেই বা কি ক'রে! চমৎকার মেয়ে এই সীতা। যেমন লক্ষ্মীর মত চেহারা, তেমনই লক্ষ্মীর মত মিষ্টি আর শান্ত স্বভাবটি।

খেতে খেতে চোখ পড়ল বিছানার ওপর, তার পর শেল্‌ফের দিকে, সুটকেসের দিকে। একটি কল্যাণী নিপুণ হাতের ছোঁয়া যেন সোনার লেখার মত তাকের ওপরে জলজ্বল করছে। এই রকম একটি কল্যাণ-করস্পর্শ জীবনে কত দিন—

সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কে যেন সাঁ ক'রে একটা কি বসাল, আচমকা একটা কামড় পড়ল জিভের ওপর। এসব কি ভাবছে সে? এ সমস্ত কিসের প্রলোভন? এ তার আদর্শ নয়, এ তার দীক্ষার অঙ্গ নয়। পথ যাকে ডাক দিয়েছে, এমন মোহ কেন তাকে আচ্ছন্ন করে? পঁয়ত্রিশ বছরের নিষ্যাতিত অগ্নিশুদ্ধ জীবনে আজ কি মলিনতার ছোঁয়া লাগল?

মনের মধ্যে রমলা এসে দাঁড়াল। প্রথম যৌবনের বিপ্লবী নায়িকা। আগুনের মত লাল টকটকে শাড়ি তার আগুনের শিখার মত উজ্জ্বল দেহকে জড়িয়ে আছে। চোখে আগুন। কিন্তু সেই আগুন একদিন নিবে গিয়েছিল রমলার চোখ থেকে, উচ্ছলিত জল সেখানে ছলছল ক'রে উঠেছিল। কালো চুলের রাশি দিয়ে সমস্ত মুখখানা ঢেকে আর্ত্তকণ্ঠে রমলা বলেছিল, আমি পারব না, আমি পারব না। আমি দুর্ব্বল। তুমি তুলে নাও আমাকে।

ঘৃণায় আর বিরক্তিতে সমস্ত মনটা বিষদগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সুবোধের। প্রশান্ত কঠিন স্বরে বলেছিল, আমি চললুম, আর দেখা হবে না।

চোখ মুখ থেকে, চুলের রাশি সরিয়ে একবারটি সজল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রমলা। আর কিছু বলে নি, কোন অনুরোধ জানায় নি। রমলা জানত, অনুরোধে কোন ফল হবে না। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে পাশের ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

সুবোধ আর দাঁড়ায় নি। দাঁড়াবার সময়ও ছিল না তার। সে ফেরারী, তিনটে ওয়ারেণ্ট তখন তাকে সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া কত কাজ! দলের মধ্যে বিভীষণ দেখা দিয়েছে, জেলার পার্টি বিপন্ন। জিনিসপত্রগুলো রাতারাতি সরিয়ে ফেলতে হবে। দ্রুত চরণে সুবোধ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

ঘূর্ণির মত জীবন। ফেনিল উন্মাদনা। কোথায় মিলিয়ে গেল রমলা—মিলিয়ে গেল সুবোধের মন থেকেও। এতটুকুও দুঃখ হয় নি। রমলাকে সে ভালবাসত, রমলাকে সে কামনা করেছিল তার কর্মজীবনের পাশে পাশেই। কিন্তু সেই রমলা যখন নিবে গেল, নীড় বাঁধতে চাইল দুর্যোগভীরু অসহায়া কপোতীর মত, সেদিন সুবোধ আর তাকে ক্ষমা করতে পারে নি। তার প্রেম অযোগ্যের জন্য নয়।

তারপরে দশ বছর জেল। বেরিয়ে দু মাস কাজ করতে না করতেই আবার অন্তরীণ। কোন্ এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে রমলার। ভালই হয়েছে। বড় গাছে নৌকো বেঁধেছে রমলা, ঝড়-জলের ভয় নেই। আই. সি. এস. পুত্র আর সোসাইটি-গার্ল কন্যার জন্ম দিয়ে মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করবে নিঃসন্দেহ।

সুবোধ উঠে পড়ল। আর খাওয়ার স্পৃহা নেই। মাথার মধ্যে লোহার পেরেকগুলোর ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে ক্রমাগত। কপালের রগগুলো যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সুবোধ বিছানায় এসে বসল। কত কাজ আছে, কত কি করবার আছে তার! বাইরের জগৎ ডাকছে হাতছানি দিয়ে। সমস্ত দেশ রাত্রির কালো আকাশের মত গভীর বেদনাতুর চোখ মেলে যেন তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। অসহায় বন্দিত্ব, কঠিন শৃঙ্খল। এই বন্দিত্ব থেকে তুমি মুক্ত কর আমাকে, এই

শৃঙ্খল চূর্ণ ক'রে দাও। তুমি এস। সুবোধের বুকের মধ্যে বাজতে লাগল একটা আর্ত্ত কলধ্বনি।

দূরে মহানন্দার চরে সনসন ক'রে কাঁদতে লাগল বনঝাউয়ের দল।

রাত কেটে গেল, এল সকাল। দিনের পরে দিন। সময়ের সমুদ্রে ঢেউ ওঠে, ঢেউ ভাঙে। বৈশাখের শেষাশেষি সারারাত বৃষ্টি হয়ে গেল, মহানন্দার জল বেড়ে উঠল—বনঝাউয়ের দল অর্দ্ধমগ্ন দেহ তুলে রইল গেরুয়া-রাঙা স্রোতের ওপর। চড়াগুলো তলিয়ে গিয়ে তিন-চারটে ধারা এক ধারায় রূপান্তরিত হ'ল। ওপারের উচু ডাঙা এর মধ্যেই ঝুপ-ঝাপ ক'রে ভাঙতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

সব সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে আসে। দারোগা নিয়মিত খবর নেন। পাশার চক পেতে ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার গালে হাত দিয়ে চাল ভাবেন। অপ্রত্যাশিতভাবে একটা বারো-পাঞ্জা-সতরো পড়তে মুহরী-বাবু আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন বিকচ্ছ হয়ে।

দারোগা মাঝে মাঝে বলেন, কত ভাগ্যে যে আপনার মত লোককে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম সুবোধবাবু! পুলিসে চাকরি করতে এসে তো আর ভদ্রলোকের মুখ দেখি না।

সুবোধ হাসে। চিরদিনই আপনাদের মধ্যে আমাকে এই ভাবে আটকে রাখতে চান নাকি?

দারোগা জিভ কাটেন। ছি, ছি, কি যে বলেন! পুলিসের চাকরি যে কি লজ্জা আর ধিক্কারের ব্যাপার, সেটা তখনই বুঝতে পারি, যখন আপনাদের মত লোককেও আটকে রাখতে হয়।

সুবোধ বলে, ছেড়ে দিন না, চ'লে যাই।

দারোগা ম্লান হয়ে যান। নতমস্তকে বলেন, কেন লজ্জা দেন? আমাদের ক্ষমতা যে কতটুকু, সে তো জানেন। পেটের দায়ে যা কিছু করি, নইলে—

তা সত্যি। দারোগার গলায় আন্তরিকতার সুর স্পষ্ট। আইন আর পেষণ-যন্ত্র মানুষের মনকেও কি হত্যা করতে পারে? দেশের, জাতির অপমান আর নির্য্যাতন তাকেও সত্যি সত্যিই দুলিয়ে তোলে।

জীবিকা দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ আর নিষ্ঠুর সমস্যা। সবাই মহামানব হতে পারে না, নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেবার যোগ্যতা থাকে না সকলের। তবু দারোগার এই অনুতাপবিদ্ধ কণ্ঠস্বরে অপমানিত মানুষটি নিজেকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করে।

দারোগাকে ভাল লাগে সুবোধের। রাগ হয় না, অভিযোগ করতে ইচ্ছে হয় না। সবাই দেবতা নয়। সুবোধ ভালবাসে মানুষকে। ত্রুটি আছে মানুষের, স্বার্থবুদ্ধি আছে, আছে সংকীর্ণতা, কিন্তু মানুষ চিরন্তন আর চিরঞ্জীব—তার হৃদয়ের মৃত্যু নেই কখনও।

ডাক্তারবাবু বলেন, আর একটু দেরি ক'রে চা খাবেন সুবোধবাবু। সীতা কি দু-চারটে খাবার তৈরি করেছে, পাঠিয়ে দেবে।

সুবোধ সলজ্জভাবে বলে, ছি ছি, এ ভারী অন্যায়। সীতা তো রোজই খাওয়াচ্ছে। প্রত্যেক দিন আপনাদের এই ভাবে বিব্রত করা—

ডাক্তারবাবু সস্নেহে হাসেন। আমি আপনার বাবার বয়সী সুবোধবাবু। ভদ্রতাটা আমার সঙ্গে আর নাই করলেন। বিদেশে নির্বান্ধব দেশে প'ড়ে আছেন, কত অসুবিধে—সামান্য এতটুকুও তো করতে পারি না আপনার জন্যে।

এর ওপর কথা চলে না।

দিন কাটে। আকাশে নববর্ষার নীল মেঘ দেখা দেয়। নিমাসরাই স্তম্ভটাকে কুয়াশায় আচ্ছন্ন ক'রে নামে ঘনধারার বর্ষণ। মহানন্দা পাড় ভাঙে, তার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ে গাং-শালিকের বাসা। নদীর জল দুলে ওঠে, ফুলে ওঠে, গর্জন করে। মহানন্দা প্রখর আর প্রবল রূপ নিয়েছে। বনঝাউয়ের দল কোথায় গেছে তলিয়ে, সেখানে এখন দশ হাত লগির থই মেলে না। জেলেদের গ্রামগুলো বৃষ্টিতে অস্পষ্ট হয়ে যায়—'ফটিকজল' পাখী ঝাঁক বেঁধে আকাশের বুকে নাচতে শুরু করে।

আকাশ, বাতাস, মহানন্দা—সকলের সঙ্গে একটা সহজ প্রীতির সম্পর্ক। বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত বোধ করলেই বাইরের জগৎটা এসে সুবোধের মনের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে নেয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে এই নিমাসরাই স্তম্ভ কিংবা মহানন্দার চলস্রোতের

দিকে তাকিয়ে। তা ছাড়া দারোগা আছেন, ডাক্তার আছেন, কম্পাউণ্ডার আছেন। একটা বিচিত্র পরিবেষ্টনী।

বন্দী-জীবন পীড়িত করে মনকে। খবরের কাগজ বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের সংবাদ ব'য়ে আনে। মিলে শ্রমিক ধর্ম্মঘট। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা। বিলাতে রক্ষণশীল দলের অনমনীয় মনোভাব। কাজের অন্ত নেই। আজ যদি বাইরে থাকত, তবে কত কাজ সে করতে পারত! পঁয়ত্রিশ বছর মাত্র বয়স, সে বুড়ো হয় নি। গায়ে শক্তি আছে, মনে জ্বলছে অনুপ্রেরণার অনির্ব্বাণ মশাল। আজ দশ বছর ধ'রে অবরুদ্ধ দেশের চিন্তাধারার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংস্রব নেই। দেশ কতটা এগিয়ে গেছে, তাও সে স্পষ্ট জানে না। আজকের কর্ম্মীদের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে, চিন্তা মিলিয়ে নিতে হয়তো সময় লাগবে খানিকটা। তা লাগুক, তবুও আজ তার বাইরে থাকা একান্তই দরকার।

অনেকক্ষণ থেকে আকাশ গুমট ক'রে ছিল, হঠাৎ ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নামল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই সীতা ভিজতে ভিজতে এসে দাঁড়াল সুবোধের ঘরের বারান্দায়।

এস এস, ঘরে এস সীতা। দুপুরবেলায় কি মনে ক'রে?

ভিজে আঁচলটা গায়ে ভাল ক'রে জড়িয়ে নিয়ে লজ্জারুণ মুখে সীতা বললে, মা একখানা বই চাইছিলেন, তাই—

বই! তা ব'স, ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে যেন কিসের একটা ছোঁয়া বাঁচিয়ে সীতা চেয়ারের একপাশে বসল। সুবোধ শেলফের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে বললে, বাংলা বই তো আমার কাছে দেখছি না, দু-একটা পত্রিকা আছে খালি। তাই নিয়ে যাবে?

দিন।

পত্রিকা নিয়ে সীতা উঠে যাওয়ার উপক্রম করলে। কিন্তু বাইরে অবিরাম আর অঝোর ধারে বৃষ্টি। নদীর জল ফুটে উঠছে টগবগ ক'রে, ঝুপঝুপ শব্দে পাড় ভেঙে পড়ছে। সুবোধ বললে, এই বিষ্টির মধ্যে যাবে কি ক'রে? একটু দাঁড়িয়ে যাও।

চেয়ারের হাতলটা ধ'রে সীতা দাঁড়িয়ে রইল সসংকোচে। অলকে

জলের বিন্দু মুক্তাচূর্ণ ছড়িয়েছে। লজ্জিত মুখখানিতে যেন পূর্ব্বরাগের রক্তিম স্পর্শ। চঞ্চল কালো চোখের দৃষ্টি একবার সুবোধের মুখের ওপর ফেলে সীতা চোখ নামালে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল, সে বিদ্যুৎ দুটি কৃষ্ণ তরল তারার ওপরেও চমক লাগিয়ে গেল।

আর চমকে উঠল সুবোধ। সীতার চোখের এই দৃষ্টিটাকে সে চিনতে পেরেছে। এমনিই দৃষ্টি সে দেখেছে আর একজনের চোখে—সে রমলা। কিন্তু সে দিনটি হারিয়ে গেছে—রমলাকে জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছে সে। সেদিনকার পৃথিবী ছিল বিরাট আর বহুব্যাপ্ত, সেদিন কর্ম্মশক্তি ছিল অব্যাহত। কিন্তু আজ?

সীতা আবার মাথা তুললে, আবার নামিয়ে নিলে। তার গালের লালিমা আরও ঘন হয়ে এসেছে। ডুরিপাড় আঁচলটা একমনে জড়িয়ে চলেছে আঙুলে।

কিন্তু আজ? সুবোধ ভাবতে লাগল। আজ কি তেমন চলবার ক্ষমতা আছে? খবরের কাগজে বৃহত্তর সমস্যা আর তো তাকে বিব্রত ক'রে তোলে না? সমস্ত দেশের আকুল আহ্বান সত্যিই কি তেমন ক'রে তাকে চঞ্চল ক'রে তোলে? তার চাইতে অনেক সত্য হয়ে উঠেছে এই মহানন্দা, এই আকাশ, ওই নির্ব্বাক স্তম্ভটা। ওপারের মৃত্যুজীর্ণ জেলেদের গ্রামটা তার চাইতে অনেক বেশি বাস্তব। নিজেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না ক'রেও কি দেশকে ভালবাসা যায় না?

সামনে এখনও দাঁড়িয়ে আছে সীতা। ষোড়শী, সুন্দরী—লক্ষ্মীর মত শান্ত আর মধুর কমনীয়তায় অপরূপ। জীবনের সমস্ত রুক্ষতার ওপরে এমনই একটা সুধাস্নিগ্ধ ধারাবর্ষণ।

সীতা!

সুবোধের গলার স্বরে বুকের ভেতর রক্ত চলকে উঠল সীতার। চোখের দৃষ্টি মাটিতেই বদ্ধ রইল, উঠল না।

কাল একবার আসবে দুপুরে? অনেক কথা বলবার আছে তোমাকে, আসবে?

আবছায়া ভীরু গলায় জবাব এল, আসব।

আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকব। আসবে তো?

আবিষ্ট আচ্ছন্ন চোখ তুলে সীতা আবার বললে, আসব।

বৃষ্টির জোরটা ক'মে গেছে, কিন্তু ঝিরঝির ক'রে পড়ছে এখনও। সীতা আর দাঁড়াল না, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল বাইরে। যাওয়ার সময় ভুলে পত্রিকাগুলো ফেলে গেল চেয়ারের ওপর। সুবোধ আর তাকে ফিরে ডাকলে না। ওপারে মহানন্দা পাড় ভেঙে চলল অবিশ্রাম।

বৃষ্টি থামল। বিকেল গেল, এল সন্ধ্যা। সুবোধের যেন বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। সমস্ত দেহমন একটা মদির আর মধুর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আজ আর কোনও কাজ নয়, কোনও ভাবনা নয়, খানিকটা স্বপ্নাতুর আলস্য। সীতা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে, কাল সে আসবেই। আদর্শ—নিষ্ঠা? কিন্তু চলার পথে একটি ছায়াতরু। তার তলায় এক মুহূর্ত বিশ্রাম ক'রে নেওয়াটা এমন কি অপরাধ?

চপচপ ক'রে একরাশ জল-কাদা ভেঙে দারোগা শশব্যস্তে প্রবেশ করলেন। আনন্দ-উচ্ছল কণ্ঠে বললেন, সুবোধবাবু, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স।

কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স! সুবোধ বিছানা ছেড়ে উঠে বসল:—ব্যাপার কি?

স্বার্থপরের মত আপনাকে আটকে রাখতে পারলেই ভাল হ'ত আমাদের পক্ষে। কিন্তু তার উপায় নেই আর। আপনার রিলিজের অর্ডার এসেছে।

রিলিজ!

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে সুবোধের মন আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে উঠল কি না কে জানে! সে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল।

তিন ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে শহরে রওনা হতে হবে। তারপর সকালের ট্রেনে কলকাতা। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে আপনাকে খালাস দেওয়া হবে। জরুরি অর্ডার।

কিন্তু এত শর্ট নোটিসে—! আমার জিনিসপত্র—

সব পরে যথাসময়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, কোনও চিন্তা নেই। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স এগেন। কিন্তু আমাদের ভুলে যাবেন না সুবোধবাবু। অনেক অপরাধ করেছি, আপনার যোগ্য মর্যাদা দিতে

পারি নি। কিন্তু তার জন্যে আমরা দায়ী নই—দায়ী আমাদের—যাক, মনে রাখবেন সন্তুষ্ট হ'লে।

আশ্চর্য্য, লণ্ঠনের আলোয় পুলিসের দারোগার নিষ্ঠুর কঠিন চোখ ছলছল ক'রে উঠল। সুবোধ তেমনই ক'রে তাকিয়েই রইল।

রাত এগারোটায় মহানন্দার খরস্রোতে ভাসল নৌকো। আজ সে মুক্ত, আজ বাইরের পৃথিবীতে আবার তার উদার আমন্ত্রণ। কিন্তু এই কি মুক্তি? একেই কি এমন একান্ত ক'রে কামনা করেছিল সে? তা হ'লে বুকের মধ্যে কেন এই এমন তীব্র বেদনাবোধ, কেন মনে হচ্ছে, কি যেন একটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, কিসের একটা আঘাত রক্তাক্ত ক'রে দিচ্ছে সমস্ত হৃদয়কে?

সীতা কাল দুপুরে আসবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

এর পরে মুক্তি। জনবহুল, কর্ম্মবহুল কলকাতা। বহুর অরণ্যে সে হারিয়ে যাবে, তলিয়ে যাবে কর্ম্মের অশ্রান্ত ঘূর্ণিপাকে। আজ দশ বছর সে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা থেকে পিছিয়ে আছে, সে ক্ষতি তাকে পূরণ ক'রে নিতে হবে, সময় নেই তার। ফিরতে পারবে না, পেছনে তাকাতে পারবে না। সমস্ত দেশ জুড়ে জগন্নাথের রথ চলেছে, সেই রথযাত্রায় পেছনের ভিড় তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে, ঠেলে নিয়ে যাবে সম্মুখে, ঠেলে নিয়ে যাবে তার আদর্শ আর ব্রত উদযাপনের পথে। কিন্তু—

এই 'কিন্তু'র জবাব সুবোধ মন থেকে খুঁজে পেলে না। মহানন্দায় ভরা বর্ষার ক্ষুরধারা, স্রোতের টানে নৌকো চলেছে সম্মুখে। পেছনে থানার আলোটা মিলিয়ে এল, মিলিয়ে এল জেলেদের গ্রাম, আর অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে এল নিমাসরাই স্তম্ভের নির্ব্বাক মূর্ত্তিটা।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

গত ১২ জুন 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের কাগজ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নূতন আদেশ প্রকাশিত হয়। ২২ জুন 'কলিকাতা গেজেটে' সেই আদেশই পুনর্মুদ্রিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। কিন্তু তৎপূর্বেই বহু বাংলা পত্রিকার শ্রাবণ-সংখ্যার কাজ অগ্রসর হইয়াছিল, আমাদেরও হইয়াছিল। ওই আদেশে বলা হইয়াছে যে, ১২ জুন তারিখের পরে প্রকাশিত যাবতীয় সাময়িক পত্রিকা, যাঁহারা দেশী মিলের কাগজ ব্যবহার করেন, পূর্ববর্তী আকারের শতকরা ত্রিশ ভাগ আকার গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হইতে পারিবে, অন্যথায় ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে কাগজের কর্তৃপক্ষ দণ্ডনীয় হইবে। 'শনিবারের চিঠি'র পূর্ববর্তী আকার গড়পড়তায় প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠা ছিল, সুতরাং আইনতঃ আমরা ৪৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাহির করিবার অধিকারী; ফর্মা হিসাবে ৪৫ পৃষ্ঠা ছাপা চলে না, সেই কারণে কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে আইনের বলেই তিন ফর্মা অর্থাৎ ৪৮ পৃষ্ঠা ছাপিবার অনুমতি দিবেন। পোষ্টাপিসের আইন অনুসারে ডাকখরচার সুবিধা পাইতে হইলে এই ৪৮ পৃষ্ঠার অর্ধেক সংবাদ ও গম্ভীর লেখা দিতে হইবে, বাকি অর্ধেকে বিজ্ঞাপন গল্প উপন্যাস ইত্যাদি হালকা বিষয় থাকিতে পারে। বিজ্ঞাপনের আয় ছাড়া পত্রিকা চলিতে পারে না, সুতরাং আমরা ওই অর্ধেক ২৪ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনই দিব। আইন পরিবর্তিত না হইলে আগামী ভাদ্র সংখ্যা হইতে আমাদিগকে মাত্র ২৪ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। এই ২৪ পৃষ্ঠা বস্তুর মূল্য ছয় আনা লইতে পারি না। সুতরাং আমরা কাগজের দাম কমাইতে বাধ্য, কিন্তু বৎসরের এই শেষ দুই মাসের জন্য (কার্তিক হইতে আমাদের বর্ষারম্ভ) দামের পরিবর্তন নগদ গ্রাহকদের জন্য সম্ভব হইলেও বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য সম্ভব নয়। এই দুই মাসের জন্য আমাদের গ্রাহক ও নগদ ক্রেতা উভয় সম্প্রদায়কেই কিঞ্চিৎ ঠকাইতে আমরা বাধ্য হইব। নূতন বৎসরেও এইরূপ চলিতে থাকিলে নগদ মূল্য ও বার্ষিক মূল্য উভয়ই হিসাবমত হ্রাস করা হইবে। ইতিমধ্যে আমরা দৈনিকপত্রে ব্যবহৃত বৈদেশিক কাগজ ব্যবহারের অনুমতি লইয়া পূর্ব আকৃতি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছি, যদি তাহা না পাই, কর্তৃপক্ষের পুনর্বিবেচনা পর্যন্ত আমাদিগকে ক্ষীণকায় হইয়াই বাঁচিতে হইবে।

• • •

কিন্তু আমাদের অসুবিধার অন্ত থাকিবে না। পাঠকেরা গল্প চান, কবিতা চান, ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাসেরও যথেষ্ট চাহিদা আছে। এ সকলই নূতন

ব্যবহার বর্জন করিতে হইবে। বহু বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে আমাদের বাৎসরিক চুক্তি আছে, নানাভাবে তাহা খেলাপ করিতে বাধ্য হইব। ক্রেতাদের সঙ্গেও একটা অলিখিত চুক্তি আছে মালের পরিমাণ লইয়া। সে চুক্তিও ভঙ্গ হইবে। পত্রিকার অফিসের এবং ছাপাখানার কাজের পরিমাণ স্বভাবতই শতকরা সত্তর ভাগ কমিয়া যাইবে, সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই লোকসংখ্যা কমাইতে হইবে। ফলে সহস্র সহস্র কর্মক্ষম ব্যক্তি বিনা দোষে বেকার হইয়া পড়িবে। ইহার ফল যে কতদূর পর্যন্ত গড়াইবে, ভাবিতে সাহস হয় না। গবর্মেণ্ট নিজের প্রয়োজনে আদেশ জারি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফলে অসামরিক নিরীহ প্রজাদের যে অসুবিধা হইবে, তাহা নিরাকরণের কোন চেষ্টা করিতেছেন কি না প্রকাশ নাই।

• • •

কাগজ-সঙ্কোচের মূল তত্ত্বকথা লইয়া বোম্বাইয়ে সভা হইয়া গিয়াছে, বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি একক ও সমবেতভাবে নানা সভাসমিতির মারফং অথবা সাময়িক পত্রিকার মারফং এই তত্ত্বের যুক্তিযুক্ততা অথবা ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কথার উপরে কথা বাড়িয়াছে মাত্র; সাধারণের পক্ষে অতিশয় দুর্বোধ্য কথা জমিয়া জমিয়া হিমালয়প্রমাণ হইয়াছে। আমরা এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারিয়াছি যে, সামরিক প্রয়োজনে অসামরিক কাগজের ব্যবহার এতখানি কমাইবার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। শুনিতেছি, এই সকল কথার ফলে গবর্মেণ্ট সাময়িক পত্রিকাগুলি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিতেছেন, তাঁহারা সদয় হইলে শতকরা ত্রিশ ভাগ শতকরা সত্তর ভাগ হইতে বাধা নাই।

• • •

কিন্তু একটা ব্যাপারে আমরা সত্যসত্যই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি। গবর্মেণ্ট বিভিন্ন পত্রিকার বিষয় সমবেতভাবে বিচার না করিয়া স্বতন্ত্র বিবেচনার যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা অতিশয় ভীতিপ্রদ। দেশের কল্যাণের পক্ষে কোন্ কাগজের উপকারিতা কত, তাহা নির্ণয়ের ভার গবর্মেণ্ট লইলে সুবিচার হইতে পারে না; কারণ শাসক ও পরাধীন শাসিতের স্বার্থ কখনই এক হয় না। দেশের পক্ষে যাঁহারা ক্ষতিকর কাজ করিতেছেন, গবর্মেণ্ট অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা দিয়া তাঁহাদিগকেই পুষ্ট করিতেছেন—এইরূপ মানবীয় দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাহা ছাড়া স্বতন্ত্র বিবেচনা অর্থেই সুপারিশ-সম্বলিত বৃহতের সুবিধা, সহায়সম্বলহীন ক্ষুদ্রের মৃত্যু। ইহাতে পত্রিকাজগতে মনোমালিন্য এবং বিশৃঙ্খলা মাত্র সৃষ্টি করা হইবে, ন্যায়বিচার হইবে না। ইতিমধ্যেই অ্যাসোসিয়েশনের ওজুহাতে কেহ কেহ ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন, সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াও সকলের

অজ্ঞাতসারে ব্যক্তিগত সুবিধার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ফলে অ্যাসোসিয়েশন অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে, সকল চাচাই আপন বাঁচাইতেছেন। ক্ষুদ্রচেতা স্বার্থপর জাতিকে অধিকতর স্বার্থপর করিবার জন্য গবর্মেণ্ট এই যে ফাঁদ পাতিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সর্বনাশই হইবে, কল্যাণ হইবে না।

• • • •

ঠেলায় পড়িয়া এইরূপ গুরুগম্ভীর রচনায় মগ্ন ছিলাম, হঠাৎ অর্ধোন্মাদ গোপালদার আবির্ভাব হইল। প্রবেশপথেই "বাস" থামাইবার ভঙ্গীতে হাঁক দিলেন, এই, রোখ্‌কে। আমি থতমত খাইয়া তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণও জানাইতে পারিলাম না। গোপালদা সামনের চৌকিতে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিতে বসিতে বলিলেন, থাক, তোমার আর সংবাদ-সাহিত্য লিখে কাজ নেই। বাজে বকা তোমার অভ্যেস. এই কাগজ-কন্ট্রোলের বাজারে সমান মাল যদি পাঠককে দিতে চাও, তোমাদের পুরোনো জলধর-পটল সিষ্টেমে তা চলবে না, মডার্ন এসপারান্টো সিষ্টেম চাই, জেমস্‌জয়েস-এজরাপাউণ্ডের কম্বিনেশন চাই। আমি একটা সিষ্টেম ইন্‌ভেণ্ট করেছি। তোমার সংবাদ-সাহিত্য ও পুস্তক-পরিচয় নতুন ধারায় লিখেও এনেছি। এই নাও। ছেপে দাও। পাঠকদের পছন্দ হ'লে প্রত্যেক মাসে দোব।

মন-মেজাজ ভাল ছিল না। নিজের পক্ষে কিছু লেখা কঠিন হইত। একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম। মনে হইল, বাঁচিয়া গেলাম। এবারকার মত গোপালদার সাহায্যই লইলাম। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ জানে।

একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। এই পদ্ধতি মোটেই নূতন নয়, বিশেষত যে দেশে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" "জন্মাদ্যস্য যতঃ" প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্র, "সচের্ধঃ' প্রভৃতি ব্যাকরণসূত্র (মুগ্ধবোধ।) এবং "হ্রীং ক্লীং" প্রভৃতি তন্ত্রমন্ত্র অবাধে প্রচারলাভ করিয়াছে, সেখানে, ইঙ্গিত যতই সংক্ষিপ্ত হউক, কাহারও বুঝিবার পক্ষে বাধিবে না। ইংলণ্ডেও ডিকেন্স তাঁহার *Pickwick Papers*-এ Jingle-এর মুখে এই ভাষা চালাইয়াছেন। যথা—

"Tall lady—mother—five children—eating sandwiches—forgot arch—crash—knock—children look round—mother's head off—sandwich still in hand—no mouth to put it in—head of family off—shocking." কর্তাদের আদেশে আমাদের ভাষার head off হইলেও যে বিশেষ আটকাইবে, তাহা মনে হয় না। Shocking ঠেকিলেও সহ্য করিতে হইবে।

১৩৫১

আবার রাস্তা নোংরা—চাট্টি খেতে দাও মা—গবর্নরের রেডিও বক্তৃতা—কিন্তু চট্টগ্রাম—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—*People's War*—গোর্ডিং যথা পূর্বং তথা পরং—গবর্মেন্ট নির্বিকার—চাল ডাল খরিদ্দারের টেণ্ডার—বুঝ লোক যে জান সন্ধান—মধ্যবিত্ত—সাবধান।

পাকিস্থান

মহাত্মা গান্ধী > রাজাগোপালাচারী > জিন্না—গবর্মেন্ট + সি. পি. আই. = পাকিস্থান।

লীগ অ্যাণ্ড লেণ্ড

ছুঁচ—ফাল।

লীগ

মোহনবাগান ১-০—টিপু সুলতান ফুল হাউস—খান ইট—ধর্ম বনাম খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি—মায়া।

সমস্যা

মাসিক বেতন ১০০৲—পরিবার চার জন—বাড়িভাড়া ২৫৲—আলো + দুধ + কয়লা-ঘুঁটে—কেরোসিন + ধোপানাপিত + স্কুলের মাইনে ইত্যাদি ২৫৲—রেশন ৭৲ × ৪ = ২৮৲—দৈনিক বাজার মাছ (২৷০ সের) একপোয়া = ৷৶০ + আলু (৷৶০ সের) আধ সের = ।/০ অন্যান্য তরিতরকারী ।০—ঘি তেল ইত্যাদি ।/০—মোট ১৷০—৩০ × ১৷০ = ৪৫৲—২৫৲ + ২৫৲ + ২৮৲ + ৪৫৲ = ১২৩৲—থিয়েটার বায়োস্কোপ সিগারেট ট্রাম বাস শাড়ি ধুতি সাবান খবরের কাগজ মাসিক পত্রিকা বই? ঘুষ চুরি উপবাস আত্মহত্যা?

সমাধান

কন্যাদায় = স্কুলকলেজ—সি. পি. আই.—সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট—কফি হাউস সিনেমা—পার্টি-মীটিং—বিদেশী সৈন্য—স্বদেশী অসবর্ণ—সিভিল ম্যারেজ—উদ্ধার।

বঙ্গদেশ

ডাক্তার বি. সি. রায়—আপীল—মহামারী, বসন্ত নবেম্বর '৪৩ থেকে এপ্রিল '৪৪, ১১১ ৭৪১—কলেরা ঐ—ঐ ৯২৫০০—দুর্ভিক্ষ হাটিহাটি পা পা।

গদ্যকবিতা

শ্রীকুমার বন্দ্যো—'ভারতবর্ষ' শ্রাবণ, ১৩৫১ পৃ. ৮২

"আজকাল পদ্যের রাজ্যে গদ্যের অনধিকার প্রবেশ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ

শুনা যায়। এ অভিযোগ সত্য হইলেও পদ্যের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সুদীর্ঘ নির্বাসনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। পদ্য জ্যেষ্ঠাধিকারের সুবিধা লইয়া গদ্যের যে সমস্ত রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিল, বয়ঃপ্রাপ্ত কনিষ্ঠভ্রাতা তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া এখন জ্যেষ্ঠের খাসতালুকে অভিযান চালাইয়াছে।"

এটি স্বীকারোক্তি। বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই স্বয়ং একটি গদ্যকবিতা।

পেপার কন্ট্রোল

'কবিতা' আষাঢ়, ১৩৫১, পৃ. ২৬৩

> "রূপ মোরে দিলো ডাক।
>
> রূপ, রূপ, রূপ দিলো ডাক।
>
> সন্ধ্যার আরক্ত মেঘে
>
> রূপ দিলো ডাক। নীরব প্রশান্তি মাঝে রূপ দিলো ডাক
>
> দুরন্ত ঝড়ের বেগে
>
> রূপ জয় ক'রে নিলো…
>
> রূপ এলো, রূপের রূটিকা!…
>
> দুর্নিবার সম্মোহনে রূপ গেল ডেকে।"

সেভেন্টি পার্সেন্ট কাটের পর এই দাঁড়িয়েছে। অরিজিন্যাল কেমন হতে পারত ভাবুন!

খাঁটি গদ্য

কোনো সাম্যবাদী পত্রিকা থেকে—

"মাটি-খচ্চর যে যার মতোন দখল করেছিলো অনেকদিন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরাট রোম কিন্তু টেকসই হলো না—রিপু হয়ে থাকলেও একদিন হিঁচে-থেঁসে মুষড়ে ধ্বসে পড়লো;"

ইস্কুলপাঠ্য প্রবন্ধ

'প্রবাসী' শ্রাবণ, ১৩৫১—"বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ"—অধ্যাপক শ্রীকালীকিঙ্কর দাশ।

"বাংলার অমর কবি জয়দেব হইতেই বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাসের আরম্ভ।…প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সমুজ্জ্বল স্তম্ভস্বরূপ।…শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই বাংলা ভাষায় রচিত বাঙালীর আদিকাব্য।

'প্রবাসী' কেঁচেগণ্ডূষ,—হায়াতড়ি—সাবাস!

মৃগনাভি

'মাসিক মোহাম্মদী', আষাঢ়।

"দিক থেকে দিগন্তরে বন-মৃগ যথ—
উন্মাদের পারা কস্তুরী হরিণ সম—
কেঁদে কেঁদে খুঁজে ফেরে নাভি আপনার—"

How ?

হক্‌কথা

'প্রভাতী', শ্রাবণ, ১৩৫১, পৃ. ৮৬।

"ভারত গভর্নমেণ্ট কাগজ কমানোর যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে বাংলার মাসিক, সাপ্তাহিকগুলো আতঙ্কনিগ্রহ বটিকার স্থাণ্ডবিলে পরিণত হবে। গভর্নমেণ্ট যুদ্ধকালে শত বাধা নিষেধের মধ্যেও সাহিত্যের অভূতপূর্ব প্রসারে আতঙ্কিত হয়ে কতখানি স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করতে পারেন তার নমুনা দিয়েছেন। নূতন পত্রিকা প্রকাশের পথ রুদ্ধই ছিল এখন প্রাচীনদের পালা। এবার তাহলেই সব শেষ। কিন্তু বিদেশী গভর্নমেণ্টের এ সাহস কে জুগিয়েছে? অনেকে মুখস্থ বলবেন, আমাদের অনৈক্য। আমরা বলব, আমাদের লোভে ঐক্য। সংবাদপত্রগুলি কিসের প্রত্যাশায় কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে কংগ্রেসবিরোধী প্রচারে গভর্নমেণ্টের হাতে রাখী বেঁধেছিল। সরকারী বিজ্ঞাপন, কাগজের কোটা, বিজ্ঞাপনের নির্ধারিত দর প্রভৃতির ব্যাপারে এরা যে দুর্বলতা দেখিয়েছে, গভর্নমেণ্টের কাগজ নিয়ন্ত্রণের সাহস তারই প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। সুতরাং এ আমাদের প্রাপ্য।"

ত্রিবেণী সঙ্গম

'মাসিক বসুমতী', আষাঢ় ১৩৫১, কবিতা "অহিংস"।

লেখক—মোহম্মদ নওলকিশোর।
বিষয়—বুদ্ধদেব।

আধুনিক কবিতা

ঢাকা-হল-বার্ষিকী 'শতদল'। সম্পাদক সত্যব্রত বসু। সম্পাদকীয়—

প্রশ্ন। "আধুনিক' কবিতা নামে পরিচিত কবিতাগুলি পড়িয়া মনে হয় দুর্বোধ্যতা; শুধু দুর্বোধ্যতা বলিলে ভুল হইবে, অর্থহীনতাই বুঝি "আধুনিক" কবিতার কাব্যলক্ষণ।" "আধুনিক" বাংলা কবিতায় নূতন যুগের নূতন কথা বলিবার চেষ্টা হয়তো আছে। স্বভাবতই সাহিত্যে যুগের সাধনা কামনা এবং

আদর্শ রূপ পাইতে চায়। কিন্তু তাই বলিয়া কোন তত্ত্ব বা "বাদ"এর প্রভাবে রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে উহা সাহিত্যপর্য্যায়ভুক্ত হইবে না। যে আবেগ হইতে কবিতার জন্ম হয় "আধুনিক" কবিদের সেই আবেগের সঙ্গেই যেন পরিচয় নাই। আধুনিক কবিতাগুলিতে নূতনত্ব আছে, টেক্‌নিক আছে, বিদেশী কবিতার বিকৃত অনুকরণ আছে (ষ্টাইল নহে)—একটা যেন ভঙ্গিমা আছে, কিন্তু প্রাণ কোথায় ?"

উত্তর। বালিগঞ্জের "কবিতাভবনে"।

বেদব্যাস ও শঙ্কর

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—(মূল)

"অমৃত-মরণ-মরণ-পিয়াসী দেহ,
বাহির হইতে চাহি যে তোমারে বুকে
অণু-পরমাণু চাহে প্রেম-অমৃতেহ।
—"প্রভাতী" 'প্রবাসী' শ্রাবণ, পৃ. ২৮৩

ইডিপুস—(টীকা)

"দেহের যৌন অনুভূতিপ্রবণ প্রত্যেক অংশই সময় সময় পরিতৃপ্তি লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং একথাও ঠিক যে প্রত্যেক নারী ও পুরুষই কোন না কোন সময় দেহ-কামনা চরিতার্থ করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছেন।"
—'নরনারী', পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, পৃ. ১৭২

[আমাদের মন্তব্য। ঐ বিষয়ে প্রভাতকাল অপ্রশস্ত। রবীন্দ্রনাথের "রাত্রে ও প্রভাতে" দ্রষ্টব্য।]

নজরুল ইসলামের স্বরূপ

আষাঢ় 'মাসিক মোহাম্মদী'—"পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি"—মুজিবর রহমান খাঁ—

"নজরুল ইসলাম নিজে পাকিস্তানের নিন্দা করুন, আর সমর্থন করুন—আসলে তাঁর লেখায় যাকে বলা হয় পাকিস্তানিজম, তারই জয়গান ঘোষিত হয়েছে। কবির পরিচয় তাঁর কাব্যেই ভাল করে পাওয়া যায়। নজরুল ইসলাম তাই সব চাইতে ভাল করে ধরা দিয়েছেন তাঁর গানে ও কবিতায়। এখানে তাঁকে আমরা পাকিস্তানবাদের প্রথম সফল রূপকার হিসাবেই দেখতে পাই।"

পাকিস্তানী প্রতীমপূজা—বাসহারা ? আজাদ-বিরোধিতা ?

অতিশয় সত্য

'মন্দিরা', আষাঢ়—শ্রীগীতা বসু—কবিতা—"অসম্ভবতা"—

"চাই না আমি টাকা
তাবলে চাইনা আমি দারিদ্র্যেভরা জীবন ফাঁকা!
যখন যা আমার প্রয়োজন, কেউ যদি দেয় মিটিয়ে,
কি হবে তাহলে আর টাকা নিয়ে?"

এখন পর্য্যন্ত এইটেই রেওয়াজ, সুতরাং—সত্য।

A Warning

মোহাম্মদ আবদুল হক—"সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা"—'মাসিক মোহাম্মদী', আষাঢ়—

"বর্ত্তমানে কোনো কোনো হিন্দু সাহিত্যিক মুসলমান সমাজের একটু আধটু ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহাদের প্রতি আমার বক্তব্য, মুসলমান নামধারী নরনারীর কাহিনী লিখিলেই মুসলমান সমাজের ছবি আঁকা হয় না। যে-কোনো সমাজের কাহিনী লিখিতে গেলে কাহিনীর শিকড়কে সেই সমাজের স্তরে স্তরে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া জীবনরস আহরণ করিতে হইবে যে, সেই কাহিনীকে সেই সমাজভূমি হইতে উৎপাটন করিলে উদ্বনে দেওয়া ছাড়া আর কোনো গতি যেন তার না হয়।...মুসলমান সমাজকে হিন্দুরা চিরদিন দূরে রাখিয়াছেন এই অভিযোগ কৃত্তিবাস-চণ্ডিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-তারাশংকর পর্য্যন্ত সকলের প্রতিই করা যায়। হিন্দু-মহাসভা-কংগ্রেসী নীতি সাহিত্যেও হুবহু অনুসরণ করা হইয়া থাকে।"

বিপন্নের আর্ত্তনাদ

"কাগজের ব্যবহার কমাইবার জন্য দায়ী ভারত-সরকার, দেশবাসী নয়। কয়লার উৎপাদন আজ কমে নাই, বৎসরাধিক কাল যাবৎ কয়লা-বিভ্রাট চলিতেছে। এই সময়ের মধ্যে উত্তর-আমেরিকা হইতে কাগজ আনা যাইত না ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে না। শুধু তাই নয়, ভারত-সরকারের লাইসেন্স প্রদানের গোলযোগে বিটেন হইতে যত কাগজ আনা যাইতে পারিত তাহাও আসে নাই, ইহাও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সময় থাকিতে কাগজ আমদানীর চেষ্টা না করিয়া ভারত-সরকার ছাপাখানা ও সাময়িক পত্রগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তাহাদের ব্যবহার্য কাগজ টানিয়া লইয়া নূতন এক বেকার সমস্যার সৃষ্টি বাধাইতে উদ্যত হইয়াছেন।

গবর্মেণ্টের জন্ত যত কাগজ-রিজার্ভ হইতেছে তাহার ব্যবহার সঙ্কোচ করা যায় কি না ভারত-সরকার ইহা চিন্তাও করেন নাই। জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস এদিক দিয়া ব্যবহার সঙ্কোচের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কলিকাতা রেশনিঙে কাগজের ব্যবহার অনাবশ্যক বাড়ানো হইয়াছে। ভারতবাসী যেখানে একটি মাত্র খেরো বাঁধানো জাবেদা খাতায় কোটি কোটি টাকার কারবারের হিসাব রাখিয়াছে, সেখানে এক একটি রেশন দোকানের জন্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাত-আট খানি খাতা দেওয়া হইয়াছে। রকমারি ফরম তৈরি হইয়াছে, নূতন রেশন কার্ডের আকারও পূর্বাপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া সহস্রবিধ নিয়ন্ত্রণ আদেশের দৌলতে যে রকমারি 'রিটার্ণের' বন্দোবস্ত হইয়াছে একমাত্র তাহাতেই কত সহস্র টন কাগজ অপচয় হইতেছে তাহাও কেহ ভাবিয়া দেখে নাই।"—'প্রবাসী'

"ভারত সরকার Paper control order নামক দেশীয় মুদ্রণের কাগজের উপর সম্প্রতি যে হুকুমনামা জারী করিয়াছেন, তাহাতে সাময়িক পত্রিকাগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। এই আদেশ জারির ফলে, সাময়িক পত্রিকাগুলির মারফৎ দেশে যে শিক্ষা বিস্তার করা সম্ভব হইত, তাহা হইতে পারিবে না। বহু ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, বহু সংবাদপত্রসেবী বেকার হইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লোক-শিক্ষারও অন্তরায় ঘটিবে।"—'ভারতবর্ষ'

"এই আদেশ কি করিয়া ন্যায্য বলা যায়? কাগজ শতকরা ৩০ ভাগ কমাইতে না বলিয়া ৭০ ভাগ কমাইতে বলা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বেকার সময়ের তুলনায় অনেক পত্রিকারই আকার বেশ কিছু কমিয়াছে। 'কমার্স' পত্রিকা বলেন—"যা কাগজ পাওয়া যায় তার প্রায় সবটাই সরকার নিজেরা নেন। জনসাধারণ যুদ্ধের পূর্বে শতকরা আশীভাগ কাগজ পাইত। যুদ্ধের জন্ত মাত্র ১৮ ভাগ পাইতেছে। আরও শতকরা ৩০ ভাগ কমাইলে মাত্র ৬ ভাগ থাকে। 'টোটাল ওয়ারে'র সময়ও ইহা যেন বেশী বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয়।"

এই আদেশের ফলে বেকার-সমস্যা বাড়িবে। প্রায় সকল পত্রিকাই বন্ধ হইয়া যাইবে। শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি সবই বিসর্জন দিতে হইবে।"—'মাসিক বসুমতী'

পুস্তক-পরিচয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—সা, সা, চ, মা—৭নং প্যারীকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৯নং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, ১১নং তারাশঙ্কর তর্করত্ন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—৩য় সং। ৩১নং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২নং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩নং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—পরিবর্দ্ধিত ২য় সং।

বিশ্বভারতী—বি. বি. স. ২৪, দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—প্রাঞ্জল। চিঠিপত্র, ৪র্থ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ, ঘরোয়া হ'লেও সর্বজনপাঠ্য।

Nalanda Year Book and Who's Who in India—Special War Edn. 1943-44—অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ভারত-সংস্কৃতি—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় মাত্রেরই পাঠ্য।

সান্‌মিন্‌চুই—ডক্টর সানইয়াট-সেন, জনগণের তিন নীতি, লক্ষ্মীকান্ত সেন চৌধুরী অনূদিত, স্বাধীনতাকামীদের অবশ্যপাঠ্য।

নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা—মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দীন, সুখপাঠ্য জীবনী।

বলদর্পী হিটলার—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ছেলেদের উপযোগী।

জীবন-মৃত্যু—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। সাংবাদিক সুপ্ত, কবি জাগ্রত।

চন্দ্র-সূর্য—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতার ভান।

মৃত্যু-মাতন—নির্মল দাশ। জোরালো।

বিজন-সাথী—কাজি হসমৎউল্লা। চলনসই।

প্রচ্ছাত—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ক্ষীণস্বর

বিলয় ও অন্যান্য কবিতা—জগন্নাথ বিশ্বাস। আধুনিক অথচ কবিতা।

ছোট্ট খুকী—আমাতুল্লাহ্। শিশুপাঠ্য—ভাল।

ওঅর অ্যাণ্ড পীস্—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ১ম খণ্ড। দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।

থেইস—আনাতোল ফ্রাঁস—ভূপেন্দ্রনাথ বসু। প্রশংসনীয়।

ইডিয়ট—ডষ্টয়ভস্কি—শুভেন্দু মিত্র। ভাল।

সিন্দুর বন্দর—ইউলিসিসের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুপাঠ্য।

ভুলি নাই—মনোজ বসু। ৩য় সংস্করণেই সার্থকতার প্রমাণ।

অযাত্রাপথে যাত্রী যাহারা চলে—অশোক সেন। কয়েকটি নাটিকার সমষ্টি।

মাটির পৃথিবী—অনিলকুমার ভট্টাচার্য। মন্দ নয়।

প্রগল্ভ—সৌরীন্দ্রকুমার ধা। কয়েকটি মাঝারি ছোট গল্প।

চলচ্চিত্র—বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। চলনসই নাটক।

চিত্রপুরী—অবলাকান্ত মজুমদার। ঐ

বিলাত নর্তকী—শুদ্ধোধন সেন। ঐ

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫১

নির্গুণ মনুষ্য-সমাজ

অথবা

সমাজতন্ত্র ও গীতার নিষ্কাম কর্ম্মবাদ

রুশিয়ার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর বিপ্লবের পর হইতে সোশ্যালিজ্‌ম্ বা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকলেই অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন এবং ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা ও তর্ক-বিতর্কের আর অন্ত নাই। বর্ত্তমান বিশ্ব-সংগ্রামে রুশিয়ার অদ্ভুত রণকৌশল ও কূটনীতি শত্রু মিত্র সকলকে পরাস্ত করিয়া বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে এবং লোক-হু-হ্যাভ-দের হৃদয়ে নূতন ত্রাসের ও লোক-হু-হ্যাভ-নট-দের প্রাণে নূতন আশ্বাস সঞ্চার করিয়াছে। আর উভয় দলের মধ্যবর্ত্তী চতুর মধ্যবিত্ত শ্রেণীও নূতন করিয়া ফন্দি-ফিকির আঁটিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। এদেশেও সোশ্যালিজ্‌মের ভেক ধারণ করিয়া অনেকেই নূতন খেলা খেলিতে শুরু করিয়াছেন। ফলে সোশ্যালিষ্টদের মধ্যেও নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে এবং খাঁটি ও মেকীর পার্থক্য করা সাধারণ লোকের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সোশ্যালিজ্‌মের দীর্ঘ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি এই বহুনিন্দিত ও বহুপ্রশংসিত তত্ত্ব সম্বন্ধে মাত্র একটা দিক হইতে এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। বিষয়টির এই দিক দিয়া পূর্ব্বে আর কখনও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ক্যাপিট্যালিজ্‌ম, ফ্যাসিজ্‌ম, সোশ্যালিজ্‌ম বলিতে আমরা সাধারণত তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির ও আকৃতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিয়া থাকি এবং উহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচার করিবার সময়ও মানুষকে বাদ দিয়া কন্‌ষ্টিটিউশনাল মেশিন বা শাসন-প্রণালীগুলিরই তুলনামূলক বিচার করিয়া থাকি। বিভিন্ন তন্ত্রের রাষ্ট্রপতিগণের ব্যক্তিত্বের বিচার হয়তো তাহাতে স্থান পাইয়া থাকে; কিন্তু জনসাধারণের মতিগতির বিচারের স্থান সেখানে নাই,—থাকিলেও উহা গৌণ, মুখ্য নহে। এইরূপ বিচারের প্রধান দোষ এই যে, ইহা সমাজ-ব্যবস্থা বা শাসন-প্রণালীকে মানুষের উপরে বা আগে স্থান দেয় এবং মনুষ্য-স্বভাবকে বাদ দিয়া নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কল্পনা করে। সেইজন্যই সোশ্যালিজ্‌মকে নস্যাৎ করিতে গিয়া উহার অনুরাগী ও শিষ্যগণকে আমরা কোমল মনোবৃত্তিহীন, বিবাহবন্ধনে অবিশ্বাসী, অধার্ম্মিক, সর্ব্বপ্রকার খ্রীষ্টীয় সদাচার ও নিষ্ঠাবিবর্জ্জিত কিম্ভূতকিমাকার জীব হিসাবে নিন্দা করিয়া থাকি। ইহার অর্থ

এই যে, সমাজতন্ত্রের আদর্শানুযায়ী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে তাহা হইতে এইরূপ মানবগোষ্ঠীরই সৃষ্টি হইবে। সুতরাং এই পথে আমাদের যাওয়া সঙ্গত নহে। কিন্তু আমার মনে হয়, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ-নির্ণয়ে আমরা এখানে গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি। কারণ সমাজতন্ত্র হইতে এই প্রকার মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে ইহা যতটা সত্য, তদপেক্ষা অধিক সত্য এই প্রকার মানুষ সৃষ্টি হইতেছে বলিয়াই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। এই সহজ সত্যটি যদি আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া না যাইত, তাহা হইলে আমরা ফ্যাসিজম্ বা সোশ্যালিজমের তত্ত্ব বা আদর্শকে গালমন্দ না দিয়া, এমন কি ঐ ঐ সমাজের মনুষ্যশ্রেণীকে দোষারোপ না করিয়া মনুষ্য-সমাজের এই ক্রমবিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধানে অধিকতর অবহিত হইতাম। আমাদের সমাজে আজও সোশ্যালিজমের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে বলিয়াই মনে করি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইতিমধ্যেই বহু খাঁটি ও মেকী সোশ্যালিষ্ট আমাদের মধ্যে জন্মিয়াছে এবং সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের আওতায় ও সংস্কারে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি তাহা হইতেছে এই যে, ক্যাপিট্যালিজম্, ফ্যাসিজম্ বা সোশ্যালিজম্ বলিতে আমরা বিশেষ কোন সমাজ-ব্যবস্থা বা শাসন-প্রণালীকে বুঝিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা বিশেষ চরিত্রের বা টাইপের মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব বা অস্তিত্বকেই প্রকাশ করিয়া থাকে।

এই যে নূতন ধরনের জীব, ইহারা গুরুজনকে গুরুজন বলিয়া বিশেষ সম্মান দেখাইবার প্রয়োজন বোধ করে না। প্রণাম বা নমস্কার করা ইহাদের সহজে আসে না। প্রশ্নের জবাব ইহারা পারতপক্ষে দেয় না, দিলেও অতি সংক্ষেপে। গৃহের সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ইহারা স্বাধিকারে, অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে, কিন্তু অপর পক্ষে তাহাদের উপর গৃহেরও যে কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিতে পারে, উহাদের ভাবসাবে তাহা মনে হয় না। ইহারা বিনয়ে যেমন বিশ্বাস করে না, অনাবশ্যক ঔদ্ধত্যও বড় দেখায় না। যাহা প্রয়োজন, তাহা উহারা নীরবে আত্মসাৎ করে বা ব্যবহার করে—বারণ করা চলে না। ইহারা পরকে আপন করে, আপনাকে করে পর। কবিতা ইহারা লেখে না, ইহাদের পিতাদের অনেকে লিখিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের নিকট তাহাদের ভাষা ও ভঙ্গী দুইই হয় অবোধ্য। তরুণ বয়সে ইহারা প্রেমে পড়ে না, কিন্তু বান্ধবী করে; এবং বিবাহ করিলেও প্রেমের উচ্ছ্বাসজনিত যাতনা ইহারা ভোগ করে না। সময়ের জ্ঞান ইহাদের নাই; ধর্ম্মের ধার ইহারা ধারে না। মুখে ইহাদের কঠিন আবরণ, ভাল করিয়া

ইহারা হাসে না, কাঁদিতে সম্ভবত একেবারেই জানে না। ইহাদিগকে আমরা বুঝিতে পারি না; স্বার্থপর, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, দয়ামায়াশূন্য বলিয়া রাগ করি; তাহারা বিস্মিত হয়, অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে, কিছু বলে না, আপনার পথে নির্বিকারচিত্তে আবার চলিতে থাকে। উহাদের নির্বিকার, নির্লিপ্ত স্বার্থপরতা যেমন আমাদের নিকট অবোধ্য, আমাদের সকরুণ হৃদয়াবেগ ও উচ্ছ্বাসও উহাদের নিকট তেমনই অনাবশ্যক ন্যাকামি।

সোশ্যালিজমের সহিত এইরূপ চরিত্রের মানুষের অভেদ সম্পর্ক সম্বন্ধে এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহার উত্তর দিতে হইলে সোশ্যালিজমের মূল তত্ত্বটা কি, তাহা একবার চিন্তা করা দরকার। ব্যক্তিগত ধনাধিকার ও অর্থের মধ্যস্থতায় উৎপন্ন পণ্য ক্রয়বিক্রয় যেমন ধনতন্ত্রের ভিত্তি, তেমনই ব্যক্তিগত ধনাধিকারের বিলোপ এবং প্রধানত মানুষের ভোগের জন্য পণ্য-সম্পদের সৃষ্টি (অর্থের মধ্যস্থতায় ক্রয়বিক্রয়ের জন্য নহে) হইল সমাজতন্ত্রের আদর্শ। ব্যক্তিগত বা পরিবারগত ধনাধিকারকে অস্বীকার করা মানেই হইল সাংসারিক বন্ধন ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষিত ধর্ম্মকে অস্বীকার করা। আমার জমি, আমার বাড়ি, আমার স্ত্রী, আমার গরু (এখন মোটর), সেন্স অব পজেশনের এই যে মজ্জাগত সংস্কার, ইহাকে লঙ্ঘন করিবার জন্য কতখানি সংস্কারমুক্ত, নির্লিপ্ত কঠিন হৃদয়ের প্রয়োজন, তাহা চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইহার জন্য স্ত্রী বা ধর্ম্ম পরিত্যাগের প্রয়োজন কি? প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রীকে বর্জ্জন করিবার কথা সমাজতন্ত্র কোথাও বলে নাই; জমি, বাড়ি, গরু, ঘোড়া, ভেড়ার সহিত প্রেমরসে জড়িত যে স্ত্রী, উহাতেই তাহাদের আপত্তি। কিন্তু তাহাকে শোধন করিয়া "কম্‌রেড" হিসাবে গ্রহণ করিতে ইহাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। ইহাদিগকে গৃহিণী বলিলে ব্যাকরণ কিঞ্চিৎ অশুদ্ধ হইবে; কারণ যেখানে গৃহের অভাব, সেখানে গৃহিণী কোথায় থাকিবেন। চরণদাসীও ইহারা নহেন। কিন্তু সহধর্ম্মিণী বা জীবনসঙ্গিনী লাভে কোন বাধা সমাজতন্ত্রে নাই। তারপর কথা উঠিতে পারে, বেশ, ইহা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু ধর্ম্ম কি দোষ করিয়াছে? তাহার উত্তর এই যে, শাশ্বত বা প্রাকৃত-ধর্ম্ম দোষ কিছু না করিয়া থাকিলেও ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষিত ধর্ম্মগুলিকে ইহাদের মতে মার্জ্জনা করা যায় না। এই সকল ধর্ম্ম শ্রেণীবৈষম্য ও ধনবৈষম্যকে গোড়া হইতেই পুরাপুরি স্বীকার করিয়া লইয়া মানবজীবনে দুঃখবাদকে সম্মানের আসন দান করিয়া দুনিয়ার দীনদুঃখী ও দাসজীবীকে যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ কিংবা খোদাতালার মুখপানে তাকাইয়া সকল নির্য্যাতনকেই নীরবে হজম করিতে উপদেশ দিয়াছে। দক্ষিণ গালে চড় মারিলে

বাম গাল বাড়াইয়া দিতে, কলসীর কানা মারিলেও প্রেম বিতরণ করিতে এবং মন্বন্তর, মহামারী, মহারণ প্রভৃতি সবকিছু দুর্যোগে দৈব বা অদৃষ্টের উপর সকল দোষ চাপাইয়া দিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে শিক্ষা দিয়াছে। এই সব অনুশাসনের দ্বারা সবল ও ধনীর পথ মসৃণ ও সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাদের অনাচার ও অত্যাচারকে জাগতিক বিধানের একটা স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে মানুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এইরূপ ধর্মের অহিফেন সেবন করিয়া ও পরিবারের বন্ধনে বন্দী হইয়া পৃথিবীর নিঃস্বদেরা মুষ্টিমেয় ধনী মালিকের ঘানিগাছে উদয়াস্ত ঘুরিতেছে এবং তাহাদের রক্ত-জল-করা তৈলে উহারা ফাঁপিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। অতীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি-শিল্প, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন ও সাফল্য অর্জন করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিলে সত্যকে অস্বীকার করা হইবে। কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত মূলগত বিরোধ ও বৈষম্য (কণ্ট্রাডিক্শন অ্যাণ্ড ইন্‌ইকুইটি) আজ ইহাকে এমন একটা স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, যেখানে শ্রেণী ও জাতিবিরোধ সমগ্র মানবকে নিঃশেষ ও নির্মূল করিতে উদ্যত হইয়াছে। ফলে স্বাভ-নটদের পরিবার ছত্রভঙ্গ হইয়াছে, আমার বা আমিত্বের শখ মিটিয়াছে, ধর্মের ঘোর কাটিয়াছে। সেইজন্যই মানুষ আজ অনুপাতে প্রকৃতির ন্যায় নির্মম ও নির্বিকার হইয়া উঠিয়াছে। মানব-সভ্যতার ঐতিহাসিক বিবর্তনেরই ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল।

এই ঐতিহাসিক বিবর্তনের মূলে কোন্ শক্তি প্রধানত কাজ করিতেছে। এখন তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। সোশ্যালিষ্টদের মতে, পণ্যোৎপাদনের প্রণালী এবং জীবনসংগ্রামের গুরুত্বই মানব-সমাজের ও সভ্যতার রূপকে দেশে দেশে যুগে যুগে পরিবর্তিত করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং এই পরিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করিতে হইলে অর্থনৈতিক পটভূমিকায় ফেলিয়াই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। অর্থাৎ ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিতে হইলে ধর্মের কঠিন শাসন ও রাজশক্তির দোর্দণ্ড প্রতাপকেও লঙ্ঘন করিয়া অলক্ষ্য কিন্তু অমোঘ অর্থনৈতিক প্রভাবের প্রতিই আমাদের সন্ধানী দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিতে হইবে। ইহাকেই সোশ্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্টবাদীরা মেটিরিয়ালিষ্টিক (অর ইকনমিক) ইন্‌টারপ্রিটেশন অব হিষ্ট্রি বলিয়া থাকেন। ইতিহাসের এই ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করা সহজ নহে, যদিও রাজশক্তি ও ধর্মের অনুশাসন অপেক্ষা অর্থনৈতিক প্রভাবকে উচ্চতর স্থান দিতে আমাদের মধ্যে অনেকেরই ঘোরতর আপত্তি আছে। কিন্তু আজ যে আমরা আমাদের অনেকগুলি সযত্নপুষ্ট কোমল হৃদয়বৃত্তি ও সামাজিক

আচার-ব্যবহার এবং ধর্ম্মকে ইচ্ছাসত্ত্বেও কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছি না, তাহার মূলে যে এই জীবন-সংগ্রাম বা অর্থসঙ্কটই কাজ করিতেছে, তাহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি ? এই জীবন-সংগ্রাম বা অর্থনৈতিক ব্যাপার হইতেই যে ভ্রাতৃবিরোধ, পারিবারিক কলহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, বিশ্বব্যাপী লড়াই, তাহাও কি অস্বীকার করা যায় ?

প্রাণীমাত্রেরই বাঁচিয়া থাকিবার যে প্রকৃতিদত্ত সহজাত ধর্ম্ম, তাহা আর সব হৃদয়াবেগ বা মনোবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া সকলের ঊর্দ্ধে স্থানলাভ করিতে চাহিবে ইহা সমাজতন্ত্রীদের মত বলিয়াই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সেইজন্যই সৃষ্টির আদি হইতে অধুনা পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজে বা ইতরপ্রাণী জগতে কোথাও বিরোধ, সংঘর্ষ বা লড়াই বন্ধ থাকে নাই। যে রাজশক্তি বা ধর্ম্মযাজক ইহাকে দমন বা প্রতিরোধ করিবেন, তাঁহারা নিজেরাই অতি ভয়ঙ্কর অশান্তি ও অনাচারের সৃষ্টি করিয়া ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। এমন কি ধর্ম্মের নামে এবং রাজাদেশেই বহু অনাচার-অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভ্যতা রক্ষার নামে নগ্ন বর্ব্বরতার বিশ্বব্যাপী যে বীভৎস তাণ্ডবলীলা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, আদিম বর্ব্বর যুগে কিংবা সভ্যতার মধ্যযুগে, এমন কি বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কাহারও পক্ষে ইহা কল্পনা করাও কি সম্ভব ছিল ? প্রেম, প্রীতি, দয়াদাক্ষিণ্য, ক্ষমা, তিতীক্ষা, অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, সুনীতি, সদাচার, আত্মসংযম ও পরার্থপরতা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের যে সব উচ্চ আদর্শকে আমরা এতকাল স্বীকার ও প্রচার করিয়া আসিয়াছি, সেগুলির উন্মেষসাধনে নিশ্চয়ই ইহা সহায়তা করিতেছে না। পরন্তু দুর্লোভ, দুর্নীতি, নীচতা ও নিষ্ঠুরতা বিশ্বময় আজ যে রাজটীকা ও রাজকীয় অভ্যর্থনা লাভ করিল, ইহার পর এই গৌরবের আসন হইতে ইহাদিগকে নামানো কি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় বা ধর্ম্মের সাধ্যায়ত্ত ? অতীতেও তাহা সম্ভবপর হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। কোন আদর্শকেই শুধু উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা বলিয়া বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া রক্ষা করা যাইবে না—যদি আমরা এই বিরোধ বা সংঘর্ষের মূল কারণের উচ্ছেদ সাধন করিতে না পারি অর্থাৎ আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা বা জীবন-সংগ্রামকে একটা নূতন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম না হই। তাহা করিবার জন্যই সংস্কারমুক্ত এই নূতন মানুষের প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা না চাহিলেও ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত বিরোধ ও বৈষম্যই ইহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে। যে ধনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ অবদান এই বিংশ শতাব্দী ও তাহার বিজ্ঞানাকৃত এই অপূর্ব্ব সম্পদ, সেই ধনতন্ত্রই তাহার সেই অপূর্ব্ব সৃষ্টিকে

সহস্রমুখী মারণাস্ত্রে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যতের মত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে!

এই আত্মঘাতী আচরণের মূল খুঁজিতে হইলে ধনতন্ত্রের ভিতরকার গলদ কোথায়, তাহা জানা আবশ্যক। এখন অতি সংক্ষেপে তাহাই এখানে আলোচনা করিব। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া ধনিকসম্প্রদায় এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকেন যে, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি যদি না থাকে, এত সম্পদ এত ঐশ্বর্য্য তাহার কিছুই যদি নিজের না হয়, তাহা হইলে মানুষের ধনোৎপাদনের উৎসাহ, উদ্যম থাকিবে কেন? কর্ম্মপ্রেরণার মূল উৎসই তো তাহা হইলে শুষ্ক হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে সমাজতন্ত্রের পক্ষ হইতে পালটা প্রশ্ন করা হইয়া থাকে—এতকাল যে অগণিত শ্রমিক ও শিল্পী ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, তাহার কতটুকুতে তাহাদের নিজেদের অধিকার বা স্বামিত্ব ছিল? এযাবৎকাল উৎপাদন (প্রোডাক্‌শন) যাহা হইতেছে তাহা তো সকলের সমবেত চেষ্টায় সমাজতান্ত্রিক প্রথায়ই হইতেছে; শুধু বণ্টন-(ডিষ্ট্রিবিউশন)-এর বেলায় ওই বিশাল পণ্যসম্ভারের উপর মালিকী স্বত্ব জন্মিতেছে গুটিকয়েক ধনীর। সমস্ত ব্যবস্থার এইখানেই তো অস্বাভাবিকতা এবং ইহাই তো মূল ব্যাধি। এই ব্যবস্থায়ও যদি সৃষ্টির কাজ জোরে চলিয়া আসিয়া থাকিতে পারে, তবে সবাই যখন সৃষ্ট সম্পদের স্বত্বাধিকারী না হইলেও, তুল্য ভোগাধিকারী হইবে, তখন কর্ম্মের উৎসাহ কমিবে কেন? আর এত বিতর্কেরই বা প্রয়োজন কি? কমিয়াছে কি বাড়িয়াছে, রাশিয়া তো তাহার চাক্ষুষ প্রমাণই দিতেছে। দুর্দ্ধর্ষ, অপরাজেয় জার্ম্মানশক্তির সম্মুখে দুনিয়ায় যখন কেহই দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, তখন একমাত্র রাশিয়া তাহাকে শুধু রুখিল না, ভয়ঙ্কর রকমে নাজেহাল করিল।

যে কথা বলিতেছিলাম। ধনতন্ত্রের ভিতরকার গলদের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা তাহার মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হইয়া একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতে তাহা আরও সহজে বুঝিতে পারিব। রবার্ট ওয়েন স্কটল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত কাপড়ের কলের মালিক ছিলেন। কিন্তু সাধারণ ধনিকের মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী, চিন্তাশীল ও দরদী লোক। তাঁহার কারখানার শ্রমিকদের সকল রকম মঙ্গলের জন্য তাঁহার মনোমত আদর্শ বন্দোবস্ত করিবার পরও তিনি কিছুতেই মনে শান্তি পাইতেছিলেন না, এবং পরিশেষে শ্রেষ্ঠ সামাজিক সম্মান, বিপুল বিত্তব ও ভোগবিলাস সমস্ত ত্যাগ করিয়া কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে ধনীর দীনমোহনের

(এক্সপ্লয়টেশনের) বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার "রেভলিউশন ইন মাইণ্ড অ্যাণ্ড প্র্যাক্টিসে" (১৮৪৮) লিখিয়াছেন, "আমার কারখানায় ২৫০০ শ্রমিক সমাজ মানুষের জন্য যে পরিমাণ পণ্য প্রস্তুত করিতেছে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে উহা প্রস্তুত করিতে ৬০০০০০ শ্রমিকের প্রয়োজন হইত। আমি নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম,—২৫০০ লোকে যে পণ্য আজ ভোগ করিতেছে এবং ৬০০০০০ লোকে যে পণ্য পূর্ব্বে ভোগ করিত, এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার কি হইল? সেই পণ্য কোথায় গেল?" প্রশ্নের উত্তরও তিনি নিজেই দিয়াছেন, "ইহার উত্তর খুব সহজ; এই পণ্য মূলধনের উপর শতকরা পাঁচ পাউণ্ড সুদ দিতে এবং তদুপরি তিন লক্ষ পাউণ্ড লভ্যাংশ দিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।" তাহাই আবার অভিজাত-সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি ও ভোগবিলাসের খোরাক এবং এক-একটা সর্ব্বনাশা লড়াইয়ের ইন্ধন যোগাইতে ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। এইভাবে আর কতদিন চলিবে? তাই আমাদের মধ্যে একদল অদ্ভুত নূতন মানুষের অভ্যুদয়।

সমাজতন্ত্রীদের মেটিরিয়ালিষ্টিক ইন্‌টারপ্রেটেশন অফ হিষ্ট্রিকে যদি একটা প্রাধান্য দিতে রাজি নাও হই, কিন্তু থিওরি অফ ইভলিউশনকে স্বীকার করি, তাহা হইলেও নূতন মানুষের আবির্ভাবের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কথা হইতে পারে, ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে আমরা যদি বানর হইতে মানুষ হইয়া থাকি, তাহা হইলে এক্ষণে মানুষ হইতে আমাদের দেবতা হইবার কথা। এরূপ অধঃপতন হইবার তো কথা নহে। ঠিক কথা। কিন্তু যাহাকে আমাদের পুরাতন চোখে অধঃপতন মনে হইতেছে, তাহা কি সত্যই তাই? সেন্টিমেন্ট বা ইমোশন-বিবর্জ্জিত মানুষ আমাদের অপরিচিত বলিয়াই যে নীচুস্তরের মানুষ, ইহা ধরিয়া লওয়া কি একদেশদর্শিতা হইবে না? গীতার নিষ্কাম কর্ম্মবাদ তো ইমোশন-বিবর্জ্জিত আদর্শ মানুষের কল্পনাই করিয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত সেই উচ্চ আদর্শে আমরা এতকাল চেষ্টা করিয়া কয়জন পৌঁছিতে পারিলাম? ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির বিলোপ-সাধনের প্রস্তাব করিয়া সমাজতন্ত্রীরা যদি নিষ্কাম কর্ম্মসাধনায় সিদ্ধিলাভের সেই সহজ পথটি নির্দ্দেশ করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের ক্ষুব্ধ না হইয়া তো উল্লসিত হইবার কথা। তা ছাড়া, আধুনিক জগতে ভাবপ্রবণ সদ্‌গুণবিশিষ্ট মানুষের যখন টিকিয়া থাকা আর সম্ভবপর হইতেছে না, তখন গুণবিশিষ্ট মনুষ্য-সমাজ অপেক্ষা এই নির্গুণ মনুষ্য-সমাজকে স্বীকার করিয়া লইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধনায় লাগিয়া যাইতে আপত্তি কি? ইহাতে সংসারধর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না,

অধ্যাত্ম-ধর্ম্মও বজায় থাকিবে এবং সর্ব্বোপরি আমাদের সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ হিতোপদেশেরও জয় হইবে। সম্পাদক মহাশয় যেকী সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা অত্যন্ত তিক্তবিরক্ত হইয়া থাকিলেও, এই দিক দিয়া বিষয়টা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

মহাস্থবির জাতক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমার জীবনে লক্ষ্য করেছি, একটা সুখের কারণ ঘটলেই ঠিক সেই ওজনের একটা দুঃখও এসে জোটে। সুখদুঃখের নাগরদোলায় এই ওঠানামার ওপর এমন একটা মানসিক মৌতাত আমার জন্মেছে যে, সরল একটানা জীবনযাত্রায় আমি হাঁপিয়ে উঠি, লৌকিক ও সাংসারিক বিধিমতে সে জীবন সুখের হ'লেও। লতুর সঙ্গে আমার এই যে নতুন পরিচয় ঘটল, তারই আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি দিন কাটাতে লাগলুম। লতু একদিন বললে, ভাল ক'রে পড়াশোনা কর।

সেদিন থেকে পড়ায় এমন মন লাগালুম যে, বাবা পর্য্যন্ত খুশি হয়ে উঠলেন। মনে পড়ে, এই সময় আমাদের ইস্কুলে একজন নতুন শিক্ষক এলেন। ক্লাসের মধ্যে আমি, শচীন ও প্রমথ একেবারে দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছিলুম। তর্ক, মারামারি ও নানারকম উৎপাতের জন্য শিক্ষক-সম্প্রদায় সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকতেন। ক্লাসের মধ্যে আমরা তিনজন সবার চাইতে বেশি মার খেলেও অধিকাংশ শিক্ষকই আমাদের পছন্দ করতেন বেশি। তাঁদের আশা ছিল, একদিন, যেদিন আমাদের সদ্‌বুদ্ধি হবে, সেদিন আমরা সব বিষয়েই সব ছেলের চাইতে ভাল হয়ে যাব।

আমাদের এই নতুন শিক্ষকটি আসামাত্র তাঁর সঙ্গে কি জ্যাঠামো করায় তিনি আমার ও শচীনের বেশ ক'রে কান রগড়ে দিলেন। নতুন মাস্টারের হাতে কানমোটা খেয়ে আমাদের মাথায় দুষ্ট-সরস্বতী চেপে বসল। আমরা রকম-রকমের বুলিচালি কাটতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। শেষকালে তিনি রেগে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক সেই সময় শচীনের বাবা অর্থাৎ আমাদের ইস্কুলের যিনি কর্তা, তিনি কি একটা কাজে এসেছিলেন। নতুন মাস্টারটি একেবারে তাঁর কাছে গিয়ে উৎপাতের কথা বলতেই আমাদের ডাক পড়ল। আমরা লাইব্রেরি-ঘরে যেতেই আমাদের ওপর বেত্রাঘাতের হুকুম দিয়ে তিনি চ'লে গেলেন। ঠিক হ'ল, ইস্কুলের ছুটির পর সব ছেলের সামনে আমাদের বেত মারা হবে। নতুন মাস্টার অর্থাৎ যাঁর ক্লাসে আমরা হাঙ্গামা করেছিলুম, তিনি বেত্রাঘাত করবেন—তাঁর যত ঘা খুশি।

ইস্কুলের ছুটি হতে সব ছেলেরা ও মাস্টারেরা উঠনে ভিড় ক'রে দাঁড়াল। উঠনের মাঝখানে একটা বেঞ্চি পেতে তার ওপরে আমাকে চড়ানো হ'ল। মাস্টার মশায় একখানা হাত-তিনেক লম্বা বেত নিয়ে এলেন। রাগে তখনও তিনি কাঁপছিলেন। প্রথমেই তিনি আমার পায়ে ঘা পাঁচ-সাত গায়ের জোরে মারতেই আমি একেবারে ব'সে পড়লুম। পায়ের যন্ত্রণায় মাথা পর্যন্ত ঝনঝন করছিল, তবুও রসিকতা করবার প্রলোভন সামলাতে পারলুম না। বললুম, পায়ে মারবেন না স্যার্। পা ভেঙে গেলে আর ইস্কুলেও আসতে পারব না, আপনার হাতে মার খাবার সৌভাগ্যও আর হবে না।

আমরা তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তুম। ওপরের ও নীচের সব ক্লাসের ছেলেরাই আমাদের পছন্দ করত। আমাদের ওপরে এই সাজার ব্যবস্থাটা তাদের মনঃপূত হয় নি। আমার ওই কথা শুনে তারা একেবারে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

অন্য মাস্টারেরা ছেলেদের এই ধৃষ্টতা দেখে চীৎকার ক'রে উঠলেন, এই, চুপ চুপ, হাসতে লজ্জা করে না তোমাদের! ইত্যাদি বলায় তারা চুপ করলে।

তারপরে মাস্টার মশায় এলোপাথাড়ি প্রায় পনরো মিনিট ধ'রে আমাকে প্রহার দিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, কোথায় শচীন্দ্রনাথ?

শচীন্দ্রনাথ সেইখানেই দাঁড়িয়েছিল। আমি নেমে যেতেই সে টপ ক'রে বেঞ্চির ওপরে উঠে দাঁড়াল। মাস্টার মশায় বেত আপ্সাতে আপ্সাতে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কোথায় মারব?

শচীন তার হাতখানা বাড়িয়ে দিলে, তারই ওপরে সাঁই সাঁই বেত

পড়তে লাগল। পনেরো-বিশ ঘা বেত মারার পর তিনি বললেন, ও হাত পাত।

এই হাতেই মারুন না সার্, আবার ও হাত কেন?

ও, তা হ'লে তোমার এখনও কিছু হয় নি!

হবে আবার কি সার্! আপনার বগলে বীচি আওরে যাবে, তবু আমার কিছু হবে না।

শচীনের এই কথা শুনে ছেলের দল হো-হো ক'রে হেসে উঠল। মাস্টারেরা কিছুতেই সে গোলমাল থামাতে পারে না, শেষকালে প্রথম শ্রেণীর একজন মুরুব্বী গোছের ছাত্র মাস্টারদের বললে, সার্, ওদের সঙ্গে আমাদেরও কেন সাজা দিচ্ছেন, খিদে পেয়েছে, এবার বাড়ি যাই।

প্রথম শ্রেণীর ছেলেরা বেরিয়ে যেতেই তাদের সঙ্গে আরও অনেক ছেলে বেরিয়ে গেল। দর্শকের সংখ্যা ক'মে যাওয়ায় মাস্টার মশায়ের উৎসাহও ক'মে গেল। তিনি শচীনকে নামতে ব'লে বেত রাখতে গেলেন। আমরা দুজনে অন্য ছেলেদের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় মাস্টার মশায় আমাদের ডেকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই শাস্তিই তোমাদের শেষ মনে ক'রো না। আমি তোমাদের ইতিহাস পড়াব, এই আরম্ভ জেনে রেখো।

রাস্তায় চলতে চলতে শচীন বললে, এবার থেকে তো Salium (শালা শব্দের Latin, অবশ্য আমাদের তৈরি শব্দশাস্ত্র অনুসারে) হরদম পিটবে রে।

তাই তো, কি করা যায় বল তো? দোব নাকি Saliumকে কম্বল চাপা দিয়ে—বেশ ক'রে?

পরামর্শ ঠিক ক'রে বাড়ি যাওয়া হ'ল।

আমাদের দুখানা ইতিহাস পড়া হ'ত। একখানা অধর মুখোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস আর একখানা Townsend Warner-এর ইংলণ্ডের ইতিহাস। দুখানা মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠা হবে। ঠিক হ'ল, বই দুখানা ঝাড়া মুখস্থ ক'রে ফেলা যাবে। তা সত্ত্বেও যদি মারধর করে তো বাধ্য হয়ে একদিন কম্বল চাপা দিতে হবে।

দিন তিন-চার অসুখের অছিলায় ইস্কুলে গেলুম না। সারা দিনরাত্রি

ধ'রে দুখানি বই গড়গড়ে মুখস্থ ক'রে ফেলা গেল। কামাইয়ের পর যে দিন দুই বন্ধুতে ইস্কুলে গেলুম, সেই দিনই নতুন মাস্টারের ক্লাস ছিল।

সেদিন ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়া ছিল। মাস্টার মশায় ক্লাসে বেত নিয়ে ঢুকলেন। —এ দৃশ্য এই ইস্কুলে নতুন দেখলুম।

জিজ্ঞাসা করলেন, কতদূর পড়া হয়েছে?

ইতিহাসখানা সম্পূর্ণ পড়া হয়ে গিয়েছিল, তখন গোড়া থেকে দ্বিতীয় বার পড়া হচ্ছিল। মাস্টার মশায় শুনে বললেন, আচ্ছা, কার কত দূর তৈরি হয়েছে, আমি একবার ক্লাস-সুদ্ধ ছেলেকে পরীক্ষা করতে চাই। স্থবির শর্ম্মা, উঠে এস।

উঠে মাস্টার মশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি একটা প্রশ্ন করলেন, আমি টপ ক'রে তার সঠিক উত্তর দিয়ে দিলুম। একটা প্রশ্নে রেহাই হ'ল না। বোধ হয় তিনি প্রহার দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েই এসেছিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতে লাগল। আর আমিও টপটপ তার জবাব দিতে লাগলুম। মাস্টার মশায় অবাক, ক্লাসের ছেলেরা একেবারে থ। শেষকালে তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি এই-খানেই দাঁড়াও। শচীন্দ্রনাথ, এধারে এস।

শচীন উঠে গটগট ক'রে এগিয়ে এল। একটা প্রশ্ন করা মাত্র সে উত্তর দিয়ে দিলে। মাস্টার মশায় আর একটা প্রশ্ন করার জন্যে বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছেন, এমন সময় শচীন বললে, সার্, অভয় দেন তো একটা কথা নিবেদন করি।

বল।

প্রশ্ন খোঁজবার জন্যে অত পাতা উল্টোবার দরকার কি, এক কাজ করুন, বইয়ের গোড়া থেকে শেষ অবধি আমি ব'লে যাচ্ছি, তার মধ্যে আপনি সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন। আর মারবারই যদি ইচ্ছে থাকে তো ঘা কয়েক দিয়ে ছেড়ে দিন, গিয়ে ব'সে পড়ি।

শচীনের কথা শুনে রাগে মাস্টার মশায়ের মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, কি! গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত বলবে?

হ্যাঁ সার্, ও তো সামান্য। এটা কি আর ইতিহাস! ওর চেয়ে বড়

বড় ইতিহাস আমার মুখস্থ আছে, সে সব বইয়ের নাম পর্যন্ত ইস্কুলের কেউ জানে না।

মাস্টার মশায় বললেন, আচ্ছা, বল।

শচীন বইয়ের গোড়া থেকে গড়গড় ক'রে মুখস্থ ব'লে যেতে লাগল, মাস্টার মশায় স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন।

ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল। মাস্টার মশায় আমাকে আর শচীনকে ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে লাইব্রেরি-ঘরে চললেন। সেখানে মাস্টারদের ভিড় ক'মে যাওয়ার পর বললেন, দেখ হে বাপু স্থবির শর্ম্মা এবং শচীন্দ্রনাথ! তোমাদের এমন merit, এমন intelligence হেলায় হারিও না। তোমরা ইচ্ছে করলে জগতে অনেক উন্নতি করতে পারবে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তোমরা নষ্ট হয়ে যাবে।

আমি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি বহু সন্ন্যাসী, সাধু, সন্ত, সাঁইবাবা, ফকির, মোহান্ত, মঠধারী ও জ্যোতিষীকে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু এক কথায় আমাদের সম্বন্ধে এমন মোক্ষম ও নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী আর শুনি নি।

দিনগুলি বেশ কাটছিল। পড়াশোনার উৎসাহ, পাগলা সন্ন্যেসীর লেকচার ও কবিতাপাঠ, লতু, গোষ্ঠদিদি ইত্যাদি মিলিয়ে নিরুপদ্রবে কাটছে। বিকেলবেলায় ছুটি পাওয়ায় মনের মধ্যে মুক্তির আনন্দ অনুভব করছি, এমন সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘ'টে গেল।

এই সময় আমাদের আর একজন নতুন মাস্টার এলেন। নতুন মাস্টার দেখলেই আমাদের দুষ্টুমি করবার উৎসাহ বেড়ে যেত চতুর্গুণ। এ'ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। দু-চার দিনের মধ্যেই একদিন প্রমথকে তিনি বেধড়ক প্রহার দিলেন। এর পরেই তাঁর মেজাজ একেবারে মন্বন্তর থেকী হয়ে উঠল। সকলকেই মারতে উদ্যত। কয়েক দিনের মধ্যেই ক্লাসের একটি ভাল এবং ভালমানুষ ছেলের ওপরে কি কারণে রেগে গিয়ে ভদ্রলোক মেরে তাকে একেবারে আধমরা ক'রে দিলেন।

ইস্কুলে মারধর খাওয়াটা আমরা খুব একটা অপমানজনক কাণ্ড ব'লে মনে করতুম না। মাস্টাররা মারবে জেনেই আমরা ক্লাসে দুষ্টুমি

করতুম। কখনও কখনও প্রহারের মাত্রা বেশি হয়ে যেত সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের দুষ্টুমি ও মাস্টার-জ্বালানো কায়দাগুলোও যে কোনও সময়েই মাত্রা ছাড়িয়ে যেত না, এমন কথাও হলপ ক'রে বলতে পারি না।

পরের দিন বেলা দশটার সময় ইস্কুলে যাচ্ছি, দেখি, পথে—ইস্কুল থেকে একটু দূরেই—আমাদের ক্লাসের ছেলেরা দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তারা আমাকে আটকে বললে, আজ আর ইস্কুলে যাওয়া হবে না।

কেন?

উপেনকে কি রকম মেরেছে নতুন মাস্টার! ওর কোনও দোষ নেই। মিছিমিছি মারার জন্যে আমরা ধর্মঘট করেছি, এর বিহিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ ইস্কুলে যাব না।

বহুৎ আচ্ছা।—ব'লে আমিও দাঁড়িয়ে গেলুম।

বেলা সাড়ে এগারোটা অবধি দাঁড়িয়ে থাকার পর অনেকেই বাড়ি চ'লে গেল। আমি আর শচীন 'হেদো'য় গিয়ে ব'সে রইলুম। বেলা দুটো আড়াইটে নাগাদ ইস্কুলের একটা চাকর আমাদের দেখতে পেয়ে ইস্কুলে গিয়ে খবর দিয়ে দিলে।

পরের দিন ইস্কুলের মালিক মশায় ক্লাসে এসে খুব ধমকধামক করলেন। বললেন, তোমরা আমাকে না জানিয়ে এই রকম ধর্মঘট ক'রে অত্যন্ত অন্যায় করেছ। তোমাদের দলপতিকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

বেলা তিনটে নাগাদ ইস্কুলময় র'টে গেল, দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্রের নাম কাটা যাবে। কে সে?

পরের দিন আমাদের ক্লাসে একজন মাস্টার পড়াতে পড়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, স্থবির শর্মা, আমি শুনলুম, তোমাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

ম্যালেরিয়ার দেশে জন্মালেও পিলে-চমকানো অনুভূতিটা যে ঠিক কি রকম, তা অধিকাংশ বঙ্গবাসীই বোধ হয় জানেন না। সে রস অবর্ণনীয়। মাস্টারের মুখে এই মনোরম সংবাদটি শুনে আমার পিলে চমকে উঠল। জিজ্ঞাসা করলুম, কেন স্যর্?

তুমি নাকি সেদিনকার ধর্ম্মঘটের Ring-leader ছিলে।

ক্লাস-সুদ্ধ ছেলে একবাক্যে এই অভিযোগের প্রতিবাদ ক'রে উঠল। তারা বললে, স্থবির আগে কিছু জানত না সার্, আমরাই ওকে ইস্কুলে আসতে বারণ করেছিলুম। ওকে তাড়িয়ে দিলে আমরা আবার ধর্ম্মঘট করব।

মাস্টার মশায় বললেন, ঠিক জানি না, ওই রকম কি একটা শুনছিলুম।

মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। বাড়িতে ফেরবার পথে অস্থির বললে, স্থব্রে, তোকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে শুনছি।

কি হবে ভাই ?

তুই এক কাজ কর। বাড়ি থেকে লম্বা দে, নইলে বাবা মেরে ফেলবে।

লতুকে বললুম। সে সব শুনে বললে, কি হবে ?

লতু কাঁদতে লাগল। দীর্ঘদিনের আবছায়ায় আচ্ছন্ন সেই অশ্রুমুখী কিশোরীর মুখখানি আজ আমার মানসপটে ফুটে উঠছে আর মনে হচ্ছে, জীবনপ্রভাতে সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে তার আর অস্থিরের সহানুভূতি যদি না পেতুম, তা হ'লে কি করতুম !

লতু দুহাত থেকে দু-গাছা চুড়ি খুলে আমায় দিয়ে বললে, এই দুটো বিক্রি ক'রে পালিয়ে যা। টাকার দরকার হ'লেই আমায় লিখিস, আমি পাঠিয়ে দোব, কেউ জানতে পারবে না।

গোষ্ঠদিদিকে সব বললুম। পালিয়ে যাব ঠিক করেছি শুনে সে বললে, অমন কাজ করিস নি।

বললুম, না পালিয়ে উপায় নেই। ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে শুনলে বাবা মেরে ফেলবেন।

গোষ্ঠদি জিজ্ঞাসা করলে, পালাবি যে, টাকা পাবি কোথায় ?

আমি ভেবেছিলুম, পালাবার কথা শুনলে গোষ্ঠদিদি নিজে থেকেই আমাকে টাকা দেবে। লতু আমায় চুড়ি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমার বয়সী ছেলে স্যাকরার দোকানে চুড়ি বিক্রি করতে গেলে নিশ্চয় তারা সন্দেহ ক'রে হাঙ্গামা বাধাবে—এই ভয়ে চুড়ি নিই নি। গোষ্ঠদিদি প্রায়ই

বলত, আমার টাকা ও গয়না যা কিছু আছে, সবই তো তোদের দুই ভাইয়ের; তোদের ভাবনা কি ?

সেই গোষ্ঠদিদি যখন জিজ্ঞাসা করলে, টাকা পাবি কোথায় ?—তখন আমার ভয়ানক অভিমান হ'ল। আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে লাগল। ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে, তার পর বাড়িতে সে কি হাঙ্গামা হবে—এই চিন্তা আমাকে আকুল ক'রে তুলছিল, কিন্তু গোষ্ঠদিদির কথায় আমার সমস্ত আশঙ্কা অবসন্ন হয়ে পড়ল। শুধু মনে হতে লাগল, এতদিন ধ'রে এই নারী কথার মোহে আমাদের শুধু ছলনাই ক'রে এসেছে। গোষ্ঠদিদির জন্যে না করতে পারতুম এমন কাজ আমরা কল্পনাই করতে পারতুম না। ইস্কুল কোনদিনই আমার প্রিয় ছিল না। সেখান থেকে বিনা দোষে তাড়িত হ'লে লজ্জারও কোনও কারণ নেই। তবুও ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে বাবা যে মেরে ফেলবেন, সে কথা গোষ্ঠদিদি যে না জানত তা নয়। এসব জেনে-শুনেও সে যখন আমাকে সাহায্য করলে না, তখন মনে হ'ল, আমরা তাকে যতখানি নিজের ব'লে মনে করেছি, সে তা করে না।

আমাকে কাঁদতে দেখে গোষ্ঠদিদি আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, আমাকে ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হবে না ?

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললুম, কিচ্ছু কষ্ট হবে না। কেন কষ্ট হবে ? আমি ম'রে গেলে যদি তোমার কষ্ট না হয় তো তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কিসের কষ্ট ?

গোষ্ঠদিদি আমাকে আরও জোরে চেপে ধরলে। আমি বললুম, ছেড়ে দাও, যাই।

আমার মুখখানা একবার তুলে দেখে গোষ্ঠদিদি প্রাণপণে আমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে, না, তুই যেতে পারবি না, কিছুতেই তোকে ছাড়ব না।

ঠিক হ'ল, ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে বাবা যখন মারতে থাকবেন, সে সময় গোষ্ঠদিদি গিয়ে মাঝে প'ড়ে আমাকে উদ্ধার করবে। সে গিয়ে পড়লে মারের মাত্রা কম হবে।

কয়েক দিন ইস্কুলে কিন্তু আর কোনও কথাই উঠল না। মনে হ'ল,

ফাঁড়া বুঝি কেটে গেল। হঠাৎ একদিন ক্লাসে চাকরে এক টুকরো কাগজ এনে মাস্টার মশায়ের হাতে দিলে। তিনি চেঁচিয়ে প'ড়ে ক্লাসসুদ্ধ ছেলেকে শুনিয়ে দিলেন,—ক্লাসে অনবচ্ছিন্ন অসদ্ব্যবহারের জন্য (continuous ill-behaviour) স্থবির শর্মার নাম ইস্কুলের খাতা থেকে কেটে দেওয়া হ'ল।

দণ্ডাজ্ঞা শুনেই আমার দুই কানের মধ্যে একবার ঝমঝম ক'রে ঝাঁজর বেজে উঠল। তার পর সমস্ত চিন্তা এক কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে চীৎকার করতে লাগল, কি হবে?

ক্লাসশুদ্ধ ছেলে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। মাস্টার মশায় পড়ানো বন্ধ ক'রে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বললেন, স্থবির, তোমার জন্যে আমি দুঃখিত—অত্যন্ত দুঃখিত।

মাস্টার পড়া শেষ ক'রে চ'লে গেলেন, অন্য মাস্টার এসে পড়ানো শুরু করলেন; কিন্তু খানিকটা শব্দ ছাড়া আর আমার কানে কিছুই গেল না। ছুটির কিছু আগে হেডমাস্টার আমায় ডেকে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, এখানা তোমার বাবাকে দিও।

ছুটির পর ক্লাসের বন্ধুরা আমাকে সহানুভূতি জানালে ও কর্ত্তৃপক্ষের এই অবিচারের জন্যে তারা ইস্কুল ছেড়ে দেবে বললে। আমার কানে কিন্তু কোনও কথাই যাচ্ছিল না। মনের মধ্যে এক প্রশ্ন খোঁচা দিতে লাগল, কি হবে, কি করব?

বাড়িতে এসে মাকে চিঠিখানা দিয়ে সোজা ছাতে চ'লে গেলুম। সেদিন গোষ্ঠদিদির সঙ্গে দেখা করলুম না, লতুদের বাড়িতেও যাওয়া হ'ল না। শুধু অস্থিরের সঙ্গে পরামর্শ চলতে লাগল, কি হবে, কি করব?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হতে লাগল, এতক্ষণে বোধ হয় চিঠিখানা বাবার হাতে পড়েছে, এইবার বুঝি ডাক পড়ে। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তখনও ডাক পড়ল না। মনে হতে লাগল, পাঁচ বছর আগে মেয়েদের ইস্কুলে পড়বার সময় তিন পয়সা চুরির মিথ্যা অভিযোগে প'ড়ে এই রকমই এক নিদ্রাহীন রাত্রি কেটেছিল—সেই আট বছর বয়সে হেদোর জলে ডুবে সব হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবার সংকল্প

করেছিলুম, আজ তার চেয়েও অনেক বড় বিপদে আত্মহত্যার কথা বারে বারে মনে হ'তে লাগল, কিন্তু লতুর মুখ আমার সে সংকল্পকে ভাসিয়ে দিলে। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলুম, হে ভগবান, আমার ছোট্ট জীবনে কতবার কত বিপদে তুমি উদ্ধার করেছ, এইবার বাঁচাও।

কে যেন ছাতের দরজায় টোকা দিলে। উৎকর্ণ হয়ে উঠে বসলুম। আবার টোকা! আবার টোকা!

তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়ে দেখলুম, অস্থির অগাধ নিদ্রায় অভিভূত। টপ ক'রে বাতি নিবিয়ে দিয়ে তিন লাফে ছাতের সিঁড়ি পার হয়ে সন্তর্পণে দরজাটা খুলতেই এক ঝলক জ্যোৎস্না আমার মুখের ওপরে এসে পড়ল। মুখ বাড়িয়ে দেখি, গোষ্ঠদিদি এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার অঙ্গে ধপধপে সাদা একখানা শাড়ি, তার ওপরে চাঁদের আলো প'ড়ে অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত নিস্তব্ধ রাত্রে গোষ্ঠদিদির সেই স্বভাববিষণ্ণ মুখে মৌন নিরুক্ত অভয়-আশ্বাসে আমার উদ্বেলিত মন জুড়িয়ে গেল। মনে হ'ল, আমার প্রার্থনা শুনে চাঁদের দেশ থেকে নেমে এসেছে আমার আসল মা, তার হাত ধ'রে ফিরে চ'লে যাব আমার কল্পলোকে, কাল সকাল থেকে আমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। সকলে বলবে, আহা, ছেলেটা বেশ ছিল, কোথায় চ'লে গেল!

গোষ্ঠদিদি বললে, কি রে, হাঁ ক'রে কি দেখছিস? দু ঘণ্টা ধ'রে দরজায় টোকা দিচ্ছি, শুনতেই পাস না।

আমি আর কথা বলতে পারলুম না, প্রাণপণে গোষ্ঠদিকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

দুজনে চ'লে গেলুম ছাতের এক কোণে। গোষ্ঠদিদি বলতে লাগল, তোর কোনও ভয় নেই। যেমন ক'রে পারি মায়ের হাত থেকে তোকে বাঁচাবই। স্থবির, তুই জানিস নে, তোকে আমি কত ভালবাসি, বড় হ'লে বুঝতে পারবি। তোর জন্যে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

রাত্রি তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। গোষ্ঠদিদি আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে নীচে পাঠিয়ে দিলে। বিছানায় শুয়ে বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, এমন সময় মার কণ্ঠস্বরে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে চায়ের জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। তখনও বাড়ির আর কেউ সেখানে হাজির হয় নি। চা খাবার আগেই মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ মা, বাবাকে চিঠিখানা দিয়েছিলে?

না, কিসের চিঠি ওখানা?

আমাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আমার কথা শুনে মা এমন চেঁচামেচি করতে শুরু ক'রে দিলেন যে, বাবা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। মা বললেন, তোমার গুণধর ছেলেকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বাবা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক কোন্ বিশেষ অপরাধটির জন্য আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, তার স্পষ্ট ধারণা আমার নিজেরই ছিল না।

আমি বললুম, জানি না।

সেইখানেই কিল, চড়, লাথি এক পক্কড় হয়ে গেল। তারপরে তিনি একটা ঘরে আমায় নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে প্রথমে হেডমাস্টারের দেওয়া চিঠিখানা পড়লেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তাড়িয়ে দিয়েছে বল, আজ তোমার শেষ দিন।

আজ যে আমার শেষ দিন সে জ্ঞান আমারও ছিল, তবুও শেষ মিনতি ক'রে বললুম, কেন তাড়িয়ে দিয়েছে তা সত্যিই আমি জানি না। আপনি হেডমাস্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা ক'রে তারপরে আমাকে যা ইচ্ছা হয় করুন।

বাবা সে কথা গ্রাহ্য না ক'রে আমায় মারতে শুরু করলেন। আমার চীৎকার শুনে গোষ্ঠদিদি এসে দেখলে, দরজা বন্ধ। ঘরের ভেতরে আমি চীৎকার করতে লাগলুম, বাইরে দরজা ধ'রে গোষ্ঠদিদি কাঁদতে লাগল, আর আমার চীৎকারের সঙ্গে অস্থিরও তারস্বরে চেঁচিয়ে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সেই ভোর থেকে বেলা নটা অবধি প্রহার দিয়ে বাবা আমাকে নিয়ে চললেন হেডমাস্টার মশায়ের বাড়ি।

মার খেয়ে আমার চেহারা এমন বদলে গিয়েছিল যে, হেডমাস্টার আমাকে দেখে একেবারে চমকে উঠলেন। তিনি বাবাকে বললেন, এমন ক'রে প্রহার করা আপনার উচিত হয় নি। ইস্কুল থেকে বিতাড়িত

হবার মতন কোনও অপরাধ স্থবির করে নি। ইস্কুলের মালিক মশায় চান না যে, ও ওখানে পড়ে।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

হেডমাস্টার মশায় আমতা আমতা করতে লাগলেন। তারপরে বাবাকে একটা আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে কি সব বললেন।

বাবা আমাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে বললেন, যাও, চান-টান ক'রে ইস্কুলে যাও।

আমি ইস্কুলে যেতে লাগলুম। ঠিক হ'ল, বছরটা পুরো না হওয়া পর্য্যন্ত আমি সেইখানেই পড়ব। আসছে বছরে অন্য ইস্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হব।

এই ঘটনায় আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। পড়াশুনার প্রতি যে অনুরাগ ও মনোযোগ এসেছিল, তার মূল পর্য্যন্ত মন থেকে উৎপাটিত হয়ে গেল। বাবা আমার কোনও আবেদন ও মিনতি গ্রাহ্য না ক'রে আগে শাস্তি দিয়ে পরে বিচার করলেন, এজন্য তাঁর ওপর এমন জাতক্রোধ হ'ল যে, মনে মনে একেবারে দৃঢ়সংকল্প ক'রে ফেললুম, এবার মারতে এলে আমিও দু-এক হাত এমন চালাব যে ভবিষ্যতে আমাকে প্রহার করবার সময় আক্রমণ ও আত্মরক্ষা দু দিকেই তাঁকে সমান নজর রাখতে হবে। কিন্তু আমার বয়স তখন মাত্র তেরো। সেই বয়সেই আমরা যথেষ্ট শারীরিক শক্তি অর্জ্জন করেছিলুম বটে, কিন্তু বাবার সঙ্গে পেরে ওঠবার শক্তি কোথায় পাব? তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, সবার আগে গায়ের জোর বাড়াতে হবে।

লতুদের বাড়িতে যাবার রাস্তায় একটা মাঠ পড়ত। এই মাঠের অনেকখানি জায়গা ঘিরে নিয়ে পাহারাওয়ালারা কুস্তির আখড়া করেছিল। সেখানে প্রকাণ্ড একখানা পাথরের গায়ে তেল-সিঁদুর দিয়ে মহাবীরের মূর্ত্তি আঁকা ছিল ও মাঝে মাঝে খুব ধুমধাম ক'রে পুজো হ'ত। মহাবীরের পুজোর জন্যে অনেক মহিষ ও গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ও চৌধুরী অর্থাৎ তাদের সর্দ্দার সেখানে ব্যায়াম করতে আসত। তা

ছাড়া অনেক সাংঘাতিক চরিত্রের গুণ্ডাও সেখানে আসত যেত। আমরা দু ভাই মাঝে মাঝে আখড়ার মধ্যে ঢুকে তাদের কুস্তি দেখতুম ও দু-একজনের সঙ্গে একটু আধটু মৌখিক ভাবও হয়েছিল। বাবাকে মারবার উত্তেজনায় আমরা এই আখড়ায় গিয়ে ভর্ত্তি হলুম ও রোজ ইস্কুল থেকে ফিরে সেখানে গিয়ে কুস্তি সেরে সেখানেই স্নান ক'রে পরিষ্কার হয়ে লতুদের ওখানে যেতে আরম্ভ করলুম। গোষ্ঠদিদি রোজ আমাদের জন্যে বাদাম ও মিছরির শরবত তৈরি ক'রে রাখত ও সপ্তাহের মধ্যে তিন-চার দিন দুটি ক'রে মুরগীর বাচ্চা রোস্ট হতে লাগল।

আমরা প্রতিদিন দুই ভাই নিয়ম ক'রে মহাবীরের মাথায় ফুল ও বাতাসা চড়াতে লাগলুম। এসব পয়সা অবিশ্যি গোষ্ঠদিদির তহবিল থেকেই খরচ হ'ত। ব্রাহ্ম-বাড়িতে আমাদের জন্ম হয়েছিল। পরিবারে ও পরিবারের ধর্ম্মবন্ধুদের কাছে নিশিদিন শুনেছি যে, পুতুলপুজো ক'রে হিন্দুরা ঈশ্বরের অবমাননা করে, এ সব সংস্কার সত্ত্বেও স্রেফ প্রাণের দায়ে আমাদের পুতুলের শরণাপন্ন হতে হ'ল। তার ওপর অতি নিম্নস্তরের সেই গরুর গাড়ির সর্দ্দার ও গুণ্ডা হিন্দুদের মহাবীরের ওপর নিষ্ঠা দেখে আমরাও মহাবীরের মহাভক্ত হয়ে উঠলুম। মহাবীরকে শত শত ধন্যবাদ! তিনি আমাদের শরীরে শক্তি তো দিলেনই, উপরন্তু বাবাকেও সুমতি দিলেন, কারণ এর পর আমাকে তিনি আর কখনও সে রকম প্রহার করেন নি। বাড়িতে দিনরাত ভয়ে ভয়ে থাকা তো চুকলই, বরং কলকাতার সেরা সেরা গুণ্ডা এবং গরু ও মোষের গাড়ির সর্দ্দারদের প্রাণের ইয়ার হওয়ার ফলে আমরা নিজেরাই এক-একটি ভয়ের কারণ হয়ে উঠলুম। মহাবীরকে ধন্যবাদ! সে শক্তি ও প্রতিপত্তির অপব্যয় আমরা কখনও করি নি।

একদিন বিকেলে অস্থিরের শরীরটা ভাল না থাকায় আমি একলাই বেরিয়েছিলুম। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে অস্থিরের মুখে শুনলুম যে, কাল রাত্রে পাগলা সন্ন্যেসী আমাদের দুজনকে নেমন্তন্ন করেছেন।

রাত্রে গোষ্ঠদিদি এসে মাকে আবার ব'লে গেল, কাল ওরা দুজনে আমাদের ওখানে খাবে—শ্বশুর মশায় নেমন্তন্ন করেছেন।

পরদিন একটু তাড়াতাড়ি লতুদের বাড়িতে যাওয়া হ'ল। উদ্দেশ্য

দিন থাকতে ফিরে পাগলা সন্ন্যেসীর ঘরে গিয়ে জমা যাবে, আড্ডা সেরে উঠব উঠব মনে করছি, এমন সময় লতু আমায় আলাদা ডেকে নিয়ে বললে, একটা খুব গোপনীয় কথা আছে, না শুনে যেতে পাবে না।

বল।

না, এখন বলব না। সেই সন্ধ্যের পর বলব, তার আগে যাওয়া হবে না ব'লে দিচ্ছি।

ওরে বাবা! আজ সন্ধ্যের সময় পাগলা সন্ন্যেসীর ওখানে নেমন্তন্ন আছে, ঠিক সময়ে না গেলে ভদ্রলোক বড্ড দুঃখিত হবেন।

সে সব জানি না।—ব'লে লতু ফিরে চলল। আমি তাকে টেনে নিয়ে বললুম, বল না লতু, লক্ষ্মী লতু আমার।

লতু আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে কানে কানে বললে, না না না, এখন যাওয়া হবে না।—ব'লে ছটকে পালিয়ে গেল।

কি বিপদেই পড়লুম, লতুটা যে কি করে!

খানিক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে আবার গিয়ে সবার সঙ্গে বসা গেল। লতু আগেই এসে সেখানে জুটেছিল। তার হুকুম না পেলে আমার যাবার যে জো নেই, সে বিষয়ে সে একেবারে নিশ্চিন্ত। ওদিকে অস্থির তাড়া দিতে লাগল, কি রে যাবি না?

শেষকালে অস্থিরকে বলতে হ'ল, তুই যা, আমার যেতে একটু দেরি হবে।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ব'লে দিলুম, বাড়িতে আমার খোঁজ হ'লে ব'লে দিস, সে সন্ন্যেসীর ঘরে আছে।

অস্থির চ'লে গেল। সন্ধ্যে হ'ল, কিন্তু লতু কোন কথাই বলে না। ওদিকে আমার মনের অবস্থা খুবই চঞ্চল হতে লাগল। লতুটা যে কি করে!

ইতিমধ্যে সে যে উঠে কোথায় চ'লে গেল, আধ ঘণ্টা কোন খোঁজ নেই। শেষকালে লতুকে ফাঁকি দিয়েই পালাব মনে ক'রে সবার কাছে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গুটিগুটি কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় কোথা থেকে লতু এসে আমায় ধ'রে বললে, চোর! গুটিগুটি পালানো হচ্ছে!

তুমিই তো পালিয়েছিলে। তুমি আসছ না দেখে চ'লে যাচ্ছিলুম। কি প্রাইভেট কথা আছে, বল ?

এখানে না, ছাতে চল।

দুজনে ছাতে উঠলুম। নতু বললে, এ ছাতে নয়, ওই ওপরের ছাতে।

নতুদের ছাতের ওপরে একটা বড় ঠাকুর-ঘর ছিল। তারও ছাতে ওঠা যেত। সেটা ছিল তাদের পাড়ার সবচেয়ে উঁচু ছাত। সেই ছাতে ওঠা হ'ল।

সেদিন বোধ হয় শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথি ছিল। আকাশ ও ধরণীতে জ্যোৎস্নার প্লাবন ছুটেছে—যতদূর চোখ যায় আলোয় আলো, যেন আনন্দের মুক্তধারা, কোথাও কোন মালিন্য নেই।

নতু আমায় ছাতের এক কোণে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর বুকের ভেতর থেকে একটা মোটা বেলফুলের মালা বের ক'রে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করলে।

আমার মনে হ'ল, চারিদিকের সেই জ্যোৎস্নারাশির সঙ্গে আমি যেন রেণু রেণু হয়ে একাকার হয়ে গেছি। ফুলমালার স্পর্শে অস্থিমাংসের অস্তিত্ব যেন আমার লোপ পেয়েছে, বায়বীয় শরীর নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

নতু উঠে দাঁড়াতেই আমার গলা থেকে মালাটা নিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিলুম। তারপরে প্রাণপণে আমরা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরলুম। আমার মনে হতে লাগল, সেই জ্যোৎস্নাসাগরে আমরা দুটিতে ভেসে চলেছি—লক্ষ তরঙ্গের আলোড়নে শত সহস্র জন্মের অভিজ্ঞতা মথিত হয়ে উঠতে লাগল আমাদের চারিদিকে। সেই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে কানে শুধু একটা আওয়াজ শুনতে লাগলুম, ধক—ধক—ধক।

সেটা কার বুকের আর্তনাদ, তা ঠিক বলতে পারি না।

নতু বললে, আজ আমাদের বিয়ে হ'ল। এই বিয়ের সাক্ষী রইল ওই চাঁদ। এ কথা চিরদিন গোপন থাকবে, শুধু জানলে ওই চাঁদ—আজ থেকে চাঁদের সঙ্গে আমাদের এই সম্বন্ধ বাঁধা রইল। আমি মরবার আগে এ কথা আর কারুকে ব'লো না।

আবার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আমাদের বাঁধন দৃঢ়তর হ'ল। আমায় একটা চুমু খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পিঠে ছুম ক'রে একটা কিল মেরে লতু বললে, যা তোর পাগলা সন্ন্যোসীর কাছে।

হায়, পাগলা সন্ন্যোসী, এমন সন্ধ্যেটি কি তোমার ঘরে কাটাবার জন্যে তৈরি হয়েছিল !

লতুদের ওখান থেকে এক রকম দৌড়ে পাগলা সন্ন্যোসীদের বাড়িতে গেলুম। বাড়িতে ঢুকেই অস্থিরের হাসির হর্‌রা কানে গেল। আমাদের দুই ভাইয়েরই খুব চেঁচিয়ে হাসার অভ্যাস ছিল। এই অসভ্যতার জন্য বাড়িতে প্রায়ই বকুনি খেতে হ'ত। অস্থিরের হো-হো হাসি শুনে তিন লম্ফে সিঁড়ি পার হয়ে ঘরে ঢোকামাত্র অস্থির চীৎকার ক'রে বললে, স্থবরে, এতক্ষণে এলি, আমরা এক্ষুনি উঠছিলুম খাবার জন্যে।

পাগলা সন্ন্যোসী খাটের ওপরে আধশোয়া হয়ে ব'সে ছিলেন। তিনি উঠে ব'সে বললেন, রামবাবুর বুঝি এতক্ষণে মজলিস ভাঙল ?

আমি একটু লজ্জিত হয়ে অস্থিরের পাশে বসামাত্র সে বললে, পাগলা সন্ন্যোসী, স্থবরেকে একটু ওষুধ দিন তো।

কি ওষুধ রে ?

মধু মধু, এ ওষুধ খেলে যে কোন ব্যারাম সেরে যাবে। এই ব'লে সে আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে হা দিলে। একটা বিশ্রী গন্ধ পেলুম। এমন গন্ধ ইতিপূর্ব্বে কখনও নাকে যায় নি। কিন্তু খুব সম্ভব পূর্ব্বজন্মের অভিজ্ঞতার ফলে তখনই বুঝতে পারলুম, সেটা কিসের গন্ধ।

খাটের ওপর থেকে কতকগুলো বই সরিয়ে পাগলা সন্ন্যোসী একটা কালো পেট-মোটা অদ্ভুত আকারের বোতল বের করলেন। খাটের ওপরে ব'সেই ঘাড় নীচু ক'রে খাটের তলা থেকে তিনটে বেঁটে পল-কাটা কাচের গেলাস টেনে খাটের ওপরে তুলে সেগুলোর মধ্যে ওষুধ ঢালতে আরম্ভ করলেন। দৃশ্যটি আমি জীবনে এই প্রথম দেখলুম। অস্থির কিন্তু এমন একটা ভাব দেখাতে লাগল যে, এ রকম ব্যাপার তার চোখের সামনে সর্ব্বদাই ঘটছে।

দেখলুম, পাগলা সন্ন্যোসী একটি গেলাসে অনেকখানি আর দুটিতে

একটু একটু ক'রে মধু ঢাললেন, তারপরে ঘটি থেকে একটু ক'রে জল সবগুলোতে দিয়ে একটা গেলাস আমার এগিয়ে দিয়ে বললেন, এস রামবাবু।

গেলাসটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিলুম। অস্থির যে আমার চাইতে এককাঠি বেড়ে যাবে, তা সহ্য হচ্ছিল না। গেলাসটা মুখের কাছে নিয়ে যেতেই একটা বিশ্রী তীব্র গন্ধ পেলুম। দ্বিতীয় বার গেলাসটাকে নাকের কাছে আনবার আগেই অস্থির বললে, এই, 'চিন চিন' করলি না।

অস্থির নিজের গেলাসটা বাড়িয়ে পাগলা সন্ন্যেসীর গেলাসে ঠন ক'রে ঠেকালে। আমিও দেখাদেখি আমার গেলাস বাড়িয়ে তাদের গেলাস দুটোতে ঠেকালুম। পাগলা সন্ন্যেসী বললে, To your future.

আমরাও সমস্বরে বললুম, To your future.

আমাদের হাতেখড়ি হ'ল। অস্থিরের বয়েস বারো, আমার বয়েস চোদ্দ আর পাগলা সন্ন্যেসীর বয়েস তিয়াত্তর।

পাগলা সন্ন্যেসী বলতে লাগল, রামবাবু আর লক্ষ্মণবাবু, ব্রাদার, তোমাদের একটা কথা বলবার জন্যে ডেকেছি। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে তোমাদের দু ভায়ের সঙ্গে ভাব হয়ে এই কটা বছর আমার পরমানন্দে কাটল। আমি চ'লে যাব, তোমরা এখনও অনেকদিন থাকবে, আমার কথা মনে রেখো ভাই।

সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমাদের বয়েস যদি বেশি হ'ত কিংবা আমার বয়েস যদি কিছু কম হ'ত—

বেশ হাসিখুশি হুল্লোড় চলছিল, হঠাৎ এই সব কথায় ঘরের মধ্যে যেন একটা বিষাদের ছায়া এসে পড়ল। পাগলা সন্ন্যেসী ব'লে যেতে লাগলেন, একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে করব ব্রাদার, রাখতে হবে।

বলুন।'

আমার অবর্ত্তমানে বউমাকে অর্থাৎ তোমাদের গোষ্ঠদিদিকে তোমরা দেখো, বুঝলে?

তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, বাড়ি-ঘর সব রইল, টাকা-পয়সার অভাব আমি রেখে যাব না। তোমরা শুধু দেখবে, ও

যেন ভেসে না যায়। ও তোমাদের ভালবাসে, তোমাদের কথার অবাধ্য হবে না।

পাগলা সন্ন্যেসীর ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়িতে এসে শুতে প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। ভোরবেলা গোষ্ঠদিদির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। তাদের বাড়ির দু-তিনটে গরাদবিহীন জানলা খুললে আমাদের বাড়ির সব দেখা যেত। এই একটা জানলা খুলে গোষ্ঠদিদি ডাকছিল, মা, মা, মাগো, একবার এদিকে আসুন না।

মা নীচে ছিলেন, বোধ হয় গোষ্ঠদিদির আওয়াজ কানে যায় নি। আমি তড়াক ক'রে বিছানা ছেড়ে জানলার ধারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে দিদি?

গোষ্ঠদিদি কাঁদতে কাঁদতে বললে, বাবা ম'রে গেছে রাম-ভাই!

চেঁচামেচি শুনে বাবা মা দাদা সবাই সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। আমরা তখুনি জানলা টপকে পাগলা সন্ন্যেসীর ঘরে গিয়ে দেখলুম, চিত হয়ে তিনি শুয়ে আছেন, বুকের ওপরে হাত দুটি জোড় করা। মুখ ঈষৎ ফাঁক, চোখের দুই পাশে অশ্রুর রেখা, যেন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছেন।

পাগলা সন্ন্যেসীর বাড়িতে এই ক বছরের মধ্যে কখনও কোনও আত্মীয়স্বজনকে দেখি নি, কিন্তু তিনি মারা যাওয়ামাত্র বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আহিরীটোলা থেকে চ'লে এল ভাগ্নের দল, লেবুতলা থেকে এসে গেল ভাইপোর দল, পৌত্র ও দৌহিত্রে বাড়ি ভ'রে গেল। বড় ছেলের কাছে টেলিগ্রাম গেল, দিন ছয় বাদে সেও এসে পড়ল। যে যেখানে ছিল, সবাই এল, শুধু এল না আমাদের গোষ্ঠদিদির দেবতা।

শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাবার পর সমস্যা উঠল, গোষ্ঠদিদির খরচ চলবে কি ক'রে? সে থাকবে কোথায়?

ভাসুর জানালেন, বাবা তো কিছুই রেখে যান নি, আমারও এমন কিছু অবস্থা নয় যে, ভাদ্রবউকে নিয়ে গিয়ে রাখি। বউমা তাঁর নিজের লোকজনের কাছে গিয়ে থাকুন, আমার যখন সুবিধে হবে, আমি কিছু কিছু ক'রে সাহায্য করতে পারি।

ভাদ্রবউ জানালেন, তিন চুলোয় কেউ থাকলে আপনার ভাইয়ের

সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ত না। কারুর সাহায্যে আমার দরকার নেই। আমার স্বামী নিরুদ্দেশ, সেজন্যে এই বাড়ির অর্দ্ধেক ভাগে আমার অধিকার আছে। বাড়ি বিক্রি ক'রে অর্দ্ধেক টাকা আমায় দেওয়া হোক।

ভাসুর পরম পুলকিত হয়ে জানালেন, বাবা বাড়ি বন্ধক রেখে গিয়েছেন। বিক্রি ক'রে পাওনাদারদের সব দেনা মিটবে কি না সন্দেহ।

এটা যে একেবারে মিথ্যে কথা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু গোষ্ঠদিদির হয়ে কে লড়বে? সে সব শুনে চুপ ক'রে রইল।

আমাদের বাড়িতে কয়েকটি বিধবা ও অনাথ ছেলে থাকত। এরা ছিল বাবার পেটোয়া। আমাদের ওপর বাবার শাসন যতই কঠিন হোক না কেন, এদের প্রতি তাঁর সহৃদয়তার মাত্রা প্রায় অপরাধের সীমায় গিয়ে পৌঁছত। এরা হাজার অন্যায় করলেও কারুর কিছু বলবার জো ছিল না। এদের নিয়ে মার সঙ্গে বাবার খিটিমিটি বাধত এবং তাই নিয়ে সংসারে মাঝে মাঝে ভারী অশান্তি হ'ত। আমরা মার দলে থাকলেও ভরসা ক'রে কাউকে কিছু বলতে পারতুম না। গোষ্ঠদিদির বাসস্থানের সমস্যা উঠতেই আমরা দু ভাই পরামর্শ ক'রে ঠিক করলুম, তাকে আমাদের বাড়িতেই এনে রাখতে হবে। এও ঠিক হ'ল, প্রস্তাবটা বাবার কাছে পাড়তে হবে, কারণ বাড়িতে যে কয়টি মেয়ে আছে তাদের নিয়েই মা ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছেন, নতুন আগন্তুকের সম্ভাবনাকে তিনি আমলই দেবেন না।

একদিন বিকেলে সাহস ক'রে বাবাকে গোষ্ঠদিদির কথা ব'লে ফেলা গেল। দুজনে মিলে গোষ্ঠদিদির অবস্থার এমন বর্ণনা করলুম যে, বাবার চোখে জল এসে গেল। ছেলেবেলায় বাবা অনেক সাংসারিক দুঃখকষ্ট পেয়েছিলেন, বোধ হয় সেইজন্যে দুঃখীজনের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক মমতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, আমরা থাকতে গোষ্ঠ আধার যাবে কোথায়! যাও, তাকে এখুনি নিয়ে এস, বল গিয়ে, তোমার কোন ভাবনা নেই, আমরা আছি।

আমরা কাজ ফতে ক'রে উৎফুল্ল হয়ে চলেছি, এমন সময় বাবা

বললেন, আচ্ছা, দাঁড়াও, আজ আর তাকে কিছু ব'লো না, তোমাদের মাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।

সে রাত্রে বাবা গোষ্ঠদিদিকে নিয়ে আসবার প্রস্তাব করা মাত্র মা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বললেন, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেল?

এক ধমকেই বাবা চুপ হয়ে গেলেন। তিনি হয়তো ভাবতে লাগলেন, বুদ্ধিশুদ্ধি তাঁর যে কোনকালে ছিল, সে কথাটা তাঁর স্ত্রী তা হ'লে পরোক্ষভাবে স্বীকার করছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয়ে যায় দেখে আমরা দুজনে একটু একটু ক'রে গোষ্ঠদিদির হ'য়ে বলতে লাগলুম। দু-চারটে কথা বলতে না বলতে মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, চুপ কর তোরা, এই বয়েস থেকেই বাপের ধারা নিচ্ছেন আর কি!

মা বাবাকে বলতে লাগলেন, গোষ্ঠকে যে বাড়িতে নিয়ে আসবে বলছ, একবার তার স্বামীর কথা ভেবে দেখেছ? ও এখানে থাকুক, তারপর একদিন সেই মাতাল বদমাইসটা এসে এখানে উঠুক আর বাড়িতে মদ আর গাঁজার হল্লা চলুক।

মদ গাঁজার নাম হতেই বাবা একেবারে চমকে উঠলেন, না না না, ও কথাটা আমার মনেই হয় নি, তুমি ঠিকই বলেছ, না না না।

গোষ্ঠদিদির ভাসুর মাস তিনেক কলকাতায় থেকে বাড়ি বিক্রি ক'রে শ পাঁচেক টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন, বাড়ি বেচে পাওনাদারদের দেনা ও অন্য খরচ চুকিয়ে হাজারটি টাকা বেঁচেছে। তার পাঁচশো তোমায় দিলুম। আমি পরশু মঙ্গলবারের স্টীমারে চ'লে যাচ্ছি। বাড়ি যারা কিনেছে তারা এক মাসের সময় দিয়েছে, এই এক মাসের মধ্যে অন্য কোন জায়গা ঠিক ক'রে তুমি চ'লে যাও।

সেই রাত্রেই গোষ্ঠদিদি সব কথা ব'লে আমাদের বললে, একদিনের মধ্যে যেখানে হোক আমার জন্তে একখানা ঘর ঠিক ক'রে দে।

কলিকাতা শহরে ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম যখন প্রথম চলতে আরম্ভ করে, তখন সেই ঘোড়াবিহীন গাড়ি দেখবার জন্তে সকালে সন্ধ্যায় কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের দুই ফুটপাথে বিপুল জনতা হ'ত। রাত্রির অন্ধকারে 'ট্রলির

চাকায় ও গাড়ির চাকায় ঝকঝক্ ক'রে বিদ্যুৎ ঝলকাত। বিনি পয়সায় এই আতসবাজি দেখবার জন্যে বিশেষ ক'রে রাতেই লোক জমত বেশি। আমাদের তো কোনও পরব ফাঁক যাবার জো ছিল না। প্রায় রোজই রাত্রে পড়াশুনা শেষ হবার পর বাড়ি থেকে দশ মিনিটের ছুটি নিয়ে ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে ট্রাম-বাজি দেখে বাড়ি ফিরতুম। এই রকম এক রাত্রে তামাসা দেখে বাড়ি ফিরছি, এমন সময় দেখি, একটি ছোট্ট মেয়ে, বয়স বোধ হয় তার সাত-আট বছর হবে, পথ হারিয়ে 'মা গো' 'মাসী গো' ব'লে প্রাণপণে চীৎকার করছে আর কাঁদছে। মেয়েটির চারদিকে বেশ একটি ভিড় জমেছে, সবাই তাকে নানা প্রশ্নে আরও ব্যস্ত ক'রে তুলেছে। মেয়েটির দিকে এগিয়েই আমরা তাকে চিনতে পারলুম। আমাদের ইস্কুলের পথে একটা গলির মধ্যে প্রায়ই তাকে খেলতে দেখতুম।

অস্থির তার কাছে গিয়ে বললে, খুকী, তোমার অমুক জায়গায় বাড়ি না?

সে হাঁ না কিছুই বললে না, শুধু কাঁদতে লাগল। চল খুকী, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিই।—ব'লে আমরা তাকে নিয়ে চললুম। ভিড়েরও কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে চলল।

আমরা ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম। মেয়েটিকে নিয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি যে, তার মা আর মাসী মড়াকান্না জুড়েছে, মেয়ের শোকে যায়-যায়, এমন সময় আমাদের সঙ্গে তাকে দেখামাত্র দুজনে মিলে প্রহার দিতে আরম্ভ করলে। অনেক কষ্টে তাদের কবল থেকে তাকে রক্ষা ক'রে সে রাত্রে বাড়ি ফেরা গেল।

এর পর থেকে ইস্কুলে যাবার মুখে অথবা ফেরবার পথে প্রায়ই আমরা তাদের বাড়িতে গিয়ে মেয়েটির খোঁজ করতুম। মেয়েটি নাম ছিল শৈল, সবাই তাকে শৈলী ব'লে ডাকত। শৈলর মা ও মাসী আমাদের দুই ভাইকে 'বেহ্মজ্ঞানীদের ছেলে' ব'লে ডাকত। মা ও মাসী উভয়েই ছিল রুগ্না, কিন্তু কথাবার্ত্তা ছিল ভারী মিষ্টি। তাদের পরিবারে পুরুষ কেউ ছিল না, মা মাসী কাজও কোথাও করত না, কি ক'রে তাদের সংসার চলত তা জানি না। মাসী মাঝে মাঝে পিঠে ও গজা বানিয়ে আমাদের খেতে দিত। বেশ লোক ছিল তারা।

একটা অতি পুরাতন বাড়ির একতলায় দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে তারা থাকত। একতলায় আরও কতকগুলো অন্ধকার ঘরে ভাড়াটে ভর্ত্তি ছিল। বাড়ির দোতলায় একখানা মাত্র ঘর ছিল, কিন্তু সে ঘরখানার পাঁচ টাকা ভাড়া ছিল ব'লে ভাড়া হ'ত না।

গোষ্ঠদিদি ঘর ঠিক করবার কথা বলামাত্র আমরা শৈলীর মা ও মাসীর কাছে গিয়ে তাদের বাড়ির দোতলার ঘরখানা তার জন্যে ঠিক ক'রে ফেললুম। গোষ্ঠদিদির ভাসুর বর্মা যাবার আগেই তাকে নিয়ে গিয়ে শৈলদের দোতলায় তার নতুন সংসার পেতে দিলুম।

আমি একাধিক সাধুমুখে শুনেছি যে, সাধকেরা যদি বুঝতে পারেন, দৈহিক অপটুত্ব তাঁদের যোগে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা হ'লে নতুন কলেবর লাভের জন্য তাঁরা স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। এও শুনেছি, অনেক সাধক মনোমত শিষ্য পেলে তাকে দীক্ষা দিয়েই দেহত্যাগ করেন। আমার মনে হয়, পাগলা সন্ন্যেসী উপযুক্ত শিষ্যবোধে আমাদের দু ভাইকে মাধুর্য্য-সাধনের দীক্ষা দিয়ে ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

যে অজ্ঞাত শক্তি এই বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে, সেদিনকার সেই রাত্রিটুকুর মধ্যে সে আমার জীবনে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রবাহ নিয়ে এল তা ভোলবার নয়। সন্ধ্যার সময় লতুর সঙ্গে গান্ধর্ব্ব বিবাহে আবদ্ধ হওয়া, রাত্রি নটা নাগাদ জীবনে সর্ব্বপ্রথম মধুর আস্বাদন ও শেষরাত্রে পাগলা সন্ন্যেসীর অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসরণ, আমাকে একেবারে বিহ্বল ক'রে ফেললে।

গোষ্ঠদিদিকে শৈলদের বাড়িতে স্থিতি ক'রে দিয়ে সন্ধ্যেবেলায় যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন আমাদের বিষণ্ণ মুখ দেখে মা বাবা পর্য্যন্ত সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তবুও গোষ্ঠদিদি ও পাগলা সন্ন্যেসী যে আমাদের কি ছিল, তা বাড়ির কেউ জানত না। যে বাড়ি একরকম আমাদের নিজেরই ছিল, পাগলা সন্ন্যেসী আর পাঁচ-সাত বছর জীবিত থাকলে হয়তো যে বাড়ির মালিকই আমরা হতুম, সে বাড়ির সদর-দরজায় তালা পড়ল। দোতলার বারান্দায় ইংরেজী ও বাংলায় কার্ড ঝুলল—বাড়ি ভাড়া। রাত্রে বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে ছাতের দরজায় কখন পাঁচটা টোকা পড়বে তা শোনবার জন্যে আর উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হয়

না। জ্যোৎস্নারাতে মনে হতে লাগল, আমাদেরই একান্ত গোষ্ঠদিদি শৈলর মা-মাসীকে নিয়ে ছাতে ব'সে গল্প করছে।

অদৃষ্ট সেদিন আমাদের সঙ্গে কি ছলনাই করেছিল, সে কথা মনে হয়ে হাসিও যেমন পায়, বিস্ময়ও তেমনই জাগে।

মনের যখন এই রকম অবস্থা, ঠিক সেই সময় আমাদের বাড়িওয়ালা নোটিস দিলে, এক মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, তার যক্ষ্মা হয়েছে, সে কলকাতায় এসে চিকিৎসা করাবে।

ভালই হ'ল। সেই অবস্থা আমার ও অস্থিরের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছিল। আমরা আবার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে আমাদের সেই পুরোনো বাড়ির কাছেই একটা বড় বাড়িতে উঠে গেলুম।

আগামীবারে সমাপ্য

"মহাস্থবির"

হরি হরি

গৃহিণী ঘুমান শয্যায় হয়ে কাত
চুলের তলায় এলায়ে শিথিল হাত—
ভাবি, আহা মরি মরি!
জেগে উঠে ক'ন—'গরমে প্রাণটা যায়
দুজন কি শোয়া চলে এক বিছানায়!'
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

সকাল বেলায় মেছুনী গয়লা সাথে
তর্ক করেন দৃপ্ত ভঙ্গিমাতে—
ভাবি, আহা মরি মরি!
খেতে ব'সে শুনি, উদাস কণ্ঠে কন—
দুধ ও মাছের হয় নাই আয়োজন!
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

তরুণ ঘোষের সাথে যবে কন কথা,
কি হাসি রঙ্গ! কটাক্ষ চপলতা!
ভাবি, আহা মরি মরি!

পালা ভেঙে যায় যখন সে যায় চলি,
গম্ভীর মুখে পড়েন গীতাঞ্জলি
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

নূতন শাড়িটি অঙ্গে জড়ায়ে পরি'
ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখান্ বাখান করি'—
ভাবি, আহা মরি মরি!
দোকানদারের বিল্ যবে দেয় হানা
একশো সাতাশ টাকা ও এগারো আনা
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

আয়নায় আঁখি রাখিয়া বাঁধেন চুল
কবরী ঘিরিয়া জড়ান অশোক ফুল,
ভাবি, আহা মরি মরি!
মোরে কন, আমি চললাম সিনেমায়,
নেমন্তন্ন করেছে অশোক রায়—
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

মাসের পয়লা মাহিনা পাইলে, উনি
সলীল ভঙ্গে হাসিমুখে নেন গুনি
ভাবি, আহা মরি মরি!
সে টাকাগুলির কড়া-ক্রান্তি আর
দেখিতে পাই না নাগাদ মাসকাবার—
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

পঞ্চশরের উত্তাপে দ্রব হিয়া
বিগলিত হয়ে করে যবে পিয়া পিয়া—
ভাবি, আহা মরি মরি!
কাছে যাই ; তিনি বিরস কণ্ঠে চাপা
যাহা কন, তাহা কাগজে যায় না ছাপা—
শ্রীবিষ্ণু হরি হরি।

"চন্দ্রহাস"

রামপীরিত

রামপীরিত এককালে খুব প্রবল-প্রতাপান্বিত পুরুষ-সিংহ-জাতীয় লোক ছিল। জমি-জমা হাঁক-ডাক লোকজন কি না ছিল তার! জমিদারের দক্ষিণহস্ত ছিল সে। কালক্রমে কিন্তু আস্তে আস্তে সব গেল। প্রতাপ গেল, প্রভুত্ব গেল, বুড়ো হয়ে পড়ল ক্রমশ। একদিন শুনলাম, অসুখ করেছে। আলাপ ছিল, দেখা করতে গেলাম। দেখি, ঘরের এক কোণে চুপ ক'রে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে ধীরে ধীরে উঠে বসল। একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ ছাড়ছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, গন্ধ কিসের রামপীরিত?

ইঁদুর পোড়াচ্ছি।

কেন?

খাব।

খাবে? বল কি!

আমার এক মরাই ধান, কুড়ি বস্তা গম সব ওরা নিঃশেষ করেছে। ঘরে একটি দানা খাবার নেই। ওরা আমার খাবার খেয়েছে, আমি ওদের ধ'রে ধ'রে খাচ্ছি তাই।

হাসল। কিন্তু চোখ দুটো দপ ক'রে জ্ব'লে উঠল তার।

পরিশ্রান্ত-পুরুষকার ক্লান্ত-পদ ক্ষুব্ধচিত্ত হয়ে ফিরে হঠাৎ সেদিন রামপীরিতকে মনে পড়ল।

"বনফুল"

সুরাসুর

কাক বলে, আমি কালো, কোকিলো তো তাই;
তার চেয়ে আমি কিন্তু কিছু ভাল ভাই।
গলা বটে রুক্ষ তবু শিখেছি সভ্যতা,
কোকিলের মুখে কিন্তু কেবলি কু-কথা।
কোকিল হাসিয়া বলে, তা হ'লে কি হয়,
মিষ্ট সুরে করিয়াছি ভুবন-বিজয়।
বেসুরে বলিলে 'বাবা' শোনে না তা কেউ,
সুরে 'শালা' বলো—ওঠে আনন্দের ঢেউ।

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১১

একটা কথা পুনরায় বলা আবশ্যক—আমি বিবেকানন্দের যে চরিতকথা বিবৃত করিতেছি তাহা বাংলার নবযুগের প্রধান প্রবৃত্তির সম্পর্কে; সে প্রবৃত্তি যে কি, তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি কেবল এই প্রসঙ্গে, আমি যুগের অতীত যাহা তাহারও আলোচনা না করিয়া পারি নাই; এমন আলোচনা পূর্ব্বেও করিয়াছি। এবার এই লোকোত্তর চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে আমাকে একটু বেশি করিয়া সেই ধরণের আলোচনা করিতে হইয়াছে, আশা করি, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় নহে। নবযুগের মানবধর্ম্ম—মানবপূজা, মানবত্বের মহিমাবোধ, প্রভৃতি নূতন ভাবস্রোতের উৎপত্তি ও বিকাশ, এবং সেই স্রোতোধারার বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ—সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে তাহার নব নব অভিব্যক্তির ধারা ও ধরণ—আমার বর্ত্তমান নিবন্ধের মুখ্য বিষয়। মানুষের মহিমার সেই রহস্য-সন্ধান একবার আরম্ভ করিলে তাহার কি শেষ আছে? যুগ, জাতি, দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়াও, দেশে ও কালে তাহার প্রকাশ সীমাহীন ও বিচিত্র; আবার যাহা নৈর্ব্যক্তিক তাহা ব্যক্তির মধ্যেই প্রকাশ পায়, সেই ব্যক্তিত্বই নৈর্ব্যক্তিককে যেমন প্রত্যক্ষ তেমনই রহস্য-গভীর করিয়া তোলে। মানবত্তা বলিতে কোন তত্ত্ব বা ভাববস্তু নয়, কারণ, তত্ত্বমাত্রেই নিরাকার—জগৎ ও জীবনের সম্পর্কে তাহার কোন মূল্যই নাই। ব্যক্তি বা বিশেষকে বাদ দিয়া একটা নির্ব্বিশেষ কিছুর ধ্যান যখন আমরা করি, তখনই বস্তুকে হারাই; আমরা যাহাকে সার্ব্বজনীন বলি তাহা সৃষ্টির বহির্ভূত—আমাদেরই মনঃকল্পিত একটা ধারণা মাত্র। আমি এই আলোচনায় তেমন কোন তত্ত্বকে বস্তুস্পর্শশূন্য করিয়া, ভাবকে রূপবিবর্জ্জিত করিয়া তাহারই মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছি না; একটা জাতি ও একটা যুগের প্রতিনিধিরূপে এক এক ব্যক্তির সাধনায় সেই তত্ত্বের প্রকাশ যতটুকু প্রত্যক্ষগোচর করা যায়, আমি তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি। এজন্য বিবেকানন্দের মধ্যেও কেবল একটা তত্ত্ব নয়, তাঁহার যে ব্যক্তিস্বরূপ, সেই সুগভীর মানবত্তারই একটি বিশেষ রূপে—সকল তত্ত্বকেও যেন গৌণ করিয়া, এমন প্রবলতার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমি তাহাকেই প্রাধান্য

দিতে চাই। বিবেকানন্দ নিজেও তাঁহার সেই অতি উদ্ধত ও অতি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আদর্শকে নিজ আত্মার নিঃসঙ্গ-নির্জ্জনে নিজের জন্যই গোপন রাখিয়া তাঁহার মানবীয় প্রেমকেই নর-জীবনে পূর্ণ মুক্তি দিয়াছেন; তাঁহার সেই প্রেমই তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মের একমাত্র প্রেরণা হইয়াছিল, এবং সেই প্রেম যে অর্থেই আধ্যাত্মিক হউক (সে আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি) তাহা যে নির্ব্বিশেষ নয়, বিশেষ,—নিরাকারধর্ম্মী নয়, সাকারধর্ম্মী, এবং সেই জন্যই তাহা জগৎ-সত্য ও জীবন-সত্যের সম্পূর্ণ অনুগত—ইহা লক্ষ্য করিলে, নবযুগের Humanism এই পুরুষ-অবতার মহাপ্রেমিকের জীবন-বাণীতে যে Gospel of Humanity-র রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

গুরুর দেহত্যাগের পর বরানগরের ক্ষুদ্র আশ্রমটিতে যে একটি তরুণ ব্রহ্মচারীদল ধ্যান, তপস্যা ও কঠোর সন্ন্যাসের সাধন-চক্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, নরেন্দ্র তাহারই অভিভাবক হইয়া কিছুদিন স্থিরভাবে কাটাইয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহারই উপরে এই ভাইগুলির ভার অর্পণ করিয়া যান। কিন্তু নরেন্দ্র এইরূপ শান্ত আশ্রমজীবন সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, শীঘ্রই সর্ব্ব বন্ধন ত্যাগ করিবার—নামহারা গৃহহারা হইয়া মুক্ত আকাশ-তলে, গন্তব্যহীন পথে ভ্রমণ করিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল; মাঝে মাঝে তিনি অল্পাধিক কালের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল—লোকালয় হইতে দূরে, একান্ত নির্জ্জনে আত্মার নিঃসঙ্গতা—খাঁটি সন্ন্যাস-জীবনের পরমসুখ উপভোগ করা। তবু কে যেন ধরিয়া আনে—প্রাণ বেশিক্ষণ সেই নিষ্প্রাণতার সাধনা সহ্য করিতে পারে না। এই দুর্ব্বলতাকে যেন জয় করিবার জন্যই একদা, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পাঁচ বৎসরের মধ্যেই, শেষ মমতাবন্ধন সবলে ছিন্ন করিয়া তিনি একেবারে বাহির হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে আর একবার এইরূপ নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, সে আর এক কারণে; তখন হিমালয়ের আলমোড়া প্রদেশে অবস্থানকালে এক দারুণ দুঃসংবাদ এতদূরেও পৌঁছিয়াছিল—তাঁহার শৈশব-সঙ্গিনী ভগিনীর মৃত্যুসংবাদ; এই ভগিনীকে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন, বিবাহের পর শ্বশুরগৃহে অতিশয় দুরবস্থায় তাহার জীবনান্ত হয়। এ সংবাদে বাণবিদ্ধ কেশরীর মত যন্ত্রণার অধীর হইয়া তিনি নিবিড়তর পর্ব্বতগহনে প্রস্থান করিয়াছিলেন, কিছুদিন কোন সংবাদই ছিল না। এই একটিমাত্র ঘটনাতেই বিবেকানন্দের মনুষ্য-হৃদয়ের যে পরিচয় আছে—সন্ন্যাসীর পরিচয়ও তাহাতেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। প্রেম যত বড়, যত উদার ও ব্যাপক হউক, তাহার মূলে দেহের আত্মীয়তা যেমন,

তেমনই একটা সাকার বিগ্রহ থাকিবেই ; বিবেকানন্দের মানব-প্রেমও দেশ ও জাতিকে লঙ্ঘন করিয়া একটা নির্ব্বিশেষ মহামানবের ধ্যানে চরিতার্থ হইতে পারে নাই ; স্পর্শ করিবার, স্পন্দন অনুভব করিবার মত একটা দেহ তাহার চাই। যে প্রেম সমগ্র মানব-জগৎকে বুকে করিবার জন্য বাহুবিস্তার করিতে পারে, সে প্রেম, অতি নিকট যাহা তাহারই—অধর, উরস বা চরণ-সরোজের পূজায় দুই চক্ষে আরতি-দীপ জ্বালাইবেই। যে মানুষকে ভালবাসে, সে স্বজনকে ভালবাসে নাই ; যে বিশ্বকে সত্যই আত্মীয় জ্ঞান করে, সে আপন সমাজকে, আপন দেশকে মায়ের মত প্রণয়ীর মত ভালবাসে নাই, ইহা কখনও হইতে পারে না। বিবেকানন্দ দেশ-জাতি নিরপেক্ষভাবে মানুষকে যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি. কিন্তু সেই দৃষ্টির মূলে ছিল স্বজাতি-প্রেম ; দেশকে এমন ভালবাসা বোধ হয় ভারতবর্ষে পূর্ব্বে আর কেহ বাসে নাই। এইবার সেই কথাই আসিতেছে।

উপরে বিবেকানন্দ-জীবনের যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অল্পকালের মধ্যেই—১৮৯০-৯১ সালে, তখন তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর—হঠাৎ তাঁহার প্রাণে এক অদ্ভুত প্রেরণা জাগিল। তখন তিনি হিমালয়ের তুঙ্গ গিরিভূমির এক নির্জ্জন স্থানে সর্ব্ব-বিস্মৃতির ধ্যান-সুখ ভোগ করিতেছিলেন ; যেন তাহারই প্রতিক্রিয়া-বশে সহসা সেই বিজনতার পরিবর্ত্তে এমনই সজনতার পিপাসা জাগিল যে, তিনি সেই হিমালয় হইতে পদব্রজে কন্যাকুমারী তীর্থে পৌঁছিয়া তথাকার মন্দিরে পূজা নিবেদন করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্য্যন্ত এই মহাদেশের ধূলি তিনি স্পর্শ করিবেন ; যত মানুষের যত সমাজ, যত গৃহ আছে সর্ব্বত্র অতিথি হইবেন—সেই বিপুল জন-সাগরের কোন স্রোত কোন তরঙ্গ তাঁহার বক্ষের অপরিচিত থাকিবে না! তাহাই হইল ; পূরা দুই বৎসর পরিব্রাজকরূপে তিনি সেই মহামাতৃভূমির শীর্ষ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত তাহার বিরাট দেহের সকল দৈন্য ও সকল ঐশ্বর্য্য চাক্ষুষ করিয়া, বেদনা ও বিস্ময়ে, ভক্তি ও করুণায় এমন এক দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন, যাহা আর কোন সন্তান এ পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। বস্তুতঃ ইহাই তাঁহার জীবনের চরম দীক্ষা ; এতদিনে তিনি সিদ্ধি লাভ করিলেন—ইহার পরেই তাঁহার বিবেকানন্দ-জীবনের আরম্ভ, তাঁহার চরিত্র-বিকাশের তথা চরিতকথার শেষ এইখানে।

বিবেকানন্দের জ্ঞান-চক্ষু পূর্ব্বেই উন্মীলিত হইয়াছিল, এইবার প্রাণ-চক্ষু উন্মীলিত হইল—সন্ন্যাসীকেও প্রেমে পড়িতে হইল। বিরাট ভারতবর্ষের

খণ্ড-বিখণ্ড দেহে, নিজেরই প্রাণের সাহায্যে, তিনি এক অখণ্ড প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করিলেন। সেই মলিনবসনা, নিরাভরণার সর্ব্বদেহে তিনি "সর্ব্বার্থসাধিকা গৌরী নারায়ণী"র রূপ অসংশয় দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিলেন। এই যে প্রত্যক্ষ করা ইহাই বিবেকানন্দের তপস্যার শেষ ফল। তিনি যে দৃষ্টি দ্বারা ভারতবর্ষকে দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সেই তপস্যালব্ধ শক্তিকে পূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল; সেই দৃষ্টিকে, ত্রিকালদর্শীর মত, অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত তিন কালের সাক্ষী করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানের যতকিছু দুর্দ্দশা তিনি স্থির দৃষ্টিতে ও দৃঢ়চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে কিছুমাত্র নিরাশ হন নাই। তিনি সেই যুগসঞ্চিত ভস্মস্তরের তলদেশে ভারতের চির-অনির্ব্বাণ আত্মাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ভাবে নয়, স্বপ্নে নয়, কল্পনায় নয়—একেবারে বাস্তবের রূঢ়তম পরিচয়ের মধ্যে তিনি তাহার সেই মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই বাস্তব পরিচয়ের কিঞ্চিৎ আভাস না দিলে বিবেকানন্দের সেই দিব্যদৃষ্টিলাভের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে না, তাই আমি সেই বিষয়ে দুইটি গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু বিবৃতি ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিব। মঃ রোলাঁ এই ঘটনার সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"The great Book of Life revealed to him what all the books in the libraries could not have done, which even Ramakrishna's ardent love had only been able to see dimly as in a dream.......He was not only the humble little brother who slept in stables or on the pallets of beggars, but he was on a footing of equality with every man, today a despised beggar sheltered by pariahs, tomorrow the guests of princes. Conversing on equal terms with Prime Ministers and Maharajas...ever teaching ever learning—gradually making himself the Conscience of India, its Unity and its Destiny."

"Everywhere he shared the privations and the insults of the oppressed classes. In Central India he lived with a family of outcast sweepers. Amid such lowly people who cower at the feet of society, he found spiritual treasures, while their misery choked him."

• • • •

"He had traversed the vast land of India upon the soles of his feet... When he arrived at Cape Comorin, he was exhausted, but having no money to pay for a boat to take him to the end of his pilgrimage, he flung himself into the sea and swam across the shark-infested strait; ...and when he had stepped on to the terrace of the tower he had just

climbed at the very edge of the earth with the panorama of the world spread before his eyes, the blood pounded in his ears like the sea at his feet; he almost fell...He had seen the path he had to follow. His mission was chosen."

ইহার পর ভগিনী নিবেদিতার উক্তি—

"When we read his speech before the Chicago Conference...we find ourselves in presence of something gathered by his own labours, out of his own experience. The power behind all these utterances lay in those Indian wanderings of which the tale can probably never be complete. It was of the first-hand knowledge, then, and not of vague sentiment or wilful blindness, that his reverence for his own people and their land was born. It was a robust and cumulative induction, moreover, be it said, ever hungry for new facts and dauntless in the face of hostile criticism...And more than this, it was the same thorough and first-hand knowledge that made the older and simpler elements in Hindu civilization loom so large in all his conceptions of his race and country." *

১২

দেশকে এমন করিয়া দেখা বোধ হয় আর কেহ দেখে নাই; শুধু সেই দেহ হাত দিয়া স্পর্শ করাই নয়, ওই জ্ঞান ও ওই প্রেমের দৃষ্টি দ্বারা একেবারে একাত্ম হইয়া এ যেন তাহার অন্তরের অন্তরকে দেখিতে পাওয়া! এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বিবেকানন্দ নামক যে পুরুষ এবং তাঁহার যে বাণীকে আমি একটা বৃহত্তর কালধর্মের অভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহার জন্ম হইয়াছিল তাঁহার মহাজীবনের এই মহালগ্নে; সেই পুরুষের যে জ্ঞানী-আত্মা এতদিন বিদেহী ছিল, এইবার তাহা যেন মানবদেহ ধারণ করিল; সেই মানবই একাধারে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-মানব ও ব্যূহ-মানব—Man ও Humanity। যাহা পরম সত্য বা Absolute—তাহা বর্ণহীন শুভ্র—একটা নিরাকার ভাবময় সত্তা মাত্র; সে সত্য সৃষ্টির বহির্ভূত, তাহা জগতের বা মানুষের ইতিহাসগত নয়; সেই সত্যই যখন প্রেমের 'খাদ'-যুক্ত হয়, তখনই তাহাতে সৃষ্টির গঠন-কর্ম

* এই দীর্ঘ ইংরেজী বচনগুলির বাংলা অনুবাদ দেওয়া খুবই উচিত ছিল, কিন্তু পৃষ্ঠা-সংক্ষেপের প্রয়োজনে উপস্থিত তাহা হইয়া উঠিল না; সে জন্য ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।—লেখক

সম্পন্ন হয়, অরূপ রূপ পরিগ্রহ করে, নিরাকার ভগবান সাকার হইয়া উঠে। কিন্তু তখন ওই 'খাদ'কে অস্বীকার করিয়া, তাহার মলিনতার ত্রুটি নির্দেশ যে করে, সে সৃষ্টিকেই অস্বীকার করে। সেই Universal, সেই নির্বিশেষ যখন বিশেষের আলিঙ্গনে বদ্ধ হয় তখনই প্রেমের জন্ম হয়,—এই নিয়ম ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রেমের পক্ষেই সমান। বিবেকানন্দ মানুষের আত্মাকেই সকলের উপরে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, সেই আত্মার কোন দেশ বা জাতিভেদ নাই; তাহাই পরম সত্য, কিন্তু সেই সত্যের তত্ত্বমাত্রকে যে উচ্চ চিন্তা বা উৎকৃষ্ট রস-রূপে উপভোগ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সে মানুষের জীবনের মধ্যস্থলে কখনও আসিয়া দাঁড়ায় নাই,—ভয়ার্ত্ত, দুর্গত মানুষকে আপন স্কন্ধে তুলিয়া উদ্ধার করিবার বাস্তব সমস্যা-সঙ্কটে সে কখনও পড়ে নাই। বিবেকানন্দ মানব-প্রেমের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, নিজের বুকে সেই প্রেম অনুভব করিবার প্রয়োজন তাঁহার হইয়াছিল এবং নিজের জাতি ও দেশের দুরবস্থাই তাঁহাকে প্রেমের এমন অনুভূতি-ধনে ধনী করিয়াছিল। তিনি আগে, ভারতবর্ষনামক যে মানবগোষ্ঠী তাহাকে আপন হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছিলেন, এবং পরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সেই ভারতবর্ষকেই পূজা করিয়াছিলেন। সূর্য্যরশ্মি যেমন শূন্যে তাপ বিকিরণ করে না, উষ্ণতা উৎপাদনের জন্য তাহার একটি অবয়বী পদার্থের আশ্রয় চাই, তেমনই প্রেমকে ক্রিয়াশীল হইতে হইলে তাহার একটা আধার চাই, সেই আধারকে ধরিয়াই সে আপনাকে নিরাধার করিতে পারে; প্রেম যদি সত্যকার প্রেম হয়, তবে সেই আধারে বদ্ধ হইয়াই সে উচ্ছ্বসিত আবেগে সকল সীমা লঙ্ঘন করে। প্রেমের এই পরম রহস্য বিবেকানন্দের জীবনে যে আকারে ও যে মাত্রায় আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে, তাঁহার স্বদেশ-প্রেম ও জগৎ-প্রেমের সেই অপরূপ সমন্বয়ের কথা—তাহার অন্তর্গত সেই গভীরতর সত্যের কথা, অতঃপর আমি পূর্ব্বোক্ত মনীষীদ্বয়ের উক্তির সাহায্যেই সুস্পষ্ট ও মনোজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিব, কারণ, তেমন করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমার নাই।

বিবেকানন্দের সর্ব্বজাতি-প্রেম ও স্বজাতিবাৎসল্য এই দুই বিপরীত প্রকৃতির উল্লেখ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন—"পাশ্চাত্য দেশে তাঁহাকে আমরা হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকরূপেই দেখিয়াছিলাম, এবং তাহাতে, নিখিল মানবের মধ্যে সেই একই আত্মার মহিমা-ঘোষণাই ছিল তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম; তাঁহার সেই কর্ম্মের অন্তরালে ভারতবর্ষের জন্য কোন ভাবনা বা তাহার হিতসাধনের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ পাইত না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমি তাঁহার সহিত

ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে আর এক অগ্নির নিরন্তর দহন-জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি; সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয়—দেশ ও জাতির দুর্দশা-নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস ও তাহার নিষ্ফলতার জন্ম মর্ম্মান্তিক যাতনা-ভোগ।" ভগিনীর নিজের ভাষায়—

"It was the personality of my Master himself, in all the fruitless [illegible] and struggle of a lion caught in a net. For, from the day that he met me at the ship's side till that last serene moment, when, at the hour of cow-dust, he passed out of the village of this world, leaving the body behind him, like a folded garment, I was always conscious of this element inwoven with the other, in his life."

"It was the personality of my Master."—বাক্যটি সত্যই অতি গভীর। অন্যত্র—

"He neither used the word 'nationality', nor proclaimed an era of 'nation-making'. 'Man-making', he said, was his own task. But he was born a lover, and the queen of his adoration was his Motherland.... He was hard on her sins, unsparing of her want of worldly wisdom, but only because he felt these faults to be his own."

তিনি নিজে স্বামিজীর এই স্বজাতি-বাৎসল্যের সহিত তাঁহার মানবপ্রেমের সম্বন্ধ এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"Like some great spiral of emotion, its lowest circles held fast in love of soil and love of nature; its next embracing every possible association of race, experience, history, and thought; and the whole converging and centring upon a single definite point, was thus the Swami's worship of his own land."

ভারতবর্ষকে ভালবাসার আরও কারণ ছিল—সে কারণ আরও স্পষ্ট। ভারতবর্ষই যে তাঁহার নিজের সেই জ্ঞান-চৈতন্যের জননী—তিনি যে তাহারই অমৃত-স্তন্য পানে আত্মার অনন্ত শক্তি ও অসীম আশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন; তিনি যে একান্তই সেই ভারতের সন্তান, এ চেতনা তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করে নাই। নিবেদিতাও তাহা বলিয়াছেন, যথা—

"Student and citizen of the world as others were proud to claim him, it was yet always on the glory of his Indian birth that he took his

stand. And in the midst of the surroundings and opportunities of princes, it was more and more the monk who stood revealed."

সর্ব্বশেষে, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর সহিত বুদ্ধের তুলনা করিয়া বলিতেছেন—"খ্রীষ্ট-পূর্ব্বকালে বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র দুই বিভিন্ন মুখে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ; এক দিকে তাঁহার সেই ধর্ম্মের উৎস-মূল হইতে একটি প্রবল স্রোতোধারা বহির্গত হইয়া দেশ-দেশান্তর প্লাবিত করিয়াছিল ; সেই বাণী-প্রচারের ফলে প্রাচ্য-মহাদেশে কত জাতির নব জন্ম হইয়াছিল—কত নব নব সমাজ, নূতন সাহিত্য, নূতন শিল্পকলার উদ্ভব হইয়াছিল ; কিন্তু আর এক দিকে, ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যে তাহার কাজ হইয়াছিল অন্যরূপ—

"The life of the Great Teacher was the first nationaliser. By democratising the Aryan culture of the Upanishads, Buddha determined the common Indian civilization, and gave birth to the Indian nation of future ages."

—সেইরূপ বিবেকানন্দের মহাজীবনেও একই কালে দুইটি পৃথক অভিপ্রায়-সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়—"One of world-moving, and another, of nation-making"। আমার মনে হয়, এই ঐতিহাসিক তুলনাটি বড় যথার্থ হইয়াছে, একটা অতীত ঘটনার সাক্ষ্য বর্ত্তমানের ঘটনাটিকে সহজবোধ্য করিয়াছে। মঃ রোলাঁ একটি মাত্র কথায় বিবেকানন্দের এই স্বদেশপ্রেমের একটি বড় সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যথা—"His universal soul was rooted in its human soil"। আমি নিজে এ সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছি, এ যেন তাহারই ঘনীভূত নির্য্যাস। ওই "human soil" কথাটিই এ সম্বন্ধে আমারও আদি ও শেষ কথা। বিবেকানন্দের জীবন ও চরিত-কথা এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সংবাদ-সাহিত্য

কাহিল অবস্থার সার্ ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌সকে স্তোকবাক্যস্বরূপ ভারতবর্ষে পাঠানো হইয়াছিল, তিনি সর্বদলমিলন-শর্তের ধোঁকা বা ধাপ্পা দিয়া কর্তাদের মুখ রক্ষা করিয়া বিদায় লইয়াছিলেন। গান্ধীজীর ভারসাম্যরক্ষাকারী ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিসমূহ তখনও কারাগার-অন্তরালে স্তম্ভিত হয় নাই; তিনি "ত্যাজ ভারত" প্রস্তাব দ্বারা ক্রীপ্‌স-ধাপ্পার জবাব দিয়াছিলেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের কথা ইহা। তাহার পর দ্রুতগতিতে যে সকল চমকপ্রদ ঘটনা ও দুর্ঘটনা ভারতবর্ষের বুকে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার সঠিক ইতিহাস এখনও কঠিন-কবায় ভারতরক্ষা আইনের কবলায়িত হইলেও আমাদের অনেকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত। ইংরেজ বেকায়দায় পড়িয়াও হাল ছাড়ে নাই, কিন্তু কোয়াদে-আজম জনাব জিন্নাকে বাজারে ছাড়িয়াছিল। তাহার সংকল্প সম্ভবত ইহাই ছিল যে, মরি তো সবশুদ্ধ মরিব—অর্ধত্যাগী পণ্ডিত হইয়া বাঁচিয়া থাকিব না।

• • •

কিন্তু একা জনাব জিন্নাকে দিয়া কাজ হইত না। তাঁহার মজি ও মেজাজ দিয়া তাঁহাকে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় তিনি ব্যারুদখানাবিশেষ; তাঁহাকে কার্যকরী করিয়া রাখিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটি ছুঁচাবাজির প্রয়োজন; কুরু-পাণ্ডব-সংঘর্ষে শকুনির মত শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীকে সেই প্রয়োজন-সাধনে কে নিযুক্ত করিয়াছিল জানি না, কিন্তু সেইকালে আমরা দেখিয়াছিলাম ওয়ার্কিং-কমিটি-শাসিত কংগ্রেস ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সভয়ে ইহাকে পরিহার করিয়াছিলেন, রহস্য-মধুর বৈবাহিক সম্পর্কের বাঁধনেও কলির ধৃতরাষ্ট্র ধর্মচ্যুত হন নাই। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সম্মানার্হদের শাসনও ইহার কারণ হইতে পারে।

• • •

তাহার পর সহসা একদিন দুর্ভেদ্য কারাপ্রাচীরের অন্তরালে সকল সমস্যা ও সমাধান একই কালে আশ্রয় লাভ করিয়া বহিষ্কৃত রাজাগোপালাচারীকে নূতন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দান করিল। তখনও-রাহুগ্রস্ত-কিন্তু-মোক্ষমুখী চতুর ইংরেজ মহাসমারোহে ইহারই জয়-ঘোষণায় মুখর হইয়া উঠিল, ইহাকে গোকুলে বৃদ্ধি পাইবার অবকাশ দিল। পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গনে কালের চাকা ঘুরিবে ঘুরিবে বলিয়া যেদিন নিশ্চিত আভাস পাওয়া গেল, সেদিনও সুকৌশলী ইংরেজ দয়া ও ন্যায়পরতার ভান করিতে ছাড়িল না। যখন চোখ রাঙাইয়া শাসন করা স্বাভাবিক ও সহজ হইত, তখনই গান্ধীজীকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হইল।

ইংরেজ জানিত, ওয়ার্কিং-কমিটিহীন গান্ধীকে বারুদ এবং বাক্তির সার্থকপ্রয়োগে একেবারে বানচাল করিয়া দেওয়া কঠিন হইবে না।

ইংরেজের এই জানায় ভুল হয় নাই। সমস্ত বহিঃপৃথিবীর নিকট মুখরক্ষা করিয়া ভারতবর্ষকে পূর্ববৎ অথবা পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে শোষণ করিবার ওজুহাত সৃষ্টির জন্য যুদ্ধজয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে ইংরেজ যে চাল চালিয়াছে, তাহাতে গান্ধী-জিন্না সকলেই মাত হইতে বসিয়াছেন, শুধু অজ্ঞাত অন্ধকারের অন্তরালে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং-কমিটির সদস্যেরা সভয়ে এই ভয়াবহ অপকৌশলের খেলা দেখিতেছেন। গান্ধীভক্ত কংগ্রেসী এবং গান্ধীবিরোধী সি-পি-আই যে কোন্ স্বার্থে এবং কোন্ কৌশলে একই ঐকতানবাদনে একই পাকিস্তানী নৃত্যে মাতিয়াছে সাভারকরপ্রমুখ "মহাবীর"দের কোলাহলে তাহার কৌতুকাবহ দিকটা আজ আমাদের লক্ষ্যগোচর হইতেছে না বটে, কিন্তু যে মুহূর্তে ইংরেজের ডুগডুগি-বাদ্য অকস্মাৎ থামিয়া যাইবে সেই মুহূর্তেই কংগ্রেসীরা লজ্জার সহিত অনুভব করিবে যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাহাদিগকে দুইদণ্ড নাচিবার সুযোগ দিয়া ইংরেজ ইহারই মধ্যে আপনার মতলব হাসিল করিয়া লইয়াছে। অপর পক্ষ চিরকালই ন্যাংটা, বাটপাড়ের ভয় তাহারা না করিতেও পারে।

* * *

আসলে দেওয়ার মালিক ইংরেজ। দেওয়ার কালে মহামান্য চার্চিলের ষাঁড়কুত্তীর "না" যে কিছুতেই "হাঁ"তে পরিণত হইবে না, এতদিন তাহাদের সহিত একত্র ঘর করিয়াও যাঁহারা এই সামান্য সত্যটা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাঁহারা মহাত্মা হইতে পারেন, পথভ্রান্তের পথপ্রদর্শক বা কোয়াদে-আজম হইতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধির দৌড়ে প্রতিপক্ষের কাছে যে তাঁহারা শিশু, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে জিন্না সাক্ষাৎ ইংরেজের সৃষ্টি, এবং যে ইংরেজের উপস্থিতির উপরেই জনাব জিন্নার মহিমময় অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে, তিনি কখনই গান্ধীজীর শতেক প্ররোচনাসত্ত্বেও সেই ইংরেজকে "কুইটে"র নোটিশ দিবেন না; তিনি বারংবার অনুপস্থিত হইবেন, বারংবার চাল ও শর্ত বদল করিবেন, ভয়ও দেখাইবেন হয়তো, কিন্তু ইংরেজহীন ভারতবর্ষে গান্ধীজীর কাঁধে কাঁধ মিলাইবেন না। ইহা জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধের কথা, সম্পাদ্য বা প্রতিপাদ্য নয়। গান্ধীজী বৃথাই আত্মাবমাননা উপেক্ষা করিয়া মুহুর্মুহু জিন্নার চরণ-ধূলার তলে মাথা নত করিতেছেন।

বুঝিতে পারিতেছি, বার্ধক্যের গৌরবে গান্ধীজীর হৃদয় অধিকতর নমনীয় ও উদার হইয়াছে, হয়তো সময় অল্প বুঝিয়া তিনি তাড়াতাড়ি অথবা রাতারাতি জীবনের স্বপ্নকে সফল করিবার পথ খুঁজিতেছেন, কিন্তু স্বল্পতর অভিজ্ঞতা লইয়া আমরা বলিতে পারি, এত সহজে, দুই হিমালয়-সদৃশ ব্যক্তির চুক্তিতেও সমগ্র ভারতবর্ষের দুঃখ মিটিবে না। ইহার জন্য অনেক দুঃখ আমরা সহিয়াছি, আরও অনেক দুঃখ সহিতে হইবে। অন্তত আমাদের এই হতভাগ্য বাংলা দেশের গত পঁয়ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস সেই ইঙ্গিতই দিতেছে। আমরা জানি, গান্ধীজী রূঢ় ধাক্কা খাইয়া আবার প্রকৃতিস্থ হইবেন। তিনি স্বয়ং এই গুরু বিষয়ে সকলকে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ দিয়াছেন, সেই স্বাধীন চিন্তাই আমাদিগকে বলিতেছে যে, আপোস-নিষ্পত্তির অর্থ একপক্ষের একান্ত আত্মসমর্পণ নয়—আপাতকৌশলময় সর্বস্ব সঁপিয়া দিবার স্বীকৃতিও নয়, ইহার মূল শর্ত হইতেছে সকলের সমান মর্যাদাবোধ। বর্তমান চুক্তিতে তাহারই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

* * *

বহুর কল্যাণে এক বা একাধিককে বলি দেওয়ার প্রথা আদিমকাল হইতেই আছে, কিন্তু সেখানে বলি স্বেচ্ছাবলি হওয়া প্রয়োজন। অবোধ ছাগশিশুর মাথা হাড়িকাঠে গুঁজিয়া মানুষের কল্যাণের জন্য খড়্গাঘাতে ছিন্ন করিবার প্রাচীন প্রথা গান্ধীজী নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান চুক্তিতে প্রকারান্তরে তিনি তাহাই করিতে যাইতেছেন। ইংরেজ আমাদিগকে পাকিস্তান হিন্দুস্থান কিছুই দিবে না, কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া, গান্ধীজীর মত কংগ্রেস-প্রধানের অনুমোদন আদায় করিয়া সে একদিন তাহা কাজে লাগাইবে।

* * *

আসল কথা, যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিতেছে, এ সকলের আর কিছুই প্রয়োজন হইবে না। ইংরেজের তপ্ত স্নেহচ্ছায়ায় আমরা দুই পক্ষ এখনও দীর্ঘকাল পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া রক্তাক্ত ভালবাসাবাসি করিতে পারিব।'

বাগাড়ম্বর আর চলিল না, চিনি ও দুধের পাত্র হস্তে সহসা গোপালদা দর্শন দিলেন। হায় রে, সেই গোপালদা! যিনি একদিন এ-আর-পির সৌজন্যে ধর্মপত্নীর সন্তোষবিধানের জন্য ভাঁড়ার-ঘরে চিনি-মিছরির চালাও শ্রীক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই আজ বামনাবতারের রূপ লইয়া বলির দরবারে যেন ছলিতে আসিয়াছেন। লজ্জা হইল। গৃহিণী যথেষ্ট তৎপরতার সহিত গোপালদাকে চা পরিবেশন করিয়া গেলেন, তিনি আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া দুলিতে দুলিতে পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগিলেন। বুঝিলাম, মেজাজ শরিফ আছে। চায়ের

পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া হঠাৎ বলিলেন, দেখ ভায়া, গতবারে তোমার উপর দিয়ে বড় একটা ধাষ্টামো করা গেছে, বেদান্তের বা বীজরূপ তার ধারে কাছে কি যেতে পেরেছি? ওই ডট আর ড্যাশের জটলার মধ্যে কাগজ-সমস্যার কি কিছু মীমাংসা হবে?

বলিলাম, কাগজ-সমস্যার যাই হোক গোপালদা, আপনার মুগ্ধবোধ-সংবাদ-সাহিত্যের ফলে আমি রসিক-সমস্যায় বড়ই বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছি। আমাদের পাঠকেরা অনবরত উড়ুক্কু জার্মান বোমার মত সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাঠাতে শুরু করেছেন, এই দেখুন এই মাত্র একটা এল। পড়িয়া শুনাইলাম—

"ট্রামারোহণে নামা—অদ্ভুত জামা—স্থানাভাবে বামা—বিরক্ত রামাশ্যামা—দুই টিকিটের দামা—মহিলার ঘামা—বলতে হবে মামা—২৪শে অক্টোবর যুদ্ধ থামা—বলা এবং নামা।"

• • •

গোপালদা মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, এ হ'ল কচুড়, বাগবাজারী কচুড়ি। যে ভারতবর্ষ একদিন বেদান্তের সংক্ষিপ্ত সাঙ্খ সূত্রের মধ্যে অসীম অনন্তকে বিধৃত করতে সক্ষম হয়েছিল, এ ইয়ারকি সেখানে চলবে না। দেখ, আমি গোটা গত মাসটা ধরে এ বিষয়ে অনবরত ভেবেছি এবং শেষ পর্যন্ত পথ খুঁজে পেয়েছি। সূত্রবীজ আমি আবিষ্কার করেছি। যে কোনও বিষয়ে বল, আমি এই সূত্র প্রয়োগ করতে পারব, বিরাট বিরাট মহাভারতের মত ব্যাপার চারটি কি ছটি সূত্রে জল ক'রে ছেড়ে দোব। পেপার কণ্ট্রোলের একেবারে নিকুচি ক'রে ছাড়তে পারবে এর সাহায্যে। পরীক্ষা করতে পার আমাকে।

মাথার মধ্যে গান্ধীজিন্না-ব্যাপারটাই ঘুরপাক খাইতেছিল, বলিলাম, এই পাকিস্তান-সংবাদ সূত্রাকারে বলুন। গোপালদা ক্ষণকাল চক্ষু বুজিয়া বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সাহায্যে কপাল টিপিতে লাগিলেন। তারপর স্বপ্নোত্থিতের মত বলিয়া উঠিলেন, লিখে নাও।

কাগজ পেন্সিল হাতের কাছেই ছিল। প্রস্তুত হইলাম। গোপালদা সহসা কাগজ ও পেন্সিল আমার হাত হইতে প্রায় ছিনাইয়া লইয়া নিজেই লিখিলেন—

"শেষ মীমাংসা বা কংগ্রেস্যাত্মদর্শনম্ বা অখাণ্ড-সূত্রম্

১। কাল, ২। পাজি, ৩। পাজি, ৪। কলা।"

পড়িয়া আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম। গোপালদা হাসিয়া বলিলেন, ব্যস ফিনিশড, গোটা সিচুয়েশানটা ওই চারটি সূত্রের মধ্যে নিবদ্ধ আছে।

আমার দৃষ্টি বিহ্বলতর হইতেই বলিলেন, অবিশ্যি টীকা আবশ্যক। সে ভার তোমরা নেবে। আপাতত এখানেই আরম্ভ ব'লে ধর্তাইটা আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

আমি নির্বাক। স্মরণ হইল—ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তদর্শন, ব্যাসসূত্র, উত্তর-মীমাংসা, বাদরায়ণ সূত্র, শারীরক সূত্র, শারীরক মীমাংসা, বেদান্তসূত্র প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত মাত্র ৫৫৫টি (মতান্তরে ৫৫৮টি) সূত্রের সহস্রাধিক বিপুলায়তন ভাষ্যের কথা, স্মরণ হইল শাঙ্কর-ভাষ্যের শঙ্করকে, শ্রী-ভাষ্যের রামানুজকে এবং তাহারও পূর্বে বোধায়ন, উপবর্ষ, টঙ্ক, দ্রামিড়, গুহদেব, কপর্দী, ভারুচি প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণকে। মনে পড়িল মধ্বাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, বল্লভাচার্য, বলদেব বিদ্যাভূষণকে, বিজ্ঞানভিক্ষু, অবধূতাচার্য, ভাস্করাচার্যকে, মনে পড়িল মাত্র এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিতব্য এই ৫৫৫টি সূত্রের কৃপায় অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট-শিবাদ্বৈতবাদ, সমন্বয়বাদ, পরিণামবাদ, কর্মবাদ, ভেদাভেদবাদ, দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি নানাবিধ বাদানুবাদের কথা। মাত্র চার অধ্যায় এবং চার × চার = ষোল পাদের কেরামতি ভাবিয়া বিমূঢ় হইয়া গেলাম। কাগজ-সমস্যার সহজ সমাধান বটে!

গোপালদা যেন আমার মনের কথা টের পাইলেন। বলিলেন, যা ভাবছ তা নয়, এই নতুন অস্বাগুসূত্রের টীকা গুরুতে একটু আধটু প্রয়োজন, হবে বটে, কিন্তু ধাতস্থ হয়ে গেলে তোমার পাঠকদের সূত্রেই উপলব্ধি হবে। টীকার প্রয়োজন হবে না।

—কিন্তু ওই কলি গাজি পাহি হন্না?

—আমার এই দর্শনে চার অধ্যায়ে চারটি সূত্র মাত্র। প্রথম অধ্যায়ে সমন্বয়—কলি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবিরোধ—গাজি, তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন—পাহি এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ফল-নির্ণয়—হন্না। অবশ্য শেষ-মীমাংসার আগে পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা কল্পনা করে নিতে হবে। কলি অর্থাৎ কংগ্রেস ও লিগের এই সমন্বয়ের পূর্বে বিরোধের আভাস স্বতই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা দিল, আমরা দ্বিতীয় অর্থাৎ অবিরোধ অধ্যায়ে এসে পড়লাম। এই অবিরোধ ঘটালে কে? না গাজি—অর্থাৎ গান্ধী ও জিন্না। গান্ধী ও জিন্নার মিলনের পূর্বাপর সমগ্র ইতিহাসটি এই অধ্যায়ের টীকার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা সাধনের অধিকারী হলাম। কি সাধন? পাহি অর্থাৎ পাকিস্তান-হিন্দুস্থান সাধন। সে সাধন অতিশয় কঠিন, শেষ মীমাংসা অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত হ'লেও আসলে এটি কর্মকাণ্ড এবং এরই ফল চতুর্থ অধ্যায়ে হন্না—কি না হরি ও আল্লার যোগ।

হল্লার এই তাৎপর্যে তাজ্জব বনিব বনিব করিতেছি, গোপালদা বলিয়া উঠিলেন, এ ছাড়াও এই সূত্র কটির স্বতন্ত্র বিশিষ্ট তাৎপর্যও আছে। তা এই যে, এই কলিকালে গান্ধির শরণাপন্ন না হ'লে পরিত্রাণ (পাহি) নাই এবং হল্লাই এ যুগের ধর্ম। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, গান্ধী-জিন্না সূত্রে গান্ধী প্রথম স্থান পেলেও শব্দব্রহ্মের কৃপায় গান্ধি শব্দটি হয়ে উঠেছে মুসলমান-প্রধান এবং পাকিস্তান-হিন্দুস্থান সূত্রে পাকিস্তানকে আগে দাঁড় করিয়েও সংস্কৃত পাহির লীলা প্রকট হয়ে পড়েছে। প্রথম সূত্রেও কংগ্রেসের গুরুত্বে কলি হিন্দু; চতুর্থ সূত্রে হরি আগে স্থান পেলেও যুক্তাক্ষরের গুরুত্বে ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে।

—তা হ'লে?

হল্লা কর।—বলিয়া গোপালদা ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালায় পুনর্বার চুমুক দিলেন। কাগজ-সমস্যার সমাধানে নিরাশ হইয়া আমরাও ব্রহ্মসূত্র "সংবাদ-সাহিত্যে"র আশায় জলাঞ্জলি দিলাম।

—

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক গ্রামে দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরন্নের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া এবং পৈতৃক ভিটার ধ্বংসোন্মুখ মূর্তির চিত্র ছাপিয়া ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত 'পিপলস্ ওয়ার' তাঁহাকে খেলো করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না, কারণ খোদ রাশিয়া হইতে বর্তমানে চিত্র ও সংবাদ-সংগ্রহ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

—

হজরৎ মহম্মদ-বাক্য—

The bringers of grain to the city to sell at a cheap rate gain immense advantage by it, and whoso keepeth back grain in order to sell at a high rate is cursed.

সুতরাং মহাপুরুষ-মতে বাংলা দেশে হাসেম-কাসেম-ইস্পাহানীর দল নিশ্চয়ই **immense advantage gain** করিতেছেন!

—

যে দেশে দস্যু-তস্করাদিকে উপযুক্ত সময়ে প্রতিনিবৃত্ত করিবার সঙ্গত ব্যবস্থা নাই, সেই দেশেই চুরি-ডাকাতির পর পুলিস-"এনকোয়ারি"র বহর দেখিলে তাক লাগিয়া যায়, অবশ্য এই ঘনঘটায় বর্ষণ যে কদাচিৎ হয় তাহা বলাই বাহুল্য। দুর্ভিক্ষও একজাতীয় আক্রমণ, ইহাকে ঠেকাইবার ব্যবস্থা না থাকিলেও দুর্ভিক্ষান্তে কমিশন যথারীতি বসিয়া থাকে—এবারেও বসিয়াছে। সার্ জন উডহেড অনেক আশা লইয়াই আসিয়াছেন, কোনও আশা দিয়া যাইতে পারিবেন

কি না বুঝা যাইতেছে না। দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের মৃত্যুসংখ্যা নির্ধারণও কমিশনের কার্যতালিকায় আছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত মানুষের আদমসুমারির সময় যে সরকারী প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল, সেই প্রথায় মৃতের তালিকা নির্ধারণও অত্যন্ত সহজসাধ্য; মৃত্যুসংখ্যা ঠিক কত দেখানো সঙ্গত—আগে হইতে জানিয়া লইলে কমিশন অনেক অনাবশ্যক পরিশ্রমের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন।

—

রক্তমাংসের দেহে রবীন্দ্রনাথ যে এত লোকের সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার জীবিতকালে আমরা তাহা অবগত ছিলাম না। আমরা এক বনমালী একে নীলমণিকেই জানিতাম, যে শেষবয়সে রবীন্দ্রনাথের রক্তমাংসের সর্বাধিক সান্নিধ্যের দাবি করিতে পারিত। কিন্তু লোকটি এতই অসম্ভব বিনয়ী যে, গত তিন বৎসরে রবীন্দ্র-স্মৃতি-কল্পে অনুষ্ঠিত বহুসহস্রাধিক সভার কোনটিতেই সে আপনার দাবি পেশ করে নাই। ফলে অপেক্ষাকৃত কম সৌভাগ্যশালী লোকেরা একটু বেশিই দাবি করিয়া বসিতেছে। আমাদের এখনও ভরসা আছে চৈতন্যদাস-গোবিন্দদাসের কড়চার মত বনমালীর কড়চা একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া রক্ত-মাংসের সমুদায় দ্বন্দ্বের নিরসন করিয়া দিবে।

• • •

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-স্মৃতি-প্রতিষ্ঠার কথা স্বতই মনে হইতেছে। যাঁহারা রক্তমাংসের সান্নিধ্যের কথা আজ ঘটা করিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই বড়লোক; ইচ্ছা করিলে ইঁহারা এককই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সাড়ম্বরে 'অল-ইণ্ডিয়া রবীন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল কমিটি'র প্রতিষ্ঠা ও কীর্তির জয়ঘোষণা শুনিয়াছিলাম। অনেক হোমরাচোমরার নাম এই কমিটিতে ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রক্তমাংসের মত সে কমিটিও আজ ভস্মশেষমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে—মাত্র কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা সম্ভবত সেফডিপজিটে রাখিয়া কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন; অথচ এদিকে মাত্র কয়েক মাসের চেষ্টায় কস্তুরবা-স্মৃতি-তহবিলে একা বাংলা দেশ প্রায় নয় লক্ষ টাকা প্রণামী দিয়াছে। ইহা লইয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই, রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর পরিবার ছিলেন না।

• • • •

তবু বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কবির প্রতি বাঙালীর একটা কর্তব্য থাকিয়া যায়, সে কর্তব্য বর্তমান যুগের পরিবেশের মধ্যে শুধুমাত্র কাব্যপাঠেই শেষ হইয়া যায় না; রবীন্দ্রনাথের নামে জাতির কল্যাণকর গৌরবময় একটা কিছু স্থাপনের প্রয়োজন হয়। কলিকাতা ম্যুনিসিপাল গেজেটের ১২ আগস্টের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত

অমল হোম রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু-ক্ষেত্র কলিকাতায় একটি আর্টগ্যালারি প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন—সেই মন্দিরে রবীন্দ্র-সাহিত্যের উত্তরাধিকারী বাঙালীরা শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও নানাবিধ শিল্পচর্চায় সমবেত হইবে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত একটি মিউজিয়াম ও একটি লাইব্রেরি রক্ষিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ইহা অপেক্ষা সুষ্ঠুতর ভাবে আর রক্ষিত হইতে পারে না এবং ঠাকুর-পরিবারের বসতবাটীটিকেই এই প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিলে কাহারও বলিবার কিছু থাকে না। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির নামে ব্যক্তিগত জয়-ঘোষণায় না মাতিয়া সমগ্র বাঙালী জাতি যদি এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়, তাহা হইলে জাতীয় কলঙ্কের কতকটা ক্ষালন হইতে পারে।

—

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য লইয়া আমরা বহুবার বহুভাবে—ব্যঙ্গচ্ছলে অথবা গম্ভীর ভাবে—আলোচনা করিয়াছি। আমরা এখন পর্যন্ত দেখিতেছি, ইহাতে ভঙ্গী আছে, ভান আছে, ঢং আছে, হঠাৎ এক একটা এলোমেলো শব্দ অথবা পংক্তি অথবা বহুবিখ্যাত কবিতার চরণবিশেষ বসাইয়া চমক লাগাইবার প্রয়াস আছে—ভাবের একটা পূর্বাপর সঙ্গতি নাই, একটা কিছু বলিবার বা প্রকাশ করিবার চেষ্টা নাই। ছন্দ আসে খামোকা, শব্দ আসে অকারণ—কোনও কিছুরই সুষমা বা সামঞ্জস্য নাই। আসল কথা, অন্তরের যে প্রেরণা হইতে কাব্যের জন্ম, এই সকল কবিতায় সেই প্রেরণারই অভাব—sincerityর একান্ত অভাব। সমালোচক হিসাবে যাঁহারা এই সকল কবিতা লইয়া মাতামাতি করেন, লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি—তাঁহারা কেহই সামাজিক জীব নহেন, বর্বর বাউণ্ডুলে সম্প্রদায়ের লোক; তাঁহাদের অন্তরের কথা হইতেছে—"এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই" জাতীয়।

• • •

শুনিতে পাই খাঁটি ইংলণ্ডীয় আদর্শ হইতে এই সকল আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম। ভঙ্গীর অনুসরণ তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রেই এগুলি ভাবে ও ভাষায় অনুবাদ মাত্র। অর্থাৎ মূলের স্বরূপ নির্ধারণ করিতে পারিলে নকলেরও কতকটা হদিস পাওয়া যাইতে পারে। সাহিত্যে এবং জীবনে সর্ববিধ সংস্কার-মুক্তি যে টি. ই. লরেন্সের আজীবন সাধনা ছিল, তিনিও আধুনিক ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

> **Poets of to-day feel often that their feelings are foolish. So they splash something about shirt-sleeves or oysters quickly into every sentimental sentence, to prevent us laughing at them before they have laughed at themselves.**

আধুনিক কবিতা দেখিয়া এই ধরনের অনুভূতি আমাদেরও হইয়াছে। অন্তরের মধ্যে যাহা অস্পষ্ট অনুভব করিয়াছি, তাহা সম্প্রতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে অত্যাশ্চর্যরূপে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাহা সর্বৈব প্রযোজ্য। তিনি বলিতেছেন—

"আমাদের সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্যকে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে বিচার করা নিরাপদ নয়। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেটুকু অনুভব করি সে আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, তার অনেকখানিই হয়তো অজ্ঞতা। এ সাহিত্যের অনেক অংশের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো যথেষ্ট আছে, কালে কালে তার যাচাই হতে থাকবে।" আমি যা বলতে পারি তা আমারি ব্যক্তিগত বোধশক্তির সীমানা থেকে। আমি বিদেশীর তরফ থেকে বলচি, অথবা তাও নয়—একজন মাত্র বিদেশী কবির তরফ থেকে বলচি—আধুনিক ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত। আমার এ কথার যদি কোনো ব্যাপক মূল্য থাকে তবে এই কথা বলতে হবে এই সাহিত্যের অন্য নানা গুণ থাকতে পারে, কিন্তু একটা গুণের অভাব আছে যাকে বলা যায় সার্বভৌমিকতা, যাতে করে বিদেশ থেকে আমিও একে অকুণ্ঠিত চিত্তে মেনে নিতে পারি। ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে যে কেবল রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয় নি। আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করচি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার বলে ঠেকে, বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি, তার মধ্যে এমন উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্চে না, ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে, এর কাছে এমন বাণী পাইনে যা শুনে মনে করতে পারি যেন আমারি বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণীরূপে। দুই একটা ব্যতিক্রম যে নেই তা হতেই পারে না। মনে পড়চে রবার্ট ব্রিজেসের নাম। আরো আছে।

"আমাদের দেশে তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয় সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ববর্তী পুরাতনকে

উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্য সত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময়ে একটা স্পর্ধামাত্র। আমি এই বলি, বিজ্ঞানে মানুষের কাছে প্রাকৃতিক সত্য আপন নূতন নূতন জ্ঞানের ভিত্তি অবারিত করে, কিন্তু মানুষের আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে কিন্তু ভিত্তি বদল করে না। যে সৌন্দর্য যে প্রেম যে মহত্ত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতই উদ্বোধিত হয়েছে তার তো বয়সের সীমা নেই, কোনো আইনষ্টাইন এসে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারে না, বলতে পারে না বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসে যার অকৃত্রিম আনন্দ সে সেকেলে ফিলিষ্টাইন। যদি কোনো বিশেষ যুগের মানুষ এমন সৃষ্টিছাড়া কথা বলতে পারে, যদি সুন্দরকে বিদ্রূপ করতে তার ওষ্ঠাধর কুটিল হয়ে ওঠে, যদি পূজনীয়কে অপমান করতে তার উৎসাহ উগ্র হতে থাকে, তাহলে বলতেই হবে এই মনোভাব চিরন্তন মানবস্বভাবের বিরুদ্ধে। সাহিত্য সর্বদেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দ-নিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহ-বেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চিরপুরাতনের চিরনূতনত্ব বহন করছে মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা। এই জন্যেই মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা, সর্বমানবের। তাই বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে বর্তমান ইংরাজি কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে নূতন, যে তরুণের মন কালাপাহাড়ী সে এর নব্যতার মদিররসে মত্ত, কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ। সে নবীনতাকে অভ্যর্থনা করে বলতে পারিনে—

> "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

"তাকে যেন সত্যই নূতন বলে ভ্রম না করি, সে আপন জরা নিয়েই জন্মেছে, তার আয়ুস্থানে যে শনি সে যত উজ্জ্বলই হোক তবু সে শনিই বটে।

"এতটা কথা কেন বলনুম তা বলি। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত ইংরেজি কবিমণ্ডলীর প্রতি আমার আকর্ষণ যখন প্রবল ছিল, তখন সেই প্রীতির টানেই তাদের কাছে যাবার চেষ্টা করেছি। সেই প্রীতির প্রতিদানও পেয়েছিলেম। তখন কালের মধ্যে নমনীয়তা ছিল। এখন তার পরিবর্তন হয়ে গেছে, এ যেন অনাবৃষ্টির যুগ। মরুতে যে গাছ ওঠে তার টেকনিক কাঁটার টেকনিক, সে কেবলি বলে দূরে থাকো, যে যার আপন আপন [illegible] বাহবাকে আমার সাহস হয় না—

ওরা এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে যাতে ওদের আমরা বুঝিনে, ওরাও আমাদের বুঝতে চায় না।"

—

কবি বুদ্ধদেব বসুর কাব্যপ্রতিভা যে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রবল প্রভাবে আপন স্বকীয়তা হারাইয়া পরকীয়াধর্মী হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতিই সূচিত হইতেছে। কবি যাহা হারাইয়াছেন তাহার জন্ত আর্তনাদ স্বাভাবিক কিন্তু সর্বগ্রাসী "কবিতা-ভবন"-সম্রাটের নিকট হইতে আমরা আরও দৃঢ়তা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। আমাদের মনে হয়, এখনও সময় যায় নাই, স্বকীয় মহিমায় তিনি পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন—যদি স্বধর্মে ফিরিয়া আসেন। পুরান-পল্টনী যেমন বালিগঞ্জী হইতে পারেন না, বুদ্ধদেবের পক্ষেও তেমনই রবীন্দ্রনাথ হওয়া সম্ভব নহে। কবির আত্মজ্ঞান টন্‌টনে আছে, ইহাই ভরসা। তিনি নিজেই বলিতেছেন—

"হায়রে মূঢ়, হায়রে দৃষ্টিহীন
এ-সব কথা একেবারেই ফাঁকা
আত্মপ্রেমের আস্তরটুকু মাখা!
তাইতে অত ভালো লাগে, কাব্য ক'রে মনের ঘরে সাজাই।
যদি হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে, বাইরে তাকে যাচাই
করতে গিয়ে দেখি,
বুকের রক্তে লালন-করা
এ-পসরা
মেকি, মেকি, মেকি।"

মেকি তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মেকিত্ব যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন কবি নিশ্চয়ই সাবধান হইতে পারিবেন।

—

পাকিস্তান হউক বা না হউক, বাংলা দেশে পূর্ব-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই পাকিস্তানী সাহিত্যের রূপ যে কি হইবে 'মাসিক মোহাম্মদী'র (শ্রাবণ-ভাদ্র যুগ্মসংখ্যা, ১৩৫১) কৃপায় আমরা তাহা স্পষ্টাস্পষ্টি জানিতে পারিয়া কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি। কলিকাতায় কিছুদিন পূর্বে "পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ-সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেখানে প্রদত্ত যাবতীয় অভিভাষণ 'মোহাম্মদী'তে একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলি হইতে আমরা স্পষ্ট জানিতে পারিতেছি যে

রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বাংলার হিন্দু মুসলমান এক জাতি কি না তাহার বিচার না করিয়া ইহারা সাংস্কৃতিক, সুতরাং সাহিত্যিক, বিচারে দুই জাতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পর্যন্ত যে সাহিত্য, মূল সভাপতি আবুল মনসুর আহমদের ভাষায় তাহা

"পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ, এটা বাঙলার মুসলমানের সাহিত্য নয়। এ-সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নাই, শুধু তা নয়, মুসলমানদের প্রতিও এ-সাহিত্যের কোনো দান নেই। অর্থাৎ এ-সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ-প্রাণ-প্রেরণা পায় নি এবং পাচ্ছে না। এর কারণ আছে। সে কারণ এই যে, এ-সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়, এর বিষয়বস্তুও মুসলমান নয়; এর স্পিরিটও মুসলমানী নয়; এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়।"

এইরূপ এবং ইহা অপেক্ষাও চমকপ্রদ হাজারো দৃষ্টান্ত এই এক সংখ্যা পত্রিকা হইতে দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। মূল সভাপতির মনোভাব-বিচারই আমাদের কাজের পক্ষে যথেষ্ট। লেখক যদি সাংবাদিক না হইয়া সামান্যমাত্র সাহিত্যিকবুদ্ধিসম্পন্ন হইতেন তাহা হইলে জানিতে পারিতেন, সাহিত্যপদবাচ্য পৃথিবীর সকল সাহিত্যেরই বিষয়বস্তু আসলে মানুষ, তা সে লুঙ্গিই পরুক, আর টিকিই রাখুক। শেক্‌স্‌পীয়র, মিল্টন, শেলী, কীট্‌স্‌, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ, টলষ্টয়ের সাহিত্য হইতে রসসংগ্রহে যদি তাঁহাদের আটকাইয়া না থাকে এখানেও আটকাইবার কথা নয়। আজিকার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় যে মনোবৃত্তি এই সকল বুদ্ধিমান ভদ্রলোক প্রকাশ করিতেছেন, ইহাই যদি তাঁহাদের চিরন্তন মনোবৃত্তি হয় তাহা হইলে কোরান ছাড়া কোনও সাহিত্যই ইঁহাদের পাঠ্য ও পঠনীয় হইবে না—সাদী, হাফিজ, রুমি, ওমর, ইকবাল পর্যন্ত বাদ পড়িবেন—পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় কবি কালীভক্ত নজরুল ইসলাম তো বটেই। কতকগুলা কথা সাজাইয়া সভা করিয়া সদম্ভে প্রচার করাটার মধ্যে কোনই বাহাদুরি নাই, যদি তাহার মধ্যে মানুষের চিরন্তন সত্য না থাকে। আদালতে উকিলরা মক্কেলকে বাঁচাইবার বা মজাইবার জন্য অনর্গল কথার তুবড়ি ছুটাইয়া থাকেন, সেই পর্বতপ্রমাণ কথাগৌরবে তাহজীব ও তমদ্দুনের কিছুই আসিয়া যায় না।

—

এই তো' গেল, এক দিক। অন্য দিকে ফ্যাসিবিরোধী সাম্যবাদীদের 'অভিবাদন'ও রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়া আমাদিগকে বিপর্যস্ত করিতে ছাড়িতেছে না।

"রক্ত !

মাত্র কয়েক ফোঁটা রক্তের অভাবে রমজান দিনদিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। হয়তো একদিন মরেই যাবে !

তবুও একটুখানি রক্ত পাবার যো আছে না কি ?

রক্ত তার শরীরের জন্ম প্রয়োজন নয়, রক্ত সে পান করতে চায়।

একদিন সে রক্ত পান করেছিল,—নিজের ছেলের রক্ত। সে স্বাদ কি সহজে ভোলা যায় ! কেমন নোনতা নোনতা অদ্ভুত এক স্বাদ।

সেই থেকেই একটা প্রচণ্ড বাসনা তার মানুষের রক্ত পানের। এ বাসনা সর্বদা তার মনে তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জলে। ঘুমন্ত স্বপ্নেও তার রসনায় রস গড়ায়। জাগ্রত অবস্থায় মাঝে মাঝে সে উন্মাদের মত হয়ে ওঠে।

না, রমজান উন্মাদ নয়। সাধারণের মতই অতি সাধারণ মানুষ। ব্যতিক্রম শুধু ঐখানে—মানুষের রক্ত পানের অমানুষিক তৃষ্ণায় সর্বদা সে উদ্‌ভ্রান্ত।...

মানুষের রক্ত চাই তার !

কিন্তু মানুষের রক্ত পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। রাস্তার চৌমাথায়, গলির মোড়ে যে সব মানুষেরা ক্যা ক্যা ক'রে ঘোরে, ডাষ্টবিনে খাবার খুঁটে খায় বা লোরে লোরে হত্তো যেয় হয়ে কুকুরের মত, ঘুমোর বাড়ির রকে, গাড়ি বারান্দার নিচে কিম্বা গাছতলায় আর মরে ভেগে-মুতে গাড়ি-চাপা পড়ে—তাদের রক্ত চায় না রমজান। ও চায় সুন্দর সবল মানুষের রক্ত—যারা প্রচুর খায় আর প্রচুর ওড়ায় আর প্রচুর ছড়ায়। দোতালা থেকে যারা চেঁচায়, দূর হ' দূর হ', মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে বলে, বেরো বেরো, পেছন থেকে দরোয়ান লেলিয়ে দিয়ে হাঁকে, ভাগ্ ভাগ্। কেমন স্বাদ ওদের রক্তের ? পাতলা লাল রক্ত, ক্রমে ক্রমে ঘন হয়—সেই ঘন রক্ত চুক চুক করে চুষে খেতে কী তৃপ্তি ! গলার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে বুকের মধ্যে পৌঁছায় সমস্ত শরীরে অদ্ভুত এক শিহরণ এনে। কিম্বা ঘন রক্ত যখন জমে যায়, একেবারে কালো হয়ে যায়—তখন সেই তাল তাল রক্ত চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার কী অসহ্য আনন্দ !

কল্পনা করেও মনে মনে এক পাশবিক উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয় রমজান, জিব দিয়ে কেমন চুক চুক শব্দ করতে করতে তন্ময় হয়ে যায় ও। মাড়ির পেশীগুলো কড়মড় করে। চোয়ালের শিরাবহুল পেশীগুলো শক্ত হয়ে ফেটে পড়বে যেন !"

এখানেই লেখকের বীভৎসতার শেষ নয়, হঠাৎ রসিক হইবার লোভে তিনি

বীভৎসতর হইয়া উঠিয়াছেন ; লেখার শেষে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি যোজনা করিয়া তিনি সাইকলজিকাল হইতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"আমাদের মনেও সর্বদা মানুষের রক্তপানের একটা অতৃপ্ত বাসনা তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলে। কিন্তু মানুষের রক্ত পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। তাই প্রিয়জনকে যথেচ্ছ চুমো খেয়ে সে সাধ মেটাই !"

লেখককে ব্লাড-ব্যাঙ্কের কোনও কাজে লাগাইয়া দিলে হয় না ? তাঁহার প্রিয়জনদের তরফ হইতেই কথাটা বলিতেছিলাম, নতুবা আমাদের আর কি !

—

কবি অমিয় চক্রবর্তী আষাঢ়ের 'চতুরঙ্গে' "সেইদিন" কবিতায় "মহাত্মাজি যদি মারা যান" তাহা হইলে কি হইবে, সেই সমস্যা তুলিয়াছেন। তিনি বিশ্ব-বখাটে বলিয়াই পারিয়াছেন, অন্য যে কেহ হইলে এই প্রশ্নটা তুলিতে পারিত না।

"মহাত্মাজি যদি মারা যান
আকাশ হবে না খান্ খান্
পৃথিবী ঘুরবে।
কঠিন প্রাণ নেবে কিনে
মাঠে অগণ্য চাষী
জলে রোদে দিনে দিনে
ধনিক বনিক আর বহু বেতনিক
দুমুঠো পুরবে ;
উপবাসী
তিনি চলে গেলে।"

মানেটা যদিও স্পষ্ট বুঝা গেল না তবুও অনুভবে বুঝিলাম, কি কি কাণ্ড ঘটিবে। শুধু একটা বিষয়ের কথা কবি স্বাভাবিক বিনয়বশত উল্লেখ করেন নাই, মহাত্মাজীর মৃত্যুর পরে অমিয় চক্রবর্তীর কদর আরও একটু বাড়িবে, যেমন বাড়িয়াছে আণ্ড্রুজ সাহেবের এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে।

—

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি আন্দোলন সম্পর্কে অনেক বিস্মৃত ও অজ্ঞাত তথ্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল আমাদিগকে শুনাইতেছেন। তাঁহার 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' ও 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' ইতিমধ্যে ঐতিহাসিকের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। সদ্যপ্রকাশিত *Beginnings of*

Modern Education in Bengal : Women's Education পুস্তকখানি তাঁহার গবেষণামূলক খ্যাতি বর্ধন করিবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি, দি লেডিজ সোসাইটি, দি লেডিজ অ্যাসোশিয়েশন, দি শ্রীরামপুর মিশন প্রভৃতি বাংলা দেশের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে কিভাবে কাজ করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া যোগেশবাবু বেথুন (বীটন) কলেজের পত্তন ও প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সেই ইতিহাসকে টানিয়া আনিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বীটন ও রাধাকান্ত দেবের পত্রগুলি অতিশয় মূল্যবান বিবেচিত হইবে।

—

'মহাস্থবির জাতকে'র প্রথম পর্ব আগামী আশ্বিন সংখ্যায় শেষ হইবে, ইহা সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও বাহির হইতেছে। অন্যান্য পর্বগুলি আর ধারাবাহিক ভাবে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না, একেবারে বই হইয়া বাহির হইবে।

কার্তিক সংখ্যা হইতে "বনফুলে"র বিচিত্র উপন্যাস 'সপ্তর্ষি' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

ডক্টর সুশীলকুমার দের 'বাংলা প্রবাদ' সম্বন্ধে অনেকেই সন্ধান চাহিতেছেন, ইহা সুবৃহৎ পুস্তক, মুদ্রণ সময়সাপেক্ষ। আশা করা যায়, বড়দিনের পূর্বে বইখানি আত্মপ্রকাশ করিবে।

'শনিবারের চিঠি'র আশ্বিন সংখ্যা পূজা-সংখ্যারূপে ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে বাহির হইবে।

—

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র প্রচলিত সংগ্রহের অষ্টাদশ খণ্ড কাগজের নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সগৌরবে বাহির হইয়াছে। রচনাবলীর যাহা বৈশিষ্ট্য—রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া—এই খণ্ডেও তাহা বজায় আছে। 'শেষ সপ্তক'-এর "সংযোজন" অংশে এই সম্পূর্ণ পাওয়ার পরিচয় মিলিবে। শেষবর্ষণ, নটীর পূজা, নটরাজ, গল্পগুচ্ছের কিয়দংশ এবং সঞ্চয়, পরিচয় ও কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—এই খণ্ডে প্রকাশিত সকল রচনা সম্বন্ধেই সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি রচনাবলীর পাঠে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত' এবং প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত দুইটি সুখপাঠ্য বই। বুদ্ধচরিতের অনুবাদ অতি চমৎকার হইয়াছে। লেখার গুণে প্রমথনাথ বিস্মৃত অতীতকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন—উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের "দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী" দ্রুত সমাপ্ত হইল, গত মাসেক কালের মধ্যে 'নবীন তপস্বিনী', 'সুরধুনী কাব্য' ও 'কমলে কামিনী নাটক' গ্রন্থাবলীর এই শেষ তিন খণ্ড বাহির হইয়াছে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়' ও 'নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়'। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক ভূদেবের এই পরিচয় সর্বত্র প্রচারিত হওয়া উচিত। নবীনচন্দ্রের ('ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি) আত্মজীবনী কৌতুককর।

এই বাজারে তাক লাগাইতেছেন সিগনেট প্রেস; রং ছবি ভাল ছাপা ও ভাল বাঁধাইয়ের মজুব লাগাইয়া দিয়াছেন—বইগুলির মহিমা তো স্বতন্ত্র আছেই! অবনীন্দ্রনাথের ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী (সম্পূর্ণ), সুকুমার রায়ের খাপছাড়া, বহুরূপী—যে অপূর্ব রূপসজ্জায় এ যুগের ছেলেমেয়েরা পাইতেছে তাহাতে তাহাদিগকে হিংসা হয়।

মেডিকাল বুক কোম্পানী হইতে কল্যাণমল্লের সুবিখ্যাত কামশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক 'অনঙ্গরঙ্গ'-এর ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে। অনুবাদক ত্রিদিবনাথ রায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত এই কাজ করিয়াছেন। তাঁহারই যত্নে এই বহুবাঞ্ছিত পুস্তকের একটি প্রামাণিক সংস্করণ আমাদের হাতে আসিল। সুশীল গুপ্ত প্রকাশ করিয়াছেন গত মন্বন্তরের সচিত্র কাহিনী—Ela Sen-এর *Darkening Days*, ও ভল্টেয়ারের *The Princess of Babylon.*

মিত্রালয় দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর শক্তিশালী উপন্যাস 'পিশাচ' ('শনিবারের চিঠি'তে অংশত প্রকাশিত), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাইরি "ঊর্মিমুখর" এবং গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'দেশবিদেশের ধর্ম' প্রকাশ করিয়াছেন। গজেন্দ্রকুমারের 'নবযৌবন' নামক 'ছোটগল্পসংগ্রহ' বাহির হইয়াছে বুক ইণ্ডাষ্ট্রীজ হইতে।

বেঙ্গল পাবলিশার্স হইতে নবেন্দু ঘোষের নূতন উপন্যাস 'ডাক দিয়ে যাই' এবং মনোজ বসুর গল্পসংগ্রহ 'বনমর্মরে'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

বর্তমান সংখ্যার ৩৩৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'সুরাসুর' কবিতাটি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন. ১৩৫১

শারদীয়া

শনিবারের চিঠি'র বর্ষ শেষ হইল; বর্ষ অর্থে 'বর্ষা'ও বটে, এদিকে বর্ষার শেষে শরৎ আসিয়া পড়িল, তাই একটু 'শারদীয়া' করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আমাদের 'শারদীয়া' অবশ্য একটু স্বতন্ত্র, তাহাতে আর যাহাই থাকুক, কাঁসিও নাই, বাঁশিও নাই—সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি।

শরৎ আসিতেছে, রাত্রে আকাশ পরিষ্কার হইয়া ছায়াপথ দেখা দিতেছে; বর্ষার দৌরাত্ম্য কমিয়া আসিয়াছে। বহুদিন পরে এবার প্রকৃত পল্লীবাসে বর্ষাযাপন করিলাম, তাই বর্ষার পর শরৎ যে কি—বাঙালীর শারদোৎসবের অর্থ কি—তাহা পুনরায় ভাল করিয়া উপলব্ধি করিলাম। বাংলা দেশের বর্ষা যে কেবল কবিতায় উপভোগ করিয়াছে, পল্লীবাসী চাষী গৃহস্থের মত যে তাহার সহিত রীতিমত ঘর করে নাই, সে শরতের এই নির্ম্মল-নীল হরিত-হিরণের প্রাণারাম রূপ কখনও অন্তরের সহিত প্রত্যক্ষ করিবে না—বাঙালীর শারদীয়া-পূজার মর্ম্ম বুঝিবে না। বাংলার শরৎকে বুঝিতে হইলে বাংলার বর্ষাকে বুঝিতে হয়। আমরা যে শ্রেণীর বাঙালী—যাহারা কবিতা লিখি, সাহিত্য-সভা করি—তাহাদের অধিকাংশই শহরবাসী, তাই বর্ষাকে আমরা চিনি না; ভাববিলাসী শৌখিন নাগরিক আমরা, বর্ষাকে সুরে বাঁধিয়া রেডিও-যোগে তাহার রস উপভোগ করি। বর্ষা যে কি বস্তু তাহা দেহাতী বাঙালীই জানে; আমরাও যখন মাঝে মাঝে সেই অবস্থায় পড়িয়া 'মাহ ভাদর ভরা বাদরে'র সঙ্গে গঙ্গলোকে মোলাকাৎ করি, তখন শহরের সঙ্কীর্ণ গলির অন্ধকার গৃহে ছাদসংলগ্ন চিলে-কোঠায় বসিয়া রবীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গল ভাঁজিবার কথা মনে পড়ে, তখন সেই চিলেকোঠাকেই অলকা, এবং সেই গানগুলিকে অলকাবাসিনী যক্ষপ্রিয়ার নয়নসলিলার্দ্রতন্ত্রী বীণার ঝঙ্কার-মূর্চ্ছনা বলিয়াই মনে হয়—অচিরে ট্রেনযোগে তথায় পৌঁছিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

বেশ বুঝিতে পারিতেছি, 'শারদীয়া' লিখিতে বসিয়া এই যে বর্ষার নিন্দা করিতেছি, ইহা আমাদের পাঠকপাঠিকাগণের রুচিসঙ্গত হইতেছে না; তাঁহারা আমাকে নিতান্তই বেরসিক ঠাওরাইবেন, অন্তত বাঙালীর পক্ষে আমার রসবোধটা যে কিছু কম, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না। কথাটা হয়তো সত্য, আমি তাহার প্রতিবাদ করিব না, বরং মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিব;

কেন, তাহাই বলি। অতএব এখন বর্ষার কথাই চলুক—'শারদীয়া' পরে হইবে; ভয় নাই, তাহাতে কবিতা বাদ পড়িবে না।

• • •

স্বীকার করি, আমাদের জয়দেব হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল কবিই মেঘ দেখিয়া পাগল। কালিদাসের কথা ছাড়িয়া দিই—তাঁহার মেঘ অতিশয় সুজন এবং সভ্য; তাহার অন্তরের বাষ্পরাশি কখনও বেসামাল হইয়া পড়ে না; স্থানবিশেষে আবশ্যকমত দুই-চারি ফোঁটা খরচ হয় বটে, কিন্তু সে বড় হিসাব করিয়া, কখন যূথীবনবিহারিণী যুবতী পুষ্পলাবীর তাপস্বিন্ন কপোলের উপরে, কখন বা সন্ধ্যা-স্বতিকালে নৃত্যপরা দেবদাসীর ক্লান্তপদপল্লব? না—বিক্ষেপবিধুর বাহুমূল বা মণিবন্ধ? না, তাহাও নয়!—মনে আসিতেছে, মুখে আসিতেছে না—তবে, কাব্যশাস্ত্রসম্মত একটি অতিশয় উপযুক্ত স্থান বটে, তাহারই উপরে। কালিদাসের মেঘ মন্দাক্রান্তা ছন্দে 'স্নিগ্ধগম্ভীর ঘোষ' ছাড়া আর কিছুই বিশেষ করে না, সে যদি বর্ষণ করিত, তবে অতখানি পথ পার হইয়া অলকায় পৌঁছিতে পারিত না। জয়দেব কেবল 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্' দেখিয়া ওই একটি মাত্র পদে কবিত্বের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন। বৈষ্ণব কবিদের অবস্থা সাধারণ কবির অবস্থা নয়—কাজেই তাঁহাদের সাক্ষ্য এখানে চলিবে না। বাকি থাকেন রবীন্দ্রনাথ, তিনিও বর্ষার কবি—বর্ষার মান তিনি যত বাড়াইয়াছেন, এমন আর কেহ নয়। রবীন্দ্রনাথ শুধুই 'নববর্ষা' নয়—'শ্রাবণধারা'র গানও গাহিয়াছেন এবং 'দাদুরী ডাকিছে সঘনে' অতএব 'জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলো না' বলিয়া তাঁহার কাব্যসুন্দরীকে সেই রাত্রে নীপশাখে ফুলের রশি দিয়া ঝুলনা বাঁধিতে সানুনয় অনুরোধ করিয়াছেন! কিন্তু সে বরষা 'প্রাসাদের শিখরে'ই তাহার কেশ এলাইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ কখনও হাঁটুর উপরে কাপড় তুলিয়া, অবিশ্রান্ত বর্ষণ মাথায় করিয়া, "জলে ভর-ভর আউসের ক্ষেত' ভাঙিয়া—ক্রোশান্তর—দূরের হাটে শাক-বেগুন-মৎস-পসারিণীদের অভিসারে যাত্রা করেন নাই; অথবা, বন্যার দিনে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল ধসিয়া ভাঙিয়া পড়ার যে পরম উৎকণ্ঠা তাহাও সারারাত্রি জাগিয়া উপভোগ করেন নাই, করিলে বর্ষার মূর্তি দেখিয়া তাঁহারও হৃৎকম্প হইত। তাই, আমরা যখন চিলেকোঠায় বসিয়া খড়খড়ির ফাঁক দিয়া দেখি—

বেলা যায় বৃষ্টি বাড়ে বসি আলিসায় আড়ে
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে;
রাজপথ জনহীন শুধু পান্থ দুই তিন,
ছাতার ভিতরে লীন ধায় গৃহমুখে।

—এবং ওই 'ভিজে কাক' ও 'পাস্থ দুই-তিনে'র তুলনায় নিজকে ভাগ্যবান ভাবিয়া সে অবস্থাতেও পুলকিত হইয়া উঠি, তখন কবির—

মনে পড়ে ৰবিবার বৃন্দাবন-অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ,
শ্যামল তমাল তল নীল যমুনার জল,
আর দুটি ছলছল নলিন নয়ন।

ইহারই নাম বর্ষার কবিতা! ইহাতে কবিতা আছে, কিন্তু বর্ষা কোথায়? 'বৃন্দাবন', 'রাধিকা', 'অভিসার'—ইহাদের একটাই তো যথেষ্ট; অতএব ইহাকে বর্ষার কবিতা না বলিয়া বর্ষায় কবিদের যে বায়ুবৃদ্ধি হয়, তাহারই গীতোৎসব বলাই ঠিক। বৈষ্ণব কবিদেরও এইরূপ হইত, বরং আরও বেশি, নহিলে, ব্যাঙের ডাকে 'ফাটি' যাওত ছাতিয়া!—সে যে আরও সাংঘাতিক! এ বিষয়ে শাক্ত কবিদের কোন মোহ ছিল না, তাঁহাদের 'বারমাস্যা'র বর্ষার যে গুণবর্ণনা আছে, আমি তাহাই সত্য বলিয়া মানি, আপনারাও মানিতেন, যদি শহরের 'বর্ষাতি'র আড়ালে বাস করিয়া বর্ষাকে ফাঁকি না দিতেন।

আসল কথা, বাংলা দেশের ঋতুগুলির মধ্যে বর্ষাই সবচেয়ে দুঃখজনক—ইহা যে না জানে, সে বাঙালীই নয়। শীতপ্রধান দেশের তুষারপাত ও আমাদের দেশের 'বাদল'—একই প্রকার দুর্যোগ। ওই সময়টাতেই আমরা প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করি, এবং লড়াই করিয়া অন্নসংগ্রহ করি—বাঁচিয়া থাকার দামটা ওই সময়েই দিয়া রাখিতে হয়। 'এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে', 'শ্যামা জন্মদে', শস্যশ্যামলাং মাতরম্'—প্রভৃতি যে ভাব-ভক্তির উচ্ছ্বাস আমরা করিয়া থাকি, সে ওই বর্ষার রূপ দেখিয়া নয়, তাহা বাংলার শারদীয়া শ্রীর বন্দনা। বাংলা দেশের ঋতুরাজ বসন্ত নয়—শরৎ, এমন শরৎ আর কোন দেশে নাই। বর্ষা আমাদের অমানিশা—শরৎই পৌর্ণমাসী। তথাপি আশ্চর্য্য এই যে, আমাদের কবিরা বর্ষাবন্দনায় পঞ্চমুখ,—শরতের গান তাহার তুলনায় কিই বা আছে? এতকাল পরে রবীন্দ্রনাথই দুই-চারিটা লিখিয়াছেন। বাংলা কাব্যের বসন্ত-বর্ণনাও নিতান্ত কৃত্রিম—সংস্কৃত কাব্য হইতে ধার করা; যাহাকে আমরা বসন্ত বলি তাহা বসন্ত নয়—তরুণ নিদাঘ; তাহারই কর্ণে চম্পকের বীরবৌলি, মাথায় অশোক-কিংশুকের মালা।

কিন্তু বর্ষাকে গালি দিয়াছি বলিয়া, নবমেঘকে আমি গালি দিই নাই। গ্রীষ্মের দাবদাহের পর, উত্তপ্ত তাম্রাভ আকাশে যখন নীলমেঘের উদয় হয়, তখন, কোন্ সাগরের ওপার হতে—এই রকম একটা রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাস

কবুল করিতে আমার আপত্তি নাই—অন্তত এককালে ছিল না। কিন্তু সে তো বর্ষার মেঘ নয়—তাহার নাম 'নবমেঘ', তাহার বর্ষণকেও 'নববর্ষা' বলে। আমি 'ঝঞ্ঝার মঞ্জীর-বাঁধা উন্মাদিনী কালবৈশাখী'র কথাও বলিতেছি না, তাহার আবির্ভাবে যে ত্রাসমিশ্রিত পুলকের সঞ্চার হয়, সে বস্তুও স্বতন্ত্র। আমি বলিতেছি, সেই যে সহসা "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" মাত্র এই কয়টি অক্ষরের ধ্বনি-চিত্রে বাঙালী কবি যাহাকে এমন রূপময় করিয়া তুলিয়াছেন, তাহারই কথা। এখানে একটু না থামিয়া পারিলাম না; এই একটিমাত্র বচন রচনা করিয়া জয়দেব কালিদাসকেও হারাইয়া দিয়াছেন। এই অতি ক্ষুদ্র পদটিতে যেমন সমস্ত আকাশের মেঘশোভা ধরা দিয়াছে, তেমনই তাহার শব্দধ্বনিতেও গম্ভীর মেঘনির্ঘোষ আরও কত স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে! ও যেন নবমেঘের পরিস্ফুটতম বাণী-রূপ মূর্তিমতী মেঘ-সরস্বতী! ওই অক্ষর-সন্নিবেশ একটু এদিক-ওদিক করিবার জো নাই, 'মেঘ-মেদুর অম্বর' বা 'নবমেঘে মেদুর অম্বর'—এমন অনুবাদও চলিবে না। শব্দমন্ত্রের কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত! কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। ওই নববর্ষার মেঘই কবিদের মনোহরণ করে; এমন কি, তাহার সেই রূপই 'নবঘনশ্যাম' নামে ভক্তেরও আরাধ্য হইয়াছে। সেই নবমেঘ দেখিয়া আমাদের একালের কবি—চিরকালের কবি—গাহিয়া উঠেন,—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে হৃদয়,
নাচে রে!

আমিও ওই নবমেঘ পর্যন্ত রাজি আছি, এমন কি বর্ষণহীন মেঘের যে তাহাকে মেঘান্ধকার বলে তাহাও বরদাস্ত করিতে পারি; কিন্তু শ্রাবণ-ভাদ্রের ঘোলাটে আকাশ, আর 'দরদর' কিংবা 'ফিস্‌ফিস্' ধারাকে কবিত্বপূর্ণ মনে করিবার মত রসোন্মাদ আমার নাই। আমি ময়ূর হইতে রাজি আছি, দাদুরী হইতে পারিব না। কোন কোন কবি ওইরূপ ধারাবর্ষণ রাত্রিকালে হইলে, "নিদ্রা যান মনের হরিষে"; হয়তো সে সময়ে উহার একটা ঘুমপাড়ানি বা soporific (না, somniferous ?) গুণ আছে; কিন্তু যাহাদের দেহ-মন সুস্থ তাহাদের ওইরূপ ঔষধের কোন প্রয়োজন আছে কি? তা ছাড়া এই যে—

রিমিঝিমি রিমিঝিমি বাদল বরিষে—
পালঙ্কে শয়ানি রঙ্গে
বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।

—ঘুমাইয়াই যদি পড়ি, তবে 'ঝিমিঝিমি' শুনিব কেমন করিয়া? বর্ণনাও যেন একটু অবাস্তব বলিয়া মনে হয়—অঙ্গে বিগলিত 'চীর', অথচ 'পালঙ্কে' শয়ান! ওরূপ সাক্ষীর সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয়। বরং একজন ইংরেজ কবি ওইরূপ রাত্রে নায়িকার যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই আরও যথার্থ বলিয়া মনে হয়। এমন রাত্রে বায়ু বৃদ্ধি হইবারই কথা; ঘুম কিছুতেই হয় না, যত দুঃস্বপ্ন ও দুর্ভাবনা ভিড় করিয়া আসে। এহেন রাত্রে নায়িকার বিনিদ্র অবস্থায় তাহার মনের যে অশান্তি স্বাভাবিক, কবি টেনিসন তাহার কি মর্ম্মান্তিক চিত্র দিয়াছেন!—

Drug thy memories, lest thou learn it, lest thy heart be put to proof,
In the dead unhappy night, and when the rain is on the roof.
Like a dog he hunts in dreams, and thou art staring at the wall,
When the dying night lamp flickers, and the shadows rise and fall.

—এমনই হয়!—কবিদের না হইতে পারে। সবেই বুঝুন, আমি ঠিক বলিয়াছি কি না; বর্ষার কিছু ভাল নয়! বাঙালী কবিরা আমার মাথায় থাকুন।

২

আমি যে 'শারদীয়া' লিখিতে বসিয়াছি, তাহা ভুলি নাই, কিন্তু লিখিব কি? দেশে বর্ষা যেমন ছিল তেমনই আছে, শরৎও যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু শারদীয়া কি আর আসে? দেশে কি আর সেকালের উৎসব আছে? বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের কথা বলিতেছি না—সে অনেক দিন হইল পঞ্জিকাসাৎ হইয়াছে। 'শারদীয়া'ও আর নাই বটে, কিন্তু বহুদিনের 'লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের গন্ধে'র মত, বাঙালী এখনও প্রাণে তাহার আভাস পায়, বাহিরে এখনও তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করে; সেই নামটাকে মাত্র আশ্রয় করিয়া—সেই উৎসব নয়, তাহার অভিনয় করিয়া থাকে। বর্ষার পর শরৎ—দেশের প্রকৃতিতে যেমন, দেশবাসীর দেহে-মনেও তেমনই, সে যেন একটা Resurrection—মৃতের পুনরুত্থান! এককালে সেই পুনরুত্থানের নব-জীবনোল্লাস দেশব্যাপী উৎসবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সে উৎসবে ডুলী, মালী, কামার, কুমার হইতে রাজা-জমিদার, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত—ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সমগ্র জাতি যোগদান করিত; তাহার অনুষ্ঠান এমনই ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছিল যে, বাঙালী—জীবনের সকল দিক—অতিশয় আধ্যাত্মিক হইতে আধিভৌতিক পর্য্যন্ত সকল প্রয়োজন—সেই উৎসবের অঙ্গীভূত হইয়া উঠিত। সে যেন বাঙালীর জাতীয় চেতনার সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি—সেই স্ফূর্ত্তিকে রূপ দিবার সে যেন এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি-প্রতিভা। আমি

পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি; বর্ষার গানের মত শরতের গান আমাদের সাহিত্যে প্রচুর তো নহেই—উৎকৃষ্টও নয়। তাহার কারণ এই যে, বর্ষা ভাবের কাল নয়—অভাবের কাল, তাই তাহাতে কল্পনার এত অধিক প্রসার, 'শূন্যমন্দিরে'র শূন্যতা পূরণের জন্য এত সুর, এত ছন্দ। কিন্তু শরৎ—'শূন্য' নয়, 'পূর্ণে'রই পরম রূপটিকে স্থলে-জলে বিথারিয়া দেয়—সে ত্যাগ নয়, ভোগ; কল্পনা নয়, বাস্তব। তাই তখন কথায় ছন্দে গান-রচনা নয়, সমাজ-জীবনের পংক্তিতে পংক্তিতে সে গান ছন্দিত হইয়া উঠে। সে কাব্য লিখিয়া রাখিবার—পড়িয়া শুনাইবার নয়; প্রতি বৎসর তাহাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হয়, বাস্তব রঙ্গমঞ্চে তাহার বাস্তব-অভিনয় হইয়া থাকে।

এই উৎসব বাঙালীর বাঙালীত্বের সমবয়সী; এই একটি পার্ব্বণ তাহার প্রাণের পার্ব্বণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের দুর্গা-প্রতিমার নাম শারদীয়া-প্রতিমা—তাহার পূজাও কেবল ব্যক্তি-গৃহস্থের পূজা নয়, সে পূজার মূলে তত্ত্ব-তত্ত্বই বড় নয়—সে পূজা বিশেষভাবে সামাজিক, তাহাতে ব্যক্তির জীবন সমাজ-জীবনকে আলিঙ্গন করিত। ওই যে প্রতিমা, উহার মূর্ত্তি কল্পনায় যেমন, তেমনই তাহার পূজাপদ্ধতি ও উপচারের ঘটায় বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতির যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, আর কোন জাতির কোন একটি উৎসবে তেমনটি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এই প্রতিমা যাহার প্রতীক—বাঙালীর সেই জীবনোল্লাস, দুঃখজয়ের, মৃত্যুজয়ের সেই আনন্দ, বর্ষান্তের সেই শারদীয়া—এমন পূজা আর কোথায় পাইয়াছে?

কিন্তু আজ সে কথা তুলিবে কে? গত দুই পুরুষ ধরিয়া বাঙালীর এই উৎসব—এই শারদীয়া—তাহার জীবন হইতে ক্রমে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। বাল্যকালে সে উৎসব দেখিয়াছি—তাহার সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপ প্রাণে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; তখন যাহা মনে বুঝিবার প্রয়োজন ছিল না আজ তাহা স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাই তাহাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার এত চেষ্টা! চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও একটা কথা বুঝিয়াছিলাম, তাহা এই যে, বাঙালীর কোন পার্ব্বণই যেমন শহরের নয়, তেমনই দুর্গোৎসবও শহরের উৎসব নয়। তাহার কারণ, শহরের জীবন খাঁটি বাঙালী-জীবন নয়; শহরে সে সমাজও নাই, প্রকৃতির সেই পরিবেশও নাই। অতএব শহরে 'শারদীয়া'—একটা অসম্ভব কল্পনা। আজ সেই শহর বা, শহরতুল্য স্থান ছাড়া, বাঙালীর পৈতৃক বাসভূমিতে শারদোৎসব প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে—তাই উৎসবের সে রূপও আর কোথাও নাই। তাহার উপর এখন ঘরে আর প্রতিমার স্থান নাই—বাহিরে

বারোয়ারীতলায় তাহার স্থান হইয়াছে। সেকালে বারোয়ারী পূজাও হইত—তাহার প্রতিমাও ভিন্ন—সময়ও এই মহাপূজার সময় নয়। এখন এই যে সার্ব্বজনীন পূজার সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিতেছে, ইহার কারণ কি? কারণ অতিশয় স্পষ্ট; তখন পরের ঘরের পূজাও ছিল সকলের আপন পূজা—এখন সেই পূজায় সমাজের সহিত একাত্মীয়তা নাই, ধনীর পূজায় দরিদ্রের অধিকার নাই—সে পূজা জগজ্জননীর পূজা নয়, তাহাতে ধনী-দরিদ্র ইতর-ভদ্র এক হইয়া আনন্দ করিবার উপায় আর নাই। সার্ব্বজনীন পূজায় সংঘ-বোধ আছে—সমাজ-চেতনা নাই; সেখানে গৃহস্থও নাই, তাই অভ্যাগতও নাই; সেখানে সমানাধিকারের আত্মমর্য্যাদা-বোধ আছে, নিজের গৃহদ্বার খুলিয়া দিয়া পরকে আহ্বান করিয়া—সেই পরের মুখে পরমান্ন তুলিয়া দিয়া আত্ম-পর ভেদ ভুলিয়া যাওয়ার আনন্দ নাই। এইরূপ পূজায় কুল-প্রথার কোন বালাই নাই বলিয়া জাতিধর্ম্মের বন্ধনও আর থাকে না। সেকালে শহরের সেই পূজা যেমনই হউক, তাহার প্রতিমা অর্থাৎ ভাবের প্রতীকটা ঠিক ছিল; তাহাতে অন্তত জাতির পৈতৃক ধারাটা বজায় থাকিত—পিতৃপিতামহদের কথা স্মরণ হইত, পূজার প্রাক্কালিক 'পিতৃপক্ষে'র অর্থ বুঝা যাইত। এখনকার ওই সার্ব্বজনীন পূজায় প্রতিমাটাও নষ্ট হইতে বসিয়াছে—কোন ভাব-মন্ত্রের প্রতীক না হইয়া একণে তাহা 'ইণ্ডিয়ান আর্ট' নামক কুলচুর-বিলাসের বস্তু হইয়া নব নব ভঙ্গিমায় ত্রিভঙ্গিম হইয়া উঠিতেছে, সাধকের ধ্যান-কল্পনার পরিবর্ত্তে সিনেমা-অভিনেত্রীর 'পোজ' তাহাকে প্রজ্যন্তর করিয়া তুলিতেছে!

কিন্তু প্রতিমার কথাও অবান্তর; যে ভাব মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, জীবনে যাহার সাড়া—যে কারণেই হউক—আর জাগে না, তাহাকে লইয়া 'আর্ট' করা চলে, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া—'কালীর দোহাই দিয়া পাঁঠা খাওয়া'র মত—সমাজ-জীবনের নয়, ক্লাব-জীবনের আমোদ-পিপাসা মিটানো যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে বাঙালীর শারদীয়া-উৎসব বলা চলে না। অতএব আজ তাহার কথা যাক! কিন্তু মোহ যে ঘোচে না, তাই আমি বাংলার এই পল্লীতে বসিয়া, আমার শিরায় শিরায় এখনও, পিতামহগণের মতই, সেই শারদীয়ার আগমনী অনুভব করিতেছি। মেঘের আস্তরণ ছিন্ন করিয়া আকাশ যেমন গভীর, তেমনই গাঢ়-নীল দেখাইতেছে, রৌদ্রে সোনার রঙ লাগিয়াছে, মাটি সবুজ হইয়া উঠিতেছে। শরৎ আসিতেছে—বাংলায় শরৎ! কিন্তু উৎসব করিবে কে?, কে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে? আমরা যদি চেতন না হইয়া জড় হইতাম, তাহা হইলেও মান থাকিত; ঝিল-বিল-পুষ্করিণীতে শালুক হইয়াও মুখে একটু হাসি ফুটাইতে

পারিতাম, ধানের ক্ষেতে দিগন্ত-বিস্তার সবুজের ঢেউ তুলিয়া আনন্দের স্বর্ণালোকে ঝলমল করিতাম! জড়েরও জীবন আছে, আমাদের জীবন নাই। এত দুর্দশার শেষে জীবনের যেটুকু অভিমান আমাদের ছিল, গত বৎসরে তাহাও ঘুচিয়াছে; মানুষের ইতিহাসে যাহা কখনও ঘটে নাই, আমাদের জীবনে তাহা ঘটিয়াছে। আমরা শবরাশিকে ইন্ধন করিয়া শ্মশানচুল্লীতে অন্ন পাক করিয়াছি, সেই অন্ন ভোজন করিয়া এখনও সুস্থদেহে বাঁচিয়া আছি। আমরা কি আর মানুষ আছি? যাহারা সেই মহামারীর অনুচররূপে অনশনশীর্ণ মুমূর্ষুর অস্থি চর্ব্বণ করিয়া হৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছিল, তাহারাই কি এবার শারদোৎসব করিবে? সেই মহাপাপের উদাসীন সাক্ষী ছিল যাহারা, তাহারা কি কখনও কোনও উৎসব করিয়াছে?

তাই বলিতেছিলাম, শরৎ এবারেও আসিয়াছে, যেমন প্রতি বৎসর আসে; কিন্তু সে দাঁড়াইবে কোথায়? রোগের মহামারী, দুর্ভিক্ষের মড়ক—ইহার মধ্যে তাহার সোনার রঙ যে পিঙ্গল হইয়া উঠিবে! আমার ঘরের নীচে মাঠের পর মাঠ কচিধানের পাতায় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে—জানালা খুলিলেই, পশ্চিম আকাশপ্রান্তের নীল নারিকেলশ্রেণী পর্য্যন্ত, সেই ক্রোশব্যাপী হরিৎ-শোভা মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কিন্তু সে দৃশ্য দেখিয়া তখনই প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, জানালা বন্ধ করিয়া দিই। ওই হরিতের মধ্যে অন্নপূর্ণার সে সুধাহাস্য আর নাই, ওই সতেজ সরস তৃণরাশির অঙ্গে ধনলুব্ধ পিশাচের লালসা-বহ্নি এখন হইতেই জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—উপবাসকাতর বঞ্চিত বুভুক্ষুর দীর্ঘশ্বাস উহাকে আন্দোলিত করিতেছে। তাই ওই শোভা এত ভয়ঙ্করী। ওই শস্য যাহাদের ভাণ্ডার ভরিয়া তুলিবে তাহারা দুর্ভিক্ষের দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছে, যুদ্ধ পাছে শেষ হয় সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদকেও যাহারা অভিশাপে পরিণত করিয়াছে—সুন্দরকে ভয়ানক, শুচিকে অশুচি করিয়া তুলিয়াছে—গ্রামেও যখন তাহারাই সমাজপতি, তখন বাংলা দেশে শারদোৎসব করিবে কে?

বাগনান, ভাদ্র ১৩৫১

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

মীননাথ ও কানুপা

মাতা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি—এই তিনটিই প্রত্যেক মানুষের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। যে ভাষা ছয় কোটি লোকের কথা-বার্তার, হর্ষ-শোকের, ঘৃণা-ভালবাসার ভাষা, সে ভাষা হেলার সামগ্রী নয়। যে ভাষা ভাষীর সংখ্যায় পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম, সে ভাষা নগণ্য নয়। যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য সাহিত্য রচনা করেছেন, সে ভাষা দীনা হীনা নয়। এই বাংলা ভাষার আদি লেখকদের কথা বলতে গেলে, একটা প্রশ্ন প্রথমে স্বতই মনে আসে, এর জন্ম হ'ল কবে? ভাষার জন্ম জীবজন্তুর জন্মের মত নয় যে, সন তারিখ ঠিক ক'রে তার নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। ভাষা নদীর স্রোতের মত নিরবচ্ছিন্ন। যখন কোন এক সময়ের লোকদের কাছে তাদের পূর্ব্বের বা পরের যুগের ভাষা দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য হয়, তখন একই ভাষাস্রোতের ভিন্ন নাম দেওয়া হয়। এইরূপেই আমাদের বাংলা ভাষার পূর্ব্বে গৌড় অপভ্রংশ, গৌড়ী প্রাকৃত, প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত, প্রাচীন পূর্ব্ব ভারতীয় আর্য্য ভাষা বর্ত্তমান ছিল। এরা একই ভাষা-প্রবাহের বিভিন্ন রূপ। কবে এই ভাষা-প্রবাহ গৌড় অপভ্রংশ রূপ বদলে বাংলা রূপ নিলে, তার সঠিক সংবাদ দেওয়া মুশকিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের আগে বাংলা রূপের আবির্ভাব হয় নি, একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময় নিয়ে নানা মুনির নানা মত আছে। যতদূর দলিল প্রমাণ আমরা পেয়েছি, তাতে আমাদের বলতে হয় যে, মীননাথই বাংলা ভাষার আদিম লেখক।

মীননাথ বাঙালী। তাঁর নামান্তর মীনপদ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, মচ্ছেন্দ্রনাথ, মৎস্যেন্দ্রপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ। 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে' তাঁকে "চন্দ্রদ্বীপবিনির্গত" বলা হয়েছে। 'নিত্যাহ্নিকতিলকে' (লিপিকাল ১৩৯৫ খ্রীঃ অঃ) লেখা আছে তাঁর "বরণা বঙ্গদেশে" জন্ম। চন্দ্রদ্বীপ বাখরগঞ্জ জেলার প্রাচীন নাম। বাংলা দেশের যোগী-সম্প্রদায় আদৌ নাথপন্থাবলম্বী ছিল। এক সময় সমস্ত ভারতবর্ষে এই নাথপন্থার বিশেষ প্রভাব ছিল। এখনও কিছু আছে। আদিনাথ শিব। তাঁর পরই মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরী হাড়িপা, কানপা প্রভৃতি সিদ্ধগণ। নাথপন্থার প্রধান দেবতা আদৌ ছিলেন নিরঞ্জন বা শূন্য। পরে নিরঞ্জনকে শিবের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাথপন্থার আদি প্রচারক এই মীননাথ। বাঙালীর এটা একটা গৌরবের বিষয় যে, একজন বাঙালী গোটা ভারতবর্ষকে

একটা ধর্মমত দিয়েছিলেন। এই নাথপন্থারই অন্য নাম সহজসিদ্ধি—এ পরে তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করে।

মানুষের জীবনী লেখা ভারতবর্ষীয়দের ধাতের সঙ্গে খাপ খায় না। ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি সব দেবতাকে কেন্দ্র ক'রে—এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। শেষে মানুষ যখন দেবতা হয়ে ওঠে, তখন তার নগ্ন সত্য জীবনটার স্থানে আসে একটা কল্পনার জমকালো পোশাকপরা পুরাণ কথা, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Myth বা Legend. মীননাথ ও কানুপার জীবনের সেই পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে আমাদিগকে সন্তুষ্ট হতে হবে। 'গোরক্ষবিজয়ে' দেখতে পাই যে আদ্যের শরীর থেকে—

"বদনে জন্মিল শিব যোগীরূপ ধরি
শিরেত উত্তম জটা শ্রবণেত কোড়ি।
নাভিতে জন্মিল মীন গুরু ধন্বন্তরি
সাক্ষাতে সিদ্ধার তেজ অনন্ত মুরারী।
হাড়ীপার জন্ম হৈল হাড় হোতে
সর্ব্বাঙ্গ সিদ্ধার তেজ দেখিয়ে সাক্ষাতে।
কণ্ঠ হোতে জন্মিল কানুপা গোসাই
অস্থি ধরতর হৈল গাভুর সিদ্ধাই।
জটা ভেদি নিকলিল যতি গোরখনাথ
সিদ্ধ ঝুলি সিদ্ধ কাঁথা তাহার গলাত।
সকল শরীরে হল জগতের আই
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন অনুমানে পাই।
জন্মিলেক এক কন্যা পরম সুন্দরী
নূতন যৌবন কন্যা নাম থুইল গৌরী।"

এই বৃত্তান্ত থেকে আমরা শিব, মীননাথ, হাড়িপা, কানুপা, চৌরঙ্গীনাথ (গাভুর সিদ্ধাই), গোরক্ষনাথ এবং গৌরীর জন্মবিবরণ পাই। কোন কোন পুঁথিতে আদ্য স্থানে অনাদ্য আছে।

এর পর নিরঞ্জনের আজ্ঞায় শিব গৌরীকে পত্নীরূপে পেলেন। তারপর সকল সিদ্ধ পৃথিবীতে এসে বাস করতে লাগলেন। পৃথিবীতে এসে—

"মীনানাথের চাকরী করে যতি গোরখাই
হাড়িপার সেবা করে কানুফা গোসাই।
এইরূপে কতদিন সাধিলেক যোগ,
বায়ু ভক্ষি রহিলেন ত্যাজি উপভোগ।
শিবের দক্ষিণ বামে হাড়িপা মীনাই,
পৃষ্ঠভাগে গৌরী তবে জগতের আই।"

একদিন হরগৌরী একত্রে ব'সে আছেন, তখন গৌরী শিবকে জিজ্ঞেস করলেন—

"কণ্ঠে কেনে তোমার হাড়ের ধর মালা?
ঝলমল্ করে যেন জগত উজালা।
মহাদেব বোলে তুমি কহিয়াছ ভাল
তত্ত্ব-কথা কহি আমি শুনহ তৎকাল।
সপ্তবার মর যদি হও সপ্তবার
একবার মর তুমি এক গোটা হাড়।
তুমি কেন তত্ত্ব গোসাঞি আমি কেনে মরি
হেন তত্ত্ব কহ দেব নগে নগে তরি।
দেবীর বচন শুনি কহে মহেশ্বর
সত্বরে চলহ গৌরী ক্ষীরোদ সাগর।
সেই সাগরেতে আছে টঙ্গি মনোহর
এ বলিয়া দুই জনে চলিলা সত্বর।"

মহাদেব সেখানে এসে তত্ত্বকথা বলতে লাগলেন আর মাছের রূপ ধ'রে মীন মোচন্দর সব কথা শুনতে লাগলেন। দেবী ছিলেন ঘুমে কাতর, তাই তিনি

কিছু শুনতে পান নি। ওদিকে কিন্তু টঙ্গির নীচে থেকে মীননাথ হুঁ হুঁ ব'লে সায় দিচ্ছিলেন। মহাদেব মনে করছিলেন দেবী সায় দিচ্ছেন। তারপর—

"চৈতন্য পাইয়া দেবী বলিলা বচন,
কিছু না শুনিনু আমি নিদ্রার কারণ।
দেবীর বচন শুনি চিন্তিলেক মনে,
কহিতে বচন মুই হুঙ্কারিল কোণে।
নিরখিয়া দেখে হর ভাবি মহাজ্ঞান,
টঙ্গীর নামতে দেখে মীন পরিমাণ।
চিন্তিয়া জানিল এই শুনিল বচন
শাপ দিলা এক কালে হোক বিস্মরণ।
তথা হোতে হরগৌরী উলটি আসিলা
পুনর্ব্বার সিদ্ধাসনে একত্র মিলিলা।"

তারও পরে—

"মহাদেব চলি গেলা পর্ব্বত কৈলাস
তথা গিয়া মহাদেব করে গৃহবাস।
পুব্বেতে হাড়িপা গেল দক্ষিণে কানাই
পশ্চিমে গেলেন গোর্ক্ষ উত্তরে মীনাই।"

একদিন হরগৌরী একত্র ব'সে সৃষ্টি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। গৌরী বললেন যে, সকল সিদ্ধা গৃহবাস করুক। মহাদেব বললেন যে, তাদের যখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ নেই, তখন কি ক'রে তাদের দ্বারা গৃহস্থালী হয়? তখন দেবী তাঁদের পরীক্ষা করতে শিবকে বললেন। শিব মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা প্রভৃতি সিদ্ধাগণকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনলেন। সিদ্ধাগণ খেতে বসলেন, পার্ব্বতী পরিবেশন করতে লাগলেন। তখন এক গোরক্ষনাথ ছাড়া—

"দেবীর যে রূপ দেখি যত সিদ্ধাগণ
কামবাণে ভেদিলেক স্থির নহে মন।
কহিলেক মীননাথ মনে আশা করি
ত্রিজগতে পাই যদি এমন সুন্দরী।
বিচিত্র শয়নে থাকি এমন নারী লই
রঙ্গ কৌতুকে তবে রজনী পোহাই।
এবমস্তু বলি দেবী পাইলা এহি বর
কদলীর দেশে তুমি চলহ সত্বর।
ষোল শত নারী লয়ে তুমি কর কেলি
কদলীর রাজা হইবা কাটে যাও চলি।"

হাড়িকা গৌরীকে দেখে যেমন মনে করলেন, গৌরীও তাকে তেমন বর বা শাপ দিলেন।

এখন—

"কানুকাএ আকুলিল তাহান অন্তর
পরম সোন্দরী যদি থাকে মোর ঘর।
তার সঙ্গে কেলি করি জদি মরি জাই
তবেহ তাহান সঙ্গে আনন্দে খেলাই।
অঙ্গীকার কৈলা দেবী মনে বিমসিয়া
ডুরমানে যাহ তুমি ডাহকা চলিয়া।
জেমত মাগিলা তবে তেমত পাইলে বর
আনন্দ কর গিয়া রমণীর ঘর।"

পাতুর সিদ্ধা (চৌরঙ্গীনাথ) দেবীকে দেখে যেমন মনে করলেন, দেবীও তাঁকে সেইরূপ বর বা শাপ দিলেন। কেবল গোরক্ষনাথের মনে কোনও কুভাব জন্মে নি। দেবী তাঁকে অশুরকমে পরীক্ষা করেছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন টলাতে পারেন নি। এই পরীক্ষার পর—

"তবে সিদ্ধা চলি গেল যার যেই ঘর
প্রথমে কানফা গেল বহড়ির দ্বার।
হাড়িফা চলিয়া গেল ময়নামতি পুরী
তথা গিয়া রহিল হাড়ীরূপ ধরি।
গাভুর সিদ্ধাই গেল আপনার দেশ
মীননাথ চলি গেল কদলী উদ্দেশ।"

তারপর আর একবার গোরক্ষনাথের সঙ্গে কানুপার সাক্ষাৎ হয়। গোরক্ষনাথ গুরুকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন; কোনও সন্ধান না পেয়ে এক বকুলের তলায় ব'সে ভাবছেন, এমন সময় মাথার উপর দিয়ে কানুপাও আকাশপথে নিজ গুরুর অন্বেষণে পবনের গতি যাচ্ছিলেন। গোরক্ষনাথ ছায়া দেখে মাথা তুলে চাইলেন। ভাবলেন সিদ্ধার ভিতর কে এমন আছে যে আমার সম্মান করে না। তখন তিনি তাকে বেঁধে আনবার জন্য নিজের খড়মকে হুকুম করলেন। খড়ম আকাশে গিয়ে কানুপাকে ধ'রে নামিয়ে আনলে। গোরক্ষনাথ কানুপাকে তিরস্কার করলে উত্তরে কানুপা বললেন—

"ত্রিভুবনে জানে তুহ্মি যতি গোরখাই
একন্তর থাক তুহ্মি তোহ্মার গুরু কোন ঠাই
বড়াই না ছাড় তুহ্মি কীর কোন কলে,
তোর গুরু পড়িয়াছে কদলীর ভোলে।"

তারপর মীননাথের দুর্দ্দশা বর্ণনা ক'রে কানুপা বললেন—

"যদি সে আছয়ে গোর্খ কলঙ্কের ডর
ঝাঁটি গিয়া তোহ্মার গুরুর প্রাণ রক্ষা কর।"

গোরক্ষনাথ তখন রাগে কানুপাকে তার গুরু হাড়িফার অবস্থাটা বললেন—

"তোর গুরু বন্দী হৈছে মেহেরকুল দেশ
নিশ্চয় জানয় মুই তাহার উদ্দেশ।
মেহার কুলেত আছে জ্ঞানী এক জানি
মৈনামতি নাম তার রাজার ঘরণী।
ঈশ্বরের হৈতে সেই পাইল মহাজ্ঞান
জ্ঞানী নাহি পৃথিবীতে তাহার সমান।
বিধবা যে নারী পুত্র রাজরাজেশ্বর
দৈবগতি হাড়িফা বঞ্চএ তার ঘর।
তার পুত্র গুরু তোর বান্ধিলা রাখিল
মাটির করিয়া ঘর তাহাতে থুইল।
হস্তী যেহ্ন বান্ধি রাখে তাহার উপর
নিরন্তর থাকে সিদ্ধা মাটির ভিতর।"

তখন—

"দুই জন পাই দুইর গুরুর উদ্দেশ
যার যেই গুরুর উদ্দেশে চলি গেল দেশ।
কানফা চলিয়া গেল মেহারকুল দেশ
গোর্খনাথ চলি গেলা কদলী উদ্দেশ।"

কানুপা মেহেরকুলে কি করলেন, তা গোবিন্দচন্দ্র গীতে আছে। ময়নামতির পুত্র রাজা গোপীচাঁদ হাড়ীপাকে ঘোড়ার আস্তাবলে পুতে রেখেছিলেন। কানুপা তাঁকে মাটি খুঁড়ে বের করলেন। তখনও হাড়ীপা যোগস্থ ছিলেন। যোগ ভঙ্গ হ'লে গোপীচাঁদের আর রক্ষা ছিল না। তাই পূর্ব্ব থেকেই কানুপা গোপীচাঁদের সোনার মূর্ত্তি তৈরি ক'রে রেখেছিলেন। হাড়ীপার সরোষ হুঙ্কারে

গোপীচাঁদের সোনার মূর্ত্তি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তারপর কানুপা অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে হাড়ীপাকে গোপীচাঁদের উপর প্রসন্ন করালেন। কিছুদিন পরে গোপীচাঁদ হাড়ীপার কাছে সন্ন্যাস নিলেন। নিজে রাজপাট রাজরাণী সব ছেড়ে হাড়ীপার সঙ্গে সন্ন্যাসী বেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

'গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে' আছে—হাড়ীপাকে কানুপা গোপীচাঁদের সোনার মূর্ত্তি দিয়ে ঠকিয়েছিলেন, তাতে

"কানুপার তরে সিদ্ধা তখনি শপ্প দিল
সেবক হইয়া বেটা ভাণ্ডিলা আমারে।
তোমার কন্ধ কাটা পড়িবে ডাহুকার গড়ে।"

তখন ময়নামতি অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে হাড়ীপাকে কানুপার উপর প্রসন্ন করালেন। তাতে হাড়ীপা শাপমোচন ব'লে দিলেন—

"হাড়িপা বলেন শুন ময়নামতি রাই
উদ্ধার করিবে পুত্র বাইল ভাদাই।"

তারপর—

"কানুপা বন্দিল পুনঃ গুরুর চরণ
ডাহুকার সঙ্গে যায় করিবারে রণ।"

ডাহুকার গড়ে রমণীর প্রেমে প'ড়ে কানুপার মাথা কাটা পড়বার যোগাড় হয়েছিল। পরে তাঁর শিষ্য বাউলভাদাই বা ভাদ্রপাদ তাঁকে উদ্ধার করেন, এ সম্বন্ধে কোন বৃত্তান্ত অন্য কোনও পুঁথিতে দেখা যায় না।

মীননাথ তো কদলীতে চ'লে গেলেন। ধর্ম্মপ্রচার করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তিনি এক করতে গিয়ে আর ক'রে ফেললেন। সেখানে তিনি ষোল শ' নারীর মধ্যে রাজা হইয়া বসলেন। জপতপ সব দূরে গেল; তিনি এখন ভোগসুখে মেতে গেলেন। নর্ত্তকীর বেশে গোরক্ষনাথ মীননাথের দরবারে হাজির হলেন। কোনও পুরুষের সেখানে যাওয়ার অধিকার ছিল না—'গোরক্ষবিজয়ে' আছে

"নাচেন্ত গোর্খনাথ তালে করি ভর	কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলী হেন বোলে।
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর।	হাতের ধমাক নাচে পদ নাহি লড়ে
নাচেন্ত যে গোর্খনাথ ঘাগরীর রোলে	গগন মণ্ডলে যেন বিজুলী সঞ্চরে।"

মীননাথ নাচগানে মোহিত হলেন কিন্তু—

"মাদলের তাল শুনে তোলে মীন রায়ে	এক শিষ্য আছে মোর বন্তি গোরক্ষাই
মাদলের রায়ে কেনে গুরু মোরে কহে।	আর শিষ্য আছে মোর গাভুর সিদ্ধাই।
নাট করে নাটুয়া তাল বহে ছলে	দুই শিষ্য আছে মোর আন্ধি জানি ভালে,
তোন্ধার মাদলে মোর গুরু গুরু বোলে।	তুন্ধি কোন গুরু হেন মোরে বল ছলে।"

তারপর গুরুশিষ্য পরিচয় হ'লে গোরক্ষনাথ গুরুকে নানা মতে বুঝিয়ে সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। এর পরের বৃত্তান্ত নাথদের কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় না।

নেপালীদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, মীননাথ কামরূপ হয়ে শেষ বয়সে নেপালে এসেছিলেন। পরে তাঁর সন্ধানে গোরক্ষনাথও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তিব্বতী বইয়ে মীননাথ কাহ্নপার সম্বন্ধে কিছু কিছু বৃত্তান্ত আছে। কাহ্নপার সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা আছে যে, তাঁর বাড়ি ছিল উড়িষ্যা দেশে; তিনি থাকতেন সোমপুরী বিহারে। পাহাড়পুরের আবিষ্কৃত বিহারই এই প্রাচীন সোমপুরী বিহার—এইরূপ অনেকের মত।

আগেই বলেছি মীননাথ বাংলার আদি লেখক। তাঁর লেখা চার লাইনের একটি শ্লোক বৌদ্ধ গানের টীকায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। সে শ্লোকটি এই—

"কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্মকুরঙ্গ সমাধিক পাট।
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমলমধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা।"

এই শ্লোকে পরমার্থের, বিকশিল আধুনিক বাংলা রূপেরই সমান। শব্দ ও ব্যাকরণ বিচারে আমরা একে প্রাচীন বাংলাই বলব।

কাহ্নপা একজন বড় লেখক ছিলেন। তাঁর লেখা অপভ্রংশ ভাষার একখানা দোহা-কোষ আছে আর তার তেরোটি বৌদ্ধ গান 'আশ্চর্যচর্য্যাচয়' নামে পুস্তকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বইখানা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে সংগ্রহ-পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। এই তেরোটি গানের মধ্যে একটি গানের পাতা নষ্ট হয়েছে। বাকি বারোটি গানের ভাষা আলোচনা ক'রে বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন যে, সেগুলি পুরানো বাংলায় লেখা বটে। তার মধ্যে একটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"সুণ বাহ তথতা পহারী
মোহভণ্ডার লুই সঅলা অহারী।
ঘুমই ণ চেবই সপর বিভাগা
সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা।
চেঅণ ণ বেঅণ ভর নিদ গেলা
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা।
স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সুণ
ঘোরিঅ অবণা গমণ বিহুন।
শাখি করিব জালন্ধরি পাএ
পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাএ।"

এই গানে "দেখিল" "করিব" আধুনিক বাংলার সঙ্গে এক। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে একে প্রাচীন বাংলা বলতেই হইবে। এই গানে আর একটা খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, জালন্ধরীপা কানুপার গুরু ছিলেন। জালন্ধরীর অন্য নাম যে হাড়ীপা তা আমরা নাথদের বাংলা বই থেকে জানতে পারি। এখন মীননাথ আর কানুপার সময় সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলি। মীননাথের নাম 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' নামে যে পুঁথিখানিতে পাওয়া যায়, তা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে অনুমান ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে। মীননাথ এর বহুদিন আগেকার স্বীকার করতেই হবে, কেন না তিনি এই পুঁথিখানিতে রক্ত-মাংসের মানুষ থেকে একেবারে দেবতার কাছাকাছি বা দেবতা হয়ে গেছেন।

অভিনব গুপ্ত তাঁর তন্ত্রালোকে "মচ্ছন্দবিভু" ব'লে এই মৎস্যেন্দ্রনাথের উল্লেখ করেছেন। এখানে মৎস্যেন্দ্রনাথ শিবের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। অভিনব গুপ্তের সময় অনুমান ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ। কাজেই মীননাথ এর বহু বহু আগেকার লোক।

একটা নিশ্চিত প্রমাণ ফরাসী দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত সিল্‌ভাঁ লেভি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Le Nepal-এ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্র-দেবের রাজত্ব সময়ে মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালে এসেছিলেন। এই সময় নিরূপণ যে সঙ্গত, তা অন্য দিক থেকেও প্রমাণ করা যেতে পারে। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ। গোরক্ষনাথের শিষ্য পদ্মবজ্রসরোরুহ। ইহারই নামান্তর পদ্মসম্ভব। উড্ডানের রাজা ইন্দ্রভূতি এই পদ্মসম্ভবের পালক পিতা এবং শিষ্য ছিলেন। জার্মান পণ্ডিত শ্লাগিণ্টভাইট (Schlagintweit) স্থির করেছেন যে, পদ্মসম্ভব ৭২১।২২ খ্রীঃ জন্মেছিলেন। কাজেই মীননাথের সময় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝেই হবে। এত প্রাচীন ব'লেই তাঁর রচিত উদ্ধৃত শ্লোকটি এমন দুর্বোধ্য ব'লে মনে হয়।

কানুপার সময় এখন বিচার করা যাক, কানুপার লেখা একখানি বই "শ্রীহেবজ্রপঞ্জিকাযোগরত্নমালা" কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। এই পুঁথিখানি লিপি করেছিলেন কায়স্থ গয়াকর গোবিন্দপাল দেবের রাজত্বকালের উনচল্লিশ বৎসরে ভাদ্র মাসের ১৪ই তারিখে। এতে বইয়ের লেখার তারিখ ১২০০ খ্রীঃ হচ্ছে। কাজেই কানুপা এর আগেই বর্তমান ছিলেন মানতে হবে। অন্য প্রমাণ থেকে আমরা আর একটু সঠিক তারিখ পেতে পারি। "আমরা

দেখেছি কানুপার গুরু জালন্ধরি। জালন্ধরির গুরু ছিলেন ইন্দ্রভূতি, যাঁর নাম আগে করেছি। এতে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে আমরা কানুপার সময় ফেলতে পারি।

গোড়াতেই বলেছি মীননাথ সহজ মতের আদি প্রচারক। সহজ সম্বন্ধে কানুপা বলেছেন—

"ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জায় বাকপথাতীত কাহিব কীস।
কাঅবাকচিঅ জসু ণ সমায়। জে তই বোলি তে তবি টাল
আলে গুরু উএসই সীস গুরু বোব সে সীসা কাল।"

অর্থাৎ বল কেমনে সহজ বলা যায়, যাতে কায়বাকচিত্ত প্রবেশ করতে পারে না। গুরু শিষ্যকে বৃথা উপদেশ দেন। বাকপথাতীতকে কেমনে বলবে। যতই তিনি বলেন সে সবই ছলনা, গুরু বোবা সে শিষ্য কালা। কাজেই এই সহজ তত্ত্ব জানতে গেলে গুরুর পাদপ্রসাদ চাই। তবে আমরা পাঁজি-পুঁথি থেকে যতটুকু বুঝেছি; সহজসিদ্ধির মত এই যে (১) মন্ত্রতন্ত্র, বেদপুরাণ পূজা অর্চনার কোনই প্রয়োজন নাই। (২) নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ ক'রে মনকে একেবারে চিন্তাশূন্য ক'রে শূন্যময় হয়ে যেতে হবে। এই শূন্যই এঁদের মতে একমাত্র তত্ত্ব। জগৎ সংসারে এই শূন্য থেকেই জন্মে, শূন্যেই লয় হচ্ছে। (৩) ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হবে। (৪) সন্ন্যাসের কোনও প্রয়োজন নাই। ভোগের মধ্য দিয়েই সাধনা করতে হবে। (৫) সহজসিদ্ধির চূড়ান্ত হ'লে আটটি সিদ্ধি লাভ হয়। সাধনমালার এক জায়গায় এই আটটি সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে। খড়্গাঞ্জনপাদ লেপান্তর্দ্ধান রস রসায়ন খেচর ভূচর পাতাল সিদ্ধি প্রমুখাঃ সিদ্ধীঃ সাধয়েৎ।

এর মানে হ'ল (১) সিদ্ধি হ'লে এমন খড়্গ পাওয়া যায় যা ঘোরালে শত্রুদের মাথা কেটে অমনই প'ড়ে যাবে। (২) এমন অঞ্জন করবার শক্তি হবে যা চোখে দিলে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে বা আছে সব দেখা যাবে। (৩) এমন জুতা পাওয়া যাবে, যাহা পরলে নিমেষ মধ্যে সব জায়গায় যাওয়া যাবে। (৪) অদৃশ্য হবার ক্ষমতা হবে। (৫) এমন রসায়ন তৈরি করতে পারবে যা খেলে কেউ কখনও বুড়ো হবে না, মরবে না। (৬) পাখীর মত আকাশে ওড়বার ক্ষমতা হবে। (৭) পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্র সব জায়গায় চলেফিরে বেড়ানোর ক্ষমতা হবে। (৮) এমন কি পাতালে পর্য্যন্ত যাওয়ার শক্তি হবে। যাঁরা এ সিদ্ধিলাভ করেন তাঁদের বলা হয় সিদ্ধ বা মহাসিদ্ধ। এঁরাই বাংলার নাথদের বইয়ে 'সিদ্ধা' বলে পরিচিত।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

শেষ কথা

লাট ভরতপুর, পরগণে পূর্ব্বচক, সম্পত্তিটা খুব বড় সম্পত্তি। সবাই বলে সোনার সম্পত্তি। গাছের পাতা কুলোর মত, ডাল ঢেঁকির মত; যথা হরিচন্দনের মত মোলায়েম মাটি—গায়ে মাখলে গা জুড়িয়ে যায়, ফসলের বীজ পড়বার অপেক্ষা—দেখতে দেখতে ফসলে ভরে যায় মাঠ; তা ছাড়া ভরতপুরে না পাওয়া যায় কি? সোনার সম্পত্তি কথাটাও কথার কথা নয়। আগে লোকে নদীর বালি থেকে সোনার দানা বের করত। মাটির তলায় সত্যিই সোনা আছে। প্রজারা সব বেকুবের দল। চাষ ক'রে খায়, খায় খেয়ে হাসে, বলে, তুমি কি আমার পর? তারপর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে—হাতে লাগে নি তো মারতে গিয়ে। পরনে ঠেঁটি কাপড়, কপালে তিলক-ফোঁটা গলায় তুলসী মালার কণ্ঠী, কালো রঙ। এ থেকেই বেকুবত্ব প্রমাণ হয়ে যায়। চাষ ক'রে খায়—চাষীর দল সব। জমিদার পক্ষ বলে চাষা। আগে খেতো-দেতো, চাষ করতো, তামাক টানতো, পূজো-অর্চ্চনা করতো, ঘুমুতো। এখন আর সে কাল নেই, কলি বোধ হয় চার পো পুরো হয়ে উঠছে, তারই ফলে আজকাল আধপেটা খায়, রোগে হাঁপায়, কোন রকমে চাষ করে, ভগবানকে কেউ ডাকে—কেউ ডাকে না, অর্থাৎ কেউ কাঁদে—কেউ বসে বসে দাঁত খিঁচোয়।

পদ্মাপারের সাউ মশায়েরা এখন ভরতপুরের জমিদার। আগে ছিল, মঙ্গল-কোটের মিঞাদের জমিদারী। সাউ মশায়েরা তখন এখানে ব্যবসা করতে এসেছিলেন। মিঞাদের ঘরোয়া ঝগড়া বাধলে, একপক্ষ সাউদের কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। ধার সহস্র ধারায় যখন বাড়ে তখন কি আর রক্ষা থাকে? তার ওপর এই যে চাষী প্রজাগুলিদের মাতব্বর—তারাও সেকালে মামলায় প্রায় সবাই সাক্ষী দিয়েছিল—এই সাউদের তরফে।

যাক ওসব কথা। তবে এখন ওরা নিজের গালে—; ও কথাও যাক, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নাই। বিস্তারিত বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। একেবারে হালের কথাই ভাল। পদ্মাপারের সাউ মশায়েরা এখন জমিদার। গাঁয়ে গাঁয়ে কাছারী, কাছারীতে কাছারীতে নায়েব, বড় কাছারীতে বড় নায়েব; এ ছাড়া পদ্মাপার নিজের দেশ থেকে আমদানী করা পাইকের দল এনে পাকা-পোক্ত বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন সাউ মহাশয়েরা। এ ছাড়াও সাউ মশায়দের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অনেকে এসে বহু দোকানপানী খুলে কলাও ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। অনেক কলকারখানাও বসিয়েছেন; এখানকার অনেক লোক আজকাল কলেও খাটে। এই সব লোকেরাও কেউ বা দাঁত খিঁচোয়—কেউ বা কাঁদে। তা

কাঁচুক আর গাড়ই খিঁচোক—দিন চলছিল ভালোয় মন্দতে। জমিদারের কর্মচারীদের সঙ্গে গাছের মালিকানী নিয়ে ঝগড়া করে, জমির স্বত্ব নিয়ে আপত্তি জানিয়ে, পাইকদের খোরাকী রোজ প্রভৃতি নিয়ে 'না—না' ক'রে, সাউ দোকানদারদের সঙ্গে নুনের দর, তেলের দর, কাপড়ের দর নিয়ে বাকচাতুরী ক'রে, কলকারখানার মজুরী নিয়ে বিসম্বাদ করে নানা টক-ঝকের মধ্যে দিয়ে দিন চলছিল একরকম ক'রে। ঘানির চারপাশের চোখ-ঢাকা বলদের শিঙ নেড়ে পাক খাওয়ার মত সবই চলছিল। তেলও বের হচ্ছিল—সে নিচ্ছিলো কলু, আর খোলও হচ্ছিল—তা খাচ্ছিল বলদে।

হঠাৎ ভূমিকম্পে নড়ে ওঠার মত সব নড়ে উঠল। ভয়ানক কাণ্ড বেধে গেল। সাউ জমিদার মশায়দের সঙ্গে হলদীবাড়ীর 'সাঁই' জমিদারদের সীমানা নিয়ে ফৌজদারী বেধে গেল। বেমক্কা ফৌজদারী, বলা নাই, কওয়া নাই, নোটিশ নাই, পত্র নাই, সাঁই বাবুদের পাইকদের দল হঠাৎ বন বাদাড় ভেঙে লাঠি-সোঁটা সড়কী বল্লম নিয়ে ভরতপুরের পাশের লাট—লাট ধর্মপুরে চড়াও হল। কাছারীতে ঢুকে—মারধর খুনজখম ক'রে দখল ক'রে নিলে সব। সাউ বাবুদের দল এসে ভরতপুরের কাছারীতে ঢুকল। শুধু তাই নয় সাঁইদের লোকজনদের ব্যাপার দেখে ভরতপুর সম্বন্ধেও চিন্তার কারণ ঘটে গেল। লাঠি-সোঁটায় তেল মাখিয়ে তলোয়ারে শান দিয়ে এমন তোড়জোড় আরম্ভ করলে যে, ভরতপুর ঢুকেও যে তারা শেষ পর্যন্ত একটা হাঙ্গামা বাধাতে পারে—এতে আর কারও সন্দেহ রইল না। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ভরতপুরের কাছারীতে কাছারীতে সাজ সাজ রব উঠল।

চাষীর দল সব চমকে উঠল। দুই লড়ায়ে ষাঁড়ের পায়ের তলায় উলুঘাসের মত দশা তাদের। তারা সব চঞ্চল হয়ে উঠল।

বুড়ো লালমোহন পাণ্ডে ভরতপুরের চাষীদের চাঁই। খাটো ক'রে চুল ছাঁটা, দাঁতগুলি সব পড়ে গেছে, আস্তে আস্তে কথা বলে, মিষ্টি মিষ্টি হাসে, বুড়ো ভাবনায় মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

দলে দলে ভরতপুর লাটের লোকেরা এসে বুড়োকে ঘিরে বসল।

সসম্মানে হাত জোড় করে বুড়ো ফোকলা দাঁতে—মায়ের কোলের শিশুরা যে হাসি হাসে আপনার বাপখুড়ো ভাইবোনদের দেখে—সেই হাসি হেসে বললে, আসুন পঞ্চ।

সকলে ব'সে গেল। তারপর বললে শুধু একটি কথা—কর্তা? ওই একটি কথাতেই সব ওদের বলা হয়ে গেল। কর্তাও সব বুঝে নিলে।

বুড়োর সুখেও হাসি, দুখেও হাসি, ভাবনাতেও হাসি, বুড়ো ভাবতে ভাবতে হাসতে লাগল।

গৌরপুরের একজনা বললে, সাঁইবাবুরা আমাদের জমির মালিকানী মানছে নাই, আমরা কেনে ছাড়ব সুবিধে। সাঁইয়েরাও জমিদার, সাঁইয়েরাও জমিদার, তা সাঁইয়েরা যদি আমাদের জমির মালিকানী মানে তবে উয়াদের হয়েই সাক্ষী দাওনা কত্তা?

বুড়ো ঘাড় নাড়তে লাগল, উঁ—হু। পাপ হবে।

একজনা বললে, তবে আমরাও জুটে পুটে লাগাই ফৌজদারী, এস।

বুড়ো ঘাড় নাড়লে—উঁ—হু।

কেনে, ভয় লাগছে, না কি? ছোকরা রুখে উঠল।

বুড়ো হাসলে। সে হাসির সামনে ছোকরা এতটুকু হয়ে গেল। বুড়ো হেসে বললে, ভয় নয় রে ভাই, পাপ হবে।

তবে? তবে কি করবে বল? কিসে পাপ হয় না তাই বল?

হুঁ। দাঁড়া রে ভাই। মনকে শুধাই। মন শুধাক ভগবানকে। তবে তো!

রতনলাল বললে, যা হয়, চটপট ঠিক ক'রে ফেল কত্তা। তুমি যা বলবে, তাই করব আমি।

বুড়ো হাসলে। রতনের ওপর তার অনেক ভরসা। ভারী ভাল ছোকরা। আর তেমনি কি সাহস!

ঠুক-ঠুক ক'রে বুড়ো কাছারীতে এসে উঠল, রাম-রাম গো নায়েব মশায়!

কে, লালমোহন? এস, এস।

হ্যাঁ, এলাম একবার।

এলাম টেলাম নয়। লেগে যাও, সব কোমর বেঁধে লেগে যাও একবার। সাঁই-বেটাদের একবার মেরে বেচপাট ক'রে দিতে হবে। একধার থেকে কেটে ফেলতে হবে।

বুড়ো হাসলে। কি যে বলেন নায়েব মশায়?

কেন?

ওই! কেটে ফেলালে রক্ত পড়বে যে গো। মরে যাবে যে লোকগুলান! পাপ হবে যে! বুড়োর চোখ দিয়ে জল পড়িতে লাগল।

নায়েবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ'লে গেল বুড়োর এই ভণ্ডামী দেখে। তবুও লোকটা খাতিরের লোক, তাই রাগ ক'রেও ভদ্রভাবে বললে, হুঁ।

বুঝেছি। ওদের রক্ত দেখে তোমাদের চোখে জল আসছে! বুঝতে পারছি সব! ব'লে খস খস ক'রে কয়েক ছত্র লিখে আবার বললে; আর আমাদের পাইকদের যে খুন জখম করেছে, রক্তে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে! তার বেলায়—

বুড়োর ঠোঁট থর থর করে কাঁপতে লাগল, চোখের জল দ্বিগুণ হয়ে গেল, হে ভগবান! সে কথা শুনে ইস্তক কাঁদছি নায়েববাবু, আঃ—হায়, হায়, হায়! কত লাগল তাদের ভাবেন দেখি? সে চোটগুলান, মনে হয় আমারই বুকে পড়ল গো!

নায়েব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। লোকটা ভণ্ড-পাষণ্ড, না সত্যিই সাধু? ভেড়ার শিঙে ধাক্কা লাগলে নাকি হীরের ধারও ভেঙে যায়, ঠিক তেমনি নায়েবের ইস্পাতের ক্ষুরের পাক দেওয়া শক্ত ধারালো বুদ্ধিও বুড়োর ভোঁতা বুদ্ধির ঘরের দরজায় ঠিক গর্ত্ত করতে পারছে না। অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে নায়েব বললে, তা হ'লে? তা হ'লে কি করতে হবে শুনি?

তাই তো বুলছি গো আপনকাকে। চোখের জলের মধ্যেই আবার বুড়োর হাসি ফুটে উঠল।

কি বলছ?

বুলছি। আমাদের জমির মালিকানীটি মেনে লাও, তুমরা সব পাইক বরকন্দাজ নিয়ে তফাত হয়ে থাক, সেখ সাঁইদের আমরা রুখে দি।

রুখে দেবে? ফৌজদারীর কি বোঝ তোমরা? চাষ কর, খাও। লাঠি ধরতে জান? সড়কী চালাতে জান?

বুড়ো হাসলে।

হাসছ যে?

আপনকার কথা শুনে হাসছি গো! আমরা লাঠী সড়কী ধরবই নাই যে।

তা হ'লে কি ক'রে রুখবে?

উয়ারা আসবে, আমরা পিঠ পেতে দাঁড়াব, লাও, মার লাঠি। বুক পেতে দিব, চালাও সড়কী। আমাদের রক্ত পড়বে, মাটি লাল হয়ে যাবে, আমরা মরব। তখন উয়াদের আক্কেল হবে, বুকগুলান টন টন করবে—চোখে জল আসবে। ভগবান জ্ঞান দিবে। উয়ারা লাজ মেনে ফিরে যাবে।

নায়েব হা-হা ক'রে হেসে উঠল, এই তোমার বুদ্ধি?

বুড়ো কিন্তু আশ্চর্য্য। সে এতটুকু অপ্রতিভ হ'ল না। তারও দন্তহীন মুখে সেই আশ্চর্য্য ছেলে-মানুষী হাসি ফুটে উঠল। হয় গো হয়। আমার মন

শুধালে যে ভগবানকে। ভগবান যে বুলছে গো! আপনকাদের মন যে ভগবানকে কিছু শুধায় না গো! না হলি বুঝতি পারছে আমার কথা।

যেমন দেবা তেমনি দেবী; বুড়োর বুড়ীটি ঠিক ক্যাপার ক্ষেপীর মত।

সমস্ত শুনে সে ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ল। চিন্তাটা তার বুড়োর মতই, সাউ নায়েবের জন্যে চিন্তা। এ তো সহজ কথা, সোজা কথা। উয়ারা কেনে বুঝতে লারছে? হ্যাঁ গো বুড়া?

সেই তো গো বুড়ী।

তবে কি হবে? কি করবে তুমি?

আমি? অনেক ভেবে বুড়া হাসলে, হাঁ, হয়েছে। ঠিক হয়েছে।

কি?

আমি মরব।

মরবে?

হ্যাঁ, আমি মরব। আমি যদি মরি তবে তখন উয়ারা মনে দুখ পাবে। ভগবান জ্ঞান দিবে! তখুন আমাদের কথা ঠিক উয়াদের সমঝে আসবে।

বুড়ী কিছুক্ষণ ভাবলে। ভেবে সে খুসী হয়ে উঠল। হেসে বার বার ঘাড় নেড়ে বললে, হাঁ, ঠিক বুলেছ তুমি!

বুলি নাই? হেসে বুড়ো বুড়ীর দিকে তাকালে।

হাঁ। তাই কর তুমি। মর। ম'রে উয়াদিগে বুঝায়ে দাও।

বাইরে থেকে ডাকলে রতনলাল, কর্তা।

বেটা! আয় রে বেটা আয়। লালমোহনের মুখ হাসিতে ভ'রে উঠল।

রতনলাল এসে দাঁড়ালে হাসিমুখে। বললে, সব এসে দাঁড়িয়ে আছে কর্তা। কি হ'ল, কি করব তাই বল। রতন যেন আগুনের শিখার মত জ্বলছে।

বুড়ো বাইরে এসে জোড়হাত ক'রে বললে, নমো পঞ্চ।

তার আগেই কিন্তু একটা গণ্ডগোল ঘটে গেল। সাউবাবুদের পাইক বরকন্দাজ এসে সব ঘিরে দাঁড়াল। সাউবাবুদের সদর নায়েব চারু শীল, দিয়েল নায়েব। সে কারুর তোয়াক্কা রাখে না, সে এখানকার নায়েবকে হুকুম পাঠিয়েছে পাগলাটাকে পাকড়ে আটকে রাখ। শুধু পাগলা নয় রতনলাল-টতনলাল চেলাচামুণ্ডা তামাম আদমী আটক করো। বিলকুল।

বুড়ো হেসে বললে, চলো। রতনলাল প্রভৃতি চেলাদের দিকেও চেয়ে বললে, চলো বেটালোক।

বুড়ী একগাল হেসে এগিয়ে এসে বললে, আমি ?

সাউবাবুদের লোক বললে, হাঁ হাঁ, সে হুকুমও আছে।

বুড়ী বললে, দাঁড়া বাবা, জেবাসে সবুর করো বেটা ; বুড়ার কৌপীন, আমার কাপড় আর সেই লোটাটা নিয়ে নি। ওই লোটাটাতে জল না খেলে আমার তিয়াস মেটে না।

বুড়া হেসে ঘাড় নাড়ে, হাজার হ'লেও মেয়েলোক কিনা! লোটার মায়া ছাড়তে পারে না!

সাউবাবুরা বুড়াকে আটক করলেও খুব যত্ন ক'রেই রাখলে। সে দিক দিয়ে তারা এতটুকু কসুর রাখলে না। বুড়ো কিন্তু সেই বুড়ো, আটকের মধ্যে থেকেও হাসে ; ভগবানকে ডাকে, আর ভাবে। মনে মনে বলে, ভগবান আমার মনকে বুলে দাও কি করব ? মরব ? আমি মরলে উয়ারা সুখ পাবে ? তুমি উয়াদিকে জ্ঞান দিবে ?

বুড়ী আটকের মধ্যেই ঘুরঘুর ক'রে ঘুরে বেড়ায়, বুড়ার খাবারটি করে, বিছানা মানে কম্বলটি ঝাড়ে, লোটাটি ঝকঝকে ক'রে রাখে। ওর যেন এ অবস্থাটা খানিকটা ভালই লাগে। বুড়াকে অনেকটা কাছে পেয়েছে। বাইরে তো বুড়ার হাজার কাজ, এক লহমার ফুরসৎ হয় না দুটো কথা বলবার, ঘরোয়া কথা বলবার। সব কথাই তার ভরতপুরের কথা, নয়তো মানুষের কথা। আজ এখান, কাল সেখান, এ আসছে, সে আসছে, লোকজনেই বুড়াকে ঘিরে রেখে দেয়। এখানে বুড়ার অনেকটা কাছে আসতে পেয়েছে সে। কিন্তু কয়েক দিন পরেই বুড়ীর ভুল ভেঙে গেল। বুড়া সেই বুড়া। লোকের ভিড় নাই, কিন্তু বুড়ার মাথার ভাবনার ভিড় এতটুকু কমে নাই। লোকে বাইরে বলতো বুড়াটি পাথর। বুড়ীর মনে হয় কথাটি মিথ্যা নয়।

সে বলে, বুড়া!

উঁ। বুড়া তার দিকে তাকায়, বুড়ীর মনে হয় বুড়া তার দিকে চেয়ে নাই, চেয়ে আছে ওই—ওই কোন দিকদিগন্তরে, অনেক দূরে, সেই পাহাড়ের মাথায় আছে যে ঠাকুরের মন্দির, সেই মন্দিরের চূড়ার দিকে।

কি ভাবছ ?

ভাবছি—। বুড়া হাসে।

হেসো না বুড়া, এ হাসিটি তোমার ভাল লাগছে নাই আমার।

হুঁ। ছোট্ট একটি হুঁ ব'লে বুড়া চুপ ক'রে যায়।

ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় বুড়ী, সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলে, ভগবান বুড়াকে বাঁচিয়ে-রাখ। না হ'লে এত ভাবনা ভাববে কে ?

হঠাৎ একদিন বুড়া বললে, আমি মরব।

বুড়ীর বুকটা যেন ফেটে যাবার উপক্রম হ'ল, কিন্তু সে কথা তো মুখ ফুটে বলবার উপায় নাই। বুড়া তা হ'লে এমন হাসি হেসে শুধু বলবে, ছি! তাতেই বুড়ী মরমে ম'রে যাবে। সে শুধু বললে, কেনে বুড়া ? মরবে কেনে ?

মরব, সাহাবাবুরা বলছে, আমি বাইরের লোকগুলিকে বলে এসেছিলাম, ফৌজদারী দাঙ্গা করতে। বাইরের লোকগুলির সঙ্গে বাবুদের পাইকের মারপিঠ হয়ে গিয়েছে। আমাদের লোকগুলি উদিকে মেরেছে, অনেক ক্ষেতি করেছে। বাবুরা বলছে ই সব আমার শিক্ষা।

রতনলাল বললে, তার লেগে তো কর্ত্তা, বাবুদের পাইকরা লোকদেরও খুব মার দিয়েছে !

বুড়া ঘাড় নেড়ে হাসলে। বললে, শুধু তাই লয় রতন। আমাদের লোকেরা মারলে যখন, তখন লোকেদের পাপ হ'ল। আমি মরি, ম'রে ভগবানকে বলব, ভগবান, তুমি পাপটি ক্ষমা কর, শুধু আমাদের পাপ লয়, ওই পাইকদের পাপও ক্ষমা কর। আর—

আর কি কর্ত্তা ?

বুড়া হাসলে।—তবে তো উয়ারা বুঝবে, আমি পাপী লই।

বুড়া মরণ-পণ ক'রে বসে। খায় না, লায় না, চুপ ক'রে প'ড়ে থাকে।

বুড়ীর কথাবার্ত্তা সব ফুরিয়ে গিয়েছে যেন, সে চুপ ক'রে ব'সে চেয়ে থাকে। হায়, বুড়া তার হারিয়ে গেল। তার দিকে একবার ফিরে চাইবারও ফুরসৎ নাই ! কান্না লজ্জা ; বুড়ীর কাঁদবারও উপায় নাই।

আটকখানার বাইরে হৈ-চৈ ওঠে। ভগবান আমাদের কর্ত্তাকে বাঁচিয়ে দাও।

রতনলাল আর সব চেলারা যেন উদাস হয়ে গিয়েছে।

বুড়ী আর থাকতে পারে না। সে বুড়াকে কিছু বলতে সাহস করে না। সে ভগবানকে মনে মনে ডাকে, বলে, বুড়াকে বাঁচাও দেবতা। এতগুলি

লোকের মুখের দিকে চাও। আমার মুখের দিকে চাও। বুড়ীর মনে হয় খুড়ার চেয়ে ভগবানেরও মন নরম।

বুড়ীর মনে হয় ভগবান যেন হাসছেন।

বুড়া সত্যিই মরে না। মরণের সব লক্ষণই হয়েছিল, সাউবাবুরা বড় বদ্যিও পাঠিয়েছিল, তারাও বলেছিল, আমাদের অসাধ্য। না-খেলে মানুষ বাঁচে না। বাঁচতে পারে না। তবু বুড়ো বাঁচে। আশ্চর্য্য বুড়ো, সব সময়ের মধ্যে একটিবারও তার মুখের সেই খোকার ঠোঁটের হাসির মত হাসি মিলিয়ে যায় নি। ধীরে ধীরে সব মরণ-লক্ষণ মিলিয়ে গেল, চোখের ঘোলা রঙ ঘুচে গিয়ে সাদা পদ্মের পাপড়ির আভা ফুটে উঠল। মুখের রঙে ফুটে উঠল মায়ের কোলের ছেলের মুখের মত স্বচ্ছকে রেশ। বুড়ো বললে, আমি বাঁচলম। ভগবান আমার মনকে বুললে, তোর পাপ নাই।

বুড়ীর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে বললে, বুড়া আমি এইবার মরব।

কেনে?

আমার শরীর খারাপ লাগছে। আর—

আর কি?

বুড়ী কিন্তু কিছুতেই সে কথা বললে না। শুধু হাসলে।

বুড়ী সত্যাই মারা গেল। জ্বর হ'ল সামান্য। সেই জ্বরেই মারা গেল। মরবার সময় একদৃষ্টে সে চেয়েছিল বুড়ার মুখের দিকে।

পাথরের বুড়া। লোকে মিথ্যে বলে না।

হঠাৎ বুড়ীর মনে হ'ল, লোকের কথা মিথ্যে, মিথ্যে; সত্যি নয়, সত্যি নয়। বুড়ার চোখে জল। হাঁ হাঁ, বুড়ার চোখে জল!

সে বললে, বুড়া!

চোখে জল টলমল করছিল, তবুও বুড়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বুড়া বললে, বল বুড়ী, কি বুলছ বল?

মরণ ভারী সুন্দর গো বুড়া, মরণ ভারী সুন্দর!

বুড়া হাসতে লাগল, চোখের জল টপটপ্ ক'রে ঝ'রে পড়ল, ঝ'রে পড়ল বুড়ীর কপালের ওপর। বুড়া মুছিয়ে দিতে গেল সে জল। বুড়ী বললে, না থাক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বদেশী আন্দোলনের কিছু আগে টহলরাম গঙ্গারাম নামে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক কলকাতায় এসে খুব হৈ-চৈ লাগিয়েছিলেন। ইনি বিডন উদ্যানে প্রত্যহ বিকেলে ইংরেজীতে বক্তৃতা করতেন। ইংরেজ জাত এবং ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট কার্জনের নিত্য বাপান্ত করতেন। তখনকার দিনের ইংরেজ গবর্ণেন্ট কি হজমিগুলি খেয়ে যে সে সব নিছক গালাগালি বরদাস্ত করত, তা গবেষণার বিষয়। এজন্য সে সময় অনেকে টহলরামকে ইংরেজের গুপ্তচর বলত। যা হোক, আমি, অস্থির ও বিশেষ ক'রে আমাদের বন্ধু প্রভাত টহলরামের এক নম্বরের চেলা হয়ে পড়লুম।

টহলরাম ইংরিজীতে একটা গান লিখেছিল, তার প্রথম স্ট্যাঞ্জাটা মনে আছে—

God save our ancient Ind
Ancient Ind once glorious Ind
From Sagar island to the Sind
From Himalaya to Cape Comorin
May perfect peace ever reign therein.

প্রতিদিন বিডন উদ্যানে বেলা চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা অবধি টহলরাম ইংরেজ জাতকে খিস্তি করত। তারপরে দিশী সুরে এই ইংরেজী গানটি গাওয়া হ'ত। পরে এই গান গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা ক'রে পথে পথে ঘুরে শঙ্কর ঘোষের লেনে টহলরামের বাড়িতে এসে আমাদের নিজস্ব সভা বসত।

পড়াশুনার সঙ্গে মনোমালিন্য তো ছিলই, দেশোদ্ধারের হাওয়া লেগে তার সঙ্গে একদম বিচ্ছেদই হয়ে গেল।

এই সময় আবার লাগল রুশে জাপানে যুদ্ধ। তখনকার দিনে আমরা জাপানকে পরম বন্ধু ব'লে জানতুম। এর মূলে ছিল কয়েকটি কারণ। প্রথম কারণ হচ্ছে, ইংরেজরা মনে করত যে, ভারতবর্ষের ওপরে রুশের নজর আছে। রুশকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে আফগানিস্তানকে তারা বহুদিন অবধি টাকা যুগিয়েছে। এইজন্যে ভারতবাসীরা মনে

করত, জাপানের প্রতি ইংরেজ সহানুভূতিসম্পন্ন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে, সে সময়ে বাঙালী ছেলেদের বিদেশ থেকে নানা বিদ্যা শিখে এসে দেশকে উন্নত করবার একটা বিরাট অনুপ্রেরণা এসেছিল। ইংলণ্ডের চাইতে জাপানে থেকে লেখাপড়া শিখতে খরচ কম ছিল, ওদিকে আবার কালাপানি পার হয়ে জাত যাবার ভয়টাও ছিল ব'লে মাঝামাঝি একটা রফা ক'রে অনেকেই জাপানে যেত।

রুশ-জাপানে যুদ্ধ লাগতেই কলকাতায় জাপানকে সাহায্য করবার জন্যে নানা অনুষ্ঠান হতে লাগল। থিয়েটার, ম্যাজিক প্রভৃতি দেখিয়ে জাপানের নামে টাকা তোলা হতে থাকল। সে সব টাকা জাপান অবধি পৌঁছত, না রাস্তাতেই টর্পেডোর আঘাতে জাহাজডুবি হ'ত, তা জানি না। মনে পড়ে, সেই হুল্লোড়ে অনেক ছেলেই মেতেছিল, আমরাও কিছু মেতেছিলুম।

এর পরেই এল স্বদেশীর প্লাবন। সেই প্লাবনে আমরা একেবারে গা ভাসিয়ে দিলুম। প্রতিজ্ঞা করা হ'ল—দেশের সেবা করব, ইংরেজের চাকরি করব না, হাইকোর্টের জজিয়তি পেলেও নয়।

দেশের সেবা কতখানি করেছি তা জানি না, তবে হাইকোর্টের জজিয়তি কখনও করি নি। প্রতিজ্ঞা অটুট আছে, কারণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবার অবসরই ইংরেজ গবর্মেণ্ট কোনও দিন আমাকে দিলে না।

গোষ্ঠদিদি নতুন আবহাওয়ার মধ্যে প'ড়ে নিজেকে দিব্যি মানিয়ে নিলে। তার হাতে বেশ কিছু টাকা ও গয়নাপত্র ছিল, যা দিয়ে সারা-জীবন সে ভালভাবেই কাটাতে পারত। শৈলীদের বাড়িতে আরও যে সব ভাড়াটে থাকত, তারা সকলেই ব্রাহ্মণেতর জাত। তারা সকলেই তাকে বামুনদিদি ব'লে খুব খাতির করত। আমরা প্রতিদিন অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যেও তার কাছে গিয়ে তদারক ক'রে আসতুম। মধ্যে মধ্যে সেও আমাদের বাড়িতে এসে একদিন দুদিন থাকত, এই দিনগুলো যে কি ভালই লাগত!

মানুষের দেহে রোগের বীজাণু প্রবেশ করা মাত্র যেমন সারা দেহের মধ্যে তাকে প্রতিরোধ করবার সাড়া প'ড়ে যায়, তেমনই মনের মধ্যে কোন বাসনা বা সঙ্কল্প জাগা মাত্র প্রকৃতির মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়,

আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে প্রতিরোধের সাড়াই জাগে। শুধু তাই নয়, প্রকৃতি মানুষকে দিয়েই তার ইচ্ছার সাফল্যের বিরুদ্ধেই কাজ করিয়ে নিতে থাকে। এই ব্যাপার আমি নিজের জীবনে বার বার প্রত্যক্ষ করেছি।

লতুকে আমি ভালবাসতুম, সেও আমাকে ভালবাসত। আমাদের সামাজিক মিলন হওয়া সম্ভব কি না, যদিবা সম্ভব হয় তা হ'লে ভবিষ্যতে আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হবার উপায় কি হবে, সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই দুজনের কারুর মনেই উদয় হয় নি। আমাদের স্থূলদৃষ্টির অন্তরালে যে বিরাট শক্তি এই দুনিয়াযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করছে, সেই এই মিলনের ঘটকালি করেছিল। আমাদের মধ্যে কখনও বিচ্ছেদ আসতে পারে অথবা কোনও শক্তি আমাদের একজনকে আর একজনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা কল্পনাতেও আমাদের মনে আসে নি।

কার্ত্তিক মাস। পূজোর ছুটির পর সবেমাত্র ইস্কুল খুলেছে, এই সময় একদিন লতুর মা আমাকে বললেন, স্থবির, শুনেছিস, সামনের অঘ্রাণে লতুর বিয়ে যে!

কোথায়?

ছেলে পশ্চিমে সরকারী কাজ করে, খুব ভাল কাজ। খুব লেখাপড়া জানে, খুব সুন্দর দেখতে। তাদের বাড়িই পশ্চিমে, লতুর উপযুক্ত বর হয়েছে।

লতু সেখানে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলুম, লতু কোথায়?

মা বললেন, সে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। বিয়ের কথা শুনে লজ্জা হয়েছে বোধ হয়।

লতুকে খুঁজে বার করলুম। তেতলার একটা ঘরের কোণে হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে সে ব'সে ছিল। আমি কাছে গিয়ে ডাকতেই সে মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে, চোখে তার এক ফোঁটা অশ্রু নেই।

আমি পাশে বসতেই আমার একখানা হাত মুঠো ক'রে ধ'রে নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে বললে; শুনেছিস?

আমি শুধু ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ। গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেরুল না।

ঠিক সেই রকম ক'রে আমরা ব'সে রইলুম। কারুর মুখে কোনও কথা নেই, কারুর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ নেই। নীচে আনন্দ-কোলাহল চলছিল, তারই আওয়াজ এক-আধটা ছুটকে এসে আমাদের কানে লাগতে লাগল। মধ্যে মধ্যে লতু আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরতে লাগল। মধ্যে মধ্যে মনে হতে লাগল, তার সর্ব্বাঙ্গ যেন থরথর ক'রে কাঁপছে।

আমাদের চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল। ঠাকুরঘরে শাঁখ-ঘণ্টা শুরু হ'ল। ঘরের মধ্যে ঝি ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে আমাদের দুজনকে ওই ভাবে ব'সে থাকতে দেখে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল।

আরও কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর আমি বললুম, লতু, চললুম।

লতু আমার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে জানালে, আচ্ছা।

টলতে টলতে বেরিয়ে চ'লে এলুম।

পরের দিন একটু তাড়াতাড়ি ওদের ওখানে গিয়ে দেখি, খুব সমারোহ শুরু হয়ে গিয়েছে। শাড়িওয়ালা এসেছে দু-তিনজন। তিন-চারজন স্যাকরা ব'সে গেছে হীরের কুচি পান্নার কুচি নিয়ে, জড়োয়া গয়নাগুলো শিগগিরই তৈরি হওয়া চাই। আর সময় নেই, অগ্রাণের মাঝামাঝি বিয়ে, কার্ত্তিক মাসের আর কটা দিন মাত্র আছে।

লতু আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, আমি এ বিয়ে কিছুতেই করব না। তুই আমায় নিয়ে পালিয়ে চল্, শিগগির ব্যবস্থা কর্।

পরদিন ভোরবেলা উঠেই গোষ্ঠদিদির কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললুম, তুমি লতুকে মাসখানেক রাখ, তারপরে আমি একটা চাকরি পেলেই তাকে নিয়ে চ'লে যাব।

গোষ্ঠদিদি কিছুতেই রাজি হ'ল না। সে বললে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে বড়লোকের মেয়ে, তাকে কোথায় এখানে এনে রাখবি? তার বাপ আমাকে তোকে দুজনকেই জেলে পুরবে।

গোষ্ঠদিদির পায়ে ধরলুম, কত কাঁদাকাটি করলুম, কিন্তু কিছুতেই সে রাজি হ'ল না।

বন্ধুবান্ধবদের জানালুম, কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারলে না। ওদিকে লতু রোজই তাড়া দিতে লাগল, কি রে, কি হ'ল?

বিয়ে করবে না ব'লে সে দিনরাত্রি কাঁদতে থাকায় তাদের বাড়িতেও মহা অশান্তি শুরু হয়ে গেল। শেষকালে লতুর মা একদিন আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, লতুকে তুই একটু বুঝিয়ে বল্, ও কি পাগলামি করছে।

লতু আমাকে বললে, তুই যদি আমাকে না নিয়ে যাস তো আমি বিষ খাব।

পাগলা সন্ন্যেসীর কথা মনে পড়তে লাগল। এই দুর্দিনে তিনি থাকলে হয়তো কিছু সুরাহা হতে পারত। রাগে ও অভিমানে গোঠদির ওখানে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলুম।

আমি ও লতু নিত্য গোপনে পরামর্শ করি, নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করি, কিন্তু সে সব উদ্ঘাতিনী পন্থায় পা বাড়াতে সাহস হয় না। অদৃষ্টচক্রকে জোর ক'রে ঘুরিয়ে দেবার যে চেষ্টা আমরা করছিলুম, তাতে সফল তো হলুমই না, বরং আস্তে আস্তে তার নীচে আমরা মাথা পেতে দিলুম। লতু বললে, অদৃষ্ট এই যে জোর ক'রে আমাদের আলাদা ক'রে দিলে, অদৃষ্টের এই আঘাত আমরা কাটিয়ে উঠবই, কিছুতেই সে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোরই থাকব, তুইও আমারই থাকবি, দেখি কোথায় গিয়ে এর শেষ হয়!

লতু ব'লে দিয়েছিল, বিয়ের দিন তুই আসিস নি, পরের দিন সকাল সকাল আসবি। আমরা এগারোটার সময় স্টেশনে যাব, বারোটায় গাড়ি ছাড়বে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় দুই ভাই সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লুম। আমার একটা সোনার বক্লস আংটি ছিল, কোথাও যেতে-টেতে হ'লে সেটা পরতুম। রাস্তায় বেরিয়ে অস্থিরের হাতে আংটিটা দিয়ে বললুম, এটা লতুকে দিস, তার বিয়ের উপহার।

অস্থির চ'লে গেল, আর আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে এলুম, অস্থির তখনও ফেরে নি।

বিছানায় শুয়ে কাঁদবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু কান্না এল না। মনের মধ্যে সে এক অদ্ভুত অস্থিরতা, অব্যক্ত অসহনীয় যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালবেলা অস্থির বললে, লতু তোকে তাড়াতাড়ি যেতে ব'লে দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে না খেয়েই ওদের ওখানে ছুটলুম। সেখানে গিয়ে দেখি, একাধারে অশ্রু ও আনন্দের ঢেউ চলেছে। কাল আসি নি ব'লে লতুর মা অনুযোগ করতে লাগলেন। কতবার সুজাতার নাম ক'রে চোখের জল ফেললেন। লতুর বরের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, এটি লতুর প্রাণের বন্ধু।

আমার চোখে জল এসে গেল। আমাকে দেখে লতুও কাঁদতে লাগল।

বর চমৎকার দেখতে। স্বভাবটিও তার ভারী মিষ্টি। আমাকে বললে, তুমি লতুর বন্ধু, তোমাকেও যেতে হবে আমাদের ওখানে।

লতু আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, চললুম, চললুম। কষ্ট হ'লেই আমার কাছে চ'লে যাবি।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় লতুরা চ'লে গেল ইষ্টিশানে। তার বাবা, ললিত ও আরও অনেকে পৌঁছে দিতে গেল।

সবাই চ'লে গেলে লতুর মা আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, স্থবির, তুই আমার বড় ছেলে, আমাকে কখনও ছেড়ে যাস নে বাবা।

লতুদের বাড়ি থেকে যখন বেরুলুম, তখন বারোটা বেজে গেছে। মাথার মধ্যে অদ্ভুত যন্ত্রণা, মনের মধ্যে কে যেন বিষম তাড়া লাগাচ্ছে—

কোথায় যাই, কোথায় যাই—

চলতে চলতে হঠাৎ দৌড়তে আরম্ভ ক'রে দিলুম। মানিকতলার খালের পোল পেরিয়ে সোজা রাস্তা ধ'রে দৌড়তে লাগলুম। আজ সে সব জায়গা শহরের মধ্যিখানে এসে গিয়েছে, কিন্তু তখন সে স্থান ছিল একেবারে পাড়াগাঁ বললেই হয়। একটা মেটে চওড়া রাস্তা, দুদিকে চওড়া পাঁক-ভরা নরদমা। তারপরে বড়লোকদের বাগান আর নয়

জঙ্গল। এই রাস্তা দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে পড়লুম একেবারে নতুন খালের ধারে; আজ যেখানে বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা হয়েছে। খালের ধারে ভজন উড়ের খেয়া-নৌকোয় আধ পয়সা দিয়ে পার হয়ে চ'লে গেলুম ওপারের বাদা-বনে।

বিশাল লবণাক্ত জলরাশি, এপার ওপার নজর চলে না। ডাঙা-জমি নেই বললেই চলে। কোন কোন স্থানে ঘন জঙ্গল, কোথাও বা একেবারে ফাঁকা, একগাছি ঘাস পর্য্যন্ত নেই। মধ্যে মধ্যে দু-একটা খেজুরগাছ গলায় হাঁড়ি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মন অবসন্ন, পা দুটো যেন আর দেহটাকে টানতে পারছিল না। কোনও রকমে টলতে টলতে একটা খেজুরগাছের নীচে গিয়ে ব'সে পড়লুম। মনের মধ্যে এক চিন্তা—লতু চ'লে গেছে, দুনিয়ায় আর কোন আকর্ষণ নেই। সমস্ত সুখ, সমস্ত দুঃখ, জীবনের সব মাধুর্য্য চ'লে গেল লতুর সঙ্গে।

কতক্ষণ সেই ভাবে ব'সে ছিলুম জানি না, হঠাৎ আমার কানের মধ্যে কি রকম ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল। মনে হতে লাগল, যেন এক্ষুনি মরে যাব।

মনকে শক্ত ক'রে বলতে লাগলুম—আসুক মৃত্যু। এস মৃত্যু। তুমি দু-দুবার আমার কাছে এসে চ'লে গিয়েছ, আজ আর তোমায় ছাড়ব না।

আমি সেই অনুভূতির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রে সেইখানেই শুয়ে পড়লুম।

হয়তো কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলুম। জ্ঞান ফিরে আসতেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলুম। তারপরে আস্তে আস্তে আবার খেয়া-নৌকোয় পার হয়ে এপারে চ'লে এলুম।

যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন বেলা প'ড়ে গিয়েছে। ছাতের ওপরে উঠে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছি, এমন সময়ে মার সঙ্গে দেখা। মা অত বেলায় পড়ন্ত রোদে চুল শুকোচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, গাছগুলোতে একটু জল দিয়ে দে তো।

মার ছিল গাছের শখ। ছাতের ওপরে প্রায় আড়াইশো তিনশো ছোট বড় টবে তিনি নানা রকমের ফুল ও ফলের গাছ করেছিলেন।

তাঁর এই ছাত-বাগানে কাবুলী কলা থেকে আঙুর পর্য্যন্ত ফলত। তিনি নিজের হাতে এই গাছগুলিকে লালন করতেন। ছাতে গঙ্গাজলের একটা বড় ট্যাঙ্ক ছিল। প্রতিদিন এই ট্যাঙ্ক থেকে নিজে জল তুলে গাছে দিতেন।

মার হুকুমমত গাছে জল দেওয়া সেরে ফেললুম। মা বললেন, আজ শরীরটা ভাল নেই বাবা। তার ওপরে সারাদিন যা হাঙ্গামা গিয়েছে, আজ আর একটু হ'লেই তোরা মাতৃহীন হতিস।

কি ব্যাপার?

তোমাদের বাবার জ্বালায় এতদিন প্রাণে বেঁচে আছি কি ক'রে তাই মাঝে মাঝে ভাবি। এই তো স্নান ক'রে উঠলুম। লতুরা চ'লে গেল বুঝি?

আজকাল যেমন কলকাতার রাস্তায় দলে দলে পাগল ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, তখনকার দিনেও পাগলের সংখ্যা এর চাইতে কম ছিল না। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের এই নতুন বাড়িতে এসে বাবার একটা নতুন খেয়াল চেপেছিল। একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন যে, কোন এক উৎসব-বাড়ির সামনে স্তূপীকৃত উচ্ছিষ্ট আবর্জ্জনার ভেতর থেকে একটা পাগল নিমন্ত্রিতদের ভুক্তাবশিষ্ট থেকে বেছে বেছে কি খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি পাগলটাকে ধ'রে বাড়িতে নিয়ে এসে তার মাথার জটা ও দাড়ি ছেঁটে স্নান করিয়ে তাকে ভদ্র ক'রে আমাদের বললেন, এঁকে তোমরা 'মামাবাবু' ব'লে ডাকবে।

রাস্তার পাগলের সঙ্গে হঠাৎ সম্পর্ক স্থাপন করতে মা ঘোরতর আপত্তি করায় সে ব্যক্তি তখুনি আমাদের 'কাকাবাবু' হয়ে গেল। সেই থেকে সে আমাদের বাড়িতেই থেকে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু এইখানেই শেষ হ'ল না। তারপর থেকে বাবা প্রায় প্রতিদিনই ছুটি তিনটি ক'রে পাগল রাস্তা থেকে ধ'রে আনতে আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে মাসখানেকের মধ্যে বাড়ি একটি ছোটখাট পাগলা-গারদে পরিণত হয়ে গেল। প্রতিদিন সকালবেলা এক খান কাপড়কাচা সাবান দিয়ে এই পাঁচ-ছটি পাগলাকে স্নান করিয়ে তিনি আপিসে যেতেন। এরা খেয়ে-দেয়ে বাইরে চরতে যেত আর সেই

সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরত। এদের অঙ্গে প্রায়ই শতছিন্ন ধুতি জামা থাকত। বাবা কোন্ জন্মে সরকারী বনবিভাগ ও তারপরে চা-বাগানে চাকরি করেছিলেন। সেই সময়কার পেন্টুলান ও অদ্ভুত অদ্ভুত সব জামা একটা কাঠের সিন্দুকে জমা ছিল। সেই সব জামা ও পেন্টুলান এতদিন পরে এই পাগলাদের অঙ্গে চড়তে লাগল।

দু-তিনজন পাগল সন্ধ্যে হ'লেই গুটিগুটি বাড়ি ফিরে আসত আর জন দুয়েক প্রায়ই ফিরত না। বাবা আপিস থেকে বাড়িতে ফিরেই তাদের খোঁজ করতেন আর তারা তখনও ফেরে নি শুনে তক্ষুনি বেরিয়ে যেতেন তাদের খোঁজে। সারা শহর ঘুরে কোনদিন ছাতাওয়ালা গলি, কোন দিন বা সার্পেনটাইন লেন থেকে তাদের আবিষ্কার ক'রে আবার বাড়িতে ফিরিয়ে আনতেন। এই ভাবে চলতে চলতে এক এক ক'রে তিনজন পাগল কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, আর তাদের খোঁজ পাওয়া গেল না।

যে দুজন পাগল আমাদের বাড়িতে থেকে গেল, তারা হাঙ্গামা কিছুই করত না, বরং এদের নিয়ে আমাদের বেশ আমোদেই দিন কাটত। এদের মধ্যে একজনের অভিনয় করবার ও গান গাইবার বাতিক ছিল। মধ্যে মধ্যে যেদিন তার ওপর নটরাজ ভর করতেন, সেদিন সে সারারাত চীৎকার করতে থাকত। আর একজনের ছিল লঙ্কা খাওয়ার বাতিক। আমরা তাকে প্রতিদিন লুকিয়ে আট-দশটা কাঁচা লঙ্কা দিতুম আর সে আমাদের সামনেই সেগুলোকে কচকচ ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেলত।

সে সময়ে আমাদের বাড়িতে অমূল্য ও বিনোদ নামে দুটি ছেলে থাকত। অমূল্যকে বাবা কোথায় একটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সে বেচারী রাত থাকতে উঠে বেরিয়ে যেত আর ফিরত বেলা বারোটায়। বিনোদ ইস্কুলে পড়ত। কি কারণে জানি না গাইয়ে ও লঙ্কাবিলাসী দুই পাগলাই অমূল্যকে দেখলেই ক্ষেপে যেত।

সে দিন, কি জানি কেন, লঙ্কাবিলাসী-পাগলা খাবার সময় আমাদের রাঁধুনীর ওপর চ'টে গিয়ে ভাতের থালা, জলের ঘটি ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিলে। গাইয়ে পাশে ব'সেই খাচ্ছিল। জুড়িদারের সাড়া পেয়ে সেও খাওয়া ছেড়ে রাঁধুনীকে দমাদ্দম মারতে আরম্ভ ক'রে

দিলে। মা কাছেই ছিলেন, তাঁর ধমক-ধামকে তারা একটু শান্ত হয়েছিল, এমন সময় অমূল্য কাজ থেকে ফিরে এল। তাকে দেখেই লজ্জাবিলাসী আরও ক্ষিপ্ত হ'য়ে মাকে বঁটি নিয়ে তাড়া করলে। অমূল্য কোন রকমে মাকে রক্ষা করলে বটে, কিন্তু তারা ভাতের হাঁড়ি আর যা কিছু খাবার ছিল সব নষ্ট ক'রে দিয়ে গেছে, মার খাওয়া পর্য্যন্ত হয় নি।

সমস্ত কাহিনীটি ব'লে মা জিজ্ঞাসা করলেন, তুই লতুদের ওখানে খেলি বুঝি?

মার প্রশ্নে মনে পড়ল, চব্বিশ ঘণ্টার ওপর আমার পেটে অন্ন পড়ে নি। তবুও বললুম, হ্যাঁ।

মা ব'লে যেতে লাগলেন, এই লোক নিয়ে আমি কি করব, সামান্য একটু বুদ্ধি নেই! পাগল ওরা, ওদের কি জ্ঞানগম্যি আছে!

মা ব'লে যেতে লাগলেন, কোনদিন কি আমার কথা শুনলেন! একবার, তখন উনি আসামের এক চা-বাগানের ম্যানেজারি করতেন। একদিন রাত-দুপুরে আর এক বাগানের ম্যানেজার এসে ওঁর কাছে কিছু টাকা ধার চাইলে। লোকটা ছিল অতি বদমাইস—আমি দু-চক্ষে দেখতে পারতুম না তাকে। উনি বাগানের টাকা ভেঙে তাকে দিলেন। আমি বারণ করাতে বললেন, বন্ধুর বিপদে সাহায্য করতে যে স্ত্রী বারণ করে, সে স্ত্রীই নয়।

শুনে আমি আর কিছু বলুলম না।

তারপরে সে আর টাকা দেয় না। রোজই তাগাদা করেন, কিন্তু কোন উচ্চবাচ্যই সে করে না। উনি রোজ সকালে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াতে যেতেন। একদিন সকালবেলা সেই রকম বেড়িয়ে ফিরে এসে উনি কি রকম করতে লাগলেন, হাত-পা এলিয়ে আসতে লাগল, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল—এখন যান তখন যান অবস্থা।

বাগানের ডাক্তার ছিল, তখুনি তাকে ডেকে পাঠালুম। সে এসে ব্যাপার দেখে আমাকে আলাদা ডেকে বললে, মা, আমার মনে হচ্ছে, উনি বিষ খেয়েছেন।

কি সর্ব্বনাশ! ছুটে গিয়ে বললুম, হ্যাঁ গা, ডাক্তার বলছে, তুমি বিষ খেয়েছ! কি দুঃখে তুমি বিষ খেলে?

তখন ওঁর কথা এড়িয়ে গেছে, চোখ প্রায় উল্টে গেছে। তবুও গেঙিয়ে গেঙিয়ে যা বললেন তাতে বোঝা গেল যে, বেড়িয়ে ফেরবার সময় বন্ধুর চা-বাগানে গিয়ে এক গ্লাস জল চাওয়ায় সে ভালবেসে বন্ধুকে এক গেলাস দুধ খেতে দিয়েছিল। বিষ-টিষ উনি কিছুই খান নি।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ওঁর কথা বন্ধ হ'য়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ডাক্তার বললে, মা, আর দেখছেন কি, হয়ে গেল যে!

কি করি! সেই জঙ্গলে এমন একটা লোক নেই যার কাছে একটা পরামর্শ পাই। ডাক্তার আমায় 'মা' বলত। তাকে বললুম, বাবা, ওদেরই খবর দাও, ওরাই তো ওঁর বন্ধু।

বন্ধুদের বাগান প্রায় পনরো মাইল দূরে। তাদের কাছে লোক ছুটল ঘোড়ায়। বন্ধু প্রায় বেলা একটার সময় এল তাদের বাগানের ডাক্তারকে নিয়ে। তখন চোখ উল্টে গেছে, হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে। তারা দেখে বললে, হয়ে গেছে।

বাগানের অন্য কর্মচারীরা ও ওঁর সেই বন্ধু, তারা সবাই মিলে আমাকে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া ঠিক করলে। শহর সেখান থেকে মাইল দশ-বারো দূরে। ঠিক হ'ল, গরুর গাড়িওয়ালা আমাকে শহরের স্টীমারঘাট অবধি পৌঁছে দেবে, তারপরে কাল সকালে আমি কলকাতায় রওনা হব। আমাদের জিনিসপত্র যা কিছু সব তারা পরে পাঠিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে তারা ওঁর দেহ সৎকার করবে—সেজন্য কোন ভাবনা নেই।

তোর দাদার তখন বছর দেড়েক বয়েস। সেই বাচ্চা কোলে নিয়ে বিকেল নাগাদ আমি গরুর গাড়িতে চ'ড়ে রওনা হলুম শহরের দিকে।

গাড়ির মধ্যে ব'সে ভাবছি আকাশ-পাতাল। কখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, রাত্রির অন্ধকার নেমেছে জঙ্গলে, তার খেয়ালই নেই। আসামের জঙ্গল, দিনেই অন্ধকার, রাতে তো কিছুই দেখা যায় না। দূরে কাছে মাঝে মাঝে জানোয়ারের ডাক শোনা যাচ্ছে। বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ে ছেলেটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে কাঁটা হয়ে ব'সে আছি। গাড়োয়ানটা ভাল্লুক তাড়াবার জন্যে থেকে থেকে বিকট চীৎকার করছে। আর কতদূর—কতক্ষণে গিয়ে শহরে পৌঁছব? সেখানে জানাশোনা

দু-একটি পরিবার থাকতেন, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে অত রাত্রে উঠব; এই সব ভাবছি এমন সময় গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করলে, আর কতদূরে যাবে?

গাড়োয়ানের প্রশ্ন শুনে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। বলে কি লোকটা!

বললুম, শহর আর কতদূর?

কোন্ শহর?

নওগাঁ।

সে তো জানি না। বাবুরা তো তোমাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে যেতে বললে। নওগাঁ তো অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। সে এখান থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল হবে।

একবার ভেবে দেখ্। তখন আমার অল্প বয়েস, কোলে একটা বছর দেড়েকের ছেলে, আসামের সেই ভীষণ জঙ্গল, রাত্রি প্রায় দুপুর।

মনে মনে ভগবানকে ডেকে বললুম, পোড়ারমুখো ভগবান, এ কি করলে আমার!

গাড়োয়ানকে বললুম, বাবা, আমাকে শহরে পৌঁছে দে। আমি বামুনের মেয়ে, তোকে আশীর্বাদ করব, তোর ভাল হবে। আমার স্বামীকে ওরা বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে, আমাকেও মেরে ফেলতে চায়—বুঝতে পারছিস না?

গাড়োয়ান বললে, মেয়েছেলেকে রাত-দুপুরে জঙ্গলে নামিয়ে দেবার কথা শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু অতটা বুঝতে পারি নি।

আমি বললুম, তুই আমায় শহরে পৌঁছে দে, আমার গায়ে যত গয়না আছে সব তোকে দোব, তুই আমার ছেলে।

আমার কান্না দেখে আর সব কথা শুনে তার মন গ'লে গেল। সে বললে, তোমার কোন ভয় নেই মা, আমি গয়না চাই না, আমি তোমায় শহরে পৌঁছে দিচ্ছি।

গাড়োয়ান যখন আমায় স্টীমারঘাটে এনে পৌঁছে দিলে, তখন সকাল হয়ে গেছে। ভাগ্যক্রমে স্টীমারঘাটেই আমাদের জানাশোনা ওখানকার একজন বড় উকিলের সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে?

আমি তাঁকে সব কথা বলাতে তিনি তক্ষুনি লোকজন, ডাক্তার ও আমাকে নিয়ে গাড়ি ক'রে ছুটলেন বাগানে। সেখানে গিয়ে দেখি, তারা ওঁকে এক জায়গায় মাটিতে শুইয়েছে—দূরে একটা চিতা তৈরি হচ্ছে পোড়াবার জন্যে। আমাদের জিনিসপত্র কিছুই নেই। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর প্রাণের বন্ধু, যাঁর জন্যে উনি স্ত্রী পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে পারেন, তিনি উধাও।

এঁদের ডাক্তার ওঁকে পরীক্ষা ক'রে বললেন, এখনও প্রাণ আছে, চেষ্টা করলে বাঁচতেও পারেন।

তখুনি ওঁকে শহরে নিয়ে আসা হ'ল। তারপরে প্রায় তিন মাস চিকিৎসার পর সেরে উঠলেন। ওই যে নীচে Shakespeare and Newton-এর স্টীল-ট্রাঙ্কটা আছে সেটা এক বছর পরে, মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছিল। ওঁর সেই প্রাণের বন্ধুটি সেই যে পলায়ন করলেন, আজও পুলিস তার সন্ধান করতে পারলে না।

কাহিনী শেষ ক'রে মা চুপ করলেন। তখনও তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। আমাদের দুজনকে ঘিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল। আমার বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর জমাট হয়েই ছিল, এই কাহিনী শুনে নিরুদ্ধ অশ্রু শতধা উৎসারিত হয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে মাকে জড়িয়ে ধ'রে বললুম, মা মা মা, আমি রয়েছি, তোমার ভয় কি?

অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে মা বললেন, তুই আমার বুদ্ধিমান ছেলে, তুই মায়ের দুঃখ বুঝবি, তাই বললুম।

তখুনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, যেমন ক'রে পারি মার দুঃখ ঘোচাতেই হবে। নিজে মানুষ হয়ে মাকে নিয়ে চ'লে যাব দূর দেশে। সেখানে আমরা থাকব, কোন দুঃখ, কোন আঘাত মাকে স্পর্শ করতে দোব না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে মা উঠে চ'লে গেলেন। আমি আমাদের ঘরের ছাতে উঠে গিয়ে বসলুম—নিবিড় অন্ধকারে আপনাকে লুকিয়ে। লতুর সঙ্গে হঠাৎ এই বিচ্ছেদের আঘাতে এমনিতেই আমি মুষড়ে পড়েছিলুম, তার ওপরে মার মুখে ওই কাহিনী শুনে ও তাঁর

চোখে অশ্রু দেখে অন্ধকারে ব'সে ব'সে আমি কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। মনের মধ্যে এক চিন্তা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গুমরোতে লাগল, নতু চ'লে গেল, নতু চ'লে গেছে। আমি প'ড়ে আছি একা। নতুর নতুন সংসার, নতুন জীবন ; কিন্তু আমার কি রইল ? আমি কি নিয়ে থাকব ?

নতুর সঙ্গে কি চিরবিচ্ছেদ হয়ে গেল ? তবে কেন ভগবান আমাদের দুজনকে এত কাছাকাছি এনেছিলেন ? কে এ রহস্যের উত্তর দিতে পারে ? একান্ত মনে পাগলা সন্ন্যেসীর কথা ভাবতে লাগলুম। তাঁর সেই গেরুয়া বসন, তাঁর লাইব্রেরি, তাঁর কবিতাপাঠ মনের মধ্যে জলজল ক'রে ফুটে উঠতে লাগল। ভাবতে ভাবতে একবার যেন তাঁর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজল। এক মুহূর্ত্ত যেতে না যেতে সমস্ত আকাশ ব্যেপে মেঘ-গর্জ্জনের মত পাগলা সন্ন্যেসীর কণ্ঠস্বর গ'র্জ্জে উঠল—

If day should part us night will mend division
And sleep parts us—we will meet in vision
And if life parts us—we will meet in death
Yielding our mite of unreluctant breath
Death cannot part us—we must meet again
In all in'nothing in delight in pain
How, why or when or where—it matters not
So that we share an undivided lot...

এই মহামন্ত্র শুনতে শুনতে আমি সেইখানেই লুটিয়ে পড়লুম অজ্ঞান হয়ে।'

বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েক পরে অস্থির এসে আমায় ধাক্কা দিয়ে তুলে বললে, চল্, খাবি চল্, মা ডাকছে।

আমি ঠিক করলুম, কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাব ভাগ্য অন্বেষণে। বিদায়ের আগে নতু বলেছিল, আমার সারাজীবন তোর চিন্তাতেই কাটবে। আমিও সারাজীবন নতুর ধ্যানেই কাটিয়ে দোব। সে আমায় ভালবাসতে শিখিয়েছে, এই ভালবাসাই হবে আমার ধর্ম্ম। যদি কখনও

জীবনে উন্নতি করতে পারি, তা হ'লে মার দুঃখ ঘোচাব, আর আমার কোনও কর্ত্তব্য নেই।

অস্থির বললে, স্থবিরে, আমিও তোর সঙ্গে যাব। কিন্তু পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'ল, দুজনে একসঙ্গে পালানো ঠিক হবে না। আমার একটা কিছু হ'লে অর্থাৎ উন্নতির রাস্তায় পৌছলে তাকে খবর দোব, সে চ'লে আসবে।

বাড়ি থেকে বেরুতে হ'লে কিছু অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু অর্থ কোথায় পাই? আমার মনের এই সঙ্কল্প বন্ধুদের জানাতে সাহস হ'ল না। তারা চেষ্টা করলে হয়তো কিছু অর্থের যোগাড় ক'রে দিতে পারত, কিন্তু ভয়ে তাদের কিছু বলতে পারলুম না। কারণ আমার গৃহত্যাগ যদি তাদের মনঃপূত না হয়, তারা বাড়িতে ব'লে দিয়ে সব মাটি ক'রে দিতে পারে। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষকালে আমার অন্যতম প্রাণের বন্ধু পরিতোষ রায়কে আমার মনের কথা ব'লে ত্রিশটা টাকা ধার চাইলুম। পরিতোষের কাছে তাদের সংসারের টাকা থাকত। সে বেচারী আমাকে বড় ভালবাসত। সে সব শুনে বললে, আমিও তোর সঙ্গে যাব।

ঠিক হ'ল, পরিতোষদের সংসার-খরচের টাকা ভেঙে আমরা দুজনে স'রে পড়ব।

যাবার আগে গোষ্ঠদিদিকে সব ব'লে যাবার কথা মনে হ'ল। পাগলা সন্ন্যেসী ইহলোক থেকে বিদায় নেবার আগে আমাদের দুই ভাইয়ের হাতে তাকে সমর্পণ ক'রে গিয়েছিলেন, সে কথা আমরা ভুলি নি।

একদিন বিকেলে গোষ্ঠদিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলুম, সে সেখানে নেই। শৈলর মা, মাসী ও গোষ্ঠদিদি সবাই মিলে সে বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথায় চ'লে গিয়েছে। বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরা বললে, তারা আণ্টুনিবাগান না দপ্তরীপাড়ায় কোথায় উঠে গেছে।

গোষ্ঠদিদি আমাদের না ব'লে কোথায় চ'লে গেল? বিচিত্র এই সংসার! বিচিত্র নারীচরিত্র! আমাদের চেয়ে আপনার তার কে ছিল?

প্রায় দশ দিন ধ'রে আমি আর অস্থির আণ্টুনিবাগান আর দপ্তরী-পাড়ার বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান ক'রেও গোষ্ঠদিদি ও শৈলদের খুঁজে বের

করতে পারলুম না, কোথাও তাদের সন্ধান মিলল না। নিশ্চয় তারা সে পাড়ায় ছিল না, আমাদের ফাঁকি দেবার জন্যে এ বাড়ির লোকদের কাছে মিথ্যে কথা ব'লে গিয়েছিল।

পাগলা সন্ন্যেসী, আমাদের ক্ষমা ক'রো ভাই!

ইস্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা ঘনিয়ে আসার সময় বাবা আমাদের রাত থাকতে তুলে দিতেন পড়বার জন্যে। তাঁর কাছে শুনতুম যে, শেষরাত্রে উঠে পড়লে খুব ভাল পড়া হয়। অগ্রাণ মাসের মাঝামাঝি এই রকম একদিন শেষরাত্রে বাবা আমাকে পড়বার জন্যে ঠেলে তুলে দিলেন। সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে মনে মনে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করলুম।

তখন আমার পনরো বছর বয়স চলেছে।

সমাপ্ত

"মহাস্থবির"

আশঙ্কা

শীর্ণকায় প্রৌঢ় মেঘ লঘু পক্ষে তীর্থযাত্রা করে
শরতের চন্দ্রালোকে; অচঞ্চল তারার বর্ত্তিকা
সম্মুখে দেখায় পথ। না।হ জানি কোন্ দেশান্তরে
সাগরের নীল বক্ষে জীবনের রুদ্র বিভীষিকা
শেষ অশনির রবে অবশেষে লভিবে নির্ব্বাণ
নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতায়। মহাক্লান্তি 'শাশ্বতী সমার'
হেনেছে জরার খড়্গ আমাদের শিরে—অভিমান
মৃত্যুপথযাত্রীদের লুব্ধ করে, মূঢ় কল্পনার
যাদুমন্ত্রে। আমাদের আত্মঘাতী নিষ্ফল প্রয়াস
শোণিতের শেষবিন্দু নিঃশেষিয়া, অতৃপ্ত তৃষার,
আত্ম-বঞ্চনার রোষে কুণ্ঠাহীন, করিছে বিনাশ
দূরগত যৌবনের মহাকীর্ত্তি—জীবন সন্ধ্যার
স্মৃতিহীন্ চলিতেছি, পদতলে সভ্যতার শব—
আমাদের মৃত্যু আসে; এ কী তার শেষ বল্লরব!

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

বাপ্‌স্‌!

কথাটা তা হ'লে খুলেই বলি।

মাস ফাল্গুন, বিয়ের লগ্নের আর বেশি দেরি নেই। আমার ছোট নাতনী বুলুর বিয়ে সামনে। জামাই বাবাজী আবার যুদ্ধের বাজারে চাকরি নিয়ে আসামে আছেন। কি করি? ষাটের কাছে যদিও বয়েস, তবু বিশ্রাম তো নেই! আমারই ঘাড়ে পড়ল সব ভার, মায় কেনাকাটা পর্য্যন্ত।

তাই বিয়ের যৌতুক কিনতে কলকাতায় এসেছি। কেষ্টদাস পালের ষ্ট্যাচুর কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারে যাব ভাবছি। মিলিটারী ট্রাকের ঠেলায় তো রাস্তায় পা দেবার জো-টি নেই। এমন সময় পাশে তাকিয়ে দেখি, ল্যাম্পপোষ্ট ধ'রে দাঁড়িয়ে একটি মহিলা হাস্যমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। পান-প্রপীড়িত কালবিধ্বস্ত দন্ত, আবক্ষপ্রলম্বিত গণ্ডদেশ—দার্জ্জিলিঙের ক্ষেতের মত থাকে থাকে নেমে গেছে, কৃষ্ণপক্ক কেশদাম। তিনি যে আমাকে দেখে কৌতুকাপন্ন হয়েছেন, তা বুঝলাম তাঁর গ্লোবাকার উদার কটিদেশের ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গে—আকুঞ্চনে বিকুঞ্চনে। অস্ফুট হাসির হিল্লোল যেন তাঁর মধ্যদেশে তোলপাড় খাচ্ছে। আমি হাসির কারণ আবিষ্কার করবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁর কাঁসরী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, গোরাদা, না?

হ্যাঁ, আমি গৌরগোপালই বটে। কিন্তু আপনি? ঠিক ধরতে—

আরে, আমি যে রাণু! ভুলে গেলেন সব?

না, ভুলি নি কিছুই। কিন্তু তুমি কি সেই রাণু? এ কি হতে পারে?

কেন? আমার চেহারাটা কি কিছু বদলে গেছে? আপনি কিন্তু ঠিক তেমনিটি আছেন, যেমন ছিলেন চল্লিশ বছর আগে। তেমনই রোগা ছিপছিপে, যেমনটি ছিলেন—

তাই তো রাণু! চল্লিশ বছর হয়ে গেল! সময় উড়ে যায়। দেখতে দেখতে তারপর রাণু, কলকাতায় কবে এলে?

আমরা যে বর্ম্মা ইভ্যাকুয়ি, আমাদের সব গেছে। প্রাণ নিয়ে শুধু পালিয়ে এসেছি।

হ্যাঁ, ঠিকই তো, তোমরা বিয়ের পর বর্ম্মাতেই গিয়েছিলে বটে, সে কথাও যেন ভুলে যাচ্ছিলাম। চল্লিশ বছর!

রাণু তার দুঃখের কথা ব'লে চলল। তার "ওঁর" চাকরি থেকে অবসর, ছেলেদের গুণাবলী, আর্থিক উন্নতি, মেয়েদের বিয়ে, অবশেষে জাপানের বর্ম্মা আক্রমণ, রেঙ্গুন ত্যাগ, টিড্ডিম, টামু, প্যালেল, মণিপুরের রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে

পলায়ন, সব ব'লে যেতে লাগল। আমার কানে কিছুই গেল না। আমার মন গেল চ'লে চল্লিশ বছর আগে।

চল্লিশ বছর আগে এণ্ট্রান্স পাস ক'রে কলকাতায় পড়তে আসি। হেদোর ধারে একটা মেসে উঠি। ডাফ সাহেবের কলেজে আমার সহপাঠী ছিল উমেশ। দুজনের মধ্যে অল্পদিনের মধ্যেই দারুণ ভাব জ'মে গেল। এফ. এ. পরীক্ষায় দুজনেই খুব ভাল ক'রে পাস ক'রে আবার একই কলেজে বি. এ. পড়তে লাগলাম। বন্ধুত্ব আরও বেড়ে গেল। অবশেষে একদিন তার বাড়িতে নিয়ে গেল ও তার মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিল। অল্পদিনের মধ্যেই তার বাবা-মা আমার বাবা-মা হয়ে গেলেন, আমি একজন বাড়ির লোক হয়ে গেলাম। সে সময় রাণুর বয়েস ছিল তেরো। তখন তার চেহারা সত্যি সত্যি কি রকম ছিল, তা ভাল ক'রে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না। কিন্তু একটা চেহারা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। সেটার ও বর্ত্তমান রাণুতে কোথায় মিল আছে, আমি তো ধরতে পারছি না। কিশোরী রাণুকে কেন্দ্র ক'রে আকারিত হয়ে উঠেছিল আমার নতুন-পড়া কবিতার যত স্বপ্ন। আমার কীট্‌স, আমার শেলী, আমার শেক্সপীয়ার!

তেরো বছর বয়েস শুনে তরুণ পাঠক-পাঠিকা বোধ হয় হাসছেন। কিন্তু আমাদের সময় বাংলা কবিতা ও উপন্যাসের নায়িকা তার চাইতে বড় হ'ত না। স্বর্ণলতার প্রেমকাহিনী পাঠ ক'রে তখনকার দিনে আমাদের মত নবীন যুবক হৃদয়ের খোরাক যোগাড় করত। আর সেই স্বর্ণলতা ছিল মাত্র তেরো বছরের। ভ্রমরই বলুন আর বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যাই বলুন, সকলেরই বয়েস ওরই কাছাকাছি। হিসেব ক'রে দেখুন। "কৈশোর যৌবন দুঁহুঁ মিলি গেল" কথাটি বলতেই তখনকার কবি ও ঔপন্যাসিকদের হৃদয় অবশ হয়ে উঠত। মেয়ের বয়েস তেরো হ'লে পাড়ার ভূতদের চোখ লাগত। মেয়ের সে বয়সের আগে বিয়ে না হ'লে কোন বাপের আর গলা দিয়ে ভাত নামত না। যাক, যা বলছিলাম, উমেশদের বাড়ি যাতায়াতের ফলে আমার জীবনে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন হ'ল। রবি ঠাকুরের ভাষায় বলতে গেলে, আমার জীবনকুঞ্জে সহস্র কোকিল মুখর হয়ে উঠল। রবি ঠাকুরের কবিতা পড়া তখন ফ্যাশন ছিল না। সুরেশ সমাজপতি আর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদের গালাগাল আমাদের কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। কার সাধ্যি বলে, রবি ঠাকুর একটা কবি! বেথুন কলেজ তখন ছিল একটা অদ্ভুত রহস্যে ঘেরা। তার দুই ঘোড়ার বাস যখন গুমগুম ক'রে শহরের মধ্যে দিয়ে যেত, তখন আমাদের বুকের মধ্যে দুড়ুম দুড়ুম ক'রে উঠত।

হেদোর ধারে বসলে, ওই পাঁচিলের দিকে তাকালে; আমাদের মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যেত। মনে আছে, কত চাঁদনী রাতে হেদোর ধারে ব'সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বুকের ব্যথা উছলে উঠত। মন বলত—

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে

আমা হেন অভাগারে কাঁদাইতে বারে বারে

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে…

রবি ঠাকুরের মিঠি মিঠি ঠুংরী-টপ্পাতে আমাদের চলত না।

পাঠক! তুমি যদি 'সীতারাম' প'ড়ে থাক, তবে নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে—তন্বীশ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি মধ্যে ক্ষামা চকিত-নয়না প্রেক্ষণা নিম্ননাভী। রাণুর দিকে আমি ভাল ক'রে তাকাই নি। কিন্তু রাণুর কথা মনে হ'লেই ওই ছবিটি মনে আসত। সাহিত্যে ও কবিতায় যা কিছু সুন্দর পড়েছি, তা দিয়ে আমার মনে রাণুর একটা মূর্ত্তি গ'ড়ে উঠল। জুলিয়েটের লালিমা, ক্লিয়োপ্যাট্রার যৌবন, পোর্সিয়ার প্রতিভাবিস্ফারিত ঋজু সৌষ্ঠব, শকুন্তলার কমল-কোমলতা, ডেস্‌ডিমোনার অপূর্ব্ব রূপ সব—মিলিয়ে আমি তৈরি করলাম আমার স্বপ্নের রাণুকে। কি না পারি রাণুর জন্যে? বল্কল প'রে বনে যেতে পারি। লিয়াণ্ডারের মত সাঁতরে সাগর পার হতে পারি। ক্রুসকাঠে ঝুলতে পারি, আগুনে পুড়তে পারি, হাতীর পায়ের তলে পড়তে পারি। কিছুই অসাধ্য ছিল না। রাণুকে লক্ষ্য ক'রে খাতার উপর খাতা কবিতায় ভ'রে উঠতে লাগল।

কত ভালবাসি আমি সে কথা অন্তর্য্যামী

একমাত্র জানে।

না হেরি সে মুখশশী আমার ব্যথার রাশি

বহি যায় গানে।

দিস্তার পর দিস্তা লিখে ফেললাম। পরবর্ত্তী কালে যদি সেগুলো দিয়ে আমার সহধর্ম্মিণী শ্যামমোহিনী দেবী উনুন না ধরাতেন, তবে আমিও একটা কেষ্টবিষ্টু হয়ে যেতাম।

আজকালকার তরুণ কবিরা হয়তো ব্যঙ্গ করবেন আমাদের রুচি দেখে। কিন্তু সেকালে ও একালে আকাশ-পাতাল তফাত।

সেকালে আমাদের যেমন ভেজাল ঘি খেয়ে ক্ষুধামান্দ্য ছিল না, তেমনই "নতুন ননীর মত তনু" দেখে "কুৎসিত কঙ্কালে"র কথা মনে হ'ত না। আমাদের তখন "কাশী হতে বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ, ছয় দিনে উত্তরিল [illegible] ... শ্রেণীর ঘাইলার্কের মত এই পৃথিবীর ধুলো

ছেড়ে ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর আকাশে—দিক হতে দিগন্তরে, রবি ঠাকুরের ভাষায় সুদূরের আহ্বানে। বাইরনের মেজাপার মত বল্গাহীন ছিল কল্পনার ঘোড়া। সেই উড়ন্ত ভাব কি আর তোমাদের আজকালকার বার্দি-খেকো কোঁৎ-পাড়া ভাষায় কুলোয় ?

হাওড়ার পুলে
লক্ষ লক্ষ,
হে যক্ষ,
মনোরথে নয়, বাস-এ, মোটরে ইত্যাদি
অনাদি
তোমাদেরই বহি এই ধারা।

তোমাদের আধুনিক কবি যদি রাত্তিরবেলা একটু দুধ-রুটি আর সকালবেলা উঠে একটু কাঁচা ছোলা ভেজা গুড় দিয়ে খান, তবে আর এ রকম কবিতা লিখবেন না। তোমাদের আজকালকার কবিতা একবারে একটা বিরাট ফাঁকি, তোমাদের ভাষায় বলতে গেলে একবারে "ফাঁকা লিবিডো," আমাদের ডাক কলেজের বাংলার পণ্ডিতের ভাষায় "একবারে মোক্তীবিবি"।

শুধু আমার অশ্ব-মনোরথেরই যে গতিবৃদ্ধি হ'ল, তাই নয়। অল্পদিনের মধ্যেই রাণুও জেনে ফেললে যে, একজন ব্যক্তি তার চলাফেরা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়েছে। "ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মুরছা" যাক আর না যাক, তার হাসির বিদ্যুৎঝলকে একটি প্রাণ অন্ততপক্ষে উদ্বেল হয়ে পড়ছে। রাণুর জানতে একটুও দেরি হ'ল না যে, গৌরগোপালের ওপর তার একটা বিশেষ অধিকার জন্মেছে এবং সৌম্য শান্ত গৌরগোপালকে সে একটি কথায়, একটু চোখের চাহনিতে ওঠ-বোস করাতে পারে। এইখানেই শেষ হ'ল না। তারপর একদিন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে হতভাগা গৌরগোপাল দশপৃষ্ঠাব্যাপী এক প্রেম-নিবেদন রাণুর "কথামালা"র মধ্যে রেখে দিলে। তাতে সে শেলী, ব্রাউনিং, টেনিসন থেকে,ভালবাসার যত ভাল ভাল কথা আছে তা দিয়ে প্রমাণ ক'রে দিলে, সে রাণুকে কত ভালবাসে। কিছুদিন আগে সে এক জায়গায় পড়েছিল ল্যাটিন কোটেশন amour vincit omnia অর্থাৎ প্রেমের সর্ব্বত্র জয়, তাও লিখে দিলে। কত কথাই না লিখলে! বললে, রাণু হচ্ছে তার জীবনের ধ্রুবতারা, তাকে লক্ষ্য ক'রে সে যুগযুগান্ত ধ'রে ঘুরছে, আলোকধারার চির-আশীর্ব্বাদ পাঠিয়ে দিচ্ছে তার জীবনকে ধৌত করবার জন্যে। আরও লিখলে,

সেইদিনই তার জীবন ধন্য হবে, যেদিন তার স্পর্শ সে জীবনে পাবে। আরও কত কথা।

চিঠি দেবার পর সাত দিন সে আর লজ্জায় ওমুখো হতে পারলে না। তারপর একদিন ধড়াস-ধড়াস বুকে অবশেষে এসে হাজির হ'ল। বাণুকে দেখে আর মুখ তুলতে পারে না? বাণু কিন্তু হেসে খুন। বলে, গোরাদা, আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। কি সব লিখেছেন! মানেই বোঝা যায় না। আর কি ঘেন্নার কথা গো, কি ঘেন্না! তার মধ্যে আবার লিখেছেন যে, আমার পর্শো চান। মা দেখলে কিন্তু রক্ষে রাখবে না। গৌর ভাবলে, বসুন্ধরা, দ্বিধা হও, তোমার মধ্যে ঢুকে যাই।

ব্যাপার এইখানেই শেষ হ'ল না। একদিন "কথামালা" ঘাঁটতে ঘাঁটতে বাণুর মা সেই চিঠি পেলেন। বাণুকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার চিঠি রে? ভ্যাবাচাকা খেয়ে বাণু সাফাই গাইলে, বললে, দেখ না মা, গোরাদা ভারি দুষ্টু। অসভ্য কথা লিখেছে।

কি অসভ্য কথা রে?

বলে কিনা, আমার পর্শো চায়।

অ্যাঁ, বলিস কি? বিষকুম্ভো পয়োমুখো ছোঁড়া। ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে বের ক'রে দোব। তোর পর্শো পাওয়াচ্ছি! উমেশটা যত বখা ছোঁড়ার সঙ্গে মেশে। আসুক না বুড়ো আপিস থেকে, মজা দেখাচ্ছি।

সেদিন উমেশের পিতা রাত্রি আটটায় আপিস থেকে ফিরে মুখ-হাত ধুয়ে যেই জলখাবারের জন্যে হাঁক দিলেন, গিন্নী তাঁর নিয়মিত ভেজা মুগের ডাল, আখের কুচি ও বাতাসা নিয়ে এলেন না। কিন্তু হাঁড়ি-মুখে সামনে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, তোমার মরণ হয় না?

কেন গা, হ'ল কি আবার?

হ'ল তোমার গুষ্টির মাতা!

খুলেই বল না, নাকের নথ-টথ চাই নাকি?

মরবার আর জায়গা পাও না! বুড়ো মিন্সে, তেরো বছরের আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রেখে কি ক'রে সকাল সন্ধ্যে ভাতের কাঁড়ির ছেরাদ্দ করো গা? মরণ হয় না?

হঠাৎ হ'ল কি বল না। কি মুশকিল!

তোমার উমেশের পাখা উঠেছে যে?

উমেশের কি হয়েছে?

তার মানে গোল্লায় যাচ্ছে, যত সব বদমায়েস ছোঁড়ার সঙ্গে মেলামেশা। ওই বাঙালটা বজ্জাত।

কেন, সে কি করেছে?

রাণুকে লম্বা চিঠি লিখেছে; বলে কিনা রাণুর পর্শো চায়।

অ্যাঁ, বল কি গিন্নী? হারামজাদা ফের যদি বাড়ি ঢোকে জুতো মেরে বের ক'রে দিও।

এমনই সময়ে উমেশ যেই বাড়ি ঢুকেছে তার পিতা অতর্কিতভাবে তাকে পায়ের জুতো খুলে আক্রমণ করলেন। উমেশ বলে, আরে, হ'ল কি? মারছেন কেন? তার পিতা গর্জন ক'রে বলেন, ছুঁচো, রাত আটটার পর বাকি ফের! যত সব বদমায়েস ছেলের সঙ্গে মিশছ! সন্ধ্যার বাতি দেবার আগে রোজ বাড়ি না ফের, জুতো মেরে বাড়ি থেকে বের ক'রে দোব। আর ওই বাঙাল ছোঁড়াটার সঙ্গে মিশতে পারবে না। তখনই মানা করেছি, ওই সব বাঙাল-কাঙালের সঙ্গে মিশো না। যত সব নেমকহারাম হারামজাদা।

কেন, গৌর কি করেছে?

তোমার ভগ্নীর সতীত্ব নষ্ট করেছে।

অ্যাঁ, বলেন কি? অসম্ভব। সত্যি হ'লে আমি তার জান নোব যে!

এর পর পনরো দিন উমেশের পিতা আর আপিসে গেলেন না। রাণুর বিয়ের জন্তে কলকাতা চ'ষে বেড়াতে লাগলেন। আগামী শ্রাবণের পনরো দিনের মধ্যে রাণুর বিয়ে দিতেই হবে। সত্যিই তো, রাণুর বয়সী সব মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। কেউ কেউ মা হয়ে গেছে। তিনিই ভুল করেছেন। এইজন্তেই তো গৌরীদানের ব্যবস্থা শাস্ত্রকারেরা করেছে। তিনি কিনা কেশব সেনের বক্তৃতা শুনে একটা দুর্বল মুহূর্তে রাণুকে মহাকালী পাঠশালায় পড়তে দিয়েছিলেন! এখন ঠেলা সামলাও! আত্মগ্লানিতে তাঁর চিত্ত একবারে পূর্ণ হয়ে গেল।

এদিকে চলুন গৌরগোপালের মেসে। কোটরগত চক্ষু, আ-কামানো দাড়ি, শুকনো মুখ। পাগলের মত ছটফট করছে। একবার মনে হ'ল, হাওড়ার পুল থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ শেষ করবে। কিন্তু কিছুদিন আগে 'হিতবাদী'তে পড়েছিল যে, পাড়াগাঁর এক ছেলে ষ্টার থিয়েটারের বিধুমুখীকে দেখে এমন পাগল হ'ল যে হতাশায় পুল থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে। কিন্তু মরা তার হ'ল না, মাঝিমাল্লারা টেনে তুললে। অবশেষে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কীজ সাহেবের এজলাসে আত্মহত্যা-চেষ্টার চার্জে চালান হ'ল ও সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত

কোর্টে ব'সে থাকতে হ'ল। খবরের কাগজে বিস্তৃত বর্ণনা বের হ'ল। সারা বাংলায় ছিটি প'ড়ে গেল। না না, এর চাইতে দগ্ধে দগ্ধে বেঁচে থাকাও ভাল। গৌরের মরা হ'ল না। তার সব প্ল্যান ভেস্তে গেল।

'রোমিও জুলিয়েট' সেবার টেক্সট ছিল। রোমিও জুলিয়েট পড়তে পড়তে সে ভাবত, সে হবে রোমিও, বাপু হবে জুলিয়েট। অমনই ক'রে ভোর-রাত্তিরে বাপুর ব্যাল্‌কনির নীচে সেরেনেড গাইবে—

প্রভাত গগন আলোময় হের সখি!
চাহিয়া দেখ মেলিয়া কমল আঁখি।
দুয়ারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তোমার রোমিও,
পেলব ওষ্ঠে একবার তারে চুমিও।

তাদের মিলন তো হবে না নিশ্চয়ই। অমনই ক'রে বিষ খেয়ে মরবে দুজনে। তারপর একসঙ্গে কবর হবে। কিন্তু হিন্দুদের তো কবর দেওয়া নেই! ওই তো আবার মুশকিলে প'ড়ে গেল। তা ছাড়া সেরেনেড হবে কি করে? বাপুদের বাড়ি একটা এঁদো গলির পেছন পোর্শন। সামনে থাকে অন্য ভাড়াটে, তার আবার কুকুর আছে! আর ব্যাল্‌কনিই বা কোথায়? তা ছাড়া সে রকম নার্সও তো থাকা চাই! বাপুদের ঠিকে ঝির চেহারা দেখে প্রাণ তো শুকিয়ে যায়। সেই সময় অমৃতলাল বোসের 'তরুবালা' সবার মুখে মুখে। তার দু-একটা গান গৌরও জানত।

নিতুই নিতুই ঘুরি ফিরি তোমার কানাচে
প্রাণ বোঝ না আছে।

তার অবস্থাও এমনই। প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও তার মন বাপুদের গলির আনাচে কানাচে ঘুরতে লাগল। তার মনে যখন এই রকম ঝড় বইছে, তখন একদিন শুভ লগ্নে বাপুর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। গৌরগোপালের পড়াশুনাও শেষ হয়ে গেল। একদিন দেখা গেল, বেলুড়ের মঠে উপস্থিত নবাগত এক তরুণ ব্রহ্মচারী—সংসারের সকল মায়া পদদলিত ক'রে নিষ্কাম প্রেমের সাধনভিখারী। বঙ্কিমবাবুর মত জিজ্ঞেস করছি—পাঠক-পাঠিকা চেয়ে দেখ, এই ব্রহ্মচারী কি তোমাদের চেনা? এ কি আমাদের গৌর? হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়। যাক, স্বামীজী মহারাজ ছেলেমানুষ নন। তিনি এরকম কেস অনেক দেখেছেন। এক লহমায় চিনে ফেললেন।

কি চাও বাপু?

মহারাজ, আমি বড় সংসারতাপে পীড়িত—সকল বন্ধন হ'তে মুক্তি চাই। আপনার চরণতলে যদি একটু ঠাঁই দেন!

বটে! এতটুকু বয়সে সংসারের এত তত্ত্ব শিখে ফেলেছ? আচ্ছা বেশ। ওরে! কে আছিস?

[নেপথ্য হতে উত্তর এল, আমি মহারাজ—কুমুদ।]

আচ্ছা, কুমুদ, নিয়ে যা এই ছোকরাকে তোর সঙ্গে। একে সকালে বিকেলে একঘণ্টা লাকড়ী ফাঁড়ার কাজ দিবি। পনরো দিন বাদ আমার কাছে আবার নিয়ে আসবি। তখন প্রমোশন হবে জলতোলার ক্লাসে। [গৌরের দিকে চেয়ে] বুঝলে হে ছোকরা? যাও, এর সঙ্গে যাও। আর দেখ্ কুমুদ, হরিপদ কম্পাউণ্ডারকে ব'লে দে, রোজ সকালে যেন বিশ গ্রেন ক'রে ম্যাগ-সালফ দেয়।

সাত দিন যেতে না যেতে গৌরের ব্রহ্মচর্য্য-প্রোবেশন প্রায় শেষ হয়ে এল। জলতোলা ক্লাসে প্রমোশন পাবার আকাঙ্ক্ষা একেবারে উবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বা র চিন্তারও বড় গোলমাল উপস্থিত হ'ল। অবশেষে একদিন সকালে উঠে আর গৌরের সন্ধানই পাওয়া গেল না।

তারপর গৌর আরও প্রেমে পড়েছে। শেষকালে ওটা যেন তার একটা অভ্যাসই হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু গঙ্গার পুল বা বেলুড়মুখো আর হয় নি। অবশেষে ওকালতি পাস ক'রে গৌর সিরাজগঞ্জে বসল ও বারকতক ম্যালেরিয়ার ঠেলায় রক্ত যখন ঠাণ্ডা হয়ে এল, তখন সুবোধ শিশুটির মত একটি গুভলগ্নে শ্যামমোহিনীকে বিবাহ ক'রে আর দশজন বাঙালীর ছেলের মত ঘরসংসার করতে লাগল। অবশেষে একটি ছেলে ও দুটি মেয়ের মা শ্যামমোহিনী বিশ বছর সুখে ঘর ক'রে একদিন স্বামীর কোলে মাথা রেখে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। গৌর কিন্তু আর প্রজাপতির মন্দিরে ধন্না দিলেন না। এমনই ভাবেই দিন চ'লে গেল।

রাণু তার গল্প ব'লেই যাচ্ছিল। হঠাৎ চমক ভেঙে গেল গৌরের। জিজ্ঞেস করলে, তোমার ছেলেমেয়ে কি রাণু?

আপনি এতক্ষণ কি শুনছিলেন তবে? বললাম তো, ছয় ছেলে, সাত মেয়ে।

অ্যাঁ, বল কি?—ব'লে আঁতকে উঠেই সামলে নিয়ে গৌর বললে, তা বেশ, তা বেশ।

একদিন আসবেন কিন্তু গৌরদা, ওঁর সঙ্গে আলাপ করবেন।

তা আসব বইকি। কিন্তু আমার তো কালই সিরাজগঞ্জে ফিরে যেতে হবে। নাতনীর বিয়ে।

নাতনীর বিয়ে? সময় চ'লে যায় গোরাদা। (দীর্ঘনিশ্বাস) আর কি আমার কথা শুনবেন গোরাদা? (দীর্ঘনিশ্বাস) একদিন না বলেছিলেন, এ জীবনে না হয়—

(ব্যস্ত হয়ে উঠে) আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। তবে আজ আসি। অভ্যাসমত কথাটা ব'লে ফেলে অন্তরালে জিব কেটে পরলোকগতা শ্যামমোহিনী দেবীর উদ্দেশ্যে কানমলা খেলে।

রাণু তখন বললে, আচ্ছা, আসি গোরাদা। ব'লেই পায়ের ধুলো নিতে গেল। গৌর প্রমাদ গুনলে। প্রণাম করতে গিয়ে রাণুর যা অবস্থা হ'ল তা দেখে শশব্যস্তে ব'লে উঠল, আরে, কর কি, কর কি? ভাবলে, যদি কোন রকমে বেসামাল হয়ে ফুটপাথে প'ড়ে যায়, একা তুলবে কি ক'রে? রাণু যখন অবশেষে অনেক পাঁয়তাড়ার পর খাড়া হয়ে উঠে হাঁপাতে লাগল, তখন গৌরের হৃদয় ব'লে উঠল, বাপ্‌স্, কি বাঁচাই বেঁচে গেছি।

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

লম্পট

হেরম্ববাবু একজন লম্পট।

বয়স পঁয়তাল্লিশ। এ কার্য্যে নূতন ব্রতী নহেন; দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বেশ পরিপক্ব হইয়াছেন, সামান্য একটু নলচে আড়াল দিয়া কাজ করিয়া যান। আত্মীয়-বন্ধু এই লইয়া অন্তরালে একটু হাসি-তামাসা টীকা-টিপ্পনী করেন। কিন্তু হেরম্ববাবু কৃতবিদ্য ব্যবসাদার, পয়সাওয়ালা লোক; তাঁহার চরিত্র লইয়া প্রকাশ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার কথা কাহারও মনেই আসে না।

হেরম্ববাবুর লাম্পট্যে রোমান্সের গন্ধমাত্র নাই। পাকা ব্যবসাদারের মত এ বিষয়ে তিনি লাভ লোকসানের খতিয়ানের দিকে নজর রাখিয়া চলেন। কত খরচ করিয়া কতখানি আনন্দ ক্রয় করিলে লাভে থাকা যায়, সেদিকে তাঁহার মন সর্ব্বদা সতর্ক থাকে। হেরম্ববাবুর মনস্তত্ত্ব আরও খোলাখুলিভাবে ব্যাখ্যা করিতে গেলে অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক হইয়া পড়ে, তাই যথাসাধ্য ঢাকাঢুকি দিয়া বলিতে হইতেছে। মোট কথা, তিনি একজন পাক্তি লম্পট।

শহরের নিম্নপ্রান্তে, সম্পূর্ণ অপরিচিত পাড়ায় হেরম্ববাবু একটি ঘর ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ঘরটি ছিল তাঁহার আনন্দভবন; সপ্তাহের মধ্যে

অন্তত একটি রাত্রি তিনি এইখানে যাপন করিতেন। রাত্রিযাপনের নির্জীব আসবাবপত্র সবই ঘরে মজুত থাকিত; সজীব উপকরণটি আসিত বাহির হইতে। আর কেহ এ ঘরের সন্ধান জানিত না; ইয়ার-বন্ধু লইয়া আমোদ করা হেরম্ববাবুর স্বভাব নয়। এ বিষয়ে তিনি অদ্বৈতবাদী।

একদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া হেরম্ববাবু নিজ আনন্দভবনে উপস্থিত হইলেন। দ্বারের চাবি খুলিয়া ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক আলো জ্বালিলেন; চাদরের ভিতর হইতে একটি পাঁট বোতল বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন; তারপর দেয়াল-আলমারি হইতে গেলাস সোডা ও কর্ক-স্ক্রু লইয়া টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

আজ তাঁহার শরীর ঈষৎ ক্লান্ত, কিন্তু মনের মধ্যে অনেকখানি চঞ্চলতা রহিয়াছে। চঞ্চলতার কারণ, যে অভিসারিকাটির আজ দশটা হইতে সাড়ে দশটার মধ্যে আসিবার কথা, সে সাধারণী নয়। হেরম্ববাবু খেলোয়াড় লোক; অনেক খেলাইয়া মাছটিকে ডাঙায় তুলিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান হয়, মাছটিও গভীর জলের মাছ।

এক পাত্র সোডা-মিশ্রিত সোমরস পান করিবার পর হেরম্ববাবুর ক্লান্তি কাটিয়া গেল, শরীর বেশ চনমনে হইল। তিনি উঠিয়া পাঞ্জাবি ও চাদর খুলিয়া দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখিলেন, তারপর আবার আসিয়া বসিলেন।

সিগারেট ধরাইয়া তিনি আর এক পাত্র ঢালিলেন; চুমুকে চুমুকে তাহাই আস্বাদ করিতে করিতে হাত-ঘড়ি দেখিলেন, পৌনে নয়টা। এখনও অনেক সময়; আগ্রহের প্রাবল্যে আজ হেরম্ববাবু বড় তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ক্ষতি নাই; এরূপ অবস্থায় প্রতীক্ষা করার মধ্যেও বেশ রস আছে।

দ্বিতীয় পাত্রটি শেষ হইবার পর তাঁহার ইচ্ছা হইল, গলা ছাড়িয়া গান করেন কিংবা তবলা বাজান। কিন্তু গলা ছাড়িলে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা; তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি টেবিলের উপর টপাটপ তবলা বাজাইতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিছুক্ষণ চলিল। তারপর হেরম্ববাবু আর এক পাত্র ঢালিয়া সিগারেট ধরাইলেন। ঘড়িতে দেখিলেন সওয়া নয়। সময় বড় আস্তে কাটিতেছে; ঘড়ি কানে দিয়া দেখিলেন, চলিতেছে কি না। ঘড়ি টিকটিক করিয়া জানাইল, সে সচল আছে।

ক্রমে বোতলের রঙ হেরম্ববাবুর চক্ষুতে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, ঘরটি যেন ফিকা গোলাপী ধোঁয়ায় আবছা হইয়া গিয়াছে। চেয়ারে

হেলান দিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন অনাগতা অভিসারিকার কথা…মানস-বিলাসে মনের বলগা ছাড়িয়া দিলেন।…

বোতলের লালিমা কমিয়া কমিয়া তলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। হেরম্ববাবু মানস-বিলাসে ফিকফিক করিয়া হাসিতেছেন ও স্বকনি লেহন করিতেছেন।

* * * *

একটি রমণী নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, হেরম্ববাবু টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন। বোতলটা উল্টাইয়া পড়িয়াছে।

কাছে আসিয়া রমণী তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া ঈষৎ নাড়া দিল। হেরম্ববাবু বিজবিজ করিয়া কিছু বলিলেন, কিন্তু জাগিলেন না; স্বপ্ন-বিলাসে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বোধ হয় আপত্তি জানাইলেন।

রমণীর দুই অধর-কোণ হাসির অনুকৃতিতে একটু অবনত হইল। সে হেরম্ববাবুকে ধরিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল। হেরম্ববাবু বিজবিজ করিয়া আপত্তি করিলেন। কিন্তু রমণী তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া শয্যার কাছে লইয়া গেল এবং সন্তর্পণে শোয়াইয়া দিল। হেরম্ববাবুর বিজবিজ কথাগুলি একটি স্থির হাসিতে রূপান্তরিত হইয়া অধরে লাগিয়া রহিল।

শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া একান্ত প্রণয়হীন চক্ষে রমণী কিছুক্ষণ তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল। শেষে খোঁপা হইতে একটি গোলাপ ফুল লইয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিল; তারপর আলো নিবাইয়া সাবধানে দরজা ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

* * *

পরদিন প্রাতঃকালে হেরম্ববাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

শয্যায় উঠিয়া বসিয়া তিনি গত রাত্রির কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। মাথার ভিতরটা বারুদ-ঠাসা বোমার মত হইয়া আছে; কিন্তু স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই। রাত্রে সে আসিয়াছিল। তারপর—? ম্লান বিমর্দিত গোলাপটি তাঁহার চোখে পড়িল।

হেরম্ববাবু মনের মধ্যে পরম তৃপ্তি অনুভব করিলেন। বাস্তবের স্মৃতি ও মনোবিলাসের স্মৃতি মিলিয়া তাঁহাকে দৃঢ়প্রত্যয় দিল যে, কাল রাত্রিটা ভালই কাটিয়াছে।

হেরম্ববাবু উঠিয়া পড়িলেন। উল্টানো বোতলটার তলায় তখনও কিছু তরলদ্রব্য ছিল, তাহাই পান করিয়া তিনি খোঁয়াড়ি ভাঙিলেন।

"চন্দ্রহাস"

হারাধন

রায়হাটির জমিদার—হারাধন রায় বহুদিন পরে স্বগ্রামে ফিরিল। দামী ঝকঝকে প্রকাণ্ড গাড়ি, তীক্ষ্ণ উচ্চ গর্জনের শব্দ। কাজেই সরকারী পাকা রাস্তা হইতে গাড়ি গ্রামের রাস্তায় পড়িতেই, গ্রাম-প্রান্তবাসী লোকেরা উচ্ছ্বসিত হইয়া রাস্তার দিকে তাকাইল এবং কোন একজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি গ্রামে আসিতেছেন বা গ্রামের ভিতর দিয়া পার হইয়া যাইতেছেন, এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। দ্রুতব্যাপী তরঙ্গের মত, এই বার্ত্তা গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অবিলম্বে সঞ্চারিত হইল, এবং গাড়ি যখন জমিদার-বাড়ির সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল, তখন রীতিমত ভিড় জমিয়া গেল।

গাড়ি হইতে নামিয়া হারাধন অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য প্রজারা জড় হইয়াছে। বাঙালীর অনেক ভাল ভাল জিনিসের মত, রাজভক্তিও বহু ঝড়-ঝাপটা কাটাইয়া এখনও এই পল্লীবাসীদের মধ্যেই টিকিয়া আছে। অবশ্য হারাধন রাজা নহে, ক্ষুদে জমিদার, তাহা হইলেও প্রজাদের কাছে রাজতুল্য পূজনীয় তো!

একজন মুরুব্বী-গোছের লোক হাত কচলাইতে কচলাইতে আসিয়া আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল; সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যুক্তহস্তে কহিল, আমাকে চিনতে পারেন হুজুর? আমি নফর। হারাধন যেন চিনিতে পারিয়াছে, তেমনই সুরে কহিল, ও-হো! তুমি সেই নফর, সেই যে—। লোকটা কথাটা লুফিয়া লইয়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, খদন মোড়লের ছেলে নফর মোড়ল, মনসাতলার বাঁ-হাতি হাত কুড়ি যেয়ে ফকির মোড়লের সায়কুঁড়ের পাড়ে বাঁশতলার পেছনে ঘর, আপনি দেখেছেন হুজুর, ছোটবেলায়। প্রসারিত দক্ষিণ করতল মাটির কতকটা উপরে সমান্তরালভাবে রাখিয়া কহিল, এত বড় তখন আপনি, কুল খেতে গেছলেন, কুল খেয়ে কাসি হ'ল আপনার, কর্ত্তা কত রাগ করলেন, সে অনেকদিনের কথা হুজুর, এখনও মনে হচ্ছে—। হারাধন বাধা দিয়া কহিল, আমি আসব জানলে কি ক'রে সব? লোকটা একগাল হাসিয়া জবাব দিল, হুজুর, শিঙে ফোঁকার শব্দ শুনে, আমিই সকলকার আগে শুনেছিলাম হুজুর; সঙ্গে ছিল আমাদের কটকে—বললাম, হ্যাঁ, দেখ্, কে শিঙে ফুঁকছে রে এখন? তা কটকে দেখেই বললে, শিঙে নয়, হাওয়া-গাড়ি, ওই ঝিলিক মারছে দেখ, গাড়িটার গায়ে পরম সমাদরের সহিত হাত বুলাইয়া কহিল, আচ্ছা গাড়ি কিনেছেন হুজুর। ম্যাজিষ্টর সাহেবের গাড়িকেও হার মানিয়ে দেয়।

গাড়িটাকে ঘিরিয়া সমস্ত লোকগুলা যেন আত্মহারা হইয়া গিয়াছে, গাড়ির মালিকের চেয়ে গাড়িটাই তাহাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছে বেশি। হতাশ হইল হারাধন; ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, তোমরা বাড়ি যাও, রোদ হয়ে গেছে। ড্রাইভারকে গাড়ি গ্যারেজে ঢুকাইতে আদেশ দিল। পশ্চিমা পাইক লছমন সিং আসিয়া সসম্মানে সেলাম করিয়া প্রভুকে বাড়ির ভিতরে লইয়া গেল।

রায়হাটি এবং আরও পনরো-ষোলটা ছোট-বড় মৌজা লইয়া রায়হাটির রায়দের জমিদারি। এই ছোট জমিদারির আয়ে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করা চলে না, গাড়ি-ঘোড়া হাঁকানোও চলে না। হারাধনের পূর্ব্বপুরুষেরা কোনদিন তাহা করে নাই। তাহারা বরাবর গ্রামে বাস করিত, মোটামুটি চালে চলিত, গ্রামের সকলের সুখ ও দুঃখের সমান ভাগ লইত। হারাধন প্রথম এই বংশে বি. এ. পাস করিল, জনৈক খাস কলিকাতাবাসী ভদ্রলোকের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিল, শ্বশুরের পরামর্শে কাঠের ব্যবসা শুরু করিল। ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইতে লাগিল হারাধনের। উৎসাহিত হইয়া সে কয়লার ব্যবসা ধরিল; ক্রমে কলিয়ারির কণ্ট্রাক্টার ও আট-দশ বৎসরের মধ্যেই দুই-তিনটা কলিয়ারির খোদ মালিক হইয়া উঠিল। কলিকাতায় বাড়ি করিল হারাধন। গ্রামে পৈতৃক পুরাতন বাড়ি ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া নূতন হালফ্যাশনের বাড়ি করিল। প্রতিবেশী নারায়ণপুরের পড়তি জমিদারের অনেকগুলা মৌজা নিলামে ডাকিয়া লইয়া নিজ জমিদারির আয়তন বৃদ্ধি করিল; দেনার দায়ে, বাকি খাজনার জন্য নিলাম করিয়া, এবং মোটা দাম দিয়া, প্রজাদের অনেক জমি খাস করিয়া লইল। নিজ জোতে প্রায় হাজার দুই বিঘা জমি চাষের ব্যবস্থা করিল, উৎপন্ন শস্য কলিকাতার ও কলিয়ারির বাজারে বিক্রয় করিয়া জমিদারির আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করিল। তারপর যুদ্ধ বাধিল, হারাধন মিলিটারির কণ্ট্রাক্ট লইল। দুইদিনে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল হারাধন, অজস্র টাকা লাভ হইতে লাগিল; ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ছয় অঙ্কে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেল। কলিকাতায় তিন-চারখানা বাড়ি করিল হারাধন; চার-পাঁচখানা গাড়ি কিনিল; পুরাতন ব্যবসাগুলি বিস্তারিত করিল, নূতন নূতন ব্যবসার পত্তন করিল; দুই-তিনটা ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হইল গঙ্গার ধারে রবিবাসরীয় আমোদ-প্রমোদের জন্য বাগানবাড়ি কিনিল; মোটা মাসোহারা দিয়া জনৈকা হালি ফিল্মষ্টারকে বিলাসসঙ্গিনী করিল; একজন নামজাদা অ্যারিষ্টোক্র্যাটিক গুরুর শিষ্য হইল; কর্পোরেশনের কমিশনারির জন্য পাড়ায়, হিন্দু-সংস্কার-সমিতির পৃষ্ঠপোষক হইল;—হিন্দু মহাসভার মেম্বর হইল ও ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিবার জন্য পার্টি-ফণ্ডে মোটা চাঁদা দিতে লাগিল; বার

বাহাদুরির জন্ত নিজ জেলার হাকিম বাহাদুরদের পূজা পাঠাইতে লাগিল। মোট কথা, কলিকাতার বাঙালী বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ী-সমাজে হারাধন একজন গণ্যমান্ত ব্যক্তি হইয়া উঠিল।

বেলা তিনটার সময়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া হারাধন দোতলার ঢাকা বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসিল। দিবানিদ্রার জন্ত মুখটা থমথম করিতেছে, চোখ দুইটা লাল। বার দুই হাই তুলিয়া খাস ভৃত্য রামচরণকে ডাক দিল, রামচরণ! রামচরণ ত্বরিত পদে আসিয়া দেখা দিল।

হারাধন কহিল, এক গ্লাস জল দে।

একটা কাচের গ্লাসে জল আনিল রামচরণ। ঢকঢক করিয়া সমস্ত জলটা গিলিয়া হারাধন গ্লাসটা রামচরণের হাতে ফেরত দিল; রামচরণের হাত হইতে তোয়ালে লইয়া মুখ মুছিয়া তোয়ালেটা ফিরাইয়া দিয়া কহিল, হলধর ফিরেছে, খবর জানিস?

রামচরণ জবাব দিল, না হুজুর, ফেরে নি এখনও।

কোথায় গেছে সে?

নারাণপুরের জমিদারদের একটা তালুক নিলাম হচ্ছে; সেইটা ডাকবার জন্তে জেলায় গেছে—সন্ধ্যের বাসে ফিরবে।

স্মরণ হইল হারাধনের; কহিল, আচ্ছা, যা। হারাধন ইজিচেয়ারটার উপরে অর্দ্ধশায়িত হইল। রেলিঙের ফাঁক দিয়া বহুদূর দেখা যায়, গ্রামের দক্ষিণ সীমায় উঁচু পাড়ওয়ালা গড়পুকুর, তাহার পরেই সমস্ত দক্ষিণ দিকটা ব্যাপিয়া শুভঙ্করীর দাঁড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্যারীমোহনের মাঠ, একচকে প্রায় দুই হাজার বিঘা জমি, আগে নারাণপুরের জমিদারদেরও অংশ ছিল এখানে; দেনার দায়ে তাহাদের অংশ কিনিয়া লইয়াছে হারাধন। শুভঙ্করীর দাঁড়ার ওপারে, ছোট একটা গ্রাম, কৈঁদবেদে, তারপরেই দধিমুখো, গয়লাবাঁধী—ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম, হারাধনের জমিদারির মধ্যে, তার পরেই গদারডিহির জঙ্গল—চওড়া সবুজ পাড়ের মত কুচিয়া আছে দিগন্তের গায়ে। এইখানেই হারাধনের জমিদারি শেষ হইয়া নারাণপুরের আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা জুড়িয়া গদারডিহির জঙ্গল—শাল, পিয়াল, পিয়াশাল নানারকমের গাছে ভর্ত্তি। জঙ্গলটার উপরে লোভ আছে হারাধনের। তবে নারাণপুরের জমিদারির অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাহার মনোবাসনা ষোলআনা পূর্ণ হইতে দেরি নাই। নারাণপুরের মুখুজ্জেদের আগে খুব নাম-ডাক ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান জমিদারের পিতামহ যোগেন্দ্রনারায়ণের বিলাসব্যসনের মাত্রা ঐশ্বর্য্যের পরিমাণকে ছাড়াইয়া গেল, ফলে তাঁহার

জীবনকালেই বহু দেনা হইল। তাঁহার একমাত্র পুত্র নগেন্দ্রনারায়ণ সে দেনা পরিশোধ করিতে পারিলেন না, বরং বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র, বর্তমান জমিদার, ভগবতীনারায়ণ তো দেশ ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছেন এবং দেনা করিয়া সেখানের খরচ চালাইতেছেন। একটি শান্ত নিস্তব্ধ গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ হারাধনের মনে একটি আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বিষাদের সুর বাজিতে লাগিল, ঐশ্বর্য্যই সুখের কারণ নহে। সে তো অনেক ধন, অনেক ঐশ্বর্য্য আয়ত্ত করিয়াছে, কিন্তু সে সুখী কি? তাহার রুক্ষস্বভাবা চিররুগ্না স্ত্রী; একমাত্র পুত্র, সে চিররুগ্ন; ওই ভগবতী মুখুজ্জে আকণ্ঠ দেনায় ডুবিয়া থাকিয়াও হয়তো তাহার চেয়ে সুখী।

রামচরণ আসিয়া খবর দিল, গাঁয়ের জনকয়েক ভদ্রলোক দেখা করতে চাচ্ছেন। হারাধনের মুখের উপর একটি বিরক্তির ছায়া শরতের আকাশে লঘু খণ্ডমেঘের মত দ্রুত পার হইয়া গেল; কহিল, ডেকে নিয়ে আয় এখানে, আর কতকগুলো বসবার জায়গা দিয়ে যা। রামচরণ খানকয়েক চেয়ার আনিয়া রাখিয়া আগন্তুকদের ডাকিবার জন্য চলিয়া গেল।

জন-পাঁচেক ভদ্রলোক আসিলেন; গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নয়ন ঘোষাল, পোষ্টমাষ্টার, আর দুইজন ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর। হারাধন আপ্যায়নসহকারে সকলকে বসিতে বলিল। নয়ন কহিল, শরীর ভাল আছে বেশ? হারাধন নিজের পরিপুষ্ট দেহের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া কহিল, ভালই। আপনার?

নয়ন কহিল, আমাদের ভাল-মন্দর কথা ছেড়ে দেন, যা দিনকাল পড়েছে দেশে! হেডমাষ্টার গলা ঝাড়িয়া, বার দুই কাসিয়া কহিলেন, একটা অনুরোধ করবার জন্যে এসেছি আপনার কাছে।—বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন। হারাধন গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া রহিল। হেডমাষ্টার বলিলেন, খুব অন্যায় অনুরোধ নয়, জমিদারের কাছে প্রজাদের সে অনুরোধ করবার ন্যায্য অধিকার আছে। শেষের দিকে গলাটা বসিয়া গেল মাষ্টারের; উত্তেজনায় মুখটা লাল হইয়া উঠিল, রগ দুইটা গরম হইয়া উঠিল, কানের ভিতরে ঝিমঝিম শব্দ শুরু হইল, ঠোঁট শুকাইয়া উঠিল; জিব দিয়া ঠোঁট দুইটা ভিজাইয়া কহিলেন, প্রজারা আপনার সন্তানের মত, পিতার কাছে সন্তানের যে কোন দাবি-দাওয়া করতে লজ্জা নেই।

হারাধন এবার মৃদু হাসিয়া কহিল, অনুরোধটা কি?

হেডমাষ্টার কহিলেন, আপনার গোলাবাড়িতে এ বৎসর প্রচুর ধান মজুত

হয়েছে ; প্রজাদের অনুরোধ, এ ধান আপনি এ বৎসর বাইরে নিয়ে যাবেন না। যেন কোন একটা অসম্ভব অনুরোধ প্রত্যাশা করিতেছে, এই ভাবে কপাল কুঁচকাইয়া, চোখ দুইটা ছোট করিয়া হারাধন এতক্ষণ শুনিতেছিল, কথা শেষ হইবামাত্র নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেলিয়া, কপালের কুঞ্চনরেখাবলী অপসারিত করিয়া কহিল, ওঃ, এই অনুরোধ ! আমি ভাবি কি হাতী-ঘোড়া চেয়ে বসবেন ! গম্ভীর হইয়া কহিল, তা আমার উদ্দেশ্য তো হলধরের মুখে আপনাদের জানিয়েছি, হেডমাষ্টার বিনীতভাবে কহিলেন, হ্যাঁ, তা জানিয়েছেন, তাতে কারও মন নিশ্চিন্ত হয় নি, আপনার মুখে না শুনলে— । হারাধন বাধা দিয়া কহিল, বেশ আমার মুখেই শুনুন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কণ্ঠস্বর একটুখানি তীক্ষ্ণ, চোখ দুইটা একটুখানি ছোট ও দৃষ্টি একটুখানি তীব্র করিয়া কহিল, দেখুন মাষ্টার মশায়, প্রজাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের চিন্তা জমিদারকে কি পরের কাছে উপদেশ পেয়ে তবে করতে হবে ? আমি বুঝেছিলাম, বাইরে থেকে এ বছর দালালরা এসে এখানের ধান-চাল সরিয়ে ফেলবে। লোকে কাঁচা টাকা হাতে পাবার লোভে সব উজাড় ক'রে তাদের হাতে তুলে দেবে। তাই আমি তাদের আসবার আগেই সব ধান কিনে নিয়েছি, অবশ্য ন্যায্য দামে। সকলের মুখের দিকে পরপর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে চড়াইয়া কহিল, বলুন, কারও কাছ থেকে জমিদার হিসাবে জোর ক'রে, কি কম দাম দিয়ে কিছু আমি নিয়েছি ? আপনারা তো জমিদারির সব খবর রাখেন—বলুন, আপনারা সে রকম কোন অভিযোগ আমার সম্বন্ধে শুনেছেন ? সকলে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। হারাধন কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করিয়া কহিল, দু লক্ষ টাকার ওপর খরচ করেছি আমি, ওই টাকা এমনই ভাবে ফেলে না রেখে, যদি ব্যবসায় খাটাতাম তো এতদিনে লক্ষ টাকা ঘরে আসত আমার। তবু প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে, তাদের অন্নাভাব থেকে বাঁচাবার জন্যে সে ক্ষতি আমি স্বীকার করেছি। শেষ দিকটায় কণ্ঠস্বর করুণ হইয়া উঠিল হারাধনের—করুণার কোমল সজলতায় চোখ দুইটা চকচক করিতে লাগিল। সকলে হতভম্বের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নিজের প্রতি সন্তোষের সীমা রহিল না হারাধনের ; চমৎকার বক্তৃতা দিয়াছে সে ; অ্যাসেম্বিতে ঢুকিলে সেখানে সে বেমানান হইবে না।

হারাধন হেডমাষ্টারের মুখের দিকে তাকাইয়া কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ শ্লেষ মিশাইয়া কহিল, আর কিছু বলবার আছে আপনার ? হেডমাষ্টার লজ্জারক্ত মুখে কহিলেন, আজ্ঞে না, আর কি বলব ! নয়ন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, বলবার আছে বইকি। আপনি শতায়ু হয়ে প্রজাদের এমনই ভাবে মঙ্গল করতে থাকুন।

একজন ঝাঁকড়া ভুরু ও গোঁফ, খচখচে দাড়ি, ড্যাবডেবে চোখ—এতক্ষণ ভ্রু দুইটা একসঙ্গে যুক্ত করিয়া কপাল কুঁচকাইয়া শুনিতেছিল ও মাঝখানে ঠোঁট দুইটা ফাঁক করিয়া ও কণ্ঠপেশী ফুলাইয়া কি বলিবার চেষ্টা করিয়াই থামিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ মুখটা হাঁ করিয়া বলিতে শুরু করিল, আ-আ-আ—। নয়ন তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিল, চুপ কর। নয়নের হাতটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া, তাহার দিকে জলন্ত চক্ষে চাহিয়া কহিল, ব-ব-বলতে দাও—আ-আ-আমি তো ব-ব-বরাবরই বলছি যে হু-হু-হু—। বলিতে বলিতে মুখ লাল হইয়া উঠিল, চোখের তারা কপালে উঠিবার উপক্রম করিল, কপালের শিরা ও কণ্ঠপেশী ফুলিয়া উঠিল। নয়ন কহিল, থাম না, দম আটকে মারা যাবে যে! লোকটা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা হোক, হু-হু-হুজুর না বললে, হ-হু-হ—। পাশের লোকটা বলিয়া দিল, 'হলধরের'—। ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া লোকটা কহিল, সা-সাধ্যি কি!

হারাধন হাসি চাপিয়া কহিল, সত্যই তো, আমি না বললে হলধর কি এ কথা বলতে পারে? লোকটা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ব-ব-বলুন তো, আ-আ-আমি—গো-গো-গোড়া থেকে, এ-এ-এ—। বাধা দিয়া হারাধন কহিল, বুঝেছি, তা আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, চাল-ধান যা আছে সব আপনাদের জন্যেই থাকল, ঠিক সময়ে আপনারা পাবেন।

রাত্রি আটটা। বৈঠকখানায় একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া হারাধন রূপার গড়গড়ার জরির কাজ করা নল দিয়া তামাক খাইতেছিল। সচরাচর সে সিগারেট খায়; তবে গ্রামে আসিলে জমিদারী চাল বজায় রাখিবার জন্য গড়গড়া ব্যবহার করে। খাস-ভৃত্য রামচরণ দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল।

গোমস্তা, গৌরবে ম্যানেজার—হলধর সরকার হাত কচলাইতে কচলাইতে ঘরে ঢুকিয়া, হারাধনের সামনে লম্বালম্বি উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া, হারাধনের চটিজুতা যোড়া পা দুইটাতে কপাল রাখিয়া, মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল, তারপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, প্রভুর চটিজুতা হইতে যতটা সম্ভব ধূলি সংগ্রহ করিয়া তাহা মাথায় ও জিবে ঠেকাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, যুক্তহস্ত বুকে চাপিয়া ধরিল। হারাধন কহিল, ব'স। বলিয়া মুখের ইঙ্গিতে পাশের একটা বেঞ্চিকে নির্দেশ করিল। প্রভুর সম্মুখে উচ্চাসনে বসিতে কুণ্ঠিত হইল হলধর। যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেইখান হইতে একটু সরিয়া আসিয়া মেঝের উপরেই বসিয়া পড়িল।

হারাধন কহিল, কত চাল সংগ্রহ করেছ?

হলধর কহিল, প্রায় চল্লিশ হাজার মণ। হারাধন সবিস্ময়ে কহিল, বল কি,

এত ? হলধর বিনীত হাস্যসহকারে কহিল, আমাদেরই তো ছিল প্রায় দশ হাজার মণ, বাকি সব কিনেছি, সবাইকারই বিক্রি করবার খুব আগ্রহ, কাজেই খুব চড়া দরে কিনতে হয় নি।

আগ্রহ কেন ?—

এ ধারে গুজব যে, সরকার সব ধান কেড়ে নিয়ে যাবে, কাজেই যার যা ছিল বিক্রি ক'রে দিয়েছে, অবশ্যি যারা ব্যবসায়ী তারা করে নি।

হারাধন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সব বন্দোবস্ত করা হয়েছে ?

হুজুর, হ্যাঁ।

পাহারার ব্যবস্থা আছে তো ?

মাহিন্দী বাগদী আর ওর ছেলে গোকুল পালা ক'রে সারারাত পাহারা দেয়, ওরা আমাদের খুব বিশ্বাসী লোক।

হারাধন হাসিয়া কহিল, এত চাল কি হবে, কেউ প্রশ্ন করে নি ? হলধর প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, খুব। সবাইকার মুখেই এ কথা, এত চাল কি হবে !

কি বলেছ ? হলধর কহিল, আপনি যা বলতে আদেশ করেছেন, তাই বলেছি, পড়া মুখস্থ বলার সুরে বলিতে লাগিল, দেশের চাল যাতে বাইরে যেতে না পারে, সেইজন্যে হুজুর চাল আটকে রাখছেন ; শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে যখন চালের দাম আগুন হয়ে উঠবে, হুজুর তখন সস্তা দরে চাল ছাড়বেন, যারা কিনতে পারবে না তাদের দান করবেন। ঢোক গিলিয়া কহিল, দেশে ধন্য ধন্য রব প'ড়ে গেছে হুজুর।

হারাধন গম্ভীর মুখে তামাক টানিতে লাগিল ; কিছুক্ষণ পরে কহিল, তাই মতলব ছিল হলধর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারলাম কই ? হলধর বিস্ময়াহত কণ্ঠে কহিল, এবারও কি তা হ'লে—। হারাধন বাধা দিয়া কহিল, বিক্রি ক'রে দিতে হবে মিলিটারিকে, সরকারের হুকুম, না করলে একেবারে শ্রীঘরবাস, জান তো ; কি দিনকাল চলছে এখন দেশে ! হলধর আর্তকণ্ঠে কহিল, দেশে কেউ যে খেতে পাবে না হুজুর, ম'রে যাবে সব। হারাধন উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল, গীতা পড়েছ হলধর ?

হলধর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে না। হারাধন কহিল, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে গিয়ে অর্জুন যখন একটুখানি নার্ভাস হয়ে—মানে ঘাবড়ে গেলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সাহস দেবার জন্যে বলেছিলেন, হে অর্জুন, কুরুপক্ষের ঐ যে দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধারা সব চিড়বিড় করছে, ওরা সব ম'রে গেছে, শুধু ওরা নয়,

ওদের হাতী-ঘোড়াগুলো পর্য্যন্ত, কাজেই ওদের ওপর অস্ত্রাঘাত করতে কোন অধর্ম্ম নেই, বরং ধর্ম্ম, কারণ ওরা পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করছে মাত্র। ওদের পৃথিবী থেকে সরাবার জন্যেই আমি অবতীর্ণ হয়েছি। কাজেই তুমি এ কর্ম্ম না করলে, কষ্ট ক'রে আমাকেই হাতিয়ার ধরতে হবে। হলধর কহিল, যাত্রার দলে দেখেছি হুজুর, দ্রোণ-ভীষ্ম এরা আসরে এসে বেজায় দাপাদাপি করে, আসরের মাঝে বসাই দায় হয়, ওরা যদি যুদ্ধ করবার আগেই ম'রে ব'সে থাকে, তবে—। হারাধন কহিল, ওসব কথা তুমি বুঝবে না হলধর। আসল কথা কি জান, আমাদের দেশের পিলে-পেটা, হাড়-জিরজিরে লোকগুলো মরুক আর বাঁচুক তাতে পৃথিবীর কিছু যাবে আসবে না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, অর্থাৎ যারা বীর তাদেরই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা উচিত। কাজেই সরকার ঠিক করেছেন, দেশ-বিদেশের যারা ভারতবর্ষে এসে যুদ্ধ করছে, তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা আগে করতে হবে, তারপর যা বাঁচবে সাহেবরা পাবে, আর যারা যুদ্ধে সাহায্য করছে, যেমন মন্ত্রী, সরকারী কর্ম্মচারী, আমাদের মত মিলিটারী কণ্ট্রাক্টার ইত্যাদি তারা পাবে, তারপরেও খুদ-কুঁড়ো যা বাঁচবে, পায়রাদের ধান ছড়িয়ে দেবার মত ছড়িয়ে দেওয়া হবে সারাদেশে, যে যা পারে খুঁটে খাবে।

হলধর ফ্যালফ্যাল করিয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর ভ্যাক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, হুজুর, আমারও যে কিছুই নেই, ওই চালের ওপর নির্ভর ক'রে ব'সে আছি, শুধু আমি নয়, আপনার চাকর-বাকর সব।

হারাধন বরাভয়দানের ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়া কহিল, তোমাদের কোন ভয় নেই হলধর, তোমরাও তো যুদ্ধে সাহায্য করেছ। এই যে এত চাল সংগ্রহ করা, তাদের বস্তাবন্দী করা, পাহারা দেওয়া, গ্রামের লোককে ভুজুং দেওয়া, এ সব তো তোমরাই করেছ, আমি আর কতটুকু করেছি বল, ভগবান হাতে টাকা দিয়েছেন, খরচ করেছি মাত্র।

হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া হারাধন কহিল, সবই ভগবানের লীলা হলধর, কেউ কিছু করে নি, তিনিই যাকে যা করবার করিয়েছেন। বলিয়া কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া হারাধন বোধ করি মানসচক্ষে ভগবানের লীলা সন্দর্শন করিতে লাগিল, তারপর চোখ খুলিয়া কহিল, আমার গুরুদেব কি বলেন জান হলধর? মহাকালের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল একাকার হয়ে যাবে।

হলধর কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, তাণ্ডবনৃত্য কি হুজুর?

হারাধন কহিল, জান না? আচ্ছা, চালগুলো ভালয় ভালয় পার ক'রে দাও, তারপর তোমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেখাব।

হুজুর, মহাকাল না কি বললেন, উনি কি আজকাল কলকাতাতেই নাচছেন ?

হারাধন হাসিয়া কহিল, আরে, মহাকালের নাচ তো জগৎ জুড়েই চলছে, কলকাতায় নাচে আমাদের সব বাঙালী নাচিয়েরা, গাট্টা-গোট্টা চেহারা, মাথায় বাবরি চুল, সাজগোজ ক'রে হাত-পা ছুঁড়ে সে কি নাচ ! দেখে তাক লেগে যাবে তোমার। দশ টাকা ক'রে টিকিট। তা পয়সা দেওয়া সার্থক কিন্তু। কিন্তু কত বড় বড় ঘরের মেয়েরা হরেক রকমের সাজপোশাক প'রে পরী হুরী সেজে দেখতে আসে, আশেপাশে সামনে পেছনে ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি ক'রে বসে, তারই দাম এক শো টাকা; নাচটা তো ফাউ, তা তুমি সব ব্যবস্থা ক'রে দাও, তারপর কলকাতায় গিয়ে দেখে আসবে।

হলধর কহিল, এত চাল কি গরুর গাড়িতেই যাবে ? তা হ'লে কিন্তু সবাই জানতে পারবে, তারপর মাল গাঁ থেকে বার করা দায় হয়ে উঠবে।

হারাধন কহিল, সে বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা নেই। জেলার বড় হাকিম এস. ডি. ও. সে বিষয়ে ভার নিয়েছেন। চল্লিশ-পঞ্চাশখানা লরি আসবে, রাতারাতি সব ধান ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তারপর রেল কোম্পানির ভার। তুমি কেবল গাঁয়ের লোককে ঠাণ্ডা ক'রে রেখো।

হলধর কহিল, তা না হয় রাখলাম হুজুর, কিন্তু পরে যখন জানতে পারবে তখন মেরে গুঁড়ো ক'রে দেবে সবাইকে; মুখের অন্ন যারা কেড়ে নিয়ে যায়, তাদিকে কি কেউ ছেড়ে দেয় হুজুর ?

অবজ্ঞার স্বরে হারাধন কহিল, সব করবে ! এই যে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে সব ধান-চাল সরিয়ে দিয়েছে সরকার, সবাই জানতেও তো পেরেছে, কে কি করেছে ? দিনকতক হা-হা, হু-হু, হৈ-চৈ, তারপর যে-কে সেই ! মরদের বাচ্চা কি এদেশে আছে হলধর ? সব মরা মানুষ, বললাম যে এখনই।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তা ছাড়া তোমার কোন ভয় নেই। তোমাকে এখানে থাকতে হবে না, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একটা ব্যবসাতে ঢুকিয়ে দোব এখন; তারপর সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ফিরে আসবে। ঠাণ্ডা না হ'লেও ক্ষতি নেই, কারণ যে পদ নিয়ে তুমি আসবে, সবাইকে ঠাণ্ডা ক'রে দেবার দাওয়াই তোমার হাতে থাকবে।

হলধর বোকার মত কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, বুঝলাম না হুজুর।

হারাধন মুচকি হাসিয়া কহিল, তুমি তো এখন একজন ক্ষুদে জমিদারের গোমস্তা, যখন আসবে তখন হবে একটা বড় জমিদারের ম্যানেজার।

হলধর সবিস্ময়ে কহিল, আপনি কি নতুন জমিদারি কিনছেন হুজুর?

হারাধন পুরাপুরি হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ হে, নারাণপুরের ভগবতীবাবুর এক মাড়োয়ারীর কাছে অনেক টাকা দেনা। তার সুদ ঠেলে জমিদারির খাজনা মেটানোই তাঁর দায় হয়েছে। তাই জমিদারিটা মাড়োয়ারীকেই বিক্রি করছিলেন। আমাদের বড় হাকিম এস. ডি. ও. তা জানতে পেরেই ভগবতীবাবুকে নিষেধ ক'রে দেন, আর আমাকে জমিদারিটা কেনবার জন্যে অনুরোধ করেন। ভগবতীবাবু ওঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়; আর আমার তো বন্ধু, কলকাতায় আলাপ। তা উনিই সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এই জমিদারিটা কেনবার জন্যেই ধানগুলো বিক্রি করতে হচ্ছে, না হ'লে গেছই বা প্রজারা এক বছর। একটু হাসিয়া কহিল, তুমি হয়তো বলবে, আপনার কি টাকার অভাব? কিন্তু কথাটা কি জান, একটা কেন, দশটা জমিদারি কেনবার টাকা আমার আছে, তবে ব্যবসার টাকা জমিদারিতে খরচ করতে চাই না, চাইলেও করবার উপায় নেই, গুরুদেবের কড়া নিষেধ, বলেছেন, কখনও তা ক'রো না বাবা। ওতে কোনটাই ভাল ক'রে চলে না। বলিয়া গুরুদেবের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। হলধর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হারাধন কহিল, আমাদের বড় হাকিমকে দেখেছ হলধর?

হলধর একগাল হাসিয়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেছি বইকি, এদিকে আসেন মাঝে মাঝে, তবে আমাদের মত লোকের সঙ্গে তো হুজুর—

হারাধন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, খুব ভাল লোক, হিন্দু ব্যবসাদাররা তো ওঁর মত হাকিম পেয়ে বর্তে গেল যুদ্ধের বাজারে। আমারও খুব উপকার করেছেন উনি; না থাকলে কিছুই হ'ত না।

ঢোক গিলিয়া কহিল, তা আমিও নেমকহারামি করব না, হাকিম-গিন্নীকে হাজার বিশেক টাকার একটা হীরের নেকলেস দোব ভাবছি। এখানের খুদে হাকিমগুলিও অনেক উপকার করলেন, ওঁদের তো আর মাথাপিছু কিছু দিতে পারব না, তবে ওঁদের ক্লাবে হাজার দুই টাকা দিয়ে দোব।

হলধর কহিল, ক্লাব কি হুজুর?

তা জান না। যেখানে হাকিমরা খেলাধুলো করেন, ফুর্তি করেন—

হলধর চোখ বড় করিয়া কহিল, হাকিমরাও খেলা করেন! আমি তো ভাবতাম, ওঁরা দিনরাত পোশাক এঁটে, গোমড়া মুখ ক'রে ব'সেই থাকেন।

হারাধন হাসিয়া কহিল, তুমি ভারী বোকা হলধর, হাকিম হ'লেও তো ওঁরা মানুষ ; কাজের সময় কাজ করেন, তখন হাকিমী মেজাজে থাকেন ; আবার কাজ শেষ হ'লেই তোমার আমার মত গল্পগুজব করেন, খেলাধুলো করেন। দেবতারা পর্য্যন্ত লীলা করেন, আর হাকিমরা করবেন না !

হলধর মাথা চুলকাইয়া কহিল, তা বটে হুজুর। কিন্তু একটা কথা আমি ভাবছি, নদিতে তো মাল যাবে, কিন্তু শব্দ তো একটু হবেই, তখন যদি লোকে জানতে পারে ?

হারাধন বেপরোয়াভাবে কহিল, পারলেই বা, সঙ্গে বন্দুকধারী পুলিস পাহারা থাকবে, দু-চারবার আওয়াজ করলেই যে যার ঘরে ঢুকবে।

হলধর কহিল, আমি বলি কি, হুজুর, ও সবে কাজ নেই। হাতাহাতি শিবরাত্তির মেলা আসছে ; গাঁয়ের ছোকরারা থিয়েটার করবার জন্তে ঝুঁকেছে, তা আপনি এত দিকে এত টাকা খরচ করছেন, এ বাবদেও যদি কিছু দেন তো আপনার নামও হবে, আর থিয়েটার যদি হয়তো এ তল্লাটের কেউ বাড়িতে থাকবে না, সব জড় হবে গিয়ে শিবতলাতে ; তখন চুপচাপ মাল পার ক'রে দিলেই হবে।

হারাধন পুলকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, ঠিক বলেছ। তুমি বোকা নও হলধর। বুদ্ধি আছে তোমার, তবে এখনও ধার পড়ে নি বেশ ; দিন কতক কলকাতাতে থাকলেই বুদ্ধিতে শান পড়বে তোমার ; তোমাকে মানুষের মত মানুষ ক'রে দোব আমি, এ তল্লাটে আমার নীচেই হবে তোমার স্থান।

হলধর কৃতজ্ঞতায় একেবারে গলিয়া গিয়া কহিল, হুজুর, আপনিই আমার মা-বাপ ; আমার ভগবানের নীচেই আপনি, পূজোর ঘরে, নিতাই-গৌরের পটের পাশেই আপনার ফটক রেখেছি হুজুর। গোবরার মা (হলধরের স্ত্রী) নিত্যি পূজো করে।

হারাধন সন্তোষের হাসি হাসিয়া কহিল, তাই নাকি ! পাগল।

সেইদিন রাত্রি দশটার সময়ে রমেশ কবিরাজের ডিসপেন্সারিতে গ্রামের ছোকরারা হলধরের প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল। এইখানেই তাহাদের প্রাত্যহিক সান্ধ্য-আড্ডা বসে। রাত্রে রমেশের কোন কাজকর্ম্ম থাকে না ; কাজেই ইহার জন্ত তাহার কোন ক্ষতি হয় না ; বরং মোদক বিক্রয়ের দরুন কিছু লাভই হয়। হলধরের বয়স ত্রিশের কোঠায় অনেকটা অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও সে ইহাদের বন্ধু। হলধরের গোলগাল চেহারা, শ্মশ্রুবিরল মুখ, নারীসুলভ কোমল কণ্ঠ ; ফলে কেহই তাহাকে বয়োজ্যেষ্ঠের খাতির দিতে চাহে না। মাঝে মাঝে নিজ

পদমর্য্যাদা স্মরণ করিয়া সে গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করে, কিন্তু বেশিক্ষণ বজায় রাখিতে পারে না, অনভ্যস্ত পোশাকের মত অচিরে তাহা বর্জ্জন করিয়া সকলের সহিত আবার হাসি-গল্প শুরু করিয়া দেয়।

গত রাস-পূর্ণিমা হইতে রায়হাটির ছোকরারা লজ্জায় কাহারও কাছে মাথা তুলিতে পারিতেছে না। পাশেই বড়জুড়ি গ্রাম। ওখানের ছোকরারা গত রাস-পূর্ণিমায় তিন দিন নিজেদের দলের 'শখের যাত্রা' করিয়াছে, অথচ তাহারা একটা ঝুমুরের দল ডাকিয়াও গাওনা করাইতে পারে নাই। রায়হাটির এই কলঙ্ককালিমা সাফ করিবার জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, কিন্তু গ্রামের লোকগুলির স্বাভাবিক ঔদাসীন্যের জন্য বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহারা ডুগি-তবলা ও ঢোল কিনিয়াছে, একটা ভাঙা হারমোনিয়াম সারাইয়া কাজ-চলা গোছের করিয়া লইয়াছে, একখানা বই কিনিয়া নিয়মিত রিহার্সাল চালাইতেছে, কিন্তু যাহা আসল অর্থাৎ টাকা, তাহারই কোন ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। মাগ্গিগণ্ডার বাজারের জন্য গ্রামের কেহ একটি পয়সা বাহির করিতে চাহে নাই, কাজেই তাহাদের গোপনে চাল-ধান বিক্রয় ও পিতৃদেবদের পকেট-মারা-লব্ধ সামান্য সঞ্চয়কে অবলম্বন করিয়া কি করিয়া এই বিরাট কাজ হাসিল করিবে, ভাবিয়া সকলে সমবেতভাবে সমাকুল হইয়া উঠিয়াছে। জমিদার হারাধনবাবুর শুভাগমনের বার্ত্তা শুনিয়া তাহারা নিকষ-কৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম আলোর রেখা দেখিতে পাইল এবং হলধর বাস হইতে নামিবামাত্র তাহাকে ঘেরাও করিয়া জমিদারের কাছে কথাটা কলে-কৌশলে পাড়িবার জন্য অনুরোধ করিল।

হলধর আসিবামাত্র ছোকরারা সমস্বরে প্রশ্ন করিল, কি হ'ল হলধরদা?

আশু ভবিষ্যতে যাহাকে বহুবিস্তৃত জমিদারির ম্যানেজার হইতে হইবে, তাহার এই চ্যাংড়া ছোঁড়াদের সঙ্গে হাসিয়া কথাবার্ত্তা বলা চলে না। কাজেই হলধর গুরু-গাম্ভীর্য্যে মুখ হাঁড়ির মত করিয়া কহিল, বলছি, তোমরা স্থির হয়ে ব'স দেখি।

হলধরের গাম্ভীর্য্য! হলধরের মাকুন্দে মুখে যদি এক নিমেষে গোঁফ-দাড়ি গজাইয়া উঠিত তো কেহ এতটা বিস্মিত হইত না। সকলে হকচকিয়া গিয়া একসঙ্গে বোকার মত হাসিয়া একসঙ্গেই থিতাইয়া গেল। হলধর একপাশে গম্ভীর মুখে পায়ের উপর পা চাপাইয়া বসিল। হায়! ভগবান যদি তাহাকে এক জোড়া টাঙির মত গোঁফ দিতেন! তাহা হইলে তা দিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ হলধর ব্যর্থ হইতে দিত না। সবাই চুপচাপ, মশকের গুঞ্জন স্পষ্ট শুনা

যাইতে লাগিল। বিশু হালদার, হলধরের প্রায় সমবয়সী ; ভয়ে ভয়ে কহিল, কি হে! খবর খুব খারাপ নাকি ?

হলধর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

সমস্বরে প্রশ্ন হইল, তবে ? এমন থমথমে হয়ে উঠলে কেন বল দেখি ?

হলধর পোজ না বদলাইয়া কহিল, থমথমে আবার কি। এতবড় জমিদারি যার মাথায়, তার কি খেলোমি করলে চলে ?

একজন স্নেহের সহিত কহিল, এতদিন চলল, হঠাৎ আজই অচল হয়ে উঠল। জমিদার ধমক-টমক দিয়েছে নাকি ?

ধমক! আমাকে ? বলিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিল হলধর।

বিশু কহিল, ওসব বাজে কথা যাক, জমিদার টাকা দেবেন কি না বল দেখি ?

হলধর কহিল, দেবেন তো বলছি। সমস্বরে প্রশ্ন হইল, কত ? হলধর জবাব দিল, পঁচিশ।

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া উঠিল সব ; বিশুই প্রথমে সামলাইয়া লইয়া কহিল, বল কি! অ্যাঁ! এতে যাত্রা কেন, থিয়েটার হবে যে! যা কখনও এ তল্লাটে হয় নি ; বড়জুড়ির ছোঁড়াগুলো 'শখের যাত্রা' ক'রে ধরাকে সরা দেখছে, এর পর টুঁ করবার জোটি থাকবে না বাছাধনদের।

হলধর কহিল, হবেই তো। জমিদারবাবু বললেন, ছেলেরা যদি একটু ফুর্তি করতে চায় তো যাত্রা কেন, থিয়েটারই করুক, যা খরচ লাগে আমি দোব।

সকলে ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিল, একজন কহিল, এ যে গৌরীসেনকেও হার মানিয়ে দিলে হে, বলতে না বলতেই পাঁচশো টাকা।

হলধর মৃদু হাসিয়া কহিল, ওঁর কাছে পাঁচশো টাকা আবার টাকা! যাঁর দিন দশ হাজার টাকা আয়—

সকলে চোখ বড় করিয়া কহিল, বল কি! ক্ষণজন্মা পুরুষ!

হলধর কহিল, কিন্তু ভাই যা-তা বই করলে চলবে না ; সরকারের সঙ্গে ওঁর হরদম কারবার ; তা ছাড়া ধর্ম্ম করছেন আজকাল, বললেন, এমন বই করতে হবে যাতে যুদ্ধ-টুদ্ধ লাফ-ঝাঁপ থাকবে না। বেশ মোলায়েম ধরনের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বই, যাতে শুধু নরম নরম বক্তৃতা আর গান থাকবে, অবশ্য দু-চারটে নাচ থাকলেও আপত্তি নেই।

বিশু কহিল, বেশ তো। তেমনই বই করব। ধর বিল্বমঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র।

হলধর কহিল, বিল্বমঙ্গলই ভাল, হরিশ্চন্দ্রে একটু হাঁকডাক আছে, শুনেছি বলের গানে। যখন বারণই করেছে, থাক না ভাই, বিল্বমঙ্গলই ভাল।

একজন কহিল, চিন্তামণির পার্ট তা হ'লে হলধরদাদা নিচ্ছ তো, বেশ গোঁফদাড়ি কামাতে হবে না।

আর একজন কহিল, হ্যাঁ হলধরদাকে মানাবে মন্দ নয়; একটু মুটকি হয়ে যাবে, তা চিন্তামণিকে যে প্যাঁকাটি-মার্কা হতেই হবে তার কোন মানে নেই।

হলধর কহিল, না ভাই, আমার অনেক কাজ হাতে, আমাকে বাদ দাও। হয়তো সে সময় থাকতেই পারব না আমি।

সকলেই অনুযোগের স্বরে কহিল, বা রে! তা কি হয়! তোমার দৌলতেই টাকা, আর তুমি থাকবে না?

হলধর কহিল, তা হোক ভাই, তোমরা ফুর্ত্তি কর, যারা কাজের লোক তাদের কি এসব চলে?

সেইদিন রাত্রে—রাত্রি এগারোটা। মাহিন্দী বাগদী ও তাহার বেয়াই লখাই উঠানে বসিয়া মদ খাইতেছিল। এক পাশে মদের হাঁড়ি, সামনে একটা থালায় কতকগুলা মুড়ি ও একটা পাতায় পাঁঠার নাড়ীভুঁড়ি-ভাজা। লখাই এক ভাঁড় মদ গিলিয়া এক থাবা চাট মুখে ভরিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহিল, তোমরা বেশ আছ মাইরি, আমাদের তুবেলা ভাত জুটছে না, আর তোমাদের নবাবী খানা!

মাহিন্দী তাহার টাঙ্গির মত গোঁফের ডান প্রান্তটা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী দ্বারা চুমরাইতে চুমরাইতে পরম তৃপ্তির সহিত কহিল, ই, তা বটে, বলছি যে, তোমরা এখানে চ'লে এস সবাই, গোমস্তাবাবুকে ব'লে অশথতলার জায়গাটা ক'রে দেওয়াব, তা তোমার মনে লাগছে কই? কি গুণ যে আছে মাইরি তোমার ওই ল'গাঁয়ের ভাঙা কুঁড়ের যে, নড়তে চাচ্ছ না কিছুতেই।

লখাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমার কি আর অসাধ হে, বুড়ী মা মাগী যত গোল লাগিয়েছে। বুড়ী মরবে না কিছুতেই, নড়তেও চাইবে না। বলে, সোয়ামী-শ্বশুরের ভিটে, না খেয়ে মরব এখানে, তবু ভিন গাঁয়ে যেতে নারব।

একটা চুটি ধরাইয়া টানিতে টানিতে লখাই কহিল, বেগতিক দেখলে আসতেই হবে শেষে, বুড়ী না আসে তো মরবে বেঘোরে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আজ তোমাকে পাহারা দিতে যেতে হবে না?

মাহিন্দী কহিল, যাব শেষ পহরে, গোকুল দিচ্ছে এখন, আমি যেয়ে ছাড়ান ক'রে দিব তাকে। কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিল, জোয়ান বউ ঘরে, সারারাত কি

বাইরে থাকতে পারে, কি বল হে ?—বলিয়া ঝাঁকড়া ভুরু নাচাইয়া, লখাইকে কনুইয়ের গুঁতা দিল মাহিন্দী।

লখাই গুঁতা সামলাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া চাপা কণ্ঠে কহিল, যা বলেছ ! আমরা এখন বনে-বাদাড়ে সারারাত প'ড়ে থাকলেও কারও যায়-আসে না।

সক্ষোভে কহিল, কি দিন গেছে মাইরি ! ভাটিখানা থেকে ঘরে ফিরতে একটু রাত হ'লেই মুখ একেবারে হাঁড়ি, কত সাধ্যি-সাধনা করলে হাসি ফুটত, এখন এই দেখ না, এখানে যদি এক মাস ব'সে থাকি তো মাগীর গায়েই লাগবে না।—বলিয়া মুখটা বিরস করিয়া চুটি টানিতে লাগিল।

বেয়াইয়ের এক মাস বসিয়া থাকার সম্ভাবনা শুনিয়া মাহিন্দী শঙ্কিত হইয়া উঠিল; সেঁতো হাসি হাসিয়া কহিল, বেশ তো, থাকই না বেয়াই, দেখি বেয়ান কি করে।

চোখ মটকাইয়া কহিল, বেয়ানের এ বয়সেও যা ঠসক, বল তো আমিই যেয়ে থাকব বেয়ানের কাছে।

মাহিন্দীর স্ত্রী শুনিতে পাইয়া কহিল, অ্যাঁ, মর্ মিনসে, কথা দেখ, বুড়িয়ে মরতে যাচ্ছে, এখনও রস মরল না বুড়োর ! দুই বৈবাহিক হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

লখাই কহিল, গেলই বা বেয়ান, আমি থাকব, তার আর কি !

মাহিন্দী-গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, আ মরণ !

লখাই কহিল, আমাদের ওখানে চাল-ধান এখনই যা মাগ্‌গি হয়েছে, আষাঢ়-শ্রাবণে যে কি দশা হবে, কে জানে ? তোমাদের এখানে তো রামরাজত্বি, যা শুনছি, এ রকম জমিদার লাখে একটা হয় কি না সন্দেহ।

মাহিন্দী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা সত্যি।

লখাই বোধ করি মাহিন্দীর কাছ হইতে কিঞ্চিৎ প্রতিবাদের আশা করিয়াছিল, মাহিন্দীর প্রকাশ্য স্বীকৃতিতে নিরাশ হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, এ তল্লাটের সব ধানই তো নিয়েছেন তোমাদের জমিদার।

মাহিন্দী প্রতিবাদে কহিল, নিবেন কিসের লেগে, নগদ পয়সা দিয়ে কিনেছেন।

ঔৎসুক্যের সহিত লখাই কহিল, সব তোমাদের লেগে তো ?

মাহিন্দী জোর দিয়া কহিল, নিশ্চয়। জমিদারির সব্বাইয়ের লেগে, কেউ

যাদ যাবে না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, জমিদারি না থাকলে মান থাকে না ভাই, না হ'লে জমিদারির জন্তে থোড়াই পরোয়া করে জমিদার। লাখ লাখ টাকা ঘরে ঢোকে ব্যবসাতে, কি হবে এত টাকায়? একটি মাত্র ছেলে, তাও পাঁকাটির মত চেহারা।

কত ধান আছে, দেখেছ?

মাতিন্দী ঢোক গিলিয়া কহিল, তা দেখেছি বইকি। আসলে কিছুই দেখে নাই মাতিন্দী। প্রায় আট-দশ বিঘা জায়গায় উঁচু দেওয়াল দিয়া ঘেরা জমিদারের গোলাবাড়ি, জমিদারির সমস্ত ধান আসিয়া এখানে জমে; এইখানেই ছোট একটা অয়েল এঞ্জিন দিয়া ধান ভানা হয়, তৈরি চাল বস্তাবন্দী হইয়া গুদামজাত হয়। পশ্চিমা পাইক লছমন সিং, রামসুন্দর সিং আর হলধর এসব তদবির করে, ভিতরে ঢুকিবার এখতিয়ার নাই মাতিন্দীর। তবু বেয়াইয়ের কাছে নিজের মর্য্যাদা বজায় রাখিতে হইবে তো!

মাতিন্দী কহিল, বিস্তর ধান, ধানের পাহাড় একেবারে, পর পর দুবছর অজন্মা হ'লেও এ তল্লাটের লোকের চিন্তা নেই।

লখাই কিছুক্ষণ গুম হইয়া ভাবিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, যা বলছ ভাই, তাই করব আমি, চ'লেই আসব আমি এখানে, তুমি গোমস্তাবাবুকে ব'লে রেখো আমার জন্তে।

শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রি। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে বুড়া শিবের মন্দিরে সন্ধ্যার পর হইতেই ভিড় জমিতে শুরু করিয়াছে। মন্দিরের চত্বরে, নাটমন্দিরে, মন্দিরের আশেপাশে যেখানে যতটুকু স্থান আছে, মানুষে ভর্ত্তি হইয়া উঠিতেছে। দুই-চারিটা খাবারের দোকান বসিয়াছে, তক্তাপোশের উপর থালায় থালায় সাজানো জিলাপী, মণ্ডা, মুড়ি, মুড়কি, তেলেভাজা ইত্যাদি; দোকানের সামনে ছেলে-মেয়েদের ভিড়। একটা বড় খাবারের দোকানে কড়াভর্ত্তি রসগোল্লা ও পানতুয়া; উনানে আঁচ দেওয়া হইয়াছে; ধোঁয়াতে চারিপাশ ভরিয়া উঠিয়াছে, নাকে চোখে ঢুকিয়া দর্শকবৃন্দের দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে ও চোখে জল ঝরিতেছে, তবু কেহ নড়িতেছে না। কারণ, অদূরে একটা বড় থালায় ময়দা মাখা হইয়াছে, এখনই কড়া চাপিবে, লুচি ভাজা হইবে, গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিবে; দর্শকবৃন্দের অনেকের ভাগ্যে তাহার আস্বাদ লাভ করিবার সৌভাগ্য হইবে না, তবু দেখিয়াও সুখ। পানের দোকানও বসিয়াছে দুই-তিনটা, সস্তা সিগারেট ও বিড়ি বিক্রয় হইতেছে সেখানে। পাড়াগাঁয়ের নিম্নশ্রেণীর যুবকেরা, তৈলচিক্কণ চুলে তেড়ি কাটিয়া, ফেরতা দিয়া কাপড় পরিয়া, গায়ে রঙিন গেঞ্জি আঁটিয়া,

এক-এক পয়সার পান খাইয়া মুখ লাল করিয়া, এক-একটা সস্তা সিগারেট টানিতে টানিতে নিম্নশ্রেণীর যুবতী মেয়েদের পিছনে পিছনে ঘুরিতেছে। মেয়েরাও সাজিয়াছে সাধ্যমত; চুল বাঁধিয়া চাকাবেণীর চারিদিকে বেলকাঁটা গুঁজিয়াছে; তেল গড়াইয়া কানের পাশ ও কপাল চকচক করিতেছে; চোখে কাজল পরিয়াছে কেহ কেহ; কাহারও কপালে কাচপোকার টিপ, গালে পান; ফুলপাড় শাড়ি যত্ন করিয়া পরিয়াছে; কাহারও বা শাড়ির নীচে টকটকে লাল রঙের সায়া, গায়ে সস্তা ছিটের ব্লাউজ; কাহারও সায়া-সেমিজ নাই, গায়ে শুধু চটকদার রঙওয়ালা ব্লাউস, কেহবা শুধু শাড়িখানি আঁটসাঁট করিয়া পরিয়া, যৌবন-সমৃদ্ধ বুকখানি সযত্নে ঢাকিয়া গাছ-কোমর বাঁধিয়াছে। একটা লোক সাপুড়ে বাঁশী বাজাইয়া ফুলছড়ি বিক্রয় করিতেছে—তাহাকে ঘেরিয়া ছেলেমেয়েরা ভিড় করিয়াছে। মেলার এক পাশে জুয়াখেলা চলিতেছে, খেলোয়াড় একটা শতরঞ্চির উপর খেলা পাতিয়া বসিয়াছে, পাশেই একটা টুলে একটা গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে; তাহাকে ঘেরিয়া বিস্তর লোক জড় হইয়াছে, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া; একটা লোক ক্রমাগত হাঁকিতেছে, ভারী মজার খেলা, চ'লে এস ভাই, এক-এক পয়সায় দো-দো পয়সা। কিছুদূরে একটা লোক মনিহারী দোকান পাতিয়াছে—রেশমী চুড়ি, রঙিন কাচের চুড়ি, ঘুনসি, মালা, কালো ফিতা, চীনেমাটির খেলনা ইত্যাদি হরেক রকমের জিনিস সাজাইয়াছে। তাহাকে ঘেরিয়া নানা বয়সের মেয়েদের ভিড়, লোভে ও প্রশংসায় উজ্জ্বল তাহাদের চোখ। দুই-চারিজন উবু হইয়া বসিয়া আছে; দোকানী মেয়েদের নরম হাতগুলি নিজের কড়া হাতে চাপিয়া ধরিয়া ধীরেসুস্থে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চুড়ি পরাইতেছে, কেহ চুড়িতে হাত দিতে গেলেই সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বলিতেছে, ছুঁয়ো না বাছা, ঠুনকো জিনিস, ভেঙে গেলে মিছিমিছি গচ্চা দিবে কেনে? গণিকাদেরও আমদানি হইয়াছে, আমসির মত শুকনা, পাকানো চেহারা, কুৎসিত সাজসজ্জা, বীভৎস ভাবভঙ্গী, শিকার দেখিলেই অস্ত্র হানিতেছে, ভোঁতা অস্ত্র ঠিকরাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, শিকার অবলীলাক্রমে নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

আরও কতকটা দূরে মাঠের মধ্যে জমি চাঁচিয়া-ছুলিয়া পরিষ্কার করিয়া, শামিয়ানা টাঙাইয়া, থিয়েটারের ব্যবস্থা হইয়াছে। এক দিকে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছে, ষ্টেজের সামনে ড্রপসিন ঝুলিতেছে, উপরে শিবাজীর ছবি, ধাবমান সাদা ঘোড়ায় আসীন, এক হাতে বর্শা, আর এক হাতে কোষমুক্ত তরবারি, দূরে প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গের চূড়া দৃশ্যমান, সাইড স্ক্রিনে বঙ্কিমঠামে দণ্ডায়মানা অতি-পীনোন্নত-পয়োধরা যুবতীর ছবি, চোখে কটাক্ষ, ওষ্ঠে হাসি, অঞ্জলিবদ্ধ হাতে

রক্তকমলের অর্ঘ্য। এখানেও বিস্তর মেয়ে-পুরুষের ভিড়। সকলের মুখে বিস্ময় ও কৌতুক সুপরিস্ফুট। এ তল্লাটে আগে থিয়েটার কখনও হয় নাই। শখের যাত্রা হয়, আসরের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া শ্রোতারা বসে, আসরের মধ্যে অভিনেতারা ঘুরিয়া বক্তৃতা ও গান করে। তিন দিক ঘেরা ঘরের মধ্যে কি রকমের যাত্রা! সকলকেই সামনের দিকে বসিতে হইবে। পিছনে কিংবা আশেপাশে বসিলেই সব মাটি! গোঁফদাড়ি-কামানো ভদ্রলোকের ছেলেরা সিগারেট টানিতে টানিতে ব্যস্ততার সহিত ঘুরা ফিরা করিতেছে এবং সুযোগ পাইলে আশেপাশে চোখে-লাগা মেয়েদের এক চোখ দেখিয়া লইতেছে।

রাত্রি বারোটায় সময়ে থিয়েটার আরম্ভ হইল। ভিড়ের আর অন্ত নাই; আশেপাশে দশ-বারোটা গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা, নেহাত শয্যাশায়ী রোগী ছাড়া সকলে আসিয়াছে। শহর হইতে একটা কনসার্ট পার্টি আসিয়াছে; তাহারা মজাদার নাচের সুর বাজাইতেছে। যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে; যাহারা বসিয়া আছে, তাহারা হাঁটু অথবা মাথা নাড়িতেছে; যাহারা আরও একটু বেশি রসগ্রাহী, তাহারা তালি দিতে শুরু করিয়াছে।

মাহিন্দী বাগ্দী ও তস্য পুত্র গোকুলের আজ ছুটি। বাপ-বেটার মদে চুর হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটা টকটকে লাল, গাল ও নাকের ডগা যেন ফুলিয়া চকচকে হইয়া উঠিয়াছে; ঠোঁট দুইটা মাঝে মাঝে চাড় দিয়া লম্বা করিতেছে, কখনও গুটাইয়া ছুঁচালো করিতেছে; মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া; লাঠি ঘাড়ে টুলিতে টলিতে এখানে সেখানে ছুটিতেছে ও শিথিল কর্কশ কণ্ঠে হাঁক-ডাক করিয়া জনতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

রাত্রি দুইটা। গোলাবাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপরে সারি-সারি চল্লিশ-পঞ্চাশখানা বড় বড় লরি দাঁড়াইয়া আছে। প্রায় পঞ্চাশজন লোক পিঠের উপর বস্তা বহিয়া আনিয়া লরি বোঝাই করিতেছে; বোঝাই শেষ হইবামাত্র লরিগুলা গম্ভীর চাপা গর্জ্জন করিয়া ছুটিতে শুরু করিতেছে; ছয় মাইল দূরে রেল-ষ্টেশনে মাল খালাস করিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ঘণ্টা দুই-আড়াইয়ের মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার মণ চাল সাফ হইয়া গেল। রামসুন্দর সিং সদর-দরজায় ভারী তালা ঝুলাইয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে গেল।

সারা তল্লাটে জমিদারের প্রশংসায় কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল। প্রজাদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্ত জমিদারের এত চেষ্টা প্রায় দেখা যায় না। জয়

হউক হারাধন রায়ের, তাহার টিকটিকির মত ছেলেটি তাকিল্‌-মাফিক হইয়া উঠুক।

পরদিন রাত্রি হইতে মাহিন্দী ও তাহার ছেলে গোকুল আবার তেমনই নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সহিত পাহারা দিতে লাগিল। গ্রামের লোক তেমনই নিশ্চিন্তে তাস-পাশা খেলিতে ও পরচর্চ্চা করিতে লাগিল, থিয়েটার-করা ছেলেগুলি নিজ নিজ কৃতিত্বের গৌরবে মশগুল হইয়া রহিল; পথচারী পথিকেরা গোলাবাড়ির পাশ দিয়া যাওয়া-আসার সময়ে ধান্ত স্তূপের পরিধি ও উচ্চতা সম্বন্ধে আগের মতই আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিল; যাহারা হারাধনের প্রজা নহে, তাহারা আগের মতই হিংসায় পুড়িতে লাগিল।

মাস দুই যাইতে না যাইতে চালের মণ দশ হইতে কুড়িতে উঠিল। মধ্যবিত্তেরা প্রথমে পুঁজি ভাঙিয়া, পরে জমি-জায়গা বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া, গহনা-পত্র, গরু-বাছুর, থালা-বাটি, কাপড়-চোপড় বিক্রয় করিয়া চাল সংগ্রহ করিতে লাগিল; শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া সপরিবারে অণ্ডাল ও আসানসোল অঞ্চলে, যেখানে বিস্তর মিলিটারির কাজ চলিতেছিল, সেখানে পলাইতে লাগিল; যাহারা অক্ষম ও দুর্ব্বল তাহারা ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং ভিক্ষা না পাইলে ঘাস ও গাছের পাতা-সিদ্ধ, ফল-মূল খাইয়া পেট ভরাইতে লাগিল এবং তাহাদের স্ত্রী, বধূ ও কন্যারা অনেকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিল। চাউলের ব্যবসায়ীরা যেখানে যার যতটুকু রক্ত আছে চুষিয়া লইয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। রক্তমোক্ষণও শুরু হইল কিছু-কিছু। তেঁতুলে বাগদী ও ডোমেরা, যাহারা বংশানুক্রমে ডাকাতি করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত ও ইংরেজ-শাসনের তাড়নায় ভালমানুষ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা আবার লাঠি-সড়কি ও দা লইয়া মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতে হানা দিতে লাগিল, মুসলমানেরা গাই-গরু নির্ব্বিচারে গোয়াল হইতে চুরি করিয়া কোরবানি করিতে শুরু করিল; এবং শাসক-সম্প্রদায় সরকারের স্নেহ-ছায়াতলে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে থাকিয়া, দেবলোকবাসী দেবতাগণের মত, দুঃস্থ জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা পরম আত্মপ্রসাদের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

হলধর এতদিন কলিকাতায় বসিয়া ছিল, একদিন ফিরিয়া আসিল। চেহারা তাহার ফিরিয়া গিয়াছে, গায়ের রং একটু ফিকা হইয়াছে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, কথায়-বার্ত্তায় শহুরে ছাপ লাগিয়াছে। গ্রামের লোক ধরিয়া বসিল তাহাকে, জমিদারবাবুকে ব'লে আমাদের এর পর চাল দেওয়ার ব্যবস্থা কর। গ্রামের ধান-চালের ব্যবসায়ীরা আপত্তি করিল, এখনই ও চালে হাত দেওয়া কেন?

আমাদের কাছেই তো পাচ্ছ সব, যখন কোথাও পাওয়া যাবে না, তখন ওতে হাত দেওয়াই ভাল। হলধর গম্ভীর বদনে ঘাড় নাড়িয়া যুক্তির ন্যায্যতা স্বীকার করিল।

গরিবেরা দল বাঁধিয়া কাছারির সামনে জমায়েৎ হইল। হলধর বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই বাপু?

সহস্র ক্ষুধার্ত্ত ও ক্ষীণকণ্ঠ সমস্বরে জবাব দিল, ভাত।

একজন মুরুব্বী-গোছের লোক সামনে আগাইয়া আসিয়া জোড়হাতে কহিল, হুজুর, জমিদারবাবু যে ধানের পাহাড় ক'রে রেখেছে, সে তো আমাদের জন্তেই। আমরা এতদিন আপনার অপেক্ষায় ব'সে আছি, আমাদের ধান এখন আমাদের দেওয়া হোক।

হলধর কহিল, ধান তো শুধু তোমাদের নয়। প্রসারিত ডান হাত দিয়া বাম হইতে দক্ষিণে অর্দ্ধবৃত্ত রচনা করিয়া কহিল, সকলের।

লোকটা নীরস কণ্ঠে কহিল, বেশ, সকলকে দেওয়া হোক, দু-দশজন বাদে সকলেরই তো অভাব।

হলধর চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, এখন নয়, এখনও গাঁয়ে চাল আছে, সেখানেই কেনগে তোমরা।

লোকটা অনুযোগের সুরে কহিল, পয়সা কই গো বাবু? কিনব কি ক'রে?

হলধর কহিল, কাজ করগে।

কাজ কই? কাজ দাও আমাদের।

হলধর ভারিক্কি সুরে কহিল, চারদিকেই কাজ হচ্ছে, ঘরে ব'সে আছ কেন? চ'লে গেলেই পার সব। মাহিন্দাকে হাঁকিয়া কহিল, তাড়িয়ে দে সবাইকে।

মাহিন্দার শরীর তেমনই পুষ্ট ও সবল; জমিদারের অনুগ্রহপুষ্ট ভৃত্য সে, নিত্য সিধার বরাদ্দ আছে তাহাদের বাপ-বেটার জন্ম। গোঁফ চুমরাইয়া লাঠি আস্ফালন করিয়া কহিল, চ'লে যাও সব এখান থেকে।

হলধর হাত নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ, চ'লে যাও, কিছু ভাবনা নেই তোমাদের, সময় হ'লেই চাল পাবে, এ কটা দিন কোন রকমে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করগে।

লোকটার চোখ দুইটা শান দেওয়া ইস্পাতের মত চকচক করিয়া উঠিয়া ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া আসিল, পুত্রের মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়া শোকার্ত্ত পিতা যেমন করিয়া হাসে, তেমনই হাসিয়া কহিল, ও চাল আর আমাদের খেতে হবে না বাবু। আমরা কি বাঁচব ততদিন! মাহিন্দার উদ্দেশে কহিল, তোরাই লুটে-পুটে খাবি ভাই, আমরা ম'রে যাব সব।

ক্ষুধার্ত্ত জনতা ক্ষুব্ধ গুঞ্জন করিয়া সরিয়া গেল।

গ্রামের গোবিন্দ মণ্ডল হলধরের সহিত দেখা করিতে আসিল। গোবিন্দ একজন বড় চাষী, চারখানা লাঙলের চাষ; জমিদারের একজম বড় প্রজা, অনেক টাকার এলাকা রাখে সে। বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ, ছেলে-মেয়ের বিবাহ ইত্যাদি কয়েকটা মোটা খরচের জন্ম ধানের যা পুঁজি ছিল বেচিয়া ফেলে; তাহার উপরে গত বৎসরের অজন্মার জন্ম কাবু হুইয়া পড়িয়াছে; জমিদারের কাছে জমি বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিতে চায় সে। মাহিন্দী তাহাকে বসিবার জন্ম বারান্দায় চট পাতিয়া দিল। গোবিন্দ কহিল, সরকার মশায় কোথায়? মাহিন্দী কহিল, ঘর গেছেন, আসবেন এখনই, ব'স।

হলধর আসিয়া হাস্ত মুখে কহিল, কি হে মোড়ল, কি খবর? গোবিন্দ উঠিয়া হাত জোড় করিয়া কহিল, আমার সেটার কথা বলেছিলেন বাবুকে?

হলধর চোখ মটকাইয়া কহিল, বলেছিলাম বইকি। যাব সন্ধ্যেবেলায় তোমার ওখানে, সব কথা বলব তখন।

গোবিন্দর একটি বিধবা পুত্রবধূ আছে, বয়স কাঁচা, সুন্দরীও বটে; হলধরের নজর আছে তাহার উপরে; গোবিন্দ তাহা জানে; মাছ ধরিবার জন্ম টোপ খরচ করিতে তাহার দ্বিধা নাই; হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিল, সে তো আমার ভাগ্যের কথা, আপনার পায়ের ধুলো পড়বে আমার ঘরে।

গোবিন্দ বাড়ি ফিরিতেছিল, মুখে সন্তোষের পিচ্ছিল হাসি। হলধরকে খেলাইয়া যদি 'বামুনবেড়া'র প'ড়ো জমিটা গছাইয়া মোটা টাকা আদায় করিতে পারে তো মন্দ হইবে না। হলধরের দৌড় তাহার জানা আছে; দুষ্ট ক্ষুধা তাহার, পুত্রবধূর সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

রাস্তায় হরি বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে দেখা হইল। হরির ভাই রেলে চাকরি করে, দাদার প্রতি ভক্তি তাহার অগাধ, মাসে মাসে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দাদাকে পাঠায়। তাহাই জমাইয়া, তেজারতি করিয়া হরি দুই পয়সা করিয়াছে ও এই দুর্দ্দিনের বাজারে অভাবগ্রস্ত অসহায় চাষীর গলা টিপিয়া সস্তায় দশ-পনরো বিঘা জমিও কিনিয়াছে। গো-মড়কে শকুনির মত, উল্লাসে ও উত্তেজনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে হরি, বাড়িতে এক দণ্ড বসিয়া থাকিতে পারে না, কোথায় কোন্ সুযোগ আছে, সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাই সন্ধান করিয়া বেড়ায়।

হরি কহিল, কোথায় গেছলে গো মোড়ল? গোবিন্দ পাশ কাটাইয়া কহিল, গোমস্তাবাবুর কাছে, আসি দাদা, জরুরী কাজ আছে ঘরে।—বলিয়া পা চালাইয়া

দিতেই, হরি থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখে ও চোখে বিদ্রূপের ভঙ্গী করিয়া কহিল, দেখ মোড়ল, একটু আস্তে যেও, হোঁচট খাবে যে।

গোবিন্দ কহিল, সত্যি কাজ আছে, না হ'লে কথা কইতাম।

হরি চোখ দুইটা ছোট করিয়া ধারালো কণ্ঠে কহিল, এতদিন কাজকর্ম ছেড়ে আমার বাড়িতে ধন্না দিয়েছ, আজ বড়লোক পেয়ে বুঝি গরিবকে মনে ধরছে না, না?—বলিয়া বিদ্রূপের হাসিতে ঠোঁট দুইটা ধনুকের মত বাঁকাইয়া তুলিল।

গোবিন্দ কহিল, তা আশ্রয় নিতে হ'লে বড় গাছে নেওয়াই ভাল, নয় কি বলুন?

হরি হাত নাড়িয়া কহিল, বেশ বেশ, তাই নাওগে হে। ছোট গাছও চিরদিন ছোট থাকে না, বড় হয়ে ওঠেই একদিন। তা ছাড়া আমার হাতে দিলে জমিটা ফেরত পেতে একদিন। ওখানে—। মাথাটা নাড়িয়া কহিল, ওটি চলবে না।

গোবিন্দ কহিল, কি করব বলুন? গোমস্তাবাবু নিজে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমার হয়ে জমিদারবাবুকে বলেছেন তিনি—

হরি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, বলবেন বইকি। কত অনুগ্রহ তোমার ওপর।

হঠাৎ মুখ-চোখের ভাব কঠিন করিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, কিন্তু বুঝবে বাবা একদিন মজাটা, নাম ওর হলধর, হলের মুখে সব সমভূম ক'রে দেবে ও।

বন্ধুবান্ধবরা হলধরকে ধরিয়া বসিল, হলধরদা, আমাদের একটা ব্যবস্থা কর।

হলধর মুরুব্বিয়ানার সুরে কহিল, বেশ তো। চল না সব আমার সঙ্গে।

প্রশ্ন হইল, তুমি আবার যাচ্ছ নাকি?

হলধর চোখ ডাগর করিয়া ভুরু নাচাইয়া কহিল, বা রে! আমার না গেলে চলে! মস্তবড় একটা ব্যবসার ভার আমার হাতে। বাবু বলেছেন, উপযুক্ত লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার এখানে আসা চলবে না।

গোবরার মাও সঙ্গে যাবে নাকি?

হলধর ঢোক গিলিয়া কহিল, ও একবার 'যাব' বলছে, কলকাতা কখনও দেখে নি; তা ছাড়া গিন্নিমাও বললেন, একবার নিয়ে যেতে; ভারী স্নেহ করেন তো সব আমাকে।

একজন কহিল, আমরাও কি গোবরার মায়ের সঙ্গে মেয়েমানুষ সেজে ঘোমটা টেনে অন্দরে ঢুকব নাকি?

হলধর হাসিয়া কহিল, না হে, তা কেন? তোমরা সব বার-বাড়িতে থাকবে, কত লোক প'ড়ে আছে সেখানে, সে যেন একটা হোটেলের ব্যাপার! কে আসছে,

কে থাকছে, কোন হিসেব নেই ; এলাহী ব্যাপার কিনা ! বিস্তর পয়সা হ'লে যা হয় আর কি।

একজন কহিল, ঠাট্টা নয় ভাই, সত্যি বলছি, একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও আমাদের। সংসারের অবস্থা যা সঙিন হয়ে উঠছে দিন দিন, না হ'লে আর ভদ্রতা থাকবে না। হলধর গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিল, কুলি-ঠ্যাঙানোর কাজ করতে পারবে ? দুই-চারিজন কহিল, খুব। নেহাত চাকরবাকরের কাজ ছাড়া যা বলবে সব পারব।

হলধর কহিল, বেশ। বাবু একটা নতুন কণ্ট্রাক্টটরি পেয়েছেন অণ্ডালের কাছে ; চ'লে যাবে তোমরা ওখানে, বাবুর একজন কর্ম্মচারী থাকেন সেখানে, বাবুর কাছে তাঁর নামে চিঠি লিখিয়ে পাঠিয়ে দেব তোমাদের।

জ্যৈষ্ঠ মাসে অবস্থা সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইল। মহাজনরা চাল আটকাইয়া দিল, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে চালের দাম মণ-করা ৪০৲।৫০৲ টাকা হইবে—এই আশায়। মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাহাদের কিনিবার ক্ষমতা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহারা বীজধান কিনিয়া খাইতে শুরু করিল ; যাহাদের ছিল না, তাহারা কেহ কেহ সপরিবারে এক বেলা, কেহ দুই বেলাই উপবাস দিতে লাগিল। দরিদ্রেরা ফেনের জন্য বাড়িতে বাড়িতে হা-হা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৃত্যু শীতল হস্ত বুলাইয়া অনেককে নিষ্কৃতি দিল, অনেকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া নিষ্কৃতি মাগিয়া লইল। মধ্যবিত্তদের অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল, অনেক হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যাহারা এতদিন বিধবা কন্যা বা ভগ্নী বা দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়াদের ভরণ-পোষণ করিতেছিল, তাহারা তাহাদের বিদায় করিয়া দিল, হতভাগিনীরা কোথাও আশ্রয় না পাইয়া দাসীবৃত্তি বা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিল। তবু যে বা যাহারা এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী, তাহাদের কেহ দোষ দিল না। দোষ দিল নিজেদের অদৃষ্টকে, আর জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রতপ্ত নীলাভ ধূসর আকাশের দিকে তাকাইয়া ধিক্কার দিল অদৃশ্য বিধাতাকে।

একদিন কৃষ্ণাত্রয়োদশীর রাত্রে রায়হাটির সামন্ত ও ছত্রীদের এবং এক মাইল দূরবর্ত্তী ইসলামপুরের মুসলমানদের মধ্যে, দুই গ্রামের মাঝখানে রায়পুকুরের ধারে একটা প্রকাণ্ড বড় গাছের তলায় মজলিস হইয়া গেল। বক্তৃতা দিল একজন বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সের ছোকরা, বেঁটে কালো কাহিল, চোখে চশমা, পরিধানে খদ্দরের পাজামা ও পাঞ্জাবি, পায়ে কাবলী চটি। ইসলামপুরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমানের ছেলে, কলেজে পড়ে,—ছোকরাটি তাহারই বন্ধু, জাতিতে হিন্দু অথচ

মুসলমানের বাড়িতে খাইতে থাকিতে আপত্তি নাই, ছোট খানা অবলীলাক্রমে পার করে এবং ধরন-ধারন দেখিয়া মনে হয়, বড় খানাতেও আপত্তি নাই ; কাজেই গ্রামের মোল্লা সাহেব, একটু চেষ্টা করিলেই ছোকরাটিকে কলমা পড়াইয়া আসল ধর্ম্ম অবলম্বন করাইতে পারিবেন বলিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। ছোকরাটি বলিতে লাগিল,' জমি জমিদারের নয়, জমি যে চাষ করে তাহার। যিনি জমিদারকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তোমাদেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তাঁহার সৃষ্ট মাটিতে তোমাদের ও জমিদারের সমান অংশ থাকা উচিত। বরং তোমাদেরই থাকা উচিত, জমিদারকে অংশ হইতে বঞ্চিত করা উচিত। কারণ, জমিদার জমিতে কখনও পা পর্য্যন্ত দেয় না, আর তোমরা সারা বৎসর রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া জমি চাষ কর। জমিদার বৎসরের শেষে গোমস্তা, পাইক ও বরকন্দাজ পাঠাইয়া তোমাদের পরিশ্রমলব্ধ শস্য কাড়িয়া লইয়া যায় ; তোমাদের ঠকাইয়া তোমাদের শস্য অল্প দামে কিনিয়া বহুগুণ দামে সেই শস্য বাহিরের বাজারে বিক্রয় করে। সারা বৎসর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বদলে তোমরা পাও অনাহার, নগ্নতা ও মৃত্যু, আর জমিদার বিনা পরিশ্রমেই পায় প্রচুর খাদ্য ও পরিধেয়—বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রচুর উপকরণ। বংশানুক্রমে তোমরা দেশের খাদ্য উৎপাদন করিয়াছ, তোমাদের খাদ্যাভাব কখন ঘুচিয়াছে কি ? তোমাদের স্ত্রী-পুত্র ও কন্যার মুখে কোনদিন হাসি ফুটাইতে পারিয়াছ কি ? দুরন্ত রোগের কবলে যখন তোমাদের বুকের ধন ছেলেমেয়েরা তোমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তখন মনের মত চিকিৎসা করাইয়া বা উপযুক্ত পথ্য দিয়া তাহাদের ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছ কি ? তোমাদের সেই সনাতন ভগ্ন জীর্ণ কুটীরের কিছু উন্নতি বিধান করিতে পারিয়াছ কি ? আলকাতরার মত কালো ঘন অন্ধকার, আশেপাশে সামনে প্রায় হাজার বিঘা জমির উপর কালো পাথরের মত জমাট হইয়া বসিয়া আছে ; দূরে শুভঙ্করী দাঁড়ার ধারে আলেয়া জ্বলিতেছে, নিবিতেছে ; গাছের উপর কতকগুলা পেঁচা একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিল। ছেলেটি বলিতে লাগিল, এই যে তোমরা অনাহারে দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া মরিতেছ, তোমাদের জমিদার তাহার ধানের পাহাড় হইতে একমুঠা ধান তোমাদের দিয়াছে কি ? কেন দিবে ? ও ধান কি তোমাদের খাওয়াইবার জন্ত রাখিয়াছে জমিদার ? ধাপ্পা দিয়া বোকা বুঝাইয়াছে তোমাদের, তোমরা ভালমানুষ, যাহা বুঝাইয়াছে তাহাই বুঝিয়াছ, ও ধানের একটি কণাও তোমাদের জন্ত নয়, ও ধান সরকারের ; সরকারের সঙ্গে হয়তো

দেনা-পাওনা চুকিয়া গিয়াছে এতদিন। তোমরা, তোমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা শুকাইয়া মরিয়া গেলেও ওর একটি দানাও তোমাদের ভাগ্যে জুটিবে না।

একটা ক্রুদ্ধ চাপা গর্জ্জন ঘন কালো অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল।

পরদিন রাত্রি দুইটার সময়ে প্রায় শ দুই লোক গোলাবাড়ির সামনে জড় হইল, হাতে কুড়াল, দা, শাবল ও লাঠি। শ্মশানে মড়া খাইবার জন্য ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের দল যেমন করিয়া আসে, তেমনই নিঃশব্দে। অন্ধকারের মধ্যে তাহাদের চোখ ও দাঁতগুলা শান-দেওয়া ছুরির ফলার মত চকচক করিতে লাগিল।

মাহিন্দী ও গোকুল দুইজনেই পাহারা দিতেছিল সেদিন। মাহিন্দী ভারী গলায় হাঁক দিল, কে, কে হা? কোন জবাব নাই, আবার হাঁকিল, কে হা, তোমরা এখানে কি করছ?

বিরাট সরীসৃপের মত জনতা ধীর নিশ্চিত পদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বাঘের মত লাফাইয়া আসিয়া ডান হাতে লাঠিটা বাগাইয়া ধরিয়া মাহিন্দী হাঁকিল, কি মতলব বল দেখি তোমাদের? বারণ করছি, শুনছ নাই কেনে?

একজন দীর্ঘাকৃতি লোক, মাথাটা ঢাকিয়া ও মুখটা বেড়িয়া পাগড়ি, আগাইয়া আসিয়া কহিল, স'রে যাও বাগদীর পো, লুঠ করতে এসেছি আমরা। ক্ষিপ্ত শৃগালের মত দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া মাহিন্দী কহিল, মগের মুলুক পেয়েছ নাকি, না মামাবাড়ি? মাহিন্দী বাগদীকে আগে ঘায়েল ক'রে তবে এগোবে বলছি।— বলিয়া সামনের লোকটার উদ্দেশে লাঠি চালাইল। লোকটা লাফাইয়া সরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই পাশ হইতে একটা লোক লাঠি মারিল মাহিন্দীর মাথায়; মাথাটা ফাটিয়া গিয়া গাল ও ঘাড় বাহিয়া রক্তধারা ছুটিল, এক হাতে রক্ত মুছিয়া মাহিন্দী হাঁকিল, গোকুল! লুঠ করতে এসেছে রে, রামসুন্দর সিংকে খবর দিগে যা।

গোকুল এতক্ষণ কিছু দূরে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া ছিল, শুনিয়াই ছুটিল খবর দিতে। একজন একটা হাত-লাঠি ছুঁড়িল তাহাকে তাক করিয়া। মুহূর্ত্তমধ্যে 'বাবা গো' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া গোকুল পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা লোক ছুটিয়া গিয়া তাহাকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিয়া, একটা গাছের নীচে ফেলিয়া রাখিল।

মাহিন্দী তখনও লাঠি চালাইতেছে, বিস্তর লাঠি পড়িতেছে তাহার গায়ে; জমাট রবারের মত দৃঢ় নমনীয় মাংসপেশীতে প্রত্যেকটি আঘাত প্রতিহত হইতে লাগিল, শেষে একটা লোক শাবল দিয়া মাথার পিছনে আঘাত করিতেই তীব্র তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ করিয়া মাহিন্দী মাটিতে পড়িয়া গেল।

এদিকে গোলাবাড়ির দেওয়ালে শাবলের পর শাবল চালাইয়া জনকয়েক লোক একটা বিরাট হাঁ-এর মত গর্ত্ত করিয়া তুলিল।

ভিতরে প্রায় তিন শো হাত লম্বা ও পঞ্চাশ হাত চওড়া একটি পাকা দেওয়াল ও টিনের ছাদওয়ালা ঘর, টিনেরই একটা প্রকাণ্ড দরজা, তাহাতে একটা ভারী তালা ঝুলিতেছে। জন দুই বলিষ্ঠ লোক শাবলের চাড় দিয়া তালাটা ভাঙিতে লাগিল, প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক দরজা হইতে গর্ত্ত পর্য্যন্ত সারি সারি দাঁড়াইয়া গেল, দলপতি এবং আরও ত্রিশজন লোক তালা ভাঙার জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল, বাকি লোকগুলা বাহিরে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে লাগিল। তালা ভাঙা হইতেই একটা চাপা উল্লাসধ্বনি জনশ্রেণীর এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া দেওয়ালের অপর পার্শ্বে জনতার মধ্যে সংক্রামিত হইল। মশালের রক্তাভ আলোকে ইহাদের ঘর্ম্মাক্ত দেহগুলা পালিশ-করা কালো পাথরের মত চকচক করিতে লাগিল; আসন্নপ্রায় অভীষ্ট-সিদ্ধির উল্লাসে ইহাদের চোখগুলা জ্বলজ্বল করিতে লাগিল; বিচার-বিবেচনাহীন, লোভী, স্বার্থ-সর্ব্বস্ব জমিদারের প্রতি নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায় ইহাদের মুখগুলা বীভৎস দেখাইতে লাগিল।

দরজা খোলা হইতে জন ত্রিশেক লোক ভিড় করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরের বদ্ধ বাতাস যেন আগুনের হল্কার মত গরম, সকলের দেহ হইতে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে শুরু করিল; একটা তীব্র ঝাঁজালো গন্ধে দম আটকাইয়া আসিল সকলের; গ্রাহ্য না করিয়া জ্বলন্ত মশাল হাতে তাহারা সমস্ত ঘরটা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিতে শুরু করিল।

কোথাও কিছু নাই। মেঝের উপর পুরু হইয়া ধূলা জমিয়াছে, তাহার উপর শত শত পায়ের চিহ্ন এখনও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এখানে সেখানে ফুটা বস্তা হইতে ঝরিয়া পড়া ধান জমিয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে বিস্তর ইঁদুরের গর্ত্ত; কতকগুলা ইঁদুর বোধ হয় ধান্য সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল, আলো দেখিয়া ছুটিয়া গর্ত্তে ঢুকিল; গুটি কয়েক চামচিকা বার কয়েক ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নিজ নিজ স্থানে ঝুলিতে শুরু করিল।

নিদারুণ নৈরাশ্যের সুরে সকলে বলিয়া উঠিল, সব সরিয়ে দিয়েছে রে! উচ্ছ্বসিত ক্রোধে কপালের শিরাগুলা ফুলিয়া দড়ির মত হইয়া উঠিল সবারই, পায়ের মাংসপেশীগুলা হইয়া উঠিল ইস্পাতের মত শক্ত, দাঁতে দাঁত ঘষিয়া কহিল, বেটা শয়তান! দৃঢ়মুষ্টিতে লাঠি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, পেতাম সামনে,

মাথাটা গুঁড়ো ক'রে দিতাম বেটার। অভিশাপ দিল, আমাদের বেটা-বেটীর ভাত কেড়ে নিয়ে গেছিস, নির্ব্বংশ হবি বেটা।

দলপতি লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, কুছ পরোয়া নাই, ভাই সব! জমিদারের বাড়ি লুঠ করব।

জমিদারের বাড়ির সামনে আসিয়া জনতা উন্মত্ত কোলাহল করিয়া উঠিল। তারপর সামনের ছোট দেওয়াল ডিঙাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। লছমন সিং দোতলার বারান্দা হইতে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিল। গ্রাহ্য না করিয়া সকলে বেপরোয়া দোতলার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কতকগুলা লোক ইট-পাটকেল ছুঁড়িতে শুরু করিল; তাহাতে দুই-চারিটা সার্শির কাচ ভাঙিল, কতকটা কার্নিস খসিয়া পড়িল, দোতলার বারান্দায় একটা ছবির কাচ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। লছমন সিং দোতলার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া গুলি ছুঁড়িল; পায়ে লাগিয়া বসিয়া পড়িল একজন; আর একবার, এবার বাহুতে লাগিল স্বয়ং দলপতির, চীৎকার করিয়া উঠিল সে, বন্দুক চালাতে শুরু করেছে, পালাও ভাই সব।

সেই রাত্রে তিন-চার বাড়িতে ডাকাতি হইল। হলধরের বাড়িতে; তাহার বুড়ী মাকে মারিয়া ধরিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিল এবং যাইবার সময়ে বাঁধিয়া তুলিয়া লইয়া গেল তাহার বিধবা বউদিদিকে। আর ডাকাতি হইল পরাণ রায়ের বাড়িতে। পরাণ জাতিতে তেলী, গৃহে প্রাচুর্য্য নাই, তবে ধারও তাহাকে করিতে হয় না; নিরীহ, নির্ব্বিরোধী লোক, তার ধান-চাল, বাসন-কোসন, দুই-চারিখানা সোনা-রূপার গহনা, কাপড়-চোপড়, সব কাড়িয়া লইয়া সত্যসত্যই তাহাকে সপরিবারে পথে বসাইয়া দিয়া গেল। আর ডাকাতি হইল হারাণ চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে। হারাণ সম্পন্ন গৃহস্থ, ধান-চালের কারবার করিয়া এ বৎসর অনেক টাকা লাভ করিয়াছে। দূরে কোলাহল শুনিয়াই মূল্যবান জিনিস-পত্র ও ক্যাশ-বাক্স সমেত সপরিবারে হারাণ কোঠার উপরে উঠিয়া পড়িল। উপরে উঠিবার জন্য সিঁড়ির পরিবর্ত্তে মইয়ের ব্যবস্থা ছিল; হারাণ উপরে উঠিয়া মইটাও তুলিয়া লইল। ডাকাতের দল উঠানে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিল, গালাগালি করিল; আগুন লাগাইয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইল; কিন্তু টিনের ছাউনি বলিয়া হারাণ ভয় পাইল না। শেষে গোয়াল হইতে গরুগুলা খুলিয়া লইয়া তাহারা চলিয়া গেল, যাইবার সময়ে বলিয়া গেল, কোরবানি করব তোর নামে, বেটা গোহত্যার পাতক হবি।

কোলাহল হইল প্রচুর—আর্ত্তনাদের অন্ত রহিল না, কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা,

এমন কি যাহাদের বাড়িতে বন্দুক ছিল তাহারাও, দরজা আঁটিয়া শুইয়া রহিল। কেহ বাহির হইয়া সাহায্য করিবার চেষ্টা করিল না, বা দুই-তিন মাইল দূরবর্ত্তী থানাতে খবর দিয়া পুলিসের সাহায্য আনিবার ব্যবস্থা করিল না।

মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু গৃহস্থের ইহাই রীতি। ইহারা প্রতিবেশীর হাঁড়ির খবর রাখে, কিন্তু হাঁড়িতে চাল না থাকিলে একমুষ্টি দিয়া সাহায্য করে না। সম্পদে ইহারা যেমন দল বাঁধিয়া ছুটিয়া আসে, বিপদে তেমনই দল বাঁধিয়া আত্ম-গোপন করে। বাড়িতে কেহ অসুখে পড়িলে, ইহারা ভিড় করিয়া আসিয়া চিকিৎসার ত্রুটি বাহির করে ও চিকিৎসকের সমালোচনা করে, কিন্তু রোগীর সেবা করিবার জন্ম কেহ আগাইয়া আসে না। রোগী মরিলে ইহারা সোৎসাহে, সৎকার করিয়া আসিয়া শ্রাদ্ধের বিরাট ফর্দ্দ ফাঁদিয়া গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্ম বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে। প্রতিবেশীর পুত্র ভাল চাকুরি পাইলে, ইহাদের চোখের ঘুম উবিয়া যায়, গোপনে কর্ত্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়া চাকুরিটি ঘুচাইবার চেষ্টা করে। প্রতিবেশীর পুকুরে মাছ হইলে ইহারা রাত্রে জেলে নামাইয়া ধরিয়া আনে, মাঠে ভাল ফসল হইলে গরু নামাইয়া দেয়, বাগানে তরি-তরকারি হইলে রাতারাতি সরাইয়া ফেলে। প্রতিবেশীর পুত্র বা কন্সার বড়লোকের বাড়িতে বিবাহের সম্ভাবনা হইলে ইহারা মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করে; প্রতিবেশীর সুশীলা পুত্রবধূ থাকিলে ইহারা শ্বশুর ও শাশুড়ীর বিরুদ্ধে তাহার মনকে বিষাইয়া তুলে; কমিষ্ঠা বিধবা কন্সা বা পুত্রবধূ থাকিলে তাহার নামে কলঙ্ক প্রচার করে। পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া ইহারা অত্যাচারী শাসকের সহস্র উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করে, তবু দলবদ্ধ হইয়া প্রতিরোধের চেষ্টা করে না। ইহারা কোনদিনও ভাবে না যে, ইহাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি সরকারের বা সমাজের কাহারও দৃষ্টি নাই। সরকার, ইহাদের নিরীহ, নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিরোধী প্রকৃতির কথা ভাল করিয়া জানে বলিয়া, ইহাদের চিন্তা করিবার আবশ্যকতা বোধ করে না; দেশের নেতারা ইহাদের ঘাড়ে চড়িয়া বড় হইলেও, সমগ্র দেশের কথা চিন্তা করিতে করিতে ইহাদের কথা চিন্তা করিবার সময় পায় না; এমন কি ইহাদের পুত্র-কন্সারা, যাহারা উচ্চশিক্ষিত, দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ-নীতি যাহাদের নখাগ্রে, সারা পৃথিবীর উৎপীড়িত মানববৃন্দের দুঃখে যাহারা বিগতনিদ্র, তাহারাও ইহাদের কল্যাণ কামনা করা দূরে থাক, উল্টা বরং উচ্ছেদ কামনা করে।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই সকলে শয্যাত্যাগ করিয়াই, প্রাতঃকৃত্য না সারিয়া, উৎপীড়িত গৃহস্থদের সংবাদ লইতে আসিল। তাহারা যে সকলেই

আসিবার জন্য ছটফট করিয়াছে, শুধু ঢিল-পাটকেলের ভয়ে আগাইয়া আসিতে পারে নাই, এই কথা পুনঃ পুনঃ জানাইল, এবং যে দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে সকলের ভাগ্যেই এই বিপদ ঘটিবে, হয় কিছু আগে কিংবা পরে, এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গৃহস্থকে সান্ত্বনা দিল। হলধরের বাড়িতে গিয়া তাহারা তাহার বৃদ্ধা মাকে শান্ত করিল এবং তাঁহার পুত্রবধূর অন্তর্দ্ধানের সংবাদ শুনিয়া বিস্ময়ে ও কৌতুকে আকুল হইয়া উঠিল, এবং যখন শুনিল রায়পুকুরের ধারে মেয়েটি রক্তাক্ত বসনে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে, তখন দল বাঁধিয়া তাহাকে দেখিতে ছুটিল। কিন্তু হতভাগিনীর সেবা-শুশ্রূষা ও আশ্রয়ের কোন ব্যবস্থা করিল না। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে লোক আসিয়া মেয়েটিকে সারাদিন ধরিয়া ঘেরিয়া বসিয়া থাকিয়া, সন্ধ্যার পর একে একে সরিয়া পড়িল। পরদিন দেখা গেল, মেয়েটির মৃতদেহ রায়পুকুরের জলে ভাসিতেছে।

স্থানীয় শাসকবর্গ চাঙ্গা হইয়া শাসনযন্ত্র চালনা করিবার জন্য উঠিয়া বসিল। দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, প্রজারা ক্ষুধার জ্বালায় নগ্নদেহে ছুটাছুটি করিতেছে, কুকুর-বিড়ালের মত রাস্তায় ঘাটে মরিয়া থাকিতেছে, স্থানীয় শাসকের তাহাতে করিবার কিছু নাই। প্রজাশাসনের ভার তাহার হাতে—প্রজাপালনের দায়িত্ব তাহার নাই। কাজেই যতক্ষণ দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকিবে, সে দারুব্রহ্মের মত নিশ্চেষ্ট ও নির্ব্বিকার বসিয়া থাকিবে। কিন্তু যদি কেহ বা কাহারা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া, চুরি-ডাকাতি করে, হল্লা-হাঙ্গামা করে, তখন আর তাহার চুপ করিয়া থাকা চলিবে না, দুর্ব্বিনীত প্রজাকে শায়েস্তা করিবার জন্য অবিলম্বে যথোচিত ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

ক্রমে, দারোগা আসিল, দফাদার আসিল, কন্‌ষ্টেব্‌ল আসিল, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট আসিল, সারা গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, মাহিন্দী ও গোকুলের এজাহার-মতে রায়হাটি ও ইসলামপুরের জন পঞ্চাশেক লোক ও সেদিনের নৈশ সভার বক্তা ছেলেটিকে ধরিয়া বাঁধিয়া জেলা-শহরে লইয়া গেল।

হারাধন জেলা-শহরেই ছিল। মাঝে মাঝে তাহাকে এখানে আসিতে হয় বলিয়া একটি বাড়ি এখানে ভাড়া লওয়াই আছে, শহরের বাহিরে এক নিভৃত পল্লীতে নাতি-বৃহৎ একটি দোতলা বাড়ি। একজন পাচক ও একজন ভৃত্য বরাবর এখানে থাকে।

জমিদারি-ক্রয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে এখানে আসিয়াছে; সে একা নয়, ভগবতীবাবু ও তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রিয়তোষিণী দেবী তাহার সঙ্গে আসিয়াছেন ও একই বাড়িতে বাস করিতেছেন। ভগবতীবাবুর প্রথম পক্ষের

পত্নী হরমোহিনী দেবী পাকাপাকি বন্ধ্যা প্রমাণিতা হওয়ায় কাশীতে নির্বাসিতা হইয়াছেন ; তবে সীতা দেবীর মত গহনবনে নির্বান্ধব ও নিঃসহায় অবস্থায় নহে, রীতিমত ভাড়া-করা বাড়িতে দাসদাসী-সমভিব্যাহারে। স্বামীর কাছ হইতে প্রতি মাসে মোটা মাসহারা যায় তাঁহার নামে। ভগবতীবাবুর বয়স পঞ্চাশের বেশি নয়, কিন্তু দেহের বিপুলতার জন্ম তাঁহাকে আরও অধিকবয়স্ক দেখায়। সম্প্রতি দেহে বাতের আক্রমণ হওয়ায়, একেবারে অনড় হইয়া উঠিয়াছেন। পত্নী প্রিয়তোষিণী—বয়স পঁচিশের বেশি নয় ; লম্বা দোহারা গঠন, গৌরবর্ণা, সুন্দরী, শিক্ষিতা। তাহার বাবা সওদাগরী আফিসের কেরানী, মেয়েটিকে কলেজ পর্যন্ত পড়াইয়াছিলেন এবং বোধ করি, অর্থের লোভে, প্রথম পক্ষ বাঁচিয়া থাকা সত্ত্বেও পুত্রার্থী প্রৌঢ় ভগবতীর হাতে কন্যাটিকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। প্রিয়তোষিণী অবশ্য ভগবতীকে নিরাশ করেন নাই, একটি পুত্রের জননী হইয়াছে সে। অসুস্থ স্বামী, কোলে শিশুসন্তান, দাসদাসী, দূর ও নিকট সম্পর্কের আত্মীয়-আত্মীয়াবর্গ লইয়া স্বামীর বৃহৎ সংসার, তবু প্রিয়তোষিণী বেকার। স্বামীর সেবার ভার দাসদাসীদের হাতে ; পুত্রের লালন-পালনের ভার আত্মীয়াদের হাতে ; কাজেই দিনে ও রাত্রে স্নান, আহার, নিদ্রা ও প্রসাধন ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা সম্ভব সময় খরচ করিয়া যাহা হাতে থাকে, তাহা আধুনিক লেখকদের ভাল ভাল নভেল পড়িয়া, দোকানে দোকানে দামী গহনা ও কাপড় কিনিয়া, থিয়েটার ও বায়োস্কোপ দেখিয়া তাহাকে কাটাইতে হয়।

প্রিয়তোষিণীর পরামর্শে ভগবতীবাবু জমিদারি বিক্রয় করিতেছেন। পাড়াগাঁয়ে যখন কোনদিন যাওয়া চলিবে না, চিরদিন পরের উপর নির্ভর করিয়া জমিদারি চালাইতে হইবে, তখন সে জমিদারি না রাখাই ভাল। তাহার চেয়ে জমিদারি বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থ ব্যবসায়ে খাটাইলে বিস্তর পয়সা ঘরে আসিবে। ব্যবসা দেখাশুনা করিবার লোকেরও অভাব নাই। তাহার বাবা সওদাগরী আফিসে কেরানিগিরি করিতে করিতে এসব বিষয়ে ঘুণ হইয়া উঠিয়াছেন ; তিনিই সব ভার লইবেন। তাহা ছাড়া, সে নিজেও তাঁহাকে সাহায্য করিবে।

হারাধনের সহিত পরিচিত হইবার পর প্রিয়তোষিণীর প্ল্যান কিঞ্চিৎ বদলাইয়াছে। ব্যবসা যদি করিতেই হয়, হারাধনের মত অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর সাহায্য লওয়াই ভাল। হারাধনকে ভালও লাগিয়াছে তাহার। হারাধনের বয়স চল্লিশের কম, চেহারা ভাল, লম্বা-চওড়া দেহ ; ফর্সা রং ; সম্প্রতি কিঞ্চিৎ ভুঁড়ির সঞ্চার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা তাহার দেহকে সৌষ্ঠবহীন করে নাই, বরং বড়লোকিয়ানা মর্য্যাদা দান করিয়াছে। সে যখন দামী সুট পরিয়া, চুলে

ব্যাক-ব্রাশ করিয়া সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হয়, তখন তাহার লীলাসঙ্গিনী, হাদি ফিল্মষ্টারটি পর্য্যন্ত তাহার চেহারার তারিফ করে। তবে শুধু চেহারা নহে, হারাধনের ক্লান্তিহীন কর্ম্মিষ্ঠতা, প্রখর ও প্রচুর ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রিয়তোষিণীর চিত্তকে তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। বলা বাহুল্য, হারাধন প্রিয়তোষিণীর দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়াছে; সে তাহার লোভের অনলে ইন্ধন সংযোগ করে; শুধু সাহায্য নয়, সে ভগবতীবাবুকে তাহার এক ব্যবসায়ে অংশীদার করিয়া লইবে। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল বিচিত্র ছবি আঁকিয়া সে প্রিয়তোষিণীর চোখের সামনে ধরে, তাহাতে রঙের উপর রং ফলায়; প্রিয়তোষিণী মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া অন্তরে অন্তরে বিগলিত হইয়া উঠে।

এখানে প্রায়ই পরামর্শ হয় তাহাদের, কখনও ভগবতীবাবুর চোখের সামনে, কখনও বা অন্তরালে। অন্তরালে পরামর্শটাই জমে বেশি, একটা টেবিলের দুই পাশে দুইজনে মুখোমুখী চেয়ারে বসে, কাগজ-কলম লইয়া, অঙ্ক কষিয়া, জমা-খরচ খতাইয়া, লাভের মোটা অঙ্ক ছাঁকিয়া তুলে হারাধন; উত্তেজনায় প্রিয়তোষিণী কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে, হাতে হাত ঠেকে, মুখের কাছে মুখ ঘনাইয়া আসে, হারাধনের বুকের মধ্যে কামনার আগুন জ্বলিয়া উঠে। কখনও মিষ্টি করিয়া হাসে প্রিয়তোষিণী, মিষ্টি করিয়া তাকায়, হারাধনের বুকের ভিতরটা রসিয়া উঠে।

এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রিয়তোষিণীকে সঙ্গে লইয়া হারাধন মোটরে বেড়াইতে বাহির হয়। ভগবতী আপত্তি করেন না; হারাধনকে বিশ্বাস না করিয়া তাঁহার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, পুত্র-প্রসবের পর হইতে প্রিয়তোষিণীর স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছে না, এই সুযোগে মফস্বলের খাঁটি জল-হাওয়ায় যদি তাহার শরীরটা কিছু সুস্থ হইয়া উঠে তো, ডাক্তার, ঔষধের হাঙ্গামাটার কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে। শহর হইতে পাকা রাস্তা ধরিয়া তাহাদের মোটর কত গ্রাম, মাঠ ও বন পার হইয়া বহুদূর চলিয়া যায়; একটি ছোট নদীর ধারে গিয়া থামে; নদীর বালির উপর পাশাপাশি তাহারা বসে; প্রিয়তোষিণী হয়তো এক-আধ লাইন কবিতা আওড়ায়; হারাধন পীড়াপীড়ি করিলে এক-আধটা গানও গায়; এমনই করিয়া তাহাদের পরিচয় ঘন ও ঘনতর হয়, মিসেস্ মুখার্জ্জি ক্রমান্বয়ে 'প্রিয়তোষিণী' ও 'প্রিয়' হইয়া উঠে।

মোটা কথা, এ কয়দিন হারাধনের বড় আনন্দে কাটিয়াছে। জমিদারিটা হাতে আসিয়াছে, টাকা যাহা দিতে হইয়াছে, তাহাও প্রায় হাতেই ফিরিয়া আসিতেছে, এবং ফাউ-স্বরূপ জমিদারের রূপসী গৃহিণীর, আন্তরিক প্রেম না হোক,

প্রীতিলাভ ঘটিয়াছে। কাজেই কাজ শেষ হইয়া গেলেও এখান হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না; সুখস্বপ্নের মত, এই মধুর দিনগুলিকে দীর্ঘায়িত করিতেছিল।

রামসুন্দর ভগ্নদূতের মত দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর লইয়া আসিল। হারাধন অবিলম্বে বড় হাকিমের সঙ্গে দেখা করিল। তিনি হাসিয়া কহিলেন, আপনার সৌভাগ্যের জোয়ার এসেছে মশায়। হারাধন বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। হাকিম কহিলেন, বুঝতে পারছেন না? রায়বাহাদুরি এবার আপনার নির্ঘাত। পঞ্চাশ হাজার টাকার ডিফেন্স বণ্ড কিনেছেন আপনি, সিভিকগার্ডদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার জন্যে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন; কিন্তু সে তো সরকারের সেবা! জনসেবার জন্যে কি করেছেন? এখন তারই সুযোগ এসেছে। চোখ মটকাইয়া কহিলেন, এমন ব্যবস্থা ক'রে দোব যে, প্রজা পালন ও দলন, দুই একসঙ্গে হবে। যাদের একটুখানি রস এখনও আছে আর তার জন্যেই তিড়বিড় করছে, তারা শুকিয়ে টিট হয়ে আসবে; যারা একেবারে শুকনো আর সব কাজের বাইরে, তারা ম'রে যাবে; আর সবারই আপনার জয়গান করতে করতে মুখে খড়ি ফুটতে থাকবে। আর সেই গানের রেশ যখন লাট সাহেবের কানে পৌঁছুবে, তখন 'রায়বাহাদুর' তো ছাই, সি. আই. ই. হয়ে যেতে পারবেন আপনি।

মকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হইল। প্রজারা পুত্রস্থানীয়, তাহাদের সহিত কলহ করিবার ইচ্ছা হারাধনের নাই। তাহারা কখনও এমন কাজ করে নাই; এখনও করিত না, শুধু বাহিরের লোকের প্ররোচনায় করিয়াছে। আসামীরা খালাস পাইয়া হারাধনের অজস্র প্রশংসা করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া গেল। যাইবার সময়ে তাহাদের জানাইয়া দেওয়া হইল, চাল-চালানের ব্যাপারটা হারাধনের অজ্ঞাতে হলধর নিজের বুদ্ধিতে করিয়াছে। তাহাতে বিরক্ত হইয়া হারাধন তাহাকে কাজ হইতে বরখাস্ত করিয়াছে। ইহার পর একজন নূতন ম্যানেজার নিযুক্ত হইবেন, তিনি প্রজাদের 'ভাত'-এর ব্যবস্থা করিবেন। অভাজন পরাণ রায় ও হারাণ চক্রবর্ত্তী বাধ্য হইয়া হারাধনের মত মহাজন ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। শুধু প্ররোচক ছেলেটি মুক্তি পাইল না, রীতিমত বিচার হইয়া তাহার দুই বৎসরের জন্য জেল হইল।

দরিদ্র প্রজাদের জন্য অন্নসত্র খোলার ব্যবস্থা হইল। হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্য মাথা-পিছু চালে-ডালে এক পোয়া বরাদ্দ অর্থাৎ অর্দ্ধাশনটা যেন কোনমতে সম্পন্ন হয়। যাহারা

কার্য্যক্ষম তাহারা সম্প্রতি হারাধনের চাষে কাজ করিবে, আর যাহারা দুর্ব্বল ও অক্ষম তাহারা এমনই খাইতে পাইবে। ইসলামপুরের মুসলমানদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল; তাহাদের মসজিদ সংস্কার করা হইবে ও তাহাদের মোল্লা সাহেবদের বিনামূল্যে চাল দেওয়া হইবে। অন্নসত্রের জন্য হারাধনকে বাড়ি হইতে টাকা বাহির করিতে হইবে না, চাউল বিক্রয়ের টাকা হইতেই খরচ চলিয়া যাইবে। নিজের কলিয়ারির কুলীদের জন্য সে কিছুদিন আগে মিলিটারি বিভাগের জনৈক কর্ত্তৃপক্ষকে ঘুষ দিয়া প্রায় দশ হাজার মণ ছাতা-ধরা চাল সস্তা দরে সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা হইতে হাজার দুই মণ এখানে পাঠাইয়া দিবে এবং হাজার দুই মণ বিউলির ডাল হাকিম সাহেব স্থানীয় কোন ব্যবসাদারের কাছে সুবিধামত দরে সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

অন্নসত্র উদ্বোধনের দিন। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উদ্বোধন করিবেন। সঙ্গে আসিবেন বড় হাকিম। হারাধন নিজের গাড়িতে তাঁহাদের লইয়া আসিবে। নূতন ম্যানেজারবাবুটি কর্ম্মকুশল ব্যক্তি; হলধরের মত গোলগাল চেহারা নহে, লম্বা, কাহিল, তামাটে রঙ; খাকী হাফপ্যাণ্ট, টুইলের হাফ-হাতা শার্ট, পায়ে খয়ের রঙের ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া একটা ভাঙা সাইকেলে চড়িয়া সারাদিন সারা জমিদারিটা টহল দিয়া ফিরে। আয়োজনও করিয়াছে নিখুঁত। গোলাবাড়ির সামনে প্রায় বিঘাখানেক জায়গা চাঁচিয়া-ছুলিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে; এক দিকে চাঁদোয়া টাঙাইয়া সভামণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে, সেখানে খানকয়েক চেয়ার ও বেঞ্চি বিধিমত সাজানো হইয়াছে, অন্য দিকে এক পাশে টিনের চালা তুলিয়া রান্নার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং চারিজন নবনিযুক্ত পাচক সকাল হইতেই রান্না শুরু করিয়া দিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ঢোল-সহরতের ব্যবস্থা হইয়াছে, হাকিমদের পূজার জন্য প্রচুর উপকরণ জেলা-শহর হইতে আনা হইয়াছে ও ভোগ রন্ধন ও নিবেদনের জন্য দুইজন রন্ধনকুশল কুলীন বাবুর্চ্চি সংগ্রহ করা হইয়াছে, এবং পরদিন গদারডিহির জঙ্গলে হাকিম বাহাদুরদের শিকারের জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে।

সকাল আটটা হইতেই গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের সমাগম শুরু হইয়াছে—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, অক্ষম-সক্ষম সকলেই। সকলেরই দেহ শীর্ণ, বুকের হাড়গুলা এক-একটা করিয়া গোনা যায়; গায়ে যে কতদিন তেল পড়ে নাই কে জানে, খড়ি উড়িতেছে; চুলগুলা রুক্ষ বিশৃঙ্খল—মেয়েদের চুলে জট পড়িয়াছে; কেহ কোনমতে একটা ঝুড়ি বাঁধিয়াছে, কাহারও খোলা; চোয়ালের হাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে সবারই; গাল বসা, কোটরে ঢোকা চোখে ক্ষুধার্ত্ত

সর্পের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। খাড়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যাহারা ছয় মাস আগে যৌবনের দর্পে বুক চিতাইয়া চলিত, তাহারা লাঠি ধরিয়াছে; বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চলিবার ক্ষমতা নাই, নাতি-নাতনীদের কাঁধ ধরিয়া কোনমতে জড়প্রায় দেহগুলা টানিয়া টানিয়া আনিতেছে। কাহারও দেহে পুরাপুরি কাপড় নাই, কেহ গামছা পরিয়াছে, কেহ একখণ্ড মলিন বস্ত্র কৌপীনের মত করিয়া পরিয়াছে, শতছিন্ন বস্ত্রে মেয়েদের লজ্জা ঢাকিতেছে না। ছোট ছেলেমেয়েগুলার দিকে তাকানো যায় না, যেন কতকগুলা কঙ্কালের সমষ্টি, চামড়া দিয়া কোনমতে ঢাকা হাত-পাগুলা কাঠির মত সরু, পেট ঢুকিয়া গিয়া পিঠে গিয়া ঠেকিয়াছে; মুখগুলা ইঁদুরের মুখের মত ছুঁচালো, চোখে হাড়কাঠে গলানো ছাগশিশুর মত অবোধ অসহায় আর্ত্ত দৃষ্টি; ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষুধার্ত্ত পক্ষীশাবকের মত চিঁ-চিঁ করিয়া কাঁদিতেছে, মাঝে মাঝে মায়েদের শুষ্ক-শীর্ণ স্তনে মুখ দিয়া রসাহরণের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে।

বেলা তিনটার সময়েই সমস্ত স্থানটা জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল, কোলাহলে কানে তালা লাগিতে লাগিল। রামসুন্দর সিং, লছমন সিং আরও তুইজন নব-নিযুক্ত পশ্চিমা দারোয়ান, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাহিন্দী ও তাহার পুত্র গোকুল, সকলকে সারিবদ্ধভাবে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আসিয়াছে—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নয়ন ঘোষাল, হেডমাষ্টার, সেই ঝাঁকড়া গোঁফ ও ভুরুওয়ালা লোকটি, পোষ্টমাষ্টার এবং আরও জনকয়েক। পাশাপাশি গ্রাম হইতে আসিয়াছে—থানার দারোগা, সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার, জনকয়েক মহাজন ও ব্যবসায়ী, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বরগণ ইত্যাদি ইত্যাদি। ডাক্তারবাবু ও দারোগাবাবুর চেহারা বেশ নধর, হাসি-খুশি ভাব, দেখিয়া মনে হইল—ছুর্ভিক্ষের অগ্নিশিখা তাহাদের স্পর্শ করে নাই। মহাজন ও ব্যবসাদারগুলির দেহে গত কয়েক মাসের মধ্যেই প্রচুর মেদ জমিয়া উঠিয়াছে, ভুঁড়িতে ও চিবুকে থাকের পর থাক পড়িয়াছে। চিত্র-প্রদর্শনীতে নিজের অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের মত তাহাদের মুখ ও চোখ হইতে আনন্দ যেন উপচিয়া পড়িতেছে; পোশাক-পরিচ্ছদও তাহাদের নূতন, দামী ও চাকচিক্যময়। মধ্যবিত্তদের সকলেরই জামা-কাপড় ঘরে সাবান বা সাজিমাটি দিয়া সত্তপরিষ্কৃত এবং জীর্ণপ্রায়, দেহ অনেকেরই মলিন ও শীর্ণ, সকলে মুখে হাসিতেছে বটে, কিন্তু চোখ দেখিলে মনে হয়—ভিতরে ভিতরে অভাবের অগ্নিময় স্পর্শে পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে সবাই, অথচ নিবৃত্তির কোন দিকে কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া ভয়ে দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ঝাঁকড়া গোঁফ ও ভুরুওয়ালা লোকটির, যেন সত্ত একটা

গুরুতর রোগ হইতে উঠিয়াছে লোকটা, দেহে মাংস নাই, গলার হাড়গুলা বাহির হইয়া গিয়াছে, ঘাড়টা সরু হইয়া গিয়াছে, গোঁফ ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে, চোখে জ্বালাময় দৃষ্টি, পরিধানে আট-হাতি জিলজিলে কাপড়, তালি-দেওয়া কামিজ, হাতে বা গলায় বোতামের বালাই নাই।

ম্যানেজারবাবুকে তোষামোদ করিতেছে সবাই। দুই-দুইটা জমিদারির ম্যানেজার, হলধরের মত অশিক্ষিত নয়, ম্যাট্রিকুলেশন পাস; হাকিমদের জানিত, বিশেষ করিয়া বড় হাকিমের অনুগৃহীত ব্যক্তি, তাহা ছাড়া কাপড় পরে না মোটেই, দিবারাত্র সাহেব সাজিয়াই আছে; কথাবার্ত্তাতেও ইংরেজীর ছিটা খুব বেশি, বুঝিতে অসুবিধা হয় অনেকের।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নয়ন ঘোষালের অবস্থা ভালই, নিজের সম্পত্তিও আছে, পাঁচ রকমে উপার্জ্জনও আছে। কাজেই দেহে এবং পোশাকে পরিচ্ছদে খুব বেশি পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঘোষাল মোলায়েম হাসিয়া ম্যানেজারবাবুকে কহিল, গরিবদের তো সব ব্যবস্থা হয়ে গেল, আমাদের ভদ্রলোকদের জন্মে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে বলুন। ম্যানেজারবাবু ভ্রূ-কুঞ্চনের সহিত মুরুব্বিয়ানার সুরে কহিল, দেখুন, গভর্মেণ্ট মিড্‌ল ক্লাসের জন্মে তো কোন অ্যারেঞ্জমেণ্ট করেন নি, আমরা কি করব বলুন? আমরা তো গভর্মেণ্টের আন্‌ডিজায়ারেব্‌ল কোন কাজ করতে পারি না! ঘোষাল মিনতির সুরে কহিল, তা হ'লে কি এরা সব ম'রে যাবে বাবু? ম্যানেজার কহিল, তা আমরা কি করব বলুন?—বলিয়া ঘাড়টি কাত করিয়া চোখের দৃষ্টি ঘোষালের মুখের দিকে স্থির করিয়া দিল। হেডমাষ্টার কাছে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন, মুখ টিপিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। ম্যানেজার ঘাড় সোজা করিয়া কহিল, তা আপনাদের সব প্রপার্টি রয়েছে, বিক্রি ক'রে চালান; যাদের কোথাও কিছু নেই, তাদের তো আগে দেখতে হবে। ঝাঁকড়া গোঁফ ও ভুরুওয়ালা লোকটা চোখ দুইটা ভাঁটার মত করিয়া গলার মাংসপেশী ফুলাইয়া বার কয়েক কি বলিবার চেষ্টা করিয়াই থামিয়া গেল।

বেলা পাঁচটার সময়ে হাকিমদের লইয়া হারাধন মোটরে আসিয়া হাজির হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মেদবহুল দেহ, মাঝারি গঠন, চকচকে চেহারা, ঝকঝকে দামী নিখুঁত সাহেবী পোশাক, মেয়েদের মত শ্মশ্রুবিরল মুখ, টেবো গাল, চোখে সন্তনিদ্রোত্থিত পুসি বিড়ালের মত নিদ্রালু নির্লিপ্ত দৃষ্টি। প্রায় বিশ মাইল রাস্তা দামী মোটরকারে চড়িয়া আসিয়া ক্লান্তিতে এলাইয়া গিয়াছেন, এমনই ভাবে চেয়ারে গিয়া বসিলেন। বড় হাকিম, লম্বা, বলিষ্ঠ চেহারা, মাথায় পাতলা চুলে মেয়েদের সিঁথির মত তেড়ি, পরিধানে ধোপদস্ত সাহেবী পোশাক,

মুখের গোঁফদাড়ি নির্মূল করিয়া চাঁচা। ইঁহার পাতলা ঠোঁট, সূক্ষ্মাগ্র নাকের ডগা, কেশবিরল ভুরু, পিঙ্গল চোখের তারা, বিশেষ করিয়া ইঁহার মুখের ও চোখের গঠন ও ভাব দেখিলে ইঁহার ক্রূর, অহঙ্কারী, আত্মপরায়ণ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকে না। ইনিও পা দুইটি ফাঁক করিয়া, পাতলুনের দুই পকেটে দুই হাত চালাইয়া দিয়া, গম্ভীর মুখে জনারণ্যের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত একবার দৃষ্টি বুলাইয়া গুটগট করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পাশে গিয়া বসিলেন। হারাধনের পরিধানে শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি, আদ্দির গিলা-করা পাঞ্জাবি, পায়ে দামী পেটেণ্ট লেদারের পাম্পশু; নিপীড়িত মানবের দুঃখে বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতেছে—এমনই মুখ-চোখের ভাব; ধীরপদে গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আর এক পাসে বসিল।

সারির পর সারি বাঁধিয়া দরিদ্রের দল বসিয়া গিয়াছে; প্রত্যেকের সামনে একটা করিয়া শালপাতার ঠোঙা; আজ সকলকে এখানে বসিয়া খাইয়া যাইতে হইবে। পরের দিন, যাহার ইচ্ছা হইবে, বাড়িতে লইয়া গিয়া খাইবে।

ম্যানেজার একটা রূপার থালায় কতকটা খিচুড়ি ও একটি রূপার চামচ আনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে আসিল। সাহেব উঠিয়া আসিয়া মহিমময় মৃদু হাসিতে মুখমণ্ডল মণ্ডিত করিয়া এক চামচ খিচুড়ি লইয়া একজনের পাতে ঢালিয়া দিলেন। একজন ফোটোগ্রাফার অদূরে দাঁড়াইয়া ছবি তুলিয়া লইল।

ম্যানেজারবাবু বাম হাত তুলিয়া পর পর হাঁকিতে লাগিল—জয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের জয়, জয় এস. ডি. ও. সাহেবের জয়, জয় জমিদারবাবুর জয়। জন-কয়েক লোক তাহার দেখাদেখি হাঁক দিতে লাগিল।

পরিবেশন শুরু হইয়া গেল। হারাধন হাকিমদের লইয়া গাড়ির দিকে চলিল। হারাধনের বাড়িতে গিয়া তাঁহারা পান-ভোজন ও বিশ্রাম করিবেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ঘোষাল, হেডমাষ্টার, ঝাঁকড়া ভুরু ও গোঁফওয়ালা লোকটা এবং আরও জনকয়েক লোক ইঁহাদের সঙ্গ লইল। বড় হাকিম ঘোষালকে কহিলেন, কি ঘোষাল মশায়, কি খবর আপনার? ঘোষাল দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, হুজুর, আমাদের একটা নিবেদন আছে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের কাছে। সকলে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ঘোষালের দিকে একবার তাকাইয়াই, বড় হাকিমের দিকে মুখ ফিরাইয়া ইংরেজীতে প্রশ্ন করিলেন, কে লোকটা? বড় হাকিম ইংরেজীতে ঘোষালের পরিচয় দিলেন। বড় হাকিম নীরসকণ্ঠে ঘোষালকে কহিলেন, কি, বলুন না? সে বলিল, হুজুর, আমাদের ভদ্রলোকদের কি ব্যবস্থা করলেন? ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব

জবাব না দিয়া মুখ ফিরাইলেন। জবাব দিলেন বড় হাকিম; ভারী গলায় কহিলেন, আপনাদের জন্তে কিছু ব্যবস্থা করতে পারব না আমরা, আপনারা চাল কিনে খাবেন। হেডমাষ্টার আগাইয়া আসিয়া উত্তেজনায় থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, চাল কই দেশে? থাকলেও কেনবার পয়সা কার আছে? মুচকি হাসিয়া হাকিম কহিল, কার কি আছে তা তো আমাদের জানবার কথা নয়। আপনাদের কোন ব্যবস্থা করবার জন্তে কোন নির্দেশ আমরা সরকারের কাছ থেকে পাই নি। হেডমাষ্টার কহিলেন, কিন্তু হারাধনবাবু তো আমাদের চাল দেবেন বলেছিলেন, আর তার জন্তেই আমরা চাল কেনবার সময়ে কোন বাধা দিই নি। হারাধন কহিল, আমার ম্যানেজার আপনাদের কি বলেছেন, তার জন্তে আমি দায়ী নয়। হেডমাষ্টার কহিলেন, কিন্তু আপনি নিজেও তো কথা দিয়েছিলেন। হারাধন ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল, কই, আমার তো স্মরণ হচ্ছে না। হঠাৎ পোজ বদলাইয়া কোলাহলসহকারে ভোজনরত দরিদ্রদের দিকে হাত বাড়াইয়া চোখে ও মুখে করুণার আভা ফুটাইয়া ভর্ৎসনার সুরে কহিল, মাষ্টার মশায়, এদের দিকে তাকিয়েও আপনাদের নিজেদের কথা মনে হচ্ছে? আপনারা কি? ভাবোচ্ছ্বাসে গলা বন্ধ হইয়া আসিল, হারাধনের চোখে জল আসিল, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চোখ মুছিল হারাধন।

ঝাঁকড়া গোঁফ ও ভুরুওয়ালা লোকটা এতক্ষণ ড্যাবড্যাব করিয়া তাকাইয়া ছিল, হঠাৎ বোমার মত ফাটিয়া পড়িল, ভা-ভা-ভারী মি-মি—। ঘোষাল থামাইতে গেল তাহাকে, দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল, মি-মি-মিথ্যাবাদী চা-চা-চামার, ক-ক—। জনকয়েক লোক তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দূরে সরাইয়া লইয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘামিতেছিলেন, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের ঘাম, বোধ হয় ঠোঁটের এক টুকরা মৃদু হাসিও, মুছিয়া ফেলিলেন। বড় হাকিম রুষ্ট মুখে ঘোষালকে কহিলেন, কে লোকটা? ঘোষাল সবিনয়ে কহিল, হুজুর, ওর মাথার ঠিক নেই, যা-তা বলে সবাইকে। প্রশ্ন হইল, পাগল নাকি? ঘোষাল জবাব দিল, আজ্ঞে পাগল্ নয়, লোক ভালই। দিন কয়েক আগে ওর একটি সোমত্ত মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে, একখানা শাড়ি চেয়েছিল বাপের কাছে, পয়সার অভাবে কিনে দিতে পারে নি, তারই অভিমানে। তারপর থেকে ওর মাথাটার বেশ ঠিক নেই। হাকিম কহিলেন, মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল? ঘোষাল জবাব দিল, আজ্ঞে না হুজুর, খেতে পরতেই দিতে পারে না, তার ওপর বিয়ে!—বলিয়া ম্লান হাসিল। হাকিমও মুচকি হাসিয়া কহিলেন, তা হ'লে তো ভালই হয়েছে ওর, একটা হাঙ্গামা চুকে গেছে। তা ছাড়া,

আজকালকার বাজারে একটা খাবার লোক ক'মে গেছে, সেটাই কি কম লাভ? বলিয়া নিজের রসিকতায় হাসিয়া উঠিলেন। ঘোষাল ও অন্য লোকেরা হুজুরের হাসিতে যোগ দিল, হেডমাষ্টার গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

* * *

বড় হাকিমের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। দুই সপ্তাহের মধ্যেই গ্রামে গ্রামে কলেরা ও উদরাময় রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল, শিশু ও বৃদ্ধেরা, অক্ষম ও দুর্বলেরা দলে দলে মরিতে লাগিল; যাহারা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহার শবদেহের সংকার করিল; যাহারা পারিল না, তাহারা প্রিয় আত্মীয়স্বজনের মৃতদেহ মাঠে ঘাটে, শুভঙ্করীর দাঁড়ার গর্তে ফেলিয়া দিয়া আসিল। অবিরত নরমাংস খাইয়া খাইয়া শৃগাল-কুকুরেরা হৃষ্ট হইয়া উঠিল। যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহাদের জীবন-প্রদীপ দিন দিন তিল তিল করিয়া তৈলহীন হইয়া আসিতে লাগিল। ভবিষ্যতে কোনদিন যে তাহারা আবার তাজা হইয়া সোজা হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তাহার সম্ভাবনা সুদূরবর্ত্তী হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু, যাহারা বাঁচিয়া রহিল তাহারা, যাহারা মরিতে লাগিল তাহারাও হারাধনের জয়-জয়কার করিতে লাগিল।

* * *

এক মাস পরে একটি দিন, হারাধনের বিশেষ স্মরণীয় দিন। সকাল হইতে সুখবরের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। ম্যানেজারের চিঠি আসিয়াছে, লিখিয়াছে— কলেরার আক্রমণ যেরূপ মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে অন্নসত্র বেশিদিন চালাইতে হইবে না, হইলেও খরচ এষ্টিমেটের অনেক কম হইবে। তাহা ছাড়া, অনেক পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, তাহাদের ঘরবাড়ি জমি-জায়গা খাস করিয়া লওয়া চলিবে। বড় হাকিম লিখিয়াছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আগামী রায়বাহাদুরির জন্য হারাধনের নাম লাটসাহেবের কাছে সুপারিশ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এবং যেরূপ জোর দিয়া সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে আগামী নববর্ষ-দিবসের খেতাববর্ষণে হারাধনের রায়বাহাদুরি প্রাপ্তি একেবারে নিশ্চিত। ইহা ছাড়া, সেদিনের দেশী বাংলা ও ইংরেজী খবরের কাগজে হারাধনের কীর্ত্তি-কাহিনী বাহির হইয়াছে; সঙ্গে অন্নসত্রে ভোজনরত দরিদ্রবৃন্দের এবং তাহাদের পুরোভাগে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, হারাধন ও বড় হাকিমের ছবি, ছবিতে কাল ঢেরা-চিহ্ন দিয়া দানবীর হারাধনকে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

বসিবার ঘরে খবরের কাগজখানার উপর চোখ রাখিয়া হারাধন ধ্যানমগ্নের মত বসিয়া রহিল, ছবিটা দেখিয়া দেখিয়া যেন তাহার আর সাধ মিটিতেছে না। পাড়ার লোকেরা আসিতে শুরু করিল, একের পর এক, বিরাম নাই, সকলেক

মুখেই এক কথা—ধন্ত হারাধন! বেঁচে থাক হারাধন! দরাজ হাতটা উবুড় করিয়াছ তো আর চিন্ত করিও না; আর হাতটা কষ্ট করিয়া অতদূরে লইয়া না গিয়া আশেপাশে পাড়ার লোকের উপরেই স্থির করিয়া রাখ! একটি বিনয়-বিগলিত মধুর হাস্ত হারাধন মুখের উপরে একেবারে আঁটিয়া রাখিয়াছে, কহিতেছে, কিছুই করিতে পারে নাই সে, অর্থাৎ যাহা করিয়াছে তাহা তাহার ইচ্ছার প্রাবল্যের অনুপাতে অতি তুচ্ছ। ওয়ার্ডের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও আসিতেছে, একে একে স্পষ্ট স্বীকার করিতেছে, হারাধনকে তাহারা চিনিতে পারে নাই; তুচ্ছ দৈনন্দিন ব্যাপারে মানুষের পরিচয় পাওয়াও যায় না, বিশিষ্ট বৃহৎ ব্যাপারেই মানুষের আসল পরিচয়; কেহ কেহ জানাইয়া দিতেছে, সুরাহা হইলে হারাধনকেই তাহারা ওয়ার্ডের কমিশনার করিবে। একজন সুরাহার খবরও দিয়া গেল, ওয়ার্ডের কমিশনার জগৎবাবুর কার্বাঙ্কল, ডায়াবিটিসের রোগী জগৎবাবু এ যাত্রা কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। খবর শুনিয়া হারাধনের বুকের ভিতরটা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, কৃত্রিম উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, সত্যি নাকি? ভারী মুশকিল তো!

আফিসে কর্ম্মচারীরা একে একে হারাধনের কামরায় আসিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দ যেন হারাধনের মাত্রাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে, এমনই হাবভাব তাহাদের; যেন খবরের কাগজে তাহাদেরই কীর্ত্তি-কাহিনী ও ছবি বাহির হইয়াছে, হারাধনের নয়। কে যে বেশি আনন্দ দেখাইবে, এই লইয়া তাহাদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গিয়াছে। সেদিন কাজ-কর্ম্ম কেহ কিছু করিল না; কর্ম্মচারীবৃন্দের সমবেত আনন্দপ্রকাশটিকে কি করিয়া হারাধনের চোখের সামনে ধরা হইবে, ইহার জন্ত জল্পনা শুরু হইল। শেষে স্থির হইল, সম্বর্দ্ধনা-সভা ডাকা হইবে, সেখানে হারাধনকে মাল্যচন্দনের দ্বারা ভূষিত করা হইবে, কবিতায় 'হারাধন-প্রশস্তি' পাঠ করা হইবে, এবং হারাধনকে উপহার দেওয়া হইবে। কবিতার জন্ত চিন্তা নাই, একটি সন্ত কলেজ হইতে পাস করা ছোকরা কবিতা লেখার ভার লইল, কিন্তু কি উপহার দেওয়া হইবে এই লইয়া তর্ক বাধিল। কলেজী ছোকরাটি কহিল, ফাউণ্টেনপেন। বড়বাবু ভুরু কুঁচকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না, অনেক দাম, বাজারে পাওয়াও যাবে না। তা ছাড়া, লেখাপড়ার ব্যাপার তো নয়, ক্ষেত্র অনুযায়ী একটা কিছু বল। রকমারি প্রস্তাব নাকচ হওয়ার পর একজন বলিয়া বসিল, একটা লক্ষীর চুপড়ি দিলে হয় না? সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদও করিল একজন, হাতে ডালি ধরিয়ে দেবে বাবা! 'বিলক্ষণ অলক্ষুণে যে! একজন মুচকি হাসিয়া

কহিল, ডালিপদ্ম, ধাম্মা, ক্ষেত্র-অনুযায়ীই বটে। বড়বাবু কিন্তু পছন্দ করিলেন, কহিলেন, ঠিক বলেছ, কম দাম, খাঁটি দিশী জিনিস, তা ছাড়া লক্ষ্মীর চুপড়ি লক্ষ্মীমন্তর হাতে মানাবে ভাল।

বড়বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে হারাধনের কক্ষে ঢুকিলেন। হারাধন টেলিফোনের রিসিভার কানের কাছে ধরিয়া কথা শুনিতেছিল। যাহার তাহার নহে, প্রিয়তোষিণীর। প্রিয়তোষিণী বলিতেছিল, সকালেই দেখেছি, কিন্তু কিছু বলি নি আপনাকে, দেখছিলুম নিজে থেকে খবর দেন কিনা। অভিমানের স্বরে বলিল, কই, মনে তো পড়ল না আমাকে? লজ্জার মাথা খেয়ে নিজেই ফোন ধরলুম। কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ বিষাদের রেশ মিশাইয়া কহিল, যখন দেখলুম, তখন কি মনে হচ্ছিল, জানেন? মনে হচ্ছিল, সেদিন যদি আপনার সঙ্গ নিতুম, তা হ'লে আপনার পাশে, মানে, আপনাদের সঙ্গে আমারও ছবি উঠে যেত। একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। হারাধন একটা জুৎসই উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে সাক্ষাৎ রসভঙ্গের মত বড়বাবুর প্রবেশ ঘটিল। হারাধন বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখে কহিল, কি দরকার? বড়বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাতে কহিল, একটা বিশেষ দরকারে এসেছি স্যর্। হারাধন রিসিভার রাখিয়া দিয়া চেয়ারে আসিয়া গরম হইয়া বসিল। বড়বাবু কহিল, আমরা আফিসের কর্ম্মচারীরা মিলে আপনার সম্বর্দ্ধনা করব, স্থির করেছি। হারাধনের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল; কহিল, তাই নাকি? কখন? বড়বাবু কহিল, আজ চারটের সময়। ভুরু কুঁচকাইয়া কি যেন ভাবিয়া হারাধন কহিল, বাইরের কাউকে নেমন্তন্ন করছ নাকি? বড়বাবু মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, আমাদের আয়োজন অতি সামান্য, বাইরের কাউকে ডাকা চলবে না। শুধু মিঃ মুখার্জি আর মিসেস মুখার্জিকে ডাকা হবে, হারাধন পুলকিত হইয়া কহিল, সেই ভাল, দেরি ক'রো না, এখনই কাউকে পাঠিয়ে দাও।

সম্বর্দ্ধনা-সভায় মিষ্টার মুখার্জি আসিতে পারিলেন না। ম্যালেরিয়ার বাতটা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, একটু জ্বরও হইয়াছে। কাজেই মিসেস মুখার্জিকে একাই আসিতে হইল। মাল্যদানটা তাঁহাকে দিয়াই সম্পন্ন করা হইল, চুপড়ি দান করিলেন স্বয়ং বড়বাবু, আর প্রশস্তি পাঠ করিল কলেজী ছোকরাটি।

পাঁচটার পরে হারাধন মিসেস মুখার্জিকে লইয়া মোটরে বাহির হইল। প্রথমে চলিল একটা দেশী বড় হোটেলে। কর্ম্মাধ্যক্ষ বহুদিনের পরিচিত; বহুবার বহু সঙ্গিনী লইয়া হারাধন সেখানে আসিয়াছে। সে অত্যন্ত সমাদরের সহিত হারাধনকে অভ্যর্থনা করিল এবং একটা নিভৃত কক্ষে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া

বসাইয়া পান-ভোজনের ব্যবস্থার জন্য চলিয়া আসিল। অবিলম্বে ভৃত্য আসিয়া প্রচুর ও বহুবিধ ভোজ্য ও পেয় সামগ্রী টেবিলে সাজাইয়া দিয়া দরজা ভেজাইয়া চলিয়া গেল।

নিভৃত নির্জ্জন কক্ষ, মাথার উপর ফ্যান ঘুরিতেছে। হারাধন নিজের গলার মালাটি মিসেস মুখার্জিকে পরাইয়া দিল। মুখ রক্তবর্ণ করিয়া মিসেস মুখার্জি কহিল, ও কি হ'ল?—হারাধন হাসিয়া কহিল, মাল্যদানটা সম্পূর্ণ ক'রে দিলাম, লজ্জাজড়িত কণ্ঠে মিসেস মুখার্জি কহিল, যান, আপনি ভারী দুষ্টু।

হোটেল হইতে বাহির হইয়া কলিকাতা শহর ছাড়িয়া, শহরতলী ছাড়িয়া, বহুদূর ঘুরিয়া আসিয়া রাত্রি আটটার সময়ে হারাধন প্রিয়তোষিণীকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল। কহিল, বাড়ির ভেতরে পৌঁছে দিতে হবে নাকি? ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রিয়তোষিণী কহিল, ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন না, উনি বলবেন কি?

সত্যি!—বলিয়া হারাধন প্রিয়তোষিণীর সঙ্গ লইল।

ভগবতীবাবু শুইয়া ছিলেন, একজন কোমরে সেক দিতেছিল। ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, ভারী সুখী হয়েছি, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, দেশের মুখোজ্জ্বল করুন আপনি। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ম্লানকণ্ঠে কহিলেন, যা শরীরের অবস্থা হচ্ছে দিন দিন, বেশি দিন বাঁচব না আর, এদের দিকে লক্ষ্য রাখবেন চিরদিন। প্রিয়তোষিণীর সহিত চোখোচোখি করিয়া হারাধন কহিল, কি যা-তা বলছেন! কোন চিন্তা নেই আপনার।

প্রিয়তোষিণীর কাছে বিদায় লইয়া হারাধন তাহার পোষা ফিল্মষ্টারটির কাছে চলিল। সে সকালেই টেলিফোন যোগে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছে এবং একটি বার যাইবার জন্য মাথার দিব্য দিয়াছে।

সকাল হইতে সারাদিন একের পর একটি করিয়া প্রায় আটচল্লিশজন স্তাবক ও ভক্তকে বিদায় করিয়া রাত্রি আটটার সময়ে ফিল্মষ্টার ঐন্দ্রিলা দেবী (ডাকনাম খেঁদী) প্রায় অধম হইয়া দোতলার বারান্দায় একটা ঈজিচেয়ারে এলাইয়া পড়িয়াছিল। হারাধনের মোটরের হর্ন শুনিয়াই খাড়া হইয়া বসিয়া, নাতি-প্রশস্ত সুন্দর কপালটির নীচে সুন্দর ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত করিয়া কহিল, গেলুম, বাবা! তারপর চট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্রুতপদে প্রসাধন-কক্ষে প্রবেশ করিল। হারাধন সরাসরি বারান্দায় আসিয়া ঈজিচেয়ারে বসিল। মিনিট কুড়ি পরে ঐন্দ্রিলা ফিরিয়া আসিল, পরিধানে সাধারণ সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, চূর্ণ কর্পূর (পাউডার সহযোগে) ও এলোমেলো, মুখটি ম্লান। হারাধনের দিকে একবার তাকাইয়াই মুখ ফিরাইয়া বারান্দার অপর প্রান্তে গিয়া, রেলিঙের

কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরে অন্ধকারের দিকে তাকাইল। মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল হারাধন; মাসে মাসে মোটা টাকা দিতে হইতেছে, তাহার উপরে আবার মান ভাঙাইতে হইবে না কি? তাহা ছাড়া, প্রিয়তোষিণীর সঙ্গসুখ আজ তাহার মনকে সম্পৃক্ত করিয়া তুলিয়াছে, অন্য নারীসঙ্গ আজ আর ভাল লগিতেছে না তাহার। হারাধন উঠিয়া আসিয়া ঐন্দ্রিলার পাশে দাঁড়াইল। ঐন্দ্রিলার বাহুমূলে হাত দিল হারাধন। ঐন্দ্রিলা হাতটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল, থাক। হারাধন কহিল, কেন? কি হ'ল? বিষন্নকণ্ঠে ঐন্দ্রিলা কহিল, কি আবার হবে! একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল ঐন্দ্রিলা। হারাধন বিষন্নমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঐন্দ্রিলা কহিল, সারাদিন পথ চেয়ে ব'সে আছি আমি, শুটিংএ পর্যন্ত যায় নি, কতবার ষ্টুডিও থেকে লোক এল, ফিরিয়ে দিলুম, এতক্ষণে মনে পড়ল আমাকে? কি অপরাধ করেছি আমি? খুব সম্ভব, কান্নার শেষের দিকটায় কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া প'ড়ল ঐন্দ্রিলার। ঐন্দ্রিলাকে শান্ত করিবার ঔষধ জানে হারাধন; মনিব্যাগ হইতে একটি একশো টাকার নোট বাহির করিয়া ঐন্দ্রিলার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, অপরাধের জরিমানা, অপরাধীকে মাপ কর দেবি! ঐন্দ্রিলা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, চাই নে তোমার টাকা, আসল জিনিসটাতেই ফাঁকে পড়লুম। টাকা! রেখে দাও তোমার টাকা। কিন্তু নোটটি হাতছাড়া করিল না এবং হারাধনের আলিঙ্গনে আত্মহারা হইতে হইতে কোন এক সুযোগে নোটটি ব্লাউজের মধ্যে চালান করিয়া দিল।

রাত্রি দশটার সময় বাড়ি ফিরিল হারাধন। হলধর ছুটিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। হলধরের পদোন্নতি হইয়াছে বটে, পনরো টাকার গোমস্তাগিরি হইতে পঁচিশ টাকার সরকারি। ভগবতীবাবুর সহিত ভাগে হারাধন গঙ্গার ওপারে যে বিরাট ইট, চুন ও সুরকির কারবার ফাঁদিতে শুরু করিয়াছে, হলধর তাহাই দেখাশুনা করে। হলধরের স্ত্রীও বেকার বসিয়া নাই, হারধন-গৃহিণীর খাস দাসীর কর্মে নিযুক্তা হইয়াছে। গোবর্দ্ধন দাসদাসী-মহলে কি ভাবে মানুষ হইতেছে, হলধর বা তাহার স্ত্রী সারাদিন খোঁজ রাখিবার অবসর পায় না। হারাধন হলধরের দিকে তাকাইয়া কহিল, আজকের হিসেবপত্র সব ঠিক আছে তো? হলধর কহিল, হুজুর, হ্যাঁ।

কাল সকালেই দেখব।—বলিয়া হারাধন বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল।

তেতলার বিস্তৃত ছাদে পাশাপাশি মাত্র দুইটি কক্ষ, বাকি ছাদটা এমনই পড়িয়া আছে। হারাধন একটা কক্ষে ঢুকিল, তাহার পত্নীর শয়নকক্ষ; দামী প্রকাণ্ড পালঙ্কে শুভ্রশয্যায় হারাধন-গৃহিণী শায়িতা; শুষ্ক শীর্ণ দেহ, যৌবনের

ক্ষীণমাত্রও অবশেষ নাই দেহে, শুধু বড় বড় চোখ দুইটিতে ব্যর্থ জীবনের ক্ষোভ ক্ষীণ দ্যুতিতে জ্বলিতেছে। পায়ের কাছে বসিয়া একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের শ্যামলী মেয়ে, গৃহিণীর পায়ে হাত বুলাইতেছে। হারাধন আসিয়া পত্নীর পাশে বসিতেই মেয়েটি ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিল। হারাধন এই অবকাশেই তাহার মুখ দেখিয়া লইয়া মনে মনে কহিল, হলধরের বউটি তো মন্দ নয় দেখিতে! পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বলিয়াই এমন চমৎকার স্বাস্থ্য, আর আমার! নিজের স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া নিশ্বাস ফেলিল হারাধন। মেয়েটির দিকে তাকাইয়া কহিল, হাত বুলোও না পায়ে। গৃহিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, না না, যাও তুমি, বাইরে দাঁড়াওগে। হলধরের স্ত্রী চলিয়া গেল।

গৃহিণী সক্ষোভে কহিলেন, সারাদিনের মধ্যে একটিবারও খোঁজ নিতে ইচ্ছে করে না? মরেছি কি না—তাও তো দেখে যেতে পার একবার! হারাধন তাহার মাথায় হাত বুলাইবার চেষ্টা করিল। গৃহিণী হাতটা ঠেলিয়া দিয়া তীক্ষ্ণ-স্বরে কহিলেন, থাক, আর সেবার কাজ নেই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবেগহীন নীরস কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, দেখ, আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার, মিথ্যে নিজেও কষ্ট পাচ্ছি, তোমাকেও কষ্ট দিচ্ছি, একটু বিষ এনে দিতে পার আমাকে? দিও দেখি, খেয়ে মরব আমি, তারপর ঘরের কাঁটা স'রে গেলে, মনের মত যাকে খুশি ঘরে এনে সুখে রাজত্ব করবে তুমি। হারাধন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, গৃহিণী পাশ ফিরিয়া শুইলেন, নিশ্বাস ঘন ও দ্রুত হইয়া উঠিল, হয়তো নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

হারাধন ধীর পদে বাহির হইয়া আসিয়া পাশের কক্ষে ঢুকিল। এখানে থাকে তাহার রুগ্ন পুত্র, আর তাহার নার্স সুনীতি, শান্ত শিষ্ট সেবাপরায়ণা মেয়েটি, সুন্দরীও বটে; মাসে এক শত টাকা করিয়া মাহিনা দিতে হয় তাহাকে। হারাধন শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সুনীতি একটা পেয়ালায় করিয়া খোকাকে হর্লিক্‌স খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে, পেয়ালাটা মুখের কাছে আনিতেই খোকা দুই চোখ বুজিয়া, দাঁতে দাঁত চাপিয়া, মাথা নাড়িতেছে, কিছুতেই হর্লিক্‌স খাইবে না সে; পেয়ালাটা সরাইয়া লইতেই খোকা কাঁদিতে শুরু করিতেছে, ভাত খাব আমি, ভাত দাও আমাকে—

হাসি পাইল হারাধনের। বহু লক্ষপতি হারাধন, কত লোককে ভাত দিতেছে প্রতিদিন, তাহারা একমাত্র পুত্র ভাতের জন্য কাঁদিতেছে! কলিকাতার শহরে রাস্তায় রাস্তায় বুভুক্ষু ভিক্ষুকের দল যে সুরে দ্বারে দ্বারে ভাতের জন্য দিবারাত্র প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছে, সেই সুরই যেন বাজিতেছে তাহার পুত্রের

কণ্ঠে। হারাধন কহিল, খোকাকে কি ভাত দেওয়া চলবে না মোটেই ? সুনীতি মৃদু বিনীত কণ্ঠে কহিল, না, পাকস্থলী ওর একেবারে শক্তিহীন হয়ে গিয়েছে, তরল খাদ্য ছাড়া আর কিছু সহ্য হবে না।

হারাধন বাহিরে আসিল। ছাদের এক প্রান্তে গিয়া, আলিসায় দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইল। সারা কলিকাতা শহর যেন অন্ধকার পুরী ; যাহারা একদিন হাজার হাজার আলো জ্বালাইয়া অন্ধকারকে দূরে সরাইয়া দিয়াছিল, তাহারাই আজ আলো নিবাইয়া দিয়া অন্ধকারকে সমাদরে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে। হারাধন আকাশের দিকে তাকাইল ; সদ্যধৌত সিমেন্টের মেঝের মত কৃষ্ণাভ ধূসর, পরিচ্ছন্ন আকাশ, অসংখ্য তারায় সমাকীর্ণ। হারাধনের ঠিক চোখের সামনে, আকাশের এক প্রান্তে বৃহৎ এক খণ্ড মেঘ, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। হারাধনের মনে হইল যে, বিধাতা পুষ্পে কীট, শুভ্র সুকোমল শয্যায় ছারপোকা, ও প্রেয়সীর মুখে পায়োরিয়া সঞ্চার করিয়া মাঝে মাঝে মানুষের সঙ্গে রসিকতা করেন এবং যিনি হারাধনের জীবনের পরিপূর্ণ সুধাপাত্রে একবিন্দু গরল ঢালিয়া দিয়াছেন ও তাহার জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্যের সরস সুমিষ্ট সুপক্ব ফলটিতে এক ফোঁটা পচ ধরাইয়া দিয়াছেন, তিনিই যেন নিজের রসিকতায় মুহুর্মুহু হাসিতেছেন।

শ্রীঅমলা দেবী

নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ ফেব্রুয়ারি* নবীনচন্দ্র দাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত আলামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাগন দাস। নবীনচন্দ্র তিব্বত-প্রত্যাগত শরচ্চন্দ্র দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

নবীনচন্দ্রের ছাত্র-জীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। তিনি চট্টগ্রাম-হাই-স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া, উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ক্যালেণ্ডার হইতে নবীনচন্দ্র কোন্ সালে কোন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

* শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাস তাঁহার পিতৃব্য নবীনচন্দ্রের জন্ম-তারিখ আমাকে জানাইয়াছেন ; উহা বঙ্গাব্দ ১২৫৯। শকাব্দ ১৭৭৪।১০।১৭।৩২ দণ্ড, ফাল্গুন মাস, সোমবার, কৃষ্ণপক্ষ, ষষ্ঠী।

১।	এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা…চট্টগ্রাম-হাই-স্কুল	…	১ম বিভাগ	ইং ১৮৬৯
২।	ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা প্রেসিডেন্সী কলেজ	…	১ম বিভাগ (১৪শ)	১৮৭১
৩।	বি-এ পরীক্ষা ঐ	…	১ম বিভাগ	১৮৭৪
৪।	এম-এ পরীক্ষা (আর্টসে অনার) ঐ	…		১৮৭৫
৫।	বি-এল (১ম বিভাগে সর্ব্বোচ্চ স্থান) ঐ	…		১৮৭৭

বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর নবীনচন্দ্র ২ অক্টোবর ১৮৭৭ তারিখে চট্টগ্রাম কলেজের আইনাধ্যাপকের (Law Lecturer) পদ প্রাপ্ত হন। এই পদে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার পর, তিনি পরবর্ত্তী ১৫ই এপ্রিল রংপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ৩১ বৎসর যোগ্যতার সহিত সরকারী কর্ম্ম করিয়া নবীনচন্দ্র ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার চাকুরী-জীবনের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দিবার প্রয়োজন নাই, কৌতূহলী পাঠক উহা *History of Services of Gazetted and other Officers serving under the Government of Eastern Bengal and Assam* Corrected to 1st July 1909 গ্রন্থে* দেখিতে পাইবেন।

গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকিলেও নবীনচন্দ্র অবসরকাল মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করিতেন। তিনি কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন; সংস্কৃত-সাহিত্যের রত্নরাজি পদ্যে বঙ্গানুবাদ করিয়া বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই গুণের জন্য নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলীর পণ্ডিতবর্গ ১৭ এপ্রিল ১৯০৬ তারিখে তাঁহাকে "কবি-গুণাকর" উপাধি, এবং চট্টল ধর্ম্ম-মণ্ডলী ২৭ মে ১৯১০ তারিখে "বিদ্যাপতি" উপাধি প্রদান করেন। ইহা ছাড়া তিনি "কাব্য-রত্নাকর" উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র বাংলায় যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। আকাশ-কুসুম কাব্য। ১২৯০ সাল (ইং ১৮৮৩)।

'আকাশ-কুসুম কাব্য' মৌলিক রচনা; ইহার কিয়দংশ প্রথমে ১২৭৯ সালের "হালিসহর পত্রিকা"য় প্রকাশিত হইয়াছিল। "কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত

* ইহাতে নবীনচন্দ্রের জন্ম-তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪ দেওয়া আছে। সালটি ভুল; উহা ১৮৫৪ না হইয়া ১৮৫৩ হইবে।

করিয়া" ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'আকাশ-কুসুম কাব্য' পুনর্মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণের "গ্রন্থ-সূচনা"য় কবি লিখিতেছেন :—

"তৃতীয় স্তবকে "কুমুদ সমীর" পত্রের ৪র্থ কবিতা পাঠে এ ক্ষুদ্র কাব্যের প্রস্তাবিত বিষয় অনুভূত হইবে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"প্রেমের উদ্যানে, প্রিয়, আশার ছলনে
আশৈশব যে কুমুদে করিলে যতন,
নিদারুণ বিধি হায়, কহিব কেমনে,
বজ্রাঘাতে হৃদি তব করি বিদারণ,
আমূল সে ফুলবৃন্ত করিয়া ছেদন,
অপর-অদৃষ্ট-ক্ষেত্রে করিল ক্ষেপণ।"

২। রঘুবংশ (পদ্যে বঙ্গানুবাদ)
১ম ভাগ, ১-৮ম সর্গ। ইং ১৮৯১। পৃ. ১০১+১ শুদ্ধিপত্র।
২য় ভাগ, ৯-১৫শ সর্গ। ইং ১৮৯৪। পৃ. ১৫৭।
৩য় ভাগ, ১৬-১৯শ সর্গ। ইং ১৮৯৫। পৃ. ৫৮।

ইহার নির্ব্বাচিত অংশ এবং কখন ৮-১৫ সর্গ, কখনু বা ১৩-১৫শ সর্গ বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকরূপে স্বতন্ত্রভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিন খণ্ড 'রঘুবংশ' একত্র প্রকাশিত হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'রঘুবংশ-সরল সঙ্কলন' (পৃ. ৭৬) প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। শোক-গীতি। জুন ১৯০০। পৃ. ২৮।

সূচী :—পরলোক-গতা মা'র ছবি দর্শনে (মহাকবি Cowper কুপার-কৃত "On the Receipt of my Mother's Picture" অবলম্বনে); গ্রাম্য-দেবালয়-সন্নিহিত শ্মশান দর্শনে (প্রসিদ্ধ কবি গ্রে Gray প্রণীত Elegy অবলম্বনে); পিতৃবিয়োগে; কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরলোক প্রাপ্তি শুনিয়া; মোহিনীর মৃত্যু শ্রবণে (মহাকবি বায়রণ কৃত Elegy on Thyrza অবলম্বনে)।

৪। শিশুপাল বধ। (বাংলা পদ্যে অনুবাদ)
প্রথম ভাগ, ১-২ সর্গ। ইং ১৯০৩। পৃ. ৩৭।
দ্বিতীয় ভাগ, ৩-৫ সর্গ। ইং ১৯০৫। পৃ. ৯৬।
টীকা ও "মহাকবি মাঘের জীবনী" সম্বলিত।

৫। কিরাতার্জ্জুন: (বাংলা পদ্যে অনুবাদ)

প্রথম ভাগ, ১-৫ সর্গ। ইং ১৯০৬। পৃ. ৯২।
দ্বিতীয় ভাগ ৬-১০ সর্গ। ইং ১৯১৪। পৃ. ৮২+১৮ একাদশ সর্গ।
টীকা ও "মহাকবি ভারবির জীবনী" সম্বলিত।

৬। চারুচর্য্যা-শতক। চৈত্র ১৩১৯ (ইং ১৯১৩)। পৃ. ৪৮।

ব্যাস-দাস ক্ষেমেন্দ্র-কৃত চারুচর্য্যা শতকের বাংলা পদ্যে অনুবাদ; মূল ও টীকা সম্বলিত।

"ক্ষেমেন্দ্রকৃত 'চারুচর্য্যা' নামক এই গ্রন্থ মাত্র ১০০ শ্লোকে পূর্ণ। এই গ্রন্থটি এত সারবান্ যে ইহার গুরুত্ব আকার অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক। ক্ষেমেন্দ্র এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে মহাভারত রামায়ণের প্রায় সমস্ত সারগর্ভ উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। এক একটি শ্লোকে এক একটি করিয়া উপদেশ এবং তাহার পৌরাণিক উদাহরণ সন্নিবিষ্ট করায় এই গ্রন্থ একপ্রকার সনাতন ধর্মোপদেশের সার-সংগ্রহ রূপই হইয়াছে। এতাদৃশ সারগর্ভ ও স্বল্পাকার গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যেও অতি বিরল।"—শরচ্চন্দ্র দাস।

নবীনচন্দ্র ইংরেজীতেও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, সেগুলি এই :—

Miracles of Buddha. 1895.
Ancient Geography of Asia. 1896.
A Note on the Antiquity of the Ramayana. 1899, pp. 14.

সাময়িক-পত্র : 'বিভাকর' ও 'প্রভাত' সম্পাদন

"কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে...পঠদ্দশায় উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া 'বিভাকর' নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। কাগজখানি প্রায় এক বৎসরকাল চলিয়াছিল।"—'জন্মভূমি', ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৪।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (মাঘ ১৩১৯) মাস হইতে নবীনচন্দ্রের সম্পাদনায় 'প্রভাত' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত শেষ-পর্য্যন্ত ইহার সহ-সম্পাদক ছিলেন। 'প্রভাত' চট্টগ্রাম-শাখা-পরিষদের মুখপত্রস্বরূপ ছিল। নবীনচন্দ্র ১৩১৮ সালে শাখা-পরিষদের জন্মাবধি উহার সভাপতি ছিলেন। 'প্রভাত' দুই বৎসর চলিয়াছিল; ইহাতে নবীনচন্দ্রের অনেক রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল।

২১ ডিসেম্বর ১৯১৪ (৬ পৌষ ১৩২১) তারিখে, ৭২ বৎসর বয়সে, চট্টগ্রামে নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে।

সংস্কৃত-সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া বঙ্গবীণাপাণিকে যাঁহারা সমৃদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, কবি নবীনচন্দ্র দাস তাঁহাদের একজন। তিনি চেষ্টা করিলে হয়তো পাঠযোগ্য মৌলিক কবিতা ও কাব্য অনেক রচনা করিতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার কাব্য-সংগ্রহেই মিলিবে; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া রঘুবংশ, কিরাতার্জ্জুন, শিশুপালবধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্যগুলিকে ভাষান্তরিত করিয়া বাঙালী পাঠকের যে মহদুপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। ইংরেজী কাব্যসাহিত্য হইতেও তিনি অনেক রত্ন সংগ্রহ করিয়া বাংলা ভাষাকে পুষ্ট করিয়াছেন। অতুলনীয় নিষ্ঠার সহিত তিনি মূলের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকি। তাঁহার উপরোক্ত কাব্য তিনখানি বাংলা সাহিত্যের সম্পদরূপে চিরদিন গণ্য হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নারী

কণ্টকঘন দুঃখগহন সরণির সহচরী,
জানা-অজানার ছায়ালোকে, নারী, তোমারে বরণ করি।
অৰ্দ্ধেক তব রূপ সুকুমার, অৰ্দ্ধেক গোপনতা,
কোমল কণ্ঠে অৰ্দ্ধেক বাণী, অৰ্দ্ধেক নীরবতা;
কল্পলোকের পল্লবে তুমি মিশায়ে প্রাণের ভাষা
আশার আলোকে রাঙাইয়া তোল জীবনের পূর্ব্বাশা;
রহস্যময়ী চিত্তবিজয়ী, সুন্দরী অয়ি নারী,—
বন্দনা তব গাহিতে কি পারি, তুমি যে স্বপনচারী!

গন্ধের তুমি রজনীগন্ধা, ছন্দের তুমি দোল,
বর্ষানিশীথে বিজলীর লেখা, মলয়ের হিল্লোল;
পল্লবরুচি দেহবল্লরী মন্থরতায় ভরা
সোহাগে-আদরে বাঁধিবারে নরে হে চিরস্বয়ম্বরা!
মেঘদূত ফিরি' তব সন্ধানে চিরদিন বিব্রত,
গৃহ-তপোবন-আলো-করা তুমি শকুন্তলার মত;
সুখে অনসূয়া, দুঃখের দিনে তুমি সে প্রিয়ংবদা,
গৃহ-আশ্রমে চির-ভিক্ষুণী বিনা "উপসম্পদা"!

একাধারে তুমি লক্ষ্মী ও বাণী, দুর্গা দুর্গতির,
কভু শিবে দলি' প্রকট-জিহ্বা অনাচারে শক্তির,
ঘরে ঘরে তুমি অন্নপূর্ণা, অন্নের থালা বহ,
রোগে-শোকে তুমি ইষ্টদেবতা, কানে বরাভয় কহ ;
মাতৃরূপের মহিমার সাথে রমণী সে রমণীয়,
আধেক বদ্ধ আধেক মুক্তি কামনায় কমনীয় !
শক্তির সাথে শান্তি মিলাও হে চিরগোপনচারী,
কবির প্রণতি লহ তুমি সতী, রহস্যময়ী নারী !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

লোক-সাহিত্যের ভাবধারা

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত্তি হিসাবে প্রবাদ ও ছড়াগুলির যে কতখানি মূল্য আছে, সে কথা আজ নূতন ক'রে বোঝাবার দরকার নেই। আমরা সবাই জানি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস এই ছড়া ও প্রবাদগুলি থেকেই পাওয়া যায়। সেইজন্য এগুলি দরকারী।

বেহারেও বাংলার অনুরূপ প্রবাদ, ছড়া, লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। সেগুলির সঙ্গে বাংলার লৌকিক সাহিত্যের এত বেশি সাদৃশ্য যে, সেগুলি প্রকাশ ক'রে দেখাবার লোভ সংবরণ করা কঠিন। বেহার ও বাংলায় যে একই সংস্কৃতি ছিল, তার প্রমাণ এই প্রবাদ ও ছড়াগুলি। আমাদের এখনকার কারবার বেহারী ছড়া ও প্রবাদ নিয়ে। এগুলির ভাষা হিন্দী নয়। এগুলি ত্রিহুত অঞ্চলের কথিত ভাষায় রচিত। জেলাভেদে ভাষারও সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়। এ ভাষাটা সরল মধুর গ্রাম্য ভাষা। এর বিস্তারও অনেক। ভাষা অনেকটা বাংলার অনুরূপ। হিন্দীর মত মহা আড়ম্বর ক'রে হঠাৎ "হায়" শব্দে শেষ হয়ে ভাষার গাম্ভীর্য্য নষ্ট করে না। এই ভাষাকে বাংলার মত ঐশ্বর্য্যশালী ভাষায় পরিবর্ত্তিত করা চলতে পারত। হিন্দী সাহিত্যে এই সব বেহারী ছড়া ও গানের উদ্ধারের চেষ্টা চলেছে কি না জানি না।

যে প্রবাদ ও ছড়াগুলি এখানে দেওয়া হ'ল, সেগুলি নানা লোকের মুখ থেকে সংগৃহীত এবং বহুদিন থেকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। এগুলি যে পুরাতন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ছড়াগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের রচনা হ'লেও প্রবাদগুলিকে যথেষ্ট পুরাতন ব'লেই মনে হয়। গ্রাম্য ভাষায় রচিত ব'লে ভাষা অনেক জায়গায় বিকৃত হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় গ্রাম্যতাদোষও দেখা দিয়েছে।

বেহার ফসল-ঐশ্বর্যে ধনী হ'লেও এখানকার সাধারণ লোক বড় গরিব। ডাল ভাত রুটি খায় বড়লোকেরা। গরিবরা খায় ভাজা, নয়তো মকাই-মরুয়ার রুটি। যখন কুড়ে লোকেরা আরামে ব'সে ডাল-ভাত খায় আর কামাসুত অর্থাৎ কর্মী লোকে খেটেখুটে সেই ভাজা চিবিয়েই থাকে, তখন এরা বলে—

কোঢ়িকে দালভাত, কামাসুতকে ভুজা।

ব'সে-থাকা মানুষ যত অকাজ করে। "বৈঠল বনিয়া কেয়া করে? এ কোঠিকে ধান উ কোঠি করে।" ব'সে-থাকা বেনে এক কুঠির ধান অন্য কুঠিতে অর্থাৎ গোলায় জমা করে, যার কোনই দরকার নেই। বড় কর্মীরা যেখানে কাজ ক'রে উঠতে পারে না, সেখানে অকর্মণ্যের হাঁকডাকই বেশি, যেমন রুই-কাতলার চেয়ে পুঁটি মাছের ফরফরানি বেশি। "বড় বড় ঘোঢ়া ভাসল যায় লড়্ ঘোঢ়া কহে কতেক পানি?" অর্থাৎ বড় বড় ঘোড়া ভেসে যায়, ছোট ঘোড়া এসে জিজ্ঞাসা করে, কত জল? এর উল্টো ছড়াও আছে, বড় বড় বীরদের পরাজয় ঘটল, অবশেষে পাতলা চেহারার রামজীই ধনুকে জ্যা আরোপণ করলেন।

বড়া বড়া বীর সব গেলন পরায় (পরাভব)
পাতর রামজী ধনুখা লগায়।

সব ছৌড়ী ঝুমর পারে; লুল্হি কহে হম হু।

সব ছুঁড়ীরা ঝুমুর নাচছে, নুলো মেয়েটিরও নাচবার শখ। হাততালি দিয়ে নাচাই ঝুমুর নাচের বিশেষত্ব।

গলামে পড়লই ঢোল ত বজাবেকে।

গলায় ঢোল বেঁধে দিলে বাজানোই ভাল, আর না বাজিয়েই বা উপায় কি?

সুপ দুষ্লন চল্নীকে জিন্কা বাহাত্তর গো ছেদ।

সুপ অর্থাৎ কুলো চালুনিকে নিন্দা করে, যার নিজেরই বাহাত্তরটা ছিদ্র।

অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করে, তেমনই ছেঁড়া কাপড়ের খেন্রী পরা যার অভ্যাস, সে শাড়ি সহ্য করতে পারে না, বার বার শাড়ি খুলে খেন্রীই পরে।

খেন্রীকে বান মোরা শাড়ী ন সোহায়
উছলি উছলি দেহ খেন্রী পর যায়। (মজঃফরপুর)

চোর চোর মউস্থরাত ভাই (মাসতুতো ভাই)
সাঁঝে হসুয়া ধরলন পিঁজাই।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, সাঁঝের বেলাই দায়ে শান দিয়ে রাখল।

শাও দুখে ভিন্ ভেলি; ননদ্ পড়্লন বখ্রামে।

শাশুড়ীর দুঃখে ভিন্ন হলাম, কিন্তু ভাগ-বাটোয়ারাতে ননদটি আবার ঘাড়ে পড়ল।

কুত্তরা তাকে বিলাইয়া কে মু, ঘরমে হমহি তু।

কুকুর বেরালের মুখ চেয়ে বলতে চায়, ঘরে তুমি আমি ছাড়া কেউ নেই।

মায় করে কুটায়ন পিষাওন, পুতকে নাম দুর্গাদত্ত।

মা ধান ভেনে গম পিষে খায়, ছেলের নাম দুর্গা দত্ত। বাংলা দেশে যেমন বলে পোঁটাচুন্নির বেটা পদ্মবিলাস।

লেড়কা শিখাবে বুড়্দাদীকে ঘষ্কল চল্গে দাই।

ছোট ছেলে বুড়ো ঠাকুমাকে ব'সে ব'সে ঘসটে চলা শেখায়।

শাওনমে জনমলন সিয়র ভাদোমে অলই বাঢ়

সিয়র বাহ্‌লন বাপ্ রে এইসন বাঢ় কভি ন দেখলি।

শ্রাবণ মাসে শেয়ালের জন্ম, ভাদ্র মাসে এল বন্যা, শেয়াল বললে, বাবা, এমন বন্যা কখনও দেখি নি!

তিন পোয়া ধান হয়; তিন গো মেহমান হয়।

ভইয়াকে সাগাই আউর ভৌজীকে আবাই হয়।

তিন পোয়া ধান ঘরে আছে। তিনটি অতিথির সৎকার, ভাইয়ের বিবাহ ও ভাবী বা বউদির আগমন সবই এই ধান দিয়ে হবে। বাংলায় যেমন তিন পো দুধের ছড়া আছে।

মায় গুণে বছরু, পিতা গুণে ঘোড়

ন কুছ্ তো থোড়ো থোড়।

মার গুণ দেখা দেয় বাছুরের মধ্যে, আর পিতার গুণ ঘোড়ায়। সম্পূর্ণ না হ'লেও কিছু কিছু লক্ষণ থাকবেই। ঠাট্টার ছলেই এ প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়।

বেহারী মেয়েরা উপযুক্ত সময়ে সুন্দরভাবে এই প্রবাদগুলি ব্যবহার করে।

এবার বেহারী ছেলে-ভুলানো ছড়া থেকে দু-তিনটি উদাহরণ দিই। শিশুকে ভোলাতে হ'লে উপস্থিতবুদ্ধি দ্বারা আবোল-তাবোল ছড়া রচনা ক'রে সুর ক'রে গেয়ে মা তার মনোরঞ্জন করেন। ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের একজন সরকারী বা সার্ব্বজনীন মামা আছেন। তিনি হচ্ছেন চাঁদ। অমন ঝকঝকে জিনিস দেখলে ছেলেরা সহজেই মুগ্ধ হয় আর তার পরিচয় করাবার সময় মা তাঁর বাপের বাড়ির সম্পর্কেই পরিচয় করান। হিন্দীতে চাঁদমামুর ছড়াটি সম্ভবত বৌয়া অর্থাৎ খোকার পিসী বা কাকার তৈরি, কারণ, তাতে খোকার মা—তাদের ভৌজীর উল্লেখ আছে।

চান্‌মামু চান্‌মামু হাসুয়া (কাস্তে) দ'
সে হসুয়া কাহেলা ? খড়হি কটাবে লা,
সে খড়হি কাহেলা ? বংলা ছবাবে লা,
সে বংলা কাহেলা ? ভৌজীকে রহেলা,
সে ভৌজী কাহেলা ? বৌয়া হোয় লা,
সে বৌয়া কাহেলা ? গোলিডাণ্টা খেলে লা,
গোলি ডাণ্টা টুট গেল্‌ বৌয়া রুষ্‌ গেল্‌।

চাঁদমামা কাস্তে দাও। কাস্তে দিয়ে কি হবে? খড় কাটা হবে। খড় দিয়ে হবে কি? বাংলা-বাড়ির চাল ছাওয়া হবে। বাংলাতে কি হবে? বউদি থাকবে। বউদিকে দিয়ে কি হবে? ছেলে হবে। ছেলে করবে কি? গুলি-ডাণ্ডা খেলবে। গুলিডাণ্ডা ভেঙে গেল, ছেলেও রেগে গেল।

বাংলায় 'আগডুম বাগডুম'-জাতীয় ছড়া অর্থহীন হ'লেও শিশুমহলে খুবই জনপ্রিয়। বেহারেও 'অটকন মটকন' এর অনুরূপ। এটাও একটা খেলা। কিন্তু এর মানে করা শক্ত।

অটকন মটকন দহিয়া চটকন
বড় ফুলে বড়েলা ফুলে (ফুল ফোটা).
শাওনমে করৈলা ফুলে
হে বেটি তু বনমে যা
বনমে সে কসইলি (সুপারি) লা;
কচ্চে কচ্চে তু খা, পক্কে পক্কে হম খাই'
নেউরা গেলন চোলি কেলি মমোরি, উঠা কটোরি।

টেনেটুনে একটু মানে দাঁড়ায়, তা হচ্ছে এই—শ্রাবণ মাসে করলার ফুল হয়, মেয়েটি, তুমি বনে গিয়ে সুপুরি আন, কাঁচাগুলি তুমি খাও, পাকাগুলি আমি খাই।

বৃষ্টি তাড়াতে হ'লে আমরা বলি—লেবুর পাতা করমচা, যা বৃষ্টি ধ'রে যা। বেহারী বাচ্চারা তখন বলে—এক পইসাকে লাই, মেঘ বা বিলাই। এক পয়সার খই মেঘ বিলীন হয়ে যাও। ব্যাঙের সঙ্গে সব দেশের শিশুদের একটি অদ্ভুত যোগাযোগ আছে। অনেক দেশের শিশু-সাহিত্যে ব্যাঙের কাহিনী পাওয়া যাবে। বাংলা দেশের এক সুবুদ্ধি তাঁতীর দুষ্টবুদ্ধি ছেলে ব্যাঙ মেরে কি বিপদেই পড়েছিল! এখানেও দুষ্ট ছেলেদের ব্যাঙের ফৌজের ভয় দেখানো হয়।—

কর লেড়্‌কা আই পাই
বেঙকে ফৌজ শির পর আই।

বাংলায় কতকগুলি সামাজিক ছড়া আছে। সেকালে কুলীন ঘরে বিবাহের দুঃখ, কুলীন জামাইয়ের অপদার্থতা, শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার, মেয়েদের করুণ জীবন-কাহিনী সব ছড়াগুলি থেকে জানা যায়। এদেশেও ওইরকম ছড়া ও গান আছে। বাংলা দেশে যেমন বুড়ো বরে বিয়ের দুঃখ, এদেশে তেমনই ছোট বরে বিয়ের দুঃখ। ঘর দেখবার কেউ না থাকলে অনেক সময় ছোট ছেলের জন্যে বেশ বড়সড় দেখে কাজকর্ম্ম-জানা বউ আনা হয়। বাড়ির বড় বউ ঘরের লক্ষ্মী ব'লে বড় ছেলে যদি মারা যায়, তবে তার পরের ভাই বড় বউকে বিবাহ ক'রে লক্ষ্মী অচলা রাখে। অবশ্য আজকাল এসব নিয়ম ক্রমশ উঠে যাচ্ছে, তা হ'লেও এই উভয় প্রথাতেই বর ছোট হয়। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দুর্দ্দশা এদেশেও আছে। মেয়ের বিবাহ দিতে না পারলে যেমন পাপ, কন্যাদান করাও তেমনই পুণ্য-কাজ। যার কন্যা নেই, সেও অন্যের কন্যা চেয়ে নিজের খরচে দান ক'রে পুণ্য অর্জ্জন করে। এত ক'রে মেয়ের বিয়ে হয়, কিন্তু হয়তো বরটি ছোট হয়ে যায় অথবা অন্য কারণে কন্যা সুখী হয় না। সেইজন্যে কন্যাদানের সময় একটা গান মেয়েরা গায়, যার ভাব ও ভাষা দুই সুন্দর। মেয়ে জিজ্ঞাসা করছে বাবাকে—

কাহে বিনা বাবা হো, জউরী (পায়েস) ন সিঝেলা
কাহে বিনা হোম ন হোই হো।
কাহে বিনা বাবা হো কুল অন্ধকার ভইলে
কাহে বিনা ধরম ন হোই হো ?

কিসের অভাবে বাবা পায়স সিদ্ধ হয় না ? কিসের অভাবে হোম হয় না ? কিসের জন্যই বা লোকের কুল অন্ধকার হয় ? ধর্ম্মই বা কি অভাবে রক্ষা হয় না ? তখন বাবা উত্তর দিচ্ছেন—

দুধ বিনা বেটি হো, জউরী ন সিঝেলা
ঘি বিনা হোম ন হোই হে
একহি পুত্র বিনা কুল অন্ধকার ভইলে
ধিয়া বিনা ধরম না হোই হে।

দুধের অভাবে পায়স সিদ্ধ হয় না, ঘি অভাবে হোম হয় না। একমাত্র পুত্রের অভাবে কুল অন্ধকার হয়, কন্যা না থাকলে ধর্ম্ম অর্জ্জন হয় না। মেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে—

কৌন গরহনিয়া বাবা সাঁঝহি লাগেলা
কৌন গরহনিয়া ভিনুসার হে ?
কৌন গরহনিয়া বাবা বউবা সিরে লাগেলা
কব দুনা উগ্রহনী হোইহে ?

কোন্ গ্রহণ সন্ধ্যায় এবং কোন্ গ্রহণ সকালে হয়? আপনার শিরের উপর আজ কোন্ গ্রহণ লেগেছে, এ ছাড়বেই বা কখন? বাপ বলছেন—

চাঁদ গ্রহণিয়া হো বেটি সাঁঝহি লাগেলা
সুরুয গরহনিয়া ভিনুসার হে
তোহরে গরহনিয়া বেটি মোরা শিরে লাগেলা
কব ছুনা উলুঝনী হোইহে? (ছাপরা)

চন্দ্রগ্রহণ রাত্তে এবং সূর্য্যগ্রহণ দিনে হয়, তোমার গ্রহণ আজ আমার মাথার ওপরে কবে মুক্ত হবে জানি না। বিবাহের পর মেয়েটি কিন্তু সুখী হ'ল না। বরটি তার বয়সে ছোট হ'ল। তখন বাবা আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন—

উর্ব্বর ক্ষেতে হো বেটি কাঁকর বোইলে
না জানি তিত কি মিঠ হে
উঁচি ঠাকুরাইয়া দেখি বিয়াহলি হো বেটি
না জানি ছোট কি বড় হে।
সোনবা যো রহিতে হো বেটি
ফেক সে বদ'ল তো
রূপবা বদললো ন যায় হে
পুতবা যো রহিতে বেটি হো
ফেক সে বিয়াহিতো
ধিয়বা বিহায়ল ন যায় হে। (ছাপরা)।

উর্ব্বর ক্ষেতে কঙ্কর বপন করেছি। বপন করার সময় ফল তেতো কি মিঠে তার বিচার করি নি। উচ্চ কুলশীল দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, কিন্তু বরটি ছোট কি বড় তা জানি নি। সোনা হ'লে ফের বদলে নিতাম, কিন্তু রূপ বদল হয় না (বিভিন্ন জায়গায় রূপ, রূপা ও নসীব কথাটি ব্যবহার হয়), ছেলে হ'লে আবার বিয়ে দিতাম, কিন্তু মেয়ের আর বিয়ে দেওয়া চলে না।

মেয়ের এরকম ভাগ্য হওয়াতে পরে বোধ হয় এই মেয়েটিই আক্ষেপ ক'রে বলেছিল—

বারহ বরিষ সখি বিয়া ভয়ো
বর লাগতু হ্যায় বেহরি নারীকে নাতি
মন অপনা জানে ধাঁড় হু হুয়
নাহক লোক কহে এয়বাতি।

দিন কেপে হসিতে খেলিতে
যব রৈ নঁবিতে উব কড়কে মোরা ছাতি।

সখি, বারো বছর বিবাহ হয়েছে, বরটিকে দেখলে মনে হয়, সে আমার নাতির বয়সী। আমি মনে জানি, আমি বিধবা; কিন্তু মূর্খ লোকেরা বলে, আমি এয়োতী। হেসে খেলে দিনটা একরকম কাটে, কিন্তু রাত্রিটা বেদনাদায়ক। চিত্রটি করুণ বটে।

সুন্দরীর অহঙ্কার যে, তার কাজল সিঁদুর ও জরির টিপ-পরা রূপ দেখে লোকে পাগল হয়ে মরতে বসে।

কাজ্‌রা পেন্‌হে তো দশ মরে
সেনুরা পেন্‌হে তো বিশ
আর টিকুলী সাঁটে জরাও কে
তো নিশ্‌দিন মরে পচিশ।

কি রেমার্ক।

ধর্ম্মমূলক কাহিনী, রূপকথা, রাসলীলা, দোল, বারমাসা, 'বালালখীন্দর' ইত্যাদি বহু গান ও ছড়া এদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনটাই অখণ্ডরূপে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সুন্দর ভাবধারার মধ্যে অনেক জায়গায় গ্রাম্যতাদোষ ঢুকে নষ্ট ক'রে দেয়। 'ছট' বেহারীদের শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব। আমাদের দেশের সূর্য্যের ব্রতে যে সব ছড়া আছে, ছটের গানগুলিও ঠিক তাবই মত। কিন্তু এত বেশি গান যে, প্রকাশ করাটা আজকালকার কাগজের বাজারে একরকম অসম্ভব। পুরো সব গানগুলি পাওয়া না গেলেও এর থেকে প্রমাণ হয় যে, বাংলা সাহিত্যের গোড়ায় যা অবস্থা ছিল, বেহারেও ঠিক তাই ছিল। এত উপাদান থাকা সত্ত্বেও বেহারে কোন খাঁটি বেহারী সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে নি। যে সাহিত্য আছে, সেটা হচ্ছে হিন্দী। একই সংস্কৃতির কাঠামোর ওপর বেহারের সাহিত্য ও বাংলার সাহিত্য গ'ড়ে উঠছিল। বেহারের সাহিত্য হয়তো কালে বাংলার মতই হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু কিসের অভিশাপে যে বেহারের সংস্কৃতিতে এমন ভাঁটা প'ড়ে গেল, তা কে জানে!

বেহারের গ্রাম্য সাহিত্য অনুসন্ধান ক'রে এখনও অনেক ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। হিন্দী সাহিত্যের প্রতিভার সঙ্গে বেহারের পুরাতন সংস্কৃতির অভিনব সংমিশ্রণে ঠিক বাংলার মত ধনী ভাষা ও সাহিত্য তৈরি করা যদি সম্ভব হয়, তবে বাংলা ও বেহারের দুটি সাহিত্য পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দুস্থানেরই গৌরব ঘোষণা করবে।

শ্রীউর্ম্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

বম্বে প্রিণ্ট

ডগডগে টকটকে ঝলমলে ঝিকমিকে পাড়
রঙের তুফান তুলে বন্ধহারা চলেছে হুদ্দাড়
ভয়ঙ্কর 'ভিবজিওর' ডোরা-কাটা ছাব্‌কা ছাব্‌কা
আতঙ্ক বাপ্‌কা।

ফুট ফুট ছিট ছিট গোল গোল নানা ছবি আঁকা
মুরগী-ময়ূর-হাঁস-তিত্তির বা প্রজাপতি-পাখা
অথবা আরণ্য-শোভা ফুল ফল লতার পাতার
আতঙ্ক দাদার।

ঝকমকে নয় খুব, অথচ যা ভিতরে ভিতরে
অন্তঃশীলা ফল্গুসম এড়াইয়া চলিছে ইতরে
বেশ-দামী অথচ যা ভেক ধরে অল্প-দামীর
আতঙ্ক স্বামীর।

শরীর পাখনা যেন জরি-দেওয়া জর্জেট খোল
মনে হয় অনুরাগে আবরিবে তনুটি নিটোল
ঘর্ম্ম ছোটে মর্ম্মান্তিক দাম যবে শুনায় 'হুজুর'
আতঙ্ক সবার।

নাই কোন রং ঢং, নয় মোটে ফ্যাশন-বিহ্বল
সাত্ত্বিক সরল সাদা (সপ্তবর্ণ-সম্মিলন-ফল !)
পাড়েতেই মারপ্যাঁচ ভোজবাজী 'বোম্বাই খেল'-এর
আতঙ্ক ছেলের।

রাজরাণী মেথরাণী ছুঁড়ী বুড়ী বিবিধ মাপের
ব্রাহ্মণী শূদ্রাণী বেশ্যা সতী সাধ্বী মুস্লিম কাফের
দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে পার বুঝি হইল পগার
আতঙ্ক সবার।

"বনফুল"

আর্টিস্ট

কুক্ষণে কিংবা সুক্ষণে জানি না, গঙ্গাগোবিন্দ কুণ্ডুর পুত্র ভজগোবিন্দ কুণ্ডু বারোয়ারীতলার যাত্রায় শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়া টাকা দেড়েক আন্দাজ একটি সুক্ষ্ম রূপার মেডেল পাইয়া বসিল। আর যায় কোথা? বাড়িতে, আত্মীয়-স্বজন-মহলে তাহার খাতির এরূপ বাড়িয়া গেল যে, ভজগোবিন্দের পক্ষেও কিছুদিন যেন আদর সামলানো দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

গঙ্গাগোবিন্দের উপর্যুপরি দুইটি কন্যার পর ভজগোবিন্দ একমাত্র পুত্র. সেইজন্য স্নেহের ভাগটা ইতিপূর্ব্বে তাহার ভাগে কিঞ্চিৎ অধিক তো পড়িয়াছিলই, এখন আবার চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। আহারে, পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্যে ভজগোবিন্দের নিকষকৃষ্ণ অবয়বটি কষ্টিপাথরের কৃষ্ণঠাকুরের মত চকচক করিতে লাগিল।

গঙ্গাগোবিন্দের মুদীখানার দোকান। সকালে সন্ধ্যায় পাড়ার চক্রবর্ত্তী মশাই, মুকুজ্যে মশাই নিয়মিতভাবে বাজারে যাইবার সময় সেখানে বসিয়া তামাক খাইয়া যাইতেন। তা ছাড়া গঙ্গাগোবিন্দের দেবদ্বিজে কিঞ্চিৎ ভক্তিবাহুল্য থাকায় জিনিসপত্র সেখানে অপেক্ষাকৃত সস্তায় পাওয়া যাইত। সেদিন তাঁহারাও তামাক খাইতে আসিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, গঙ্গা, পালা পেয়েছ বটে এবার তোমার ছেলে ভজু—ও বেঁচে থাকলে বুঝছ কিনা ইত্যাদি।

গঙ্গাগোবিন্দ হিসাবের খাতা লেখা বন্ধ করিয়া, রূপার চশমা জোড়া চোখ হইতে নামাইয়া একগাল হাসিয়া বলিয়া উঠিল, আপনাদের শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ, ছেলেটা বেঁচে বর্ত্তে থাকে, তবেই।

চক্রবর্ত্তী তামাক খাইতে খাইতে হুঁকা হইতে মুখটা সরাইয়া বলিয়া উঠিলেন, বাঁচবে তো বটেই, তা ছাড়া কি কাণ্ড করে দেখ! ব'লে দিলুম, ও তোমার বংশের নাম রাখবে। ব্রাহ্মণের বাক্যি মিথ্যে হবে না, দেখে নিও।

গঙ্গাগোবিন্দ পরম সন্তোষের সহিত 'হেঃ-হেঃ' করিয়া একটু বিনয়নম্র সলজ্জ হাসি হাসিল। চক্রবর্ত্তী যাইবার সময় পাঁচ পোয়া গুড় অর্দ্ধেক মূল্যে বাড়ি লইয়া গেলেন।

মুকুজ্যে মশাইয়ের বুদ্ধি প্রখরতর। চক্রবর্ত্তী উঠিয়া যাইতেই তিনি অর্দ্ধ-উৎপাটিত দন্তপংক্তি বাহির করিয়া বলিলা উঠিলেন, গিন্নি বলছিলেন গঙ্গাকে বোলো হে, ছেলে যে এবার আসর মাত করলে, তার জন্যে সে আমাদের খাওয়াচ্ছে কবে?

গঙ্গা সহাস্যেই বলিল, বেশ তো, বেশ তো, বাবে ব'লবেন—এ তো ভাগ্যের কথা!

মুকুজ্যে বলিলেন, থাক, সে যখন হবার হবে, আপাতত কিছু ময়দা আর ঘি দাও ভায়া—আমোদ ক'রে লুচি ভেজে খাওয়া যাক! ওর আর দাম দিচ্ছি না কিন্তু।

দামের কথা কে বলছে আপনাকে! নিন না।—বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ নিজের হাতেই উক্ত দ্রব্যাদি ওজন করিয়া দিয়া দিল। পুত্রগৌরবে গঙ্গাগোবিন্দ এখন দাতাকর্ণকেও হার মানাইতে প্রস্তুত!

২

যাত্রার শ্রীকৃষ্ণের গলা ভাঙিয়াছে সম্ভবত আন্তরিক চীৎকারে, কিন্তু তাহার গলা সারাইবার জন্য বাড়িসুদ্ধ সকলে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। আদা-বাটা, মরিচ-বাটা, ব্রাহ্মীশাক-ভাজা, কবিরাজী ঔষধ কিছুই বাকি রহিল না; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অথচ জমিদার-বাড়িতে পূজার সময় 'নন্দদুলাল' অভিনয় হইবে, ভজগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভাবের কথা। যাত্রার অধিকারী প্রমাদ গনিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় আর একটি ছোকরাকে নামাইয়া দিলেন। গঙ্গাগোবিন্দের যেন সর্বনাশ হইয়া গেল। পরমেশ্বর, এ কি করিলে? বেচারী পরমেশ্বরের কিন্তু দোষ ছিল না, কারণ কোন বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া মাইনর ইস্কুলের হেড-পণ্ডিত আসিয়া খবর দিলেন যে, ভজগোবিন্দ গোপনে গাঁজা খাইতেছে। এ সংবাদ দেওয়ার ফল হইল এই যে, গঙ্গাগোবিন্দ ছেলেকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইল। পড়াশুনা যেটুকু হইতেছিল তাহা বন্ধ হইল, কিন্তু কণ্ঠের অবস্থা ভাল না হইয়া ক্রমশ বাজখাঁই আওয়াজ দিতে আরম্ভ করিল।

মুখুজ্যে মশাই আসিয়া পরামর্শ দিলেন, গঙ্গা, তোমার ছেলের গলা এখন খাসা বৈঠকী গানের উপযুক্ত হয়েছে, ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও, সেখানে গানের ইস্কুলের অভাব নেই, তা ছাড়া রেডিওর কল বেরিয়েছে, ওকে সবাই লুফে নেবে। এ পাড়াগাঁয়ে কজনই বা চিনবে বল? গঙ্গাগোবিন্দ মাথা নাড়িয়া বলিল, তা তো বটেই।

ভজগোবিন্দ কলিকাতায় আসিল। মাসিক ষাট টাকা করিয়া হাতখরচ। সুবিধামত গুরুকরণও হইয়াছে। গুরুদেবের নাম ভোলানন্দ হালদার, খুব ঘরোয়ানা ঘরের গান তাঁহার ঠকে আছে, চিন্‌কিলিচ খাঁর গুরুভাই জবরদস্ত খাঁর সাকরেদ। ধ্রুপদ খেয়াল ছাড়া আর কোন সঙ্গীতকে আমল দিতে চাহেন

না, বিশুদ্ধ গানের চর্চ্চা করিয়া তিনি কলিকাতার বহু পাড়ায় মার খাইয়াছেন, বর্ত্তমানে লালবাজার থানার কাছে পুলিসের হেপাজতে থাকেন। রাত্রে তিনি গানের রেওয়াজ করিতে পারিবেন না—এরূপ মুচলেখা দেওয়া সত্ত্বেও পুলিস-কমিশনার মহাশয় তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার হেড-কোয়ার্টার্সের কাছাকাছি নজর রাখিবার জন্য বাসা লইতে বাধ্য করাইয়াছেন। ভজগোবিন্দ ইঁহারই কাছে নাড়া বাঁধিল এবং প্রাতঃকাল হইতে বেলা আটটা পর্য্যন্ত রাসভকণ্ঠে সঙ্গীতসাধনা শুরু করিল।

এহেন গুরুদেবও মাঝে মাঝে সেই সঙ্গীতে চমকাইয়া উঠিতেন, কিন্তু ছাত্রের অবস্থা ভাল জানিয়া এমন কোন কথা বলিতেন না, যাহাতে সে পালায়। বরং মাঝে মাঝে অসহ্য হইয়া উঠিলে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেন, জীতা রহো বেটা, তুম হামারা নাম ডুবায়গা! গুরুদেবের 'ডুবায়গা'র বদলে 'চুবায়গা' বলাই ঠিক ছিল, কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বে নিজেই নিজেকে ডুবাইয়া ছিলেন, এখন তাঁহার নাকানি-চুবানি খাওয়াটাই বাকি ছিল। ভজগোবিন্দ ভাবিত, কেল্লা মারিয়া দিয়াছি, গুরুদেবও গান শুনিয়া নার্ভাস হইয়া পড়িতেছেন। অতএব পরদিন হইতে দ্বিগুণ উৎসাহে রেওয়াজ শুরু হইল, গাঁজার সূক্ষ্ম ধোঁয়া লাগিয়া লাগিয়া গলা চিড় খাইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য 'সা' বলিয়া আওয়াজ বাহির করিতেই 'সারেগামাপাধানিসা'র সব কয়টি সুরই কণ্ঠের সবগুলি পর্দ্দার ফাঁক দিয়া একত্রে বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিত। ভোলানন্দ প্রমাদ গনিলেন। মাসিক চল্লিশ টাকা হাতছাড়া হইবার ভয়ে ছাত্রকে তাড়াইলেন না, কিন্তু প্রত্যহ সন্ধ্যায় কালীমার্কা দেশী বোতলের যে সদ্ব্যবহার করিতেন তাহার মাত্রা এমন বাড়াইয়া দিলেন, যাহাতে শিষ্যের রেওয়াজের টাইম পর্য্যন্ত নেশাটা পুরাপুরি থাকিয়া যায়। সত্যই অসহ্য!

তিন বৎসর কাটিয়া গেল। সরস্বতীপূজার এক বারোয়ারীতলায় ভজ-গোবিন্দ আমন্ত্রিত হইয়াছে। বিনা পারিশ্রমিকে সে গান গাহিবে। মিনিট দশেক গাহিয়াছে, এমন সময় কর্ম্মকর্ত্তাদের একটি ছোকরা কানের কাছে আসিয়া চুপিচুপি বলিল, স্যার, হয়েছে, আপনি একটু থামুন, মাঠ যে খালি হয়ে গেল, এইবার আর একজনকে গাইতে দিন।

ভজগোবিন্দ এই অপমান সহ্য করিল না, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, কভি নেহি। গানের আওয়াজ রাগমিশ্রিত হইয়া সপ্তমে চড়িল। বারোয়ারীতলার পিছনে একটি রসিক ছোকরা হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওকে চ্যাংদোলা ক'রে বাইরে নিয়ে যাও। কথাটা শুনিয়া আসরে একটা হাসির তরঙ্গ বহিয়া

গেল। ভজগোবিন্দ ক্ষিপ্ত হইয়া আসরে বিরাট তানপুরা লইয়া ঘুরাইতে আরম্ভ করিল। তাহার গানের অপমান! ইহার পর কি হইল না বলাই ভাল, কে কাহাকে মারিল ঠিক নাই, তবে ভজগোবিন্দকে সাত দিন হাসপাতালে অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

ভজগোবিন্দ গুরু ভোলানন্দের কাছে গিয়া বলিল, গুরু, বারোয়ারীতলার কাণ্ড শুনেছেন তো?

ভোলানন্দ একটু চটিয়া বলিলেন, শুনেছি বইকি, যেখানে সেখানে গান গাইতে গেলে ওই রকমই হয়। তোমায় যা দিয়েছি তা খানদানি ঘরের চাল, কস্মিন-কালে কোন বেটা পাবলিকের বাপের সাধ্যি আছে তা বুঝবে? ভজগোবিন্দ ভাবিল, এ আবার কি কথা, তাহার গান কেহ বুঝিবে না! তবে এতদিন ধরিয়া সাধনা করিয়া ফল কি হইল? একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল, লোকে যদি বুঝলই না, তা হ'লে গান গেয়ে লাভ?

ভোলানন্দ আরও চটিয়া বলিলেন, ওরে মুখ্যু, এইটে বুঝলি না? ঘরোয়ানা ঘরের চাল এ কি রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে? লোকে বুঝলে না, ভারি ব'য়েই গেল। চ'লে যা রেডিও অফিসে, সেখানে গবর্মেণ্টের পয়সায় গান গাইবি। কে না শোনে দেখি!

ভজগোবিন্দ রেডিওতে গান দিবার জন্ম দরখাস্ত করিল, একদিন পরীক্ষাও দিয়া আসিল, কিন্তু সেখানকার কর্তারা তাহাকে আমল দিলেন না। ভজগোবিন্দ মহাক্রুদ্ধ হইয়া রেডিওকে প্রাণ ভরিয়া গালি দিল, ভাবিল এখানে গুণী নাই, থাকিলে তাহার আদর হইতই।

৩

কলিকাতার যে বাসায় সে থাকিত, সেখানে রেডিওর এক গায়ক বাস করিতেন, ভজগোবিন্দ তাঁহাকে গিয়া বলিল, দেখেছেন মশাই, রেডিও কোম্পানির আক্কেলটা, আমার গান বাতিল ক'রে দিলে, যত সব অখাদ্য জুটেছে ওইখানে, ওরা গানের কি বোঝে, বলুন তো?

কথাটা যাহাকে বলিল, তিনি রেডিওতে মাঝে মাঝে গাহিয়া থাকেন। অতএব এ সংবাদে তিনি বিশেষ আত্মতৃপ্তি অনুভব করিলেন। মুখে বলিলেন, সত্যিই তো, আপনার কদর ওরা কি বুঝবে? তা ছাড়া আমার মনে হয় কি জানেন, আপনার টাইপের আর্টিষ্ট ওখানে এত বেড়েছে যে, আর বেশি হ'লে বোধ হয়, যে কটা লাইসেন্স পাছে তাও থাকবে না, তাই—

বাধা দিয়া ভজগোবিন্দ বলিয়া উঠিল, আমার মত ওদের আর্টিষ্ট আছে, না

কচু আছে, আমার মত খানদানি ঘরের চাল কোন বেটা ছাড়ুক তো দেখি! এই বলিয়া ভজগোবিন্দ তান, গিটকিরি, আলাপ, প্রলাপের এত নমুনা দেখাইতে শুরু করিল যে, ভদ্রলোক অতি কষ্টে গভীর রাত্রে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। এদিকে গঙ্গাগোবিন্দ পুত্রের অদর্শনে অস্থির হইয়া তাহাকে ক্রমাগত বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্ত চিঠির পর চিঠি লিখিতেছে, কিন্তু ভজগোবিন্দের প্রতি চিঠিতেই এক উত্তর, আর্টিষ্ট না হইয়া বাড়ি ফিরিব না।

অবশেষে সত্যই সে আর্টিষ্ট হইল। বউবাজারে হারাধন মল্লিক বলিয়া একটি ছোকরার সহিত তাহার কোন এক সূত্রে আলাপ হইল। হারাধন সিনেমায় মেয়ে সাপ্লাই করিত, দুই-পাঁচ জন আর্টিষ্টের সহিত তাহার জানাশুনাও ছিল, তাহাদের কায়দাকানুন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও বড় কম লাভ করে নাই—সে প্রতিশ্রুতি দিল, ভজগোবিন্দকে আর্টিষ্ট করিবেই। ইহার জন্ত মাসিক পঞ্চাশ টাকা তাহার চাই। ভজগোবিন্দ তাহাতেই রাজী। বাপের কাছে মাসিক একশত টাকা চাহিয়া বসিল। গঙ্গাগোবিন্দ পত্র লিখিল যে, তাহা হইলে মুদীখানার রিজার্ভে হাত পড়িবে। ভজগোবিন্দ উত্তরে লিখিল, পড়ুক, আর্টিষ্ট হইয়া যাহা রোজগার করিব, তাহাতে স্বর্গস্থিত তোমার চতুর্দশ পুরুষ স্তম্ভিত হইয়া যাইবে।

হারাধন বলিল, ঠিক আছে, ইন্‌আর্টিষ্টিক ফাদারকে উপযুক্ত জবাবই দেওয়া হয়েছে।

ভজগোবিন্দ বলিল, যাক, এখন ভাই এ লাইনের একজন ভাল লোক দাও, সাধনা করতে হবে তো!

সাধনা!—হারাধনের চোখে মুখে বিস্ময়, বলিল, এঃ, তুমি দেখছি নেহাৎ পাড়াগাঁয়ের লোক—বাংলা দেশে আর্টিষ্ট হতে গেলে আবার সাধনা করতে হয় বুঝি? স্রেফ কৌশল আর এডভারটিজমেণ্ট! এখানে সাধনা করেছ কি মরেছ! তুমি তো আউটভোটেড হয়ে যাবে হে!

তাই নাকি!—ভজগোবিন্দ অপ্রস্তুত হইল।

নিশ্চয়। এখন শোন, আর্টিষ্ট হতে হ'লে বাপু প্রথমে তোমার গাঁজাটি ছাড়তে হবে।

কেন?

হ্যাঁ। এখানে ডিরেক্টর-ফিরেক্টর হতে গেলে গাঁজা খাওয়া চলতে পারে, কিন্তু আর্টিষ্টের ও দ্রব্যটি স্পর্শ করা চলবে না।

হারাধনের কথায় ভজগোবিন্দ একটু চিন্তিত হইল। এতদিনের অভ্যাস সহসা ছাড়িয়া দেব কি করিয়া? হারাধন বলিল, কোন ভাবনা নেই, মদ ধর।

মদ না খেলে আর্টিষ্ট সমাজে খাতির নেই। প্রথমে নিজে খরচ ক'রে খাবে, পরে তোমার ভক্তরা আর বন্ধুরাই তোমাকে খাওয়াতে শুরু করবে। আর আর্টিষ্ট মহলে যা খাতির হবে, তা আর ভোলবার নয়।

সত্যই হারাধনের উপদেশমত কার্য্য করিয়া ভজগোবিন্দ হাতে হাতে ফল পাইল। দেখিল, আর্টিষ্ট, ক্রিটিক, বন্ধুবর্গ, ভক্তবৃন্দ সকলে মদ্যপানে জহ্নুমুনিকে হার মানাইতেছে। সে সুরাতরঙ্গে সব বুঝি ডুবিয়া যায়! ভজগোবিন্দ মাঝে মাঝে বমি করিয়া ফেলে, হারাধনকে বলে, এর চেয়ে ভাই গাঁজা ছিল ভাল। হারাধন চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলে, তুমি একটা ফুল, কলকাতার কোন ভদ্রসমাজে মেশবার অনুপযুক্ত, আমারই কাছে যা বললে বললে, খবরদার।

ভজগোবিন্দ মাফ চাহিয়া আরও পাঁচজন আর্টিষ্টকে ডাকিয়া মদ খাওয়ায়। দেখা যায়, ইতিপূর্ব্বে যাহারা তাহাকে গালি দিত, আজ তাহারা আনন্দের আতিশয্যে গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সহিত একত্রে ট্যাক্সিতে উঠিতেছে।

মদ ধরিয়া, লম্বা চুল রাখিয়া, কাবুলী জুতা পরিয়া, দোদুল্যমান দীর্ঘ হাতাওয়ালা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া, চুলে তেল না মাখিয়া ভজগোবিন্দ এমন আর্টিষ্টিক চেহারা করিয়া বসিল ও গলা এমন মিহি করিয়া ফেলিল যে, অল্পদিনেই লোকের মুখে ভজগোবিন্দের নাম ছাড়া আর কথা নাই। তাহা ছাড়া ইদানীং হারাধন তাহাকে রানিংফ্লাশের বড় বড় ষ্টেক ধরাইয়া সকলের মাথা ঘুরাইয়া দিতেছিল।

হারাধন বলিল, কি রকম দাদা, দেখছ? আর্টিষ্ট ভজগোবিন্দ একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, হুঁ। হারাধন মুখ দেখিয়া বুঝিল যে, তাহার শিষ্য পারফেক্ট আর্টিষ্ট বনিয়া গিয়াছে। কারণ এমন মধুর চালের মুখটেপা হাসি সত্যকারের আর্টিষ্ট ছাড়া বাহির হয় না।

বাপ গঙ্গাগোবিন্দ মাসে দুইবার করিয়া টাকা পাঠাইতেছে, কিন্তু সেও ফতুর হইবার উপক্রম হইল। পুত্রের আর্টিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই গঙ্গাগোবিন্দের মুদীখানার অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। গঙ্গাগোবিন্দ বাড়ি ফিরিয়া কারবার দেখিবার জন্য আকুল আগ্রহে তাহাকে একটি পত্র লিখিল। পত্রের মর্ম্মাংশ এই যে, আর আর্টিষ্ট হইয়া দরকার নাই, ঘরে ফিরিয়া এস, তাহা না হইলে আর টাকা পাঠানো সম্ভব হইবে না।

ভজগোবিন্দ হারাধনকে পত্রটা দেখাইতে সেও বিশেষ চিন্তিত হইল, কারণ ইতিমধ্যে মদের দোকানে বাকি বিলের টাকার অঙ্কটা একটু 'শঙ্কাজনক' হইয়া উঠিয়াছিল। হারাধন কি ভাবিয়া দুই-তিনবার ভ্রূ-কুঞ্চনের সহিত পত্রটি পড়িয়া

পরে বলিল, তুমি এক কাজ কর, একটা মোটা টাকা চেয়ে পাঠাও, আর লিখে দাও যে, খুচরো দেনাগুলো শোধ হ'লেই বাড়ি ফিরবে। তারপর ভেবে চিন্তে যা হয় একটা করা যাবে।

ভজগোবিন্দ বলিল, দেনাটা না হয় মিটবে, কিন্তু তারপর যে ভাববার কথা।

হারাধন নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিয়া উঠিল, দূর তোর ভাবনা, কলকাতা শহরে নালা দিয়ে টাকা গড়িয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধি যার আছে সেই তুলে নেয়। তুমি ইংরেজ পাড়ায় একটা 'শো' দাও তো দেখি। তারপর দেখ কি রকম কি হয়!

'শো'র আয়োজন হইল। ইতিমধ্যে ভজগোবিন্দের বহু ছাত্রী জুটিয়াছে, নিজের নাম বদলাইয়া আর্টিষ্টিক নামকরণ করিয়াছে—পেলবকুমার। লোকের মুখে মুখে শুধু পেলবকুমারের নাম। কলেজের ছাত্ররা পেলবকুমার ছাড়া আর কাহাকেও গায়ক বলিয়া স্বীকার করে না; তরুণীরা পেলবকুমারকে পাইলে যে কি করিবে, তাহা তাহারাই জানে না। কালো হইলে কি হয়, হাসিলে গালে যে টোল পড়ে, তাহা দেখিলে তরুণীদের সত্যই টাল সামলানো দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

চৌরঙ্গীতে 'শো'!

কলিকাতা শহরের অ্যারিষ্টক্র্যাটরা ভাঙিয়া পড়িল। বহু সাপ্তাহিক, দৈনিকের সমালোচকবৃন্দ যাচিয়া টিকিট লইলেন, গ্রীনরূমে গিয়া পাঁচবার তত্ত্বাবধান করিলেন ও পরে সকলে এক এক গ্লাস হেল্‌থ পান করিয়া স্ব স্ব কাগজে তিন পৃষ্ঠা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লিখিয়া ফেলিলেন। নিমন্ত্রণের অন্ত নাই। কাহার অনুরোধ রাখা যায়? হারাধন শুধু চুপিচুপি সতর্ক করিয়া গেল, সাবধান, সব্বাইকে কথা দাও, কিন্তু কোথাও যেও না! ভজগোবিন্দ বলিল, সেটা কি ঠিক হবে? হারাধন বলিল, ওই তো দাদা, মাঝে মাঝে তুমি চাল ভুল কর। বড় আর্টিষ্ট হ'তে গেলে কক্ষনো কথার ঠিক রাখতে আছে?

ভজগোবিন্দ ভাবিয়া বলিল, ঠিক। কিন্তু মিসেস মুখার্জির ওখানে—

হারাধন হাসিয়া বলিল, মেয়েদের কথা আলাদা, ওঁরা যে লক্ষ্মী! সেখানে তো ঠিক সময়ের আগে যাবে।

ভজগোবিন্দ মেয়েদের সহিত সত্যই এত আগাইয়া যাইতে লাগিল যে, অবশেষে তিনটি মেয়েকে বাধ্য হইয়া বিবাহ করিতে হইল।

৪

ইতিমধ্যে গঙ্গাগোবিন্দ পটল তুলিয়াছে, হারাধন কোথায় জুয়াচুরি করিয়া ধরা পড়িয়া জেলে গিয়াছে, যুদ্ধ বাধিয়া তাহাকে বিলাতি মদের অভাবে স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তিনবার বিবাহের পর অপর ছাত্রীরা ভয়ে

সরিয়াছে ও বিয়াহের পরে বাহিরে অজস্র নিন্দাবাদে তাহার খ্যাতির বিলুপ্তির শেষ কোঠায় গিয়া পৌঁছাইয়াছে। প্রকৃত আর্টিষ্ট জীবনের চরম দুঃখ ভজগোবিন্দের কপালে এইবার নামিয়া আসিল। ভজগোবিন্দ কিছুতেই আর ধাক্কা সামলাইতে পারিতেছিল না।

তাই তো, এ কি হইল? এতদিন তো প্রেম করিয়া বেশ চলিতেছিল, বিবাহ করিয়া সমস্ত ওলটপালট হইয়া গেল যে, আশ্চর্য্য! তিনটি সংসার, কাহারও কাছে শান্তি নাই, অথচ গোটা নয়েক পুত্র কন্যা। ভজগোবিন্দ পড়ন্ত সূর্য্যের মত দীপ্তিহীন, সে অর্থ নাই, মদ খাইবার পয়সা নাই, তাহার বন্ধুরা পলাইয়াছে, ক্রিটিকরা তাহাকে গালি দিয়া আবার আর একজন নবাগতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, স্তাবকরা তাহারই ছায়া মাড়ায় না।

দেশের অবস্থা কিরূপ তাহা তাহার জানা নাই। তা ছাড়া এতদিন শহরে কাটাইয়া এখন কি গ্রামে ফিরিতে পারিবে? ভজগোবিন্দকে পরামর্শ দিবে কে? হারাধন? সে তো এখন জেলে।

ভজগোবিন্দ জীবনের পিছনে-ফেলিয়া-আসা পথটার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, কিছু দেখা যায় না, সমস্ত যেন এক ধূসরতার ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। একটা বিরাট হৈ-হৈ কোলাহলের মধ্যে তাহার মৃত পিতার অস্ফুট আর্ত্ত কণ্ঠস্বরের ব্যাকুল আহ্বান ছাড়া সেখানে আর কিছু নাই।

ভজগোবিন্দ দেশে ফিরিল। মুদীখানার দোকানে বসিয়া আজ যখন সে হিসাব দেখে, তখন ভাবে, এতদিন সে কি ভুলই না করিয়াছে! বুড়া চক্রবর্ত্তী, মুখুজ্যে মশাই কুঁজা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বেঁকিয়া বেঁকিয়া এখনও গুড়, চিনি, ময়দা লইতে আসেন, ভজগোবিন্দ তিন গুণ দাম চাহিয়া বসে।

তাঁহারা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলেন, বলিস কি?

ভজগোবিন্দ ঠিক বাপের মতই হাসিয়া বলে, আজ্ঞে, ঠিকই বলছি। যুদ্ধের বাজার, এখনও যে মাল পাচ্ছেন, এই ঢের। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

সংবাদ-সাহিত্য

গোপালদা পড়িতে লাগিলেন—

"আমি দেখিতে পাইতেছি," অহিংসা ও সংযমের প্রতিমূর্ত্তি, শীর্ণকায় ক্ষুদ্রদেহ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী লাঠিহস্তে দৃঢ় অথচ ধীর পদক্ষেপে মালাবার পাহাড়ের দিকে চলিয়াছেন। সুবিখ্যাত ডাণ্ডি-অভিযানের কথা স্মরণ

হইতেছে; নন্দলাল বসুর সেই ছবিটি যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছি। আজিকার অভিযান সেদিনের অভিযান হইতেও গুরুত্বপূর্ণ। মাউণ্ট প্লেজেণ্ট রোডের বাংলো হইতে অখণ্ড ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতায় তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কঠিনতম কাজ; সেই কাজ সম্পন্ন করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প তাঁহার সর্বদেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অহিংসা ও মানব-প্রেম তাঁহার অন্তঃকরণকে বিগলিত করিয়া মুখাবয়বে এমন একটা কোমলতা আনিয়া দিয়াছে যে মনে হইতেছে, তাঁহার সম্মুখে পড়িলে পৃথিবীর কঠিনতম প্রাণও সহসা উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে। মনে পড়িতেছে, আমেরিকার মনীষী উইল ডুর‍াণ্টের কথাগুলি—

Picture the ugliest, slightest, weakest man in Asia, with face and flesh of bronze, close-cropped gray head, high cheek bones, kindly little brown eyes, a large and almost toothless mouth, larger ears, an enormous nose, thin arms and legs, clad in a loin-cloth, standing before an English judge in India, on trial because he has preached liberty to his countrymen. Picture him again similarly dressed, at the Viceroy's palace in Delhi, in conference on equal terms with the highest representative of England. Or picture him seated on a small carpet in a bare room at his Satyagrahashram, or School of Truth Seekers, at Ahmedabad; his bony legs crossed under him in Yogi fashion, soles upward, his hands busy at a spinning-wheel, his face lined with the sufferings of his people, his mind active with ready answers to every questioner of freedom. This naked weaver is both the spiritual and the political leader of 320,000,000 Hindus; when he appears in public, crowds gather round him to touch his clothing or to kiss his feet: not since Buddha has India so reverenced any man. He is in all probablity the most important, and beyond all doubt the most interesting, figure in the world today. Centuries hence he will be remembered when of his contemporaries hardly a name will survive.

ফরাসী ঋষি রমাঁ। রলাঁর কথাগুলিও আজ আমার ফিরিয়া ফিরিয়া মনে হইতেছে—

This is the man who has stirred to action three hundred millions of men, shaken the British Empire, and inaugurated, in human politics, the most powerful moral movement since nearly two thousand years....Only the Cross is wanting to him. Everyone knows that, without the Jews, Rome would have refused it to Christ. And the British Empire is like the Roman Empire. The elan has been created. The' soul of the Eastern Peoples has been stirred to its very depths and vibrations are heard all over the earth.

Great religious appearances in the East have always a rhythm. One of two things will surely happen: either the faith of Gandhi will be crowned with success, or it will repeat itself, just as centuries ago Christ and Buddha were born, in the complete incarnation of a mortal demi-God of a principle of life that will lead future humanity to a safer and more peaceful resting-place.

নিউইয়র্কের কমুইনিটি চার্চের ধর্মযাজক রেভারেণ্ড জন হেনেস হোমসের সেই সুবিখ্যাত উক্তিটিও আজ ভুলিতে পারিতেছি না। তিনি মহাত্মা গান্ধীকে

"Unquestionably the greatest man living in the world to-day, and one of the greatest men who has ever lived" বলিয়া শেষে লিখিয়াছেন—

When I think of Gandhi, I think of Jesus Christ. He lives his life; he speaks his word; he suffers, strives and will some day nobly die, for his kingdom upon earth.

সেই মহাত্মা গান্ধী আজ সম্ভবত শেষ বারের জন্য ভারতবর্ষের মুক্তি দাবি করিবার প্রাক্‌কালে ভারতবর্ষের ভ্রান্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে সেই দাবিতে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশে সর্বস্ব পণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন। হে ভারতবাসী, তাঁহাকে নমস্কার নিবেদন করিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যেন তাঁহার এই যাত্রা সফল হয়; তিনি যেন এ দেশের মুসলমানকে মুসলমানত্বে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াই স্বদেশপ্রেমে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারেন, তাহাদের অন্ধ স্বার্থবুদ্ধি যেন ভারত-চেতনাকে খণ্ডিত করিয়া শতাব্দীব্যাপী স্বাধীনতা-সংগ্রামকে ব্যাহত না করে, যেন—"

গোপালদা পড়িতে পড়িতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া মুখে একটু বাঁকা হাসি ফুটাইয়া বলিলেন, লিখেছ তো বেশ, কিন্তু তোমার এ-যুগের ভগবান কি এত অল্পে টলবেন? সে-যুগের ভগবান আরও অনেক কৃপাপরবশ থাকা সত্ত্বেও নরদেহে-স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য কি নিষ্ফল হয় নি? মহাভারতের উদ্যোগপর্বের ব্যাপারটা মনে আছে তোমার? তোমরা এ যুগের ব্যাপারী, সে-যুগের কথা মনে না থাকাই সম্ভব। মনে করিয়ে দিচ্ছি। শোন—

"অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি সমুদায় কুরুবংশীয়গণের প্রধান সুহৃৎ; তুমি আমাদের উভয় পক্ষেরই সম্বন্ধী ও স্নেহভাজন; অতএব যাহাতে আমাদের ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের মঙ্গল হয়, এরূপ কার্য্য কর। তুমি মনে করিলেই অনায়াসে শান্তি করিতে পার। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি এখান হইতে কুরুসভায় গমন করিয়া অতিক্রোধন দুর্য্যোধনের নিকট সন্ধিস্থাপনের কথা উল্লেখ করিবে। যদি ওই অল্পবুদ্ধি তোমার ধর্মার্থযুক্ত মঙ্গলজনক বাক্যে সম্মত না হয়, তবে তাহার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! কৌরবগণের মঙ্গল করা আমার পক্ষে হিতকর ও ধর্মজনক, অতএব আমি উহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বেই ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে গমন করিব।'

...মহাত্মা বাসুদেব...নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণের সম্মান নিমিত্ত নগর অলঙ্কৃত ও রাজমার্গ বহুবিধ রত্নে সমাচিত হইয়াছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা

সকলেই কৃষ্ণদর্শনমানসে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। কৃষ্ণ নগরে প্রবেশ করিবামাত্র তত্রস্থ সমুদায় লোকই রাজমার্গে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল। বাসুদেবের অশ্ব সমুদায় বায়ুবেগগামী; কিন্তু রাজমার্গ জনতায় আবৃত হওয়াতে তাহাদের গতি নষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব বহুপ্রাসাদশোভিত পাণ্ডুরবর্ণ ধৃতরাষ্ট্রভবনে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিন কক্ষা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।"

এ পর্যন্ত তো বেশ মিলে যাচ্ছে, কিন্তু এর পরের অংশটাও যদি মিলে যায় তা হ'লে এত হল্লা এত তোড়জোড় সবই তো সেই মহাকুরুক্ষেত্রে বরবাদ যাবে। তুমি যেমন প্রবন্ধ ফেঁদেছ, তেমন প্রবন্ধ আমিও একটা ফেঁদেছিলাম—বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু এদিক-ওদিক ক'রে। গোড়াটা এইরকম দাঁড়িয়েছিল—

"মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই নব সেন্সস রিপোর্ট উন্নত করিয়া ভোটাধিক্যবলে অর্জ্জিত বিজয়ধ্বনিতে শ্মশান-নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া বঙ্গদেশে পাকিস্থান প্রবেশ করিতেছে। কাল পূর্ণ দেখিয়া বাংলা দেশ হইতে লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, মন্দিরচূড়াসমূহ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল, কুঞ্জবনে পক্ষীগণ নীরব হইল, গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময় শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল, সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল।...গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক ব্যাপিল। আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার, হইয়া লুকাইল! আমি চক্ষে সব দেখিতেছি, আকাশ মেঘে ঢাকিয়েছে, মাউণ্ট প্লেজেণ্ট রোডের বাংলোর সোপানাবলী আরোহণ করিয়া বাংলার রাজলক্ষ্মী হাওয়া হইতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোক-বিন্দুবৎ ঊর্দ্ধে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে।" আরও শুনবে?

বলিলাম, না থাক, দরকার নেই। দোহাই গোপালদা, এ রসিকতার ব্যাপার নয়, আমাদের এখন জীবন-মরণ সমস্যা। এক দিকে খাদ্যাভাবে—

গোপালদার যেন সহসা কোনও কাজের কথা মনে পড়িয়া গেল। হঠাৎ পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আরে, দেখ, বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। দরকারী কাজের জন্যেই এসেছিলাম তোমার কাছে। একটা বিজ্ঞাপন ছাপতে পারবে?

বলিলাম, এখন কি আর জায়গা হবে? বলতে গেলে সুবই এখুনি—

গোপালদা চটিলেন, বলিলেন, 'আনন্দবাজারে' হবে না, 'প্রবাসী'তে হবে না, 'ভারতবর্ষে' হবে না—এখন তোমরাও মাথা নাড়ছ। এই জরুরি ব্যাপারটা নিয়ে কোথায় যাই বল তো? অথচ এর ওপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই দাঁওটা মারতে পারলে আখেরের জন্যে আর ভাবতে হ'ত না।

বেগতিক বুঝিয়া বলিলাম, কপি এনেছেন?

গোপালদা খুশি হইয়া বলিলেন, সামান্যই কপি, চটপট লিখে দিচ্ছি। একটা রোগা হওয়ার ওষুধের বিজ্ঞাপন, পাঁচ সাত লাইন ম্যাটার হবে।

গোপালদা লিখিতে লাগিলেন—

"দেশের দশের এবং নিজের মঙ্গল যদি চান

—রোগা হউন—

মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আজম জিন্না এবং রাজাগোপালাচারীর

কথা স্মরণ করুন। ভারতবর্ষের ভাগ্য কাহাদের হাতে?

—রোগাদের—

মোটারা কোথায়? আবুল কালাম আজাদ, বল্লভভাই পাটেল,

সীমান্ত গান্ধী, সুভাষ বসু? জবাব দিবার প্রয়োজন আছে কি?

জওহরলাল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের দিন আসিতেছে। সমস্ত পৃথিবীর জন্য ভারতবর্ষকে রোগা হইতে হইবে। হিন্দুস্থানের এবং হিন্দুর মোটাত্ব ছাঁটিয়া বাদ দিতে হইবে। এই রোগা হওয়ার উপর পৃথিবীর কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। আপনিই কি মোটা থাকিয়া দেশের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবেন?

রোগা হইবার অব্যর্থ ঔষধ—"

গোপালদার হাত চাপিয়া ধরিলাম, বলিলাম, ছি গোপালদা, সব জিনিস নিয়ে কি ঠাট্টা করা উচিত?

গোপালদা বলিলেন, উত্তম, তবে থাক। কিন্তু পরিবর্ত্তে এক পেয়ালা চা হুকুম কর তো ভায়া।

আমি বাঁচিয়া গেলাম। গৃহিণী প্রস্তুতই ছিলেন।

চা খাইতে খাইতে গোপালদা বলিলেন, এদিককার ব্যাপার শুনেছ?

কোন্ দিককার ব্যাপার কিছুই ঠাহর করিতে না পারিয়া বোকার মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। গোপালদা মুখে সেই অবজ্ঞার হাসিটি প্রয়োগ করিয়া বলিলেন, ছবি তো শেষ হয়ে এল প্রায়। হলিউডের আর নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। এই পাঁচ বছর ধ'রে এই কোটি কোটি টাকা যে ফেললে তারা, এবারে ছবিটা ওৎরালে হয়! এত টাকা জলে না পড়লেই বাঁচি।

আমার মুখের অবস্থা দেখিয়া গোপালদার বোধ হয় দয়া হইল। বলিলেন, তোমাকে অমন ক্যাষ্টর অয়েলের মত মুখ ক'রে থাকতে হবে না ভায়া। সব খুলেই বলছি। আচ্ছা, তুমি কি বলতে চাও কিছুই শোন নি আ্যাদ্দিন?

কই, না তো!

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া থেকে হলিউড আমালগেমেটেড কোম্পানি যে ইউরোপের পটভূমিতে একটা ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ারের ছবি তুলতে শুরু করেছিল, ইউরোপের কণ্টিনেণ্টের প্রায় সব দেশ, মায় রুশ পর্যন্ত, এবং এদিকে ইংলণ্ডও যে কন্‌ট্রাক্ট সই ক'রে নেমেছিল এই কাজে—শোন নি সে খবর?

গোপালদার রসিকতাটা এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। তথাপি শান্তভাবে বলিলাম, ও, সেই ছবির কথা বলছেন? চার্চিল, রুজভেল্ট, গোয়েবল্‌স, রিবেনট্রপ এতকাল ধ'রে যে ছবির পাবলিসিটির কাজ করছেন, সেই ছবি তো?

গোপালদা উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, জান দেখছি। ছবিটা ফিনিশ হয়ে এল ব'লে। বেষ্ট অ্যাক্টর্স প্রাইজ পাবেন হিটলার, মুসোলিনী অনেক দিন অফ্ দি পিকচার হয়েছেন, না হ'লে তাঁরও ক্লেম থাকত। প্রাইজটা কি দেওয়া হবে, তাই নিয়ে কর্তারা এখন মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু আশ্চর্য, এত বড় ছবি, ফিমেল পার্ট নেই বললেই হয়!

বলিলাম, কেন, মাদাম চিয়াংকাইসেক? মাদাম একেভিন বায়েরও নাম করতে পারতাম, কিন্তু তিনি এক্স্ট্রার ভিতর। গোপালদা আরও খুশি, বলিলেন, ঠিক বলেছ। এখন এই ছবির ডিষ্ট্রিবিউশন নিয়ে মারামারি কাটাকাটি চলছে। আটলাণ্টিক চার্টার-এর নাম শুনেছ তো? তাঁরাই হবেন সোল ডিষ্ট্রিবিউটর্স। ভারতবর্ষে ছবি দেখাবার কোন ব্যবস্থাই হয় নি। ঈষ্টার্ন সার্কেলের এজেন্সি পেয়েছেন চিয়াংকাইসেক। শুনছি বাংলাদেশে একটা কমিটি গঠন ক'রে সাব-এজেন্সি দেওয়া হবে; বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, প্রমথ বিশী, বিপিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর শিবশঙ্কর মিত্র, এঁরাই থাকবেন কমিটিতে।

যোগ। হওয়ার ওবুধে যদি আমাকে সাহায্য না কর, তা হ'লে এই কমিটিতে আমাকে যেমন ক'রে পার ঢুকিয়ে দাও। প্রতি হপ্তায় তিনবার নীরদ চৌধুরীর বক্তৃতা শুনি, ওকাজ আমি ঠিক চালিয়ে নিতে পারব।

রসিকতার জবাব রসিকতা দিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু সে ইচ্ছা হইল না। নানা দিক দিয়াই মনে অশান্তি ও অস্বস্তি ধূমায়িত হইতেছিল। গান্ধী-জিন্না সংবাদ তো ছিলই, তাহার উপর দুর্ভিক্ষ কমিশন, ফিলিপস-চ্যাণ্ডলার-পর্ব্ব এবং সর্ব্বাধিক আসন্ন পূজার বাজার লইয়া অতিশয় বিব্রত ছিলাম। গোপালদাকে হাতজোড় করিয়া বলিলাম, দোহাই আপনার গোপালদা, লেখাটা এখনই শেষ করতে হবে, আপনি যান।

* * * *

গোপালদা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু যাবার আগে ব'লে যাই মহারাজ নন্দ, তোমাদের এসব কাগুজে ইয়াকি আর বেশি দিন চলবে না। খবর পেয়েছ তো—তোমাদের এই পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলে হিমমণ্ডল এসে ভর করছেন। সাহারা মরুভূমিতে বরফ পড়বে অচিরাৎ। আমাদের এই বাংলা দেশেও বরফের ঘর বানিয়ে থাকতে হবে। মন্দির মসজেদ সব একাকার হয়ে যাবে ভায়া!

তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বিদায় করিবার জন্য বলিলাম, তার এখনও অনেক দেরি দাদা, অন্তত এক কোটি বছর।

ওই সর্ব্বনাশা আইনষ্টাইন যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন কিছুই ভরসা ক'রো না ভায়া। এসব গোল তো উনিই বাধাচ্ছেন।—বলিতে বলিতে গোপালদা নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ভারতবর্ষকে লইয়া আপাতদৃষ্টিতে (আমাদের চোখে) ইংলণ্ড ও আমেরিকার এক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক মহলে কিছু মন কষাকষি ঘটিতে দেখিয়া এদেশে অনেকের মনে নানা আশার সঞ্চার হইয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ কারণ ভারতবর্ষে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিজস্ব প্রতিনিধি মিঃ ফিলিপ্স-এর দৌত্য। তাঁহার মতে, ভারতবর্ষে শাসন-সংক্রান্ত পীড়নের দ্বারা ইংলণ্ড এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা প্রশান্ত-মহাসাগরীয় যুদ্ধ-পরিচালনার পক্ষে অনুকূল নয়। এই ধরনের দূতিয়ালির ফলে ফিলিপ্সের পুনর্দৌত্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পছন্দ হয় নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ কূটনৈতিক জাল বিস্তার

করিয়া ফিলিপ্‌সের পুনরাগমন রোধ করিয়াছেন। আমেরিকার সেনেটর চ্যাণ্ডলার সেই খ্যাপ্‌লা জাল ছিন্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

• • •

এই ঘটনাটুকুর মধ্যে আমাদের ভালমন্দ আর কিছু থাকুক বা নাই থাকুক, এই সংবাদটি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে যে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ভারতবর্ষ হঠাৎ হাতে স্বর্গ পাইবে না, তাহাকে আরও দীর্ঘকাল পুরাতন ভূমিকাতেই রিহার্সাল দিতে হইবে—যদি না আমেরিকা "ইণ্টারভিন" করে। কিন্তু হতভাগ্য দাসদাসীর পক্ষ লইয়া কোনও বুদ্ধিমান স্বামীই যেমন গৃহিণীর সহিত বিবাদ করিতে ভরসা করেন না, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হওয়া স্বাভাবিক। তথাপি আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিব, আমেরিকার ফিলিপ্‌স-চ্যাণ্ডলারই শুধু নন, সাহিত্যক্ষেত্রে শুধু পার্ল বাক, আপটন সিনক্লেয়ারেরাই নন, আমেরিকার বহু স্বাধীনতা-কামী মনস্বী, কবি এবং রাজনৈতিক ভারতবর্ষের পক্ষে ওকালতি-নামা লইয়া গৃহ-বিবাদ এবং জাতি-বিবাদেও ইতস্তত করেন নাই। কয়েকজন ইংলণ্ডবাসীর এই-জাতীয় উদারতার জন্য রবীন্দ্রনাথ আজীবন ইংলণ্ডের মহত্ত্ব কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। সেখানে জাতির দুর্নীতির জন্য হয়তো লজ্জা আছে, কিন্তু একান্ত-নিরপেক্ষ ও সম্পূর্ণ-নির্লিপ্ত আমেরিকার মহৎ জন আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন, তাহা আমাদের চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষের বীর-সন্তান লালা লাজপৎ রায় ইংলণ্ডের ভাড়াটিয়া ইয়াঙ্কী লেখিকা মিস মেয়োর ঘৃণ্য পুস্তকের জবাবে যে 'দুঃখী ভারত' (*Unhappy India*) পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন তাহার উৎসর্গপত্রেই সমস্ত ভারতবর্ষের হইয়া আমেরিকার মহত্ত্ব এইভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন—

Dedicated with love and gratitude to those numberless American men and women who stand for the freedom of the world; who know no distinctions of color, race, or creed; and who prefer a religion of love, humanity, and justice. To them the oppressed people of the earth look for sympathy in their struggle for emancipation, and in them is centered the hope of world-peace.

"ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার সহিত ইহা সেই সকল সংখ্যাহীন আমেরিকাবাসী পুরুষ ও নারীদিগকে উৎসর্গ করিলাম, যাঁহারা জগতের স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ, যাঁহারা বর্ণ, জাতি ও ধর্মমতের পার্থক্য মানেন না, যাঁহারা প্রেম, মানবতা ও ন্যায় ধর্মে অধিকতর আস্থাবান। পৃথিবীর যাবতীয় নিপীড়িত মানুষ তাঁহাদের মুক্তিসংগ্রামে তাঁহাদের সহানুভূতি কামনা করে এবং জগৎব্যাপী শান্তির আশা তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই।

আজও আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতে চাই 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' পুস্তকের লেখক জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডের কথা, গান্ধীভক্ত জে. এইচ. হোমস-এর কথা। স্মরণ করিতে চাই তাঁহাকে, যিনি অতীত ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস রচনা করিতে বসিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন মন্দির-সন্দর্শনে আসিয়া ভারতবাসীর দুর্দশা দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—

"আমি ভারতবর্ষে গিয়াছিলাম নিজের প্রয়োজনে, আমার 'সভ্যতার কাহিনী' (*The Story of Civilization*) পুস্তকের জন্য যে জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস আমি অনুশীলন করিতেছিলাম, সেই জাতিকে স্বচক্ষে দেখিব বলিয়া। হিন্দুদের দ্বারা আমি আকৃষ্ট হইব এরূপ আশা করি নাই অথবা ভাবাবেগের বশীভূত হইয়া ভারতীয় পলিটিক্সে মাতিয়া উঠিব, এরূপ আকাঙ্ক্ষাও আমার ছিল না। আমার উপকরণ-সম্ভার সামান্যমাত্র বৃদ্ধি করিব, ইহাই ছিল আমার আশা। বর্তমান জগৎকে বিস্মৃত হইয়া প্রাচীন শিল্পের নিদর্শনগুলি নিজের চোখে দেখিয়া পুনরায় আপন ঐতিহাসিক অনুশীলনে প্রত্যাবর্তন করিব, এইরূপই স্থির করিয়াছিলাম।

কিন্তু ভারতবর্ষে গিয়া আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার এই অনুভবই হইল যে, দারিদ্র্য ও উৎপীড়নে পীড়িত এই জাতির (সংখ্যায় যাহারা সমগ্র মানব-জাতির এক-পঞ্চমাংশ) মাঝখানে বসিয়া এই ইতিহাস অনুশীলন ও রচনা অতিশয় তুচ্ছ হৃদয়হীন কাজ—পৃথিবীর আর কুত্রাপি এই দারিদ্র্য ও অত্যাচারের তুলনা মিলিবে না। ঘৃণামিশ্রিত আতঙ্কে আমার মন পীড়িত হইয়াছিল। না দেখিলে আমি বিশ্বাসই করিতাম না যে, কোনও গবর্মেণ্ট তাহার প্রজাদের এতখানি দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে নিমজ্জিত করিতে পারে।

আমি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম যে, ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল অতীতই শুধু নহে, প্রত্যক্ষ বর্তমানও আমার অনুশীলনের বিষয় হইবে। যে অতুলনীয় বিপ্লবে মানুষ ব্যথাবেদনা অক্লেশে গ্রহণ করিতেছে অথচ বিপক্ষকে তাহা ফিরাইয়া দিতেছে না, সেই বিপ্লবের ইতিহাস আরও বিশদভাবে জানিব, বর্তমানকালের গান্ধী ও অতীতকালের বুদ্ধের বিষয় অধ্যয়ন করিব, ইহাও আমি স্থির করিয়াছিলাম। এবং আমার অধ্যয়নে আমি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ঘৃণামিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে ততই অনুভব করিতে লাগিলাম যে, বিগত দেড়শত বৎসরকাল ধরিয়া ইংলণ্ড আপাতদৃষ্টিতে জানিয়া শুনিয়া ও মতলব করিয়া ভারতবর্ষের রক্ত শোষণ করিয়াছে। আমার মনে হইতে লাগিল, আমি প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বীভৎস পাপাচরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

আমি তাই অতীত সম্বন্ধে আমার গবেষণা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিতে চাহিতেছি। আমি জানি, কামান বন্দুক ও রক্তপাতের সম্মুখে শুধু কথা কত দুর্বল; সাম্রাজ্য ও সম্পদের বিপক্ষে সত্য ও শালীনতা কত অর্থহীন। কিন্তু যদি এই ভূমণ্ডলের সুদূর অপরার্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধরত একজন ভারতবাসীও আমার এই আহ্বান শুনিয়া সান্ত্বনালাভ করে, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র বইখানির পিছনে আমার কয়েক মাসের পরিশ্রমকে মধুর জ্ঞান করিব। কারণ কোনও প্রকারে ভারতবর্ষের সাহায্যে আসা অপেক্ষা কোনও শ্রেষ্ঠ কর্তব্যের কথা আজ আমি জানি না।"
—সেই *The case for India* পুস্তকের লেখক উইল ডুরাণ্টের কথা।

আরও মনে পড়িতেছে ওয়েণ্ডেল এল. উইল্‌কির কথা—তাঁহার প্রসিদ্ধ 'অখণ্ড জগৎ' (*One World*) পুস্তকের সর্বশেষে—

"উপসংহারে, আমি যখন বলিতেছি যে এই জগৎ আত্মবিশ্বাসপরায়ণ আমেরিকার পূর্ণ সহায়তা দাবি করিতেছে, তখন আমি প্রাচ্যের অধিবাসীরা যে আমন্ত্রণ আমাদিগকে জানাইয়াছে তাহারই পুনরুল্লেখ করিতেছি মাত্র। পৃথিবীর এই বিরাট নবনির্মাণকার্যে তাহারা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সম্মিলিত জাতিকে অংশীদার পাইলে খুশি হইবে। স্বাধীন জাতিসমূহের এক নূতন সমাজগঠনের কাজে যোগদান করিবার জন্য তাহারা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, এই নূতন স্বাধীনতা শুধু পশ্চিমের অর্থনৈতিক অবিচার হইতে মুক্ত নয়, প্রাচ্যের রাষ্ট্রনৈতিক অনাচার হইতেও মুক্তি বটে। কিন্তু তাহারা এই নূতন বিরাট সম্মেলনে আমাদিগকে সংশয়াকুল, অকর্মণ্য অথবা ভীত অংশীদার হিসাবে চায় না। পৃথিবীর যেখানে যে অন্যায় অবিচার ঘটিবে তাহার বিরুদ্ধে কথা বলিতে দ্বিধা করিবে না, এমন অংশীদার তাহারা চায়।

প্রাচ্যে যাহারা আমাদের মিত্র, তাহারা জানে যে বর্তমান যুদ্ধে আমাদের সকল সামর্থ্য চালিয়া দিতে আমরা উৎসুক। কিন্তু তাহারা আমাদের কাছে এখনই আশা করে—যুদ্ধের পরে নয়, আমাদের হাতে যে বিপুল শক্তি আছে, ন্যায় ও স্বাধীনতার অধিকতর বিকাশের জন্য সেই শক্তি অবিলম্বে আমরা প্রয়োগ করি। যে সকল জাতি এখনও যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই তাহারাও ব্যগ্র আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, আমরা কবে পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক সুযোগ গ্রহণ করিব—যাহার ফলে এক নূতন সমাজসৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিবে। সেই নূতন সৃষ্ট সমাজে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী নারী ও পুরুষ মুক্তি ও স্বাধীনতার আবহাওয়ার পরিপুষ্ট হইয়া শুধু বাঁচিয়া থাকিবে না, ক্রমোন্নতি করিবে।"

"এই সকল পুস্তক যদি শুদ্ধমাত্র চক্ষুর্ধৌতি-ব্যাপার না হয়, ভারতবর্ষকে স্তোকবাক্যদিবার সাময়িক প্রচার মাত্র না হইয়া এগুলি যদি আন্তরিক বেদনার প্রকাশ হয়," তাহা হইলে ভরসা আছে, ইংলণ্ডের অর্থগৃধ্নুতা সত্ত্বেও একদিন ভারতবর্ষের মুক্তি আসিবে।

কোনও প্রকারে প্রণয়, প্রেম, প্রেস ও পাওনাদার ঠেকাইয়া উপরের গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গটি শেষ করিয়াছি, গোপালদা পুনরাবির্ভূত হইলেন। বলিলেন, একটা গল্প লিখে এনেছি, শুনবে? খুব ছোট, যেমন তোমাদের "বনফুল" লেখে। মেরেছি বুকতেই পারছ, তবে উৎস-সন্ধান করতে হ'লে জগদীশ বসুর মত কাউকে বের হতে হবে। অবশ্যি "ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে" তিনি যে কল্পনার বহর দেখিয়েছেন তাতে মনে হয়, তিনি বেঁচে থাকলেও ভয়ের কারণ ছিল না। যাক, পড়ব?

গোপালদাকে কোনও কাজে বাধা দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত। বহুকষ্টে সংযম বজায় রাখিয়া বলিলাম, পড়ুন।

গোপালদা পড়িলেন—

হরিসাধন স্বামী, কমলা স্ত্রী। পাঁচ বৎসর বিবাহিত। একটি মাত্র পুত্র-সন্তান, বয়স এগারো মাস। সাধু স্বামীস্ত্রীতে সচরাচর যেমন হয়, ঝগড়া লাগিয়াই আছে। বিশেষ হরিসাধন ছেলের কান্না একেবারেই সহিতে পারে না, কমলা ছেলের কান্না শুনিতে ভালবাসে। এই কান্না লইয়াই খুঁটিনাটির সূত্রপাত।

খোকার দাঁত উঠিতেছিল, সুতরাং হরিসাধনের পক্ষে বাড়িতে থাকা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে কাটাইলেও রাতটা বাড়িতে থাকিতেই হয়, অন্যথায় অন্য উৎপাতের আশঙ্কা আছে।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই খোকা অমানুষিক কান্না জুড়িয়া দিয়াছিল। কোলে করিয়া নাচাইলে একটু স্থির থাকে, কিন্তু বিকট চীৎকার করিয়া মাঝে মাঝে অতিষ্ঠও করিতে লাগিল। গৃহিণীর রান্নাঘরে কাজ ছিল। তিনি কপালের দোষ, বাপের দোষ ইত্যাদি নানা দোষের কথা সশব্দে আলোচনা করিয়া হরিসাধনের মুখ আগেই বন্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং হরিসাধনকে ছেলে কোলে লইয়া ঠাণ্ডা বারান্দায় বসিতে হইল। হঠাৎ খোকার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সম্মোহন-বিদ্যার "পাস" স্মরণ হইল। ছেলেটাকে মেসমেরাইজ করিলে কেমন হয়? সভীর জলসায় ওই ভাবে হাত চালাইয়া জাদু করিতে হরিসাধন কয়েকবারই দেখিয়াছে।

সে নিজেই অজ্ঞাতসারেই কয়েক দফা পাস চালাইতেই বিস্মিত হইয়া দেখিল, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য খোকা ঠাণ্ডা আছে। নীচে গৃহিণীও এই দীর্ঘস্থায়ী শান্তিতে অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন, সেখান হইতেই হাঁকিলেন, দিলে তো ঘুম পাড়িয়ে? দু ঝিনুক দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াব ভেবেছিলাম—তোমাকে দিয়ে যদি কোনও ভাল কাজ হয়! হরিসাধন দেখিল, খোকা সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রাত্রিটা নিরুপদ্রবে কাটিল। ভোরের দিকে হরিসাধনের ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই সে কিছু বিস্ময় বোধ করিল। এমন তো কখনই হয় না! ভোর পর্যন্ত একটানা ঘুম, খোকা নিশ্চয়ই রাত্রে জাগে নাই। একটা অজ্ঞাত সংশয়ে তাহার মনটা খচখচ করিতে লাগিল।

কমলার তো, মোটেই ভাল লাগিতেছিল না, এ কি কাণ্ড! সে উঠিয়া উনানে আগুন দিতে গেল। হরিসাধনকে খোকার আশেপাশে ঘুরঘুর করিতে দেখিয়া একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিল, দেখো, যেন ঘুমটি ভাঙিয়ে আমার মাথা খেও না। মনে মনে কিন্তু ইচ্ছা ঘুম ভাঙুক, স্বামী অনেকক্ষণ বড় নিশ্চিন্ত আছে।

স্ত্রী নীচে যাইতেই হরিসাধন খোকার নাকের কাছে আঙুল লাগাইয়া পরীক্ষা করিল, না, নিশ্বাস তো ঠিক পড়িতেছে।

বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াই হরিসাধন অফিস গেল। ঘণ্টাখানেক যাইতে না যাইতেই ভাগিনের শশধর খবর আনিল, খোকার ঘুম ভাঙে নাই। মামীমা ভয় পাইয়াছেন, কাঁদিতেছেনও।

সর্ব্বনাশ! ছুটি লইয়া হরিসাধন বাড়িতে ছুটিল। অফিস যাওয়ার সময় যেমনটি দেখিয়া গিয়াছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই পড়িয়া আছে খোকা, পাশ-পর্যন্ত ফেরে নাই। হরিসাধনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। অভিমন্যুর মত ব্যূহ-প্রবেশের উপায়টাই তাহার জানা ছিল, বাহির হইবার পথ জানা নাই। অথচ ইহা লইয়া হৈ-চৈ করিতে গেলেই গৃহিণী কুরুক্ষেত্র করিবেন। হরিসাধন অত্যন্ত চিন্তাকুলচিত্তে ঘটনার গতি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

শেষ পর্যন্ত ছুটিতে হইল ডাক্তারের কাছে, পাড়ার নীলমাধববাবু। তিনি দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, কই, কিছু গোল তো দেখছি না, অথচ—

আঁচলে দিয়া কান্না চাপিতে চাপিতে কমলার হঠাৎ মনে হইল, হরিসাধন কাল রাত্রে কান্না বন্ধ করিবার জন্য কিছু খাওয়াইয়া দেয় নাই তো! আফিম? অথবা কোনও ওষুধ। সে এই সন্দেহের কথা সশব্দেই ব্যক্ত করিল। ডাক্তার জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে হরিসাধনের দিকে চাহিলেন। হরিসাধন নীরব।

শেষ পর্যন্ত বিধান রায় আসিলেন। এক, দুই, তিন, চার,—ডাক্তারদের কমিশন বসিয়া গেল।

গোপালদা থামিলেন। বলিলেন, দেখ, গল্পটা এখনও শেষ হয় নি, কিন্তু এই অবস্থাতেই আমি এটিকে ফেমিন এনকোয়ারি কমিশনে আমার লিখিত সাক্ষ্য হিসেবে দাখিল করতে চাই। পারবে ব্যবস্থা ক'রে দিতে?

বন্ধুবর নলিনাক্ষ সান্ন্যালের কথা স্বতই মনে হইল। বলিলাম, চেষ্টা ক'রে দেখব। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন দেখি, ছেলেটাকে আপনি শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলতে চান নাকি?

শেষ পর্যন্ত তো মরবেই, কিন্তু তার আগে কমিশনের কেরামতিটা একটু বিশদভাবে বর্ণনা করতে চাই।

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই হঠাৎ প্রসঙ্গ ঘুরাইয়া গোপালদা বলিয়া উঠিলেন, আর শুনেছ তো সেই হাওড়া ময়দানের কাণ্ডটা? কত লাখ মণ আহার্য দ্রব্য নাকি সেখানে মাঠে ফেলে দেওয়া হয়েছে?

বলিলাম, শুনেছি। কিন্তু তার সঙ্গে দুর্ভিক্ষ কমিশনের সম্পর্ক কি?

গোপালদা বলিলেন, তারা এদিক ওদিক হাতড়ে বেড়াচ্ছে কিনা! আসল জায়গাটা তাদের দেখিয়ে দিলে হ'ত না!

আমি সত্য সত্যই গোপালদাকে লইয়া দুর্ভাবনায় পড়িলাম। এমনই থাকেন বেশ, কিন্তু মাঝে মাঝে আভ্যন্তরীণ কল কোথায় কি ভাবে যে বিগড়াইয়া যায়, তাঁহার কথাবার্তা সব এলোমেলো ঠেকে।

আমার আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করিয়া গোপালদা হঠাৎ বলিলেন, গল্প আর একটা আছে—"বত্রিশ সপ্তাহের কণ্ট্রোল"—তোমার বউদিদির লেখা। শুনবে?

বলিলাম, এবারে থাক গোপালদা, জায়গা ভর্তি হয়ে গেছে। আসছে বার হবে।

গোপালদা বলিলেন, তাই হবে, কিন্তু এক পেয়ালা চা হয় না ভায়া?

বলিলাম, নিশ্চয়ই।

"কাগজ-নিয়ন্ত্রণ (সদ্যর্য) আদেশে"র দরুন আমরা গতরে ফুলিয়া উচ্চতায় খাটো হইতে বাধ্য হইতেছি, অর্থাৎ আমাদের প্রচারসংখ্যা প্রভূত পরিমাণে নামাইতেছি। কাল শহর এবং মফস্বলের এজেন্টদিগকে আমরা বরাদ্দ অনুযায়ী কাগজ দিতে পারিব না। আমরা সাময়িকভাবে যে সকল অসুবিধার সহিত

লড়াই করিতেছি, তাহা বিবেচনা করিয়া তাঁহারাও সকল অভিযোগ মানাইয়া লইবেন, এই প্রার্থনা। একমাত্র আশার কথা এই যে, কলিকাতার রাস্তায় একচক্ষু মোটরগুলি (নিশীথসময়ে) দুই চক্ষু মারিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, এইবার যাহারা [illegible] বিহিবাহনকে বধ করিয়া পিরোজ্জ্বল হাস্য করিবেন এবং [illegible] টানাটানির [illegible] কাগজের টানাটানিও দূর হইয়া আমাদিগকে [illegible] গানের অবকাশ দিবে। আমেন।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ হইতে নলিনীকুমার ভদ্রের সচিত্র 'বিচিত্র মণিপুর' (মণিপুর সম্বন্ধে এখন আমাদের কৌতূহল জাগ্রত—এই বইখানি সে কৌতূহল অনেকখানি প্রশমিত করিবে), বঙ্কিমচন্দ্রের Rajmohon's Wife-এর বঙ্গানুবাদ 'রাজমোহনের স্ত্রী' ও সেন[illegible]কের 'মৃত্যুদূত' বাহির হইয়াছে।

নূর লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত রেজাউল করীম প্রণীত 'সাধক দারা শিকোহ্'-এর জীবনী ও কীর্তিকাহিনী একটি সর্বজনপাঠ্য উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

শ্রীবাণী গুপ্ত সচিত্র 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' লিখিয়া একসঙ্গে অভিভাবকদের ও ঐতিহাসিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড হইতে প্রকাশিত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'আধুনিক আবিষ্কার' একখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বই। যে সকল বৈজ্ঞানিক কাণ্ডকারখানার কথা আমরা অহরহ শুনি ও দেখি, অথচ ভিতরের কথা কিছুই জানি না, গোপালবাবু সরল ভাষায় চিত্রসহযোগে সেগুলি আমাদের বোধগম্য করিয়া ছাড়িয়াছেন।

দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীবীণা দেবীর 'পুরুষের মন' কয়েকটি সুলিখিত গল্পের সংগ্রহ। পুরুষের মনের বহু ধারার পরিচয় পাইয়া পুরুষেরাই চমকিত হইবেন।

'ললিতা'র তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় খণ্ড দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই সচিত্র শিল্পকলা-বিষয়ক পত্রিকাটির ভবিষ্যৎসম্ভাবনা যথেষ্ট, কর্তৃপক্ষও উদ্যোগী আছেন।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত